শতবর্ষের আলোকে স্বামী মাধবানন্দ

সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম

বাগআঁচড়া, শান্তিপুর, জেলা—নদীয়া

সম্পাদকীয় নিবেদন

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের শুভ আবির্ভাবের শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষে পরিকল্পিত 'শতবর্ষের আলোকে স্বামী মাধবানন্দ' স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। বর্তমান বিশ্বে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের স্বীকৃতি ও অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ সংঘের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই রামকৃষ্ণ সংঘকে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা আপন তপস্যা ও মনীষায় নেতৃত্ব দিয়েছেন, পরিচালনা করেছেন, সেইসব ত্যাগদীপ্ত মহাসাধকদের পুণ্য জীবনকথার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যেও অপরিসীম। ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের অন্বেষক মানুষের কাছে এইসব জীবনকথা হল পথনির্দেশিকা। প্রবাদপ্রতিম এই আধ্যাত্মিক পুরুষগণ যদিও সর্বদাই প্রচার-বিমুখ হয়ে থাকেন এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে যে অত্যাশ্চর্য দিব্যজীবন তাঁরা যাপন করে থাকেন তার বিস্তারিত লিপিবদ্ধ রূপ পাওয়া যায় না। অধ্যাত্মপিপাসু মানবের আলোকবর্তিকারূপী এইসব অনন্য জীবনস্মৃতি কালের অমোঘ নিয়মেই একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মাধবানন্দজী মহারাজের ক্ষেত্রে এই অভাব আরও বেশী করে অনুভূত হয়। কারণ তাঁর মহাপ্রয়াণের পরে বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকা ছাড়া স্বামী মাধবানন্দজীর কোনও সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত তথ্যনির্ভর জীবনী অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি। বর্তমান গ্রন্থে সেই অভাব পূরণের কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও স্বামী মাধবানন্দজীর কর্মময় ও ঘটনাবহুল দীর্ঘ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থের পরিসরকেও যথেষ্ট বলা চলে না।

প্রসঙ্গতঃ স্বামী মাধবানন্দজীর জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘ প্রায় চব্বিশ বছর সাধারণ সম্পাদকরূপে রামকৃষ্ণ সংঘ পরিচালনা করেছেন। সুদীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও নীতিনির্ধারণকারী অছি পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই বিস্তীর্ণ সময়কালে বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা-সংগ্রাম, দেশবিভাগ, ভারতের স্বাধীনতালাভ প্রভৃতি যুগান্তকারী ঘটনার পটভূমিকায় সঠিক পথে পরিচালিত হয়ে রামকৃষ্ণ সংঘের যেমন অগ্রগতি ঘটেছে, ক্রমোন্নতি হয়েছে, সংঘের প্রশাসনিক প্রধানরূপে স্বামী মাধবানন্দজীর কর্মময় জীবনও তেমনি পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে, পরিণতি লাভ করেছে। রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাসে মাধবানন্দজীর

দীর্ঘজীবন সংঘের বিকাশ, বিস্তার ও অগ্রগতির সঙ্গে একত্রীভূত হয়ে আছে। সেজন্য তাঁর জীবনের গতিকে সংঘের অগ্রগতির সঙ্গে এবং তাঁর জীবনের আলেখ্যকে সংঘের ইতিহাসের সঙ্গে যে "সমার্থক" ("synonymous") বলা হয়ে থাকে, তার একটা তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়।

প্রথম সংঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অধ্যক্ষতাকালেই স্বামী মাধবানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম অছিরূপে সংঘ পরিচালনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ঠাকুরের ষোলজন ত্যাগী পার্ষদের মধ্যে বারোজনের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আবার যাঁরা বর্তমানে মঠ ও মিশনের কর্ণধার এবং অন্ততঃ আগামী কুড়ি বছর ধরে যাঁরা সংঘকে পথনির্দেশ দিয়ে যাবেন তাঁরা সকলেই কোন না কোন সময়ে স্বামী মাধবানন্দের পূত সংস্পর্শে থেকে সংঘ পরিচালনার অসাধারণ দক্ষতা প্রত্যক্ষ করেছেন। সেদিক থেকে স্বামী মাধবানন্দকে রামকৃষ্ণ সংঘের অতীত, বর্তমান এবং ভাবীকালের যোগসূত্ররূপে বর্ণনা করা যায়।

স্বামী মাধবানন্দের আধ্যাত্মিকতা, ধ্যানমগ্নতা, প্রজ্ঞা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, কৃচ্ছ্রসাধন, অপরিগ্রহ প্রভৃতি যাঁরা নিয়মিত প্রত্যক্ষ করেছেন সেইসব প্রাচীন সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে "ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের পরেই" স্থান নির্দেশ করে থাকেন। বর্তমান গ্রন্থেও একাধিক লেখক এবিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

সর্বোপরি স্মরণীয়, স্বামী মাধবানন্দ সম্পর্কে সংঘজননী শ্রীমা সারদাদেবীর সেই অপূর্ব মূল্যায়ন—"সোনা দিয়ে বাঁধানো হাতির দাঁত"—যা থেকে স্বামী মাধবানন্দের অনন্য জীবনের মহিমার ধারণা আমরা পাই।

রামকৃষ্ণ সংঘের প্রায় চল্লিশজন প্রাচীন ও নবীন সন্ন্যাসীর মৌলিক রচনা অথবা অনুবাদকর্ম এই গ্রন্থে গ্রন্থিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এবং শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার দুটি মূল্যবান রচনাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। দুটি মলাটের বন্ধনে আবদ্ধ একটি গ্রন্থে এত অধিক সংখ্যক ত্যাগব্রতী জীবনের দিব্যস্মৃতি প্রকাশের নজির আর আছে কিনা আমাদের জানা নেই।

প্রবন্ধগুলিতে যতদূর সম্ভব নির্ভুল তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্যগত ব্যাপারে দ্বিমত থাকলে পাদটীকায় অথবা অতিরিক্ত তথ্য সংক্রান্ত পৃষ্ঠায় দ্বিবিধ তথ্যেরই উল্লেখ করা হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও তথ্য, ভাষ্য, ভাষা এবং বানানের ক্ষেত্রে কিছু অসঙ্গতি থেকে যেতে পারে এবং সেবিষয়ে সুধী পাঠকবৃন্দ অনুগ্রহ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরবর্তী সংস্করণে আমরা সেগুলি সংশোধন করে নেব। কোন কোন রচনায়, বিশেষ করে অনুবাদের ক্ষেত্রে, লেখকের ভাব ও ভাষার মধ্যে অধিকতর প্রাঞ্জলতা ও

পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে কিছু কিছু সম্পাদকীয় সংযোজন করা হয়েছে। প্রথম বন্ধনীভুক্ত সংযোজন লেখকের নিজস্ব।

একাধিক স্মৃতিকথায় একই ঘটনার পুনরুক্তি যতদূর সম্ভব পরিহার করতে চেষ্টা করা হয়েছে। শুধুমাত্র স্বামী বিমলাত্মানন্দ রচিত 'জীবনকথা'র কোন কোন স্থানের সঙ্গে স্মৃতি-সঞ্চয়ন পর্যায়ে প্রকাশিত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের পুনরুক্তি ইচ্ছাপূর্বক বর্জন করা হয়নি, কারণ জীবনকথাটি পূর্বে প্রকাশিত তথ্য ও ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের ভিত্তিতেই লিখিত। পূর্বে প্রকাশিত রচনার পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার নীচে সংশ্লিষ্ট মূল আকর-সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রবন্ধের শেষে রচনাটি অন্যত্র পুনর্মুদ্রিত হয়ে থাকলে সেকথাও জানানো হয়েছে।

এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য সম্পদ হল বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র—যা বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়েছে। রামকৃষ্ণ সংঘের বিস্মৃত অতীতের সাক্ষ্য এই চিত্রমালা পাঠকের মনকে স্মৃতির নির্যাসে অতীতচারী করে তুলবে। এই মূল্যবান আলোকচিত্রগুলি এবং সমকালীন স্মৃতিচিত্রাবলী রসাস্বাদনে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠবে বলে আশা করি।

এই মূল্যবান গ্রন্থটি সম্পাদনার কাজে আমাকে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন, অধ্যাপক বাবুরামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক তাপস বসু, অধ্যাপিকা নীতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিকা সুব্রতা সেন। তাঁদের সকলকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

সম্পাদনার সূত্রে এরকম একটি মহাজীবনের পুণ্যধারায় আমরা অভিস্নাত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। বারবার মনে হয়েছে, প্রতিটি মুহূর্তে আমরা যেন অধিকতর পবিত্র হয়ে উঠছি, আমাদের জীবন অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

আমরা বিশ্বাস করি, রামকৃষ্ণ সংঘে সংঘগুরুর মহনীয় আসনে যাঁরা অধিষ্ঠিত হন তাঁদের মধ্যে লোকহিতায় লোকসুখায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শক্তি আবির্ভূত হয়, বিরাজ করে। 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা' গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামী মাধবানন্দজী যে কথা লিখেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ "সাগরগামিনী বিশালকায়া নদী যেমন বহু শাখা বিস্তার করিয়া বিপুল ভূ-ভাগকে শস্যশালী ও অসংখ্য জীবকে জলদানে তৃপ্ত করে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও সেইরূপ লোকচক্ষুর অগোচর হইয়াও এই অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্য দিয়া তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয়রূপ যুগপ্রয়োজন সাধন ও ত্রিতাপদগ্ধ মানবের শান্তিবিধান করিয়াছেন।"

আজ এই গ্রন্থের প্রকাশমুহূর্তে লোকহিতায় নিত্য বিরাজিত সেই যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, জগজ্জননী সারদাদেবী ও যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের চরণে আমাদের অন্তরের সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানিয়ে এই গ্রন্থার্ঘ্য নিবেদন করছি।

১৪ই মার্চ, ১৯৯৪ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

প্রকাশকের নিবেদন

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় অবশেষে বহু প্রত্যাশিত 'শতবর্ষের আলোকে স্বামী মাধবানন্দ' গ্রন্থটি বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম থেকে প্রকাশিত হল। গ্রন্থটির প্রকাশে এই অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য অনেকে হতাশ হয়েছেন, আমরা অনেকের বিরাগভাজনও হয়েছি। আশাকরি গ্রন্থটি পেয়ে তাঁদের ক্ষোভ অন্ততঃ কিছুটা প্রশমিত হবে। প্রকৃতপক্ষে এই বিলম্বের মূল কারণ আমাদের প্রতিষ্ঠানের দুর্বল পরিকাঠামো। এত বড় একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল এবং অর্থবল দুটিরই অভাব আমাদের রয়েছে। তথাপি এই অবস্থাতেও দেশ এবং বিদেশ থেকে যে প্রচুর পরিমাণ উপাদান সংগৃহীত হয়েছে তাকে এককথায় অমূল্য বলা চলে। বর্তমান গ্রন্থে পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের জীবনী এবং তাঁর স্মৃতিচারণ প্রকাশিত হল। আরও কিছু স্মৃতিকথা এবং পূজ্যপাদ মহারাজজীর নিজস্ব রচনা, বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ ইত্যাদি যা আমাদের সংগ্রহে এসেছে মূল্যবান সেই সম্পদ পরবর্তী একটি পৃথক গ্রন্থে প্রকাশের ইচ্ছা রইল। পরবর্তী গ্রন্থে প্রকাশের জন্য রক্ষিত অবশিষ্ট উপাদানগুলির মধ্যে পূজনীয় মহারাজগণের এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির বেশ কিছু সমৃদ্ধ সাহিত্যকর্মও থেকে গেল। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি তথা মূল্যবৃদ্ধি এবং পাঠকের সীমিত ক্রয়ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে আমরা বর্তমান গ্রন্থটিতে সেসব রচনা অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকলাম। এজন্য সংশ্লিষ্ট লেখক, অনুবাদক ও অন্যান্যদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

১৯৮৪ সালে শ্যামলাতাল বিবেকানন্দ আশ্রমের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী একাত্মানন্দ মহারাজ পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের পুণ্য জীবনকথা অবলম্বনে একটি গ্রন্থ প্রকাশের পরামর্শ দিয়ে আমাদের চিঠি দেন। এরপর ঐ বছরেই অধ্যাপিকা নীতি বন্দ্যোপাধ্যায় (এই গ্রন্থের অন্যতম সহযোগী সম্পাদক) এই একই বিষয়ে আমাদের অনুরোধ জানান। তখন আমরা এই গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতেই ভয় পেয়েছিলাম। এরপর ১৯৮৮ সালে পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের শতাব্দী জয়ন্তী (১৯৮৮-১৯৮৯) চলাকালীন কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত ব্যক্তিগতভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু বেলুড় মঠের পূজনীয় প্রাচীন সন্ন্যাসীগণের ইচ্ছা ছিল পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের জন্মভিটায় প্রতিষ্ঠিত বাগআঁচড়া আশ্রম থেকে গ্রন্থটি

প্রকাশিত হোক্। তাঁদের সেই ইচ্ছাকে নতমস্তকে গ্রহণ করে আমরা এই প্রকাশনার কাজে ব্রতী হয়েছিলাম।

এই গ্রন্থ প্রকাশের কাজে শুরু থেকেই বেলুড় মঠ ও সারদা মঠের পূজনীয় সন্ন্যাসী ও পূজনীয়া মাতাজীদের আশীর্বাদ অজস্র ধারায় আমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে। প্রকাশনার বিভিন্ন স্তরে তাঁদের উপদেশ ও সক্রিয় সহায়তাও আমরা পেয়েছি। প্রকৃতপক্ষে লেখা দেওয়া থেকে শুরু করে, অনুবাদ, সম্পাদনা, বইয়ের উপাদান সংগ্রহ, বিভিন্ন সূত্র ; তথ্য ও অন্যবিধ সহায়তা প্রদান, এমনকি কোন কোন সময়ে প্রুফ দেখার কাজও তাঁরা করেছেন। আমরা শুধু তাঁদের নির্দেশ পালন করে কৃতার্থ হয়েছি মাত্র।

এই গ্রন্থের প্রকাশমুহূর্তে আমাদের আশ্রমের প্রাক্তন সভাপতি পরলোকগত অশোককুমার সেনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। এই গ্রন্থপ্রকাশ তথা আমাদের প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্মকাণ্ডেই তাঁর একান্ত আগ্রহ ছিল। এই গ্রন্থের জন্য তিনি স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের একটি ইংরাজী ভাষণের বঙ্গানুবাদও করে রেখে গিয়েছেন। অশোকবাবু ছাড়া এই গ্রন্থের অন্যতম লেখক স্বামী মিত্রানন্দও সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। প্রকাশিত গ্রন্থটি তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারলাম না বলে আমরা মর্মাহত। এই গ্রন্থের পরিকল্পনা ও প্রকাশনার কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে বহু ব্যক্তির ও সংস্থার কাছে আমরা সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের নাম বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট পর্য্যায়ে একটি পৃথক তালিকায় উল্লিখিত হয়েছে।

গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির বিগত দিনগুলিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরন্ময়ানন্দজীর সানুগ্রহ আনুকূল্যের কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদ ও করুণাপূর্ণ উপদেশ ব্যতীত এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হত না। সেইসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে স্বামী অকুণ্ঠানন্দজী, স্বামী আত্মস্থানন্দজী, স্বামী সত্যঘনানন্দজী, স্বামী প্রমথানন্দজী, স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী শিবময়ানন্দজী প্রমুখ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসীগণের পরামর্শ ও অনুগ্রহ আমরা লাভ করেছি। শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণাজী এবং প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণাজীর কৃপাপূর্ণ সহায়তা ও পথনির্দেশ আমরা পেয়েছি যাতে আমাদের গ্রন্থ প্রকাশের অনেক কাজ সহজসাধ্য হয়েছে।

'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী অত্যধিক কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও এই গ্রন্থের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের চিরকৃতজ্ঞ করেছেন। তাঁর নিশ্ছিদ্র কর্মব্যাপৃতির মধ্যেও এই গ্রন্থের কোন সমস্যা নিয়ে

যখনই আমরা তাঁর কাছে গিয়েছি তখনই তিনি সাগ্রহে সময় দিয়েছেন। এছাড়া এই গ্রন্থের সম্পাদকীয় পর্ষদের অন্যান্য সদস্যগণ, যথা অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন, অধ্যাপক বাবুরামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক তাপস বসু, অধ্যাপিকা নীতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিকা সুব্রতা সেন—যাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্মান ও খ্যাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত—তাঁরাও তাঁদের মূল্যবান সময় এই গ্রন্থটিকে সুসম্পাদিত করার জন্য নির্দ্বিধায় ব্যয় করেছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা-গোষ্ঠী ঠাকুর-মা-স্বামীজীর কাজে সর্বদা অকৃপণ সাহায্য করে থাকেন। উক্ত পত্রিকা-গোষ্ঠীর শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরূপকুমার সরকার এই গ্রন্থের যাবতীয় মুদ্রণ-দায়িত্ব সানন্দে বহন করেছেন। তাঁর এই সানুগ্রহ বদান্যতার জন্য আমরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রইলাম। কথামৃত প্রকাশনীর শ্রীজয়ন্তকুমার সিনহা এই গ্রন্থের কাগজ বিনামূল্যে সরবরাহ করেছেন। তাঁর কাছেও আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর কৃপাদৃষ্টি তাঁদের উপর সতত নিবদ্ধ থাকুক—এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনসের পরিচালকগণ ও কর্মীবৃন্দ গ্রন্থটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজনে আমাদের সমস্ত দাবি ও আবদার হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমরা চিরঋণী। এই প্রসঙ্গে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ (বাদল) বসু, শ্রীসমর বসু ও শ্রীদুলালকৃষ্ণ ভৌমিকের অবদান বিশেষভাবে স্মরণ করি। গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন শিল্পী শ্রীসলিল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নির্দেশিকাটি প্রস্তুত করেছেন শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ। এজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সংঘগুরু পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ তাঁর আশীর্বাণী দিয়ে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছেন ও আমাদের কৃতার্থ করেছেন। পূজ্যপাদ মহারাজজীর চরণে আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি। শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অধ্যক্ষা পরম পূজনীয়া প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা মাতাজী এই প্রকাশনা প্রয়াসে তাঁর শুভেচ্ছা-লিপি পাঠিয়ে আমাদের বাধিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর চরণেও আমাদের সভক্তি প্রণাম জানাই।

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' যাঁর জীবনে সার্থক রূপে পরিগ্রহ করেছিল, চতুর্যোগের সমন্বয় যাঁর মধ্যে কায়া ধারণ করেছিল, সেই পরমপূজ্য স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের লোক-কল্যাণকারী পুণ্য জীবনের অভিজ্ঞানস্বরূপ এই গ্রন্থ অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের কাছে অনন্ত শান্তি ও অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী ও মননশীল সাধারণ পাঠক মহলে গ্রন্থটি সমাদৃত হলে আমাদের প্রয়াস ও পরিশ্রম সার্থক হবে।

১৪ই মার্চ, ১৯৯৪ এষা বসু

সূচীপত্র

॥ পরিশিষ্ট ॥

আশীর্বাণী

Phones
PBX
66-2391
66-3578
66-2918
64-1144
64-1180

RAMAKRISHNA MATH
P.O. Belur Math
Dsit. Howrah
West Bengal-711 202

২০/৪/৮৯

বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের পক্ষ থেকে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটি জীবনী গ্রন্থ প্রকাশনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে জেনে সুখী হলাম।

মহারাজের পবিত্র সাধু জীবন সংকলিত হলে বহু ভক্তের প্রেরণার উৎস হবে, সন্দেহ নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে উক্ত সংকলনের সাফল্য প্রার্থনা করি।

স্বামী ভূতেশানন্দ

অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রবণমঙ্গল যে জীবনকথা

স্বামী প্রভানন্দ

তাঁকে প্রথম প্রণাম করবার সুযোগ পেয়েছিলাম ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে। রামকৃষ্ণ সংঘে তখনই তিনি একজন প্রবাদপুরুষ। কত কথা, কত কাহিনী তাঁকে ঘিরে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের অধিকাংশের সাহচর্যে পূত তাঁর জীবন। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের সার্টিফিকেট—"সোনা দিয়ে বাঁধানো হাতির দাঁত।" অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্বের নৈকট্যের উষ্ণতা অনুভব করেছিলাম। এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের যাদুতে। তাঁকে দেখে কখনও ভয় পাইনি, সর্বদাই বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছি।

একদিকে একটু ঝুঁকে হাঁটতেন, হাঁটতেন তরতর করে, কাজ করতেন দ্রুত, কথাও বলতেন দ্রুত। তিনি সে-সময়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক। সাধারণ সম্পাদকের অফিস ঘরই ছিল তাঁর শয়নঘর। সেখানে থাকত সামান্য কয়েকটি আসবাবপত্র, দরকারী কিছু কাগজপত্র। তাঁর পোশাক-আশাকও ছিল সহজতম। একসময়ে তিনি ছিলেন মঠ-মিশনের হিন্দী পত্রিকা 'সমন্বয়ে'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। কয়েক বছর মাত্র তাতে যুক্ত থাকলেও সমন্বয়ের সুর চিরদিন বেজেছিল তাঁর জীবন-বীণাতে। গাম্ভীর্যের মধ্যে কৌতুক, তিতিক্ষার মধ্যে রসিকতা, বৈদগ্ধ্যের মধ্যে সরসতা, নিষ্ঠার মধ্যেও মানিয়ে চলবার পটুতা ইত্যাদির ভাবমাধুর্য তাঁকে না দেখলে কখনই ধারণা করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। তাঁর কাজকর্মে, জীবনচর্যায় বেসুরো কিছুই ছিল না। নানা ভাবনা-বৈচিত্র্য তাঁর ব্যক্তিত্বে সমন্বিত হয়েছিল, তাঁর ব্যক্তিত্বে মাধুর্য দান করেছিল, মনে পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি কথা। তিনি বলেছিলেন ঃ "যে সমন্বয় করে সে-ই লোক।"

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ঘরানার বৈশিষ্ট্য হাতে-নাতে করা। বলা কওয়ার চাইতে এখানে হওয়ার উপর জোর। এই ঘরানার আবহে গড়ে উঠেছিল তাঁর নিখুঁত জীবনখানি। তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি সংঘসেবীদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন ব্যবহারাদর্শরূপে। বিবেকানন্দ-ব্রহ্মানন্দোত্তরকালে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন জনপ্রিয় আদর্শ-বিগ্রহ। তিনি তাঁর সমকালীনদের নিকট ছিলেন দৃষ্টান্তস্বরূপ, আগামীকালের সাধুদের নিকট প্রেরণার দূত।

একটি প্রচলিত নীতিবাক্য ঃ

সাধু সাজা সহজ, সাধু হওয়া কঠিন ;
সংসারী হওয়া সহজ, সংসারী সাজা কঠিন।

এখানে আমাদের আলোচ্য সাধু। 'সাধু সাজা' ও 'সাধু হওয়া'র বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে স্বামী বিবেকানন্দের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি স্মরণ করলে। নিবেদিতার পত্র-সূত্রে জানা যায় স্বামীজী একদিন বলেছিলেন ঃ খাঁটি হও। আমরা যা নই অথচ অপর মানুষ যাতে আমাদের সম্বন্ধে তাই ধারণা করে সেজন্য আমাদের জীবনীশক্তির নয়-দশমাংশ ব্যয় করে থাকি ; আমরা যা হতে চাই তার জন্য যদি আমরা সে-শক্তি সরাসরি ব্যয় করতাম তাহলে শক্তির সদ্ব্যবহার হত, আমাদেরও যথার্থ কল্যাণ হত। সাধু না হয়ে সাধু সাজবার অপপ্রচেষ্টার প্রতি কটাক্ষ করেই স্বামীজীর উপরোক্ত মন্তব্য। আমরা যাঁর কথা বলতে বসেছি তাঁর এসব কোন সমস্যাই ছিল না। সেকারণে তাঁর এধরনের কোন প্রচেষ্টায় সময় ও শ্রমের অপব্যয়ের প্রশ্নও ছিল না। তিনি তাঁর সহজাত প্রেরণায় যে জীবন-যাপন করে গেছেন, বিভিন্ন মানুষের অন্তরে যে প্রেরণা-দীপ জেবলে দিয়েছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী-সংঘের জীবনপথে যে পদচিহ্ন রেখে গেছেন তা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ হলেও সত্যই অসাধারণ। আমাদের অনেকের মতো গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী হয়েও তিনি ছিলেন অনেক বড় মাপের, তিনি ছিলেন একজন স্বতন্ত্র পুরুষ।

কোন ব্যক্তির পরিচায়ক তার নিজের অন্তর্জীবন। তার জীবনী বা আত্ম-কথা তার সত্যকার পরিচয় সামান্যই দিতে সমর্থ। মার্ক টোয়াইন তাঁর আত্ম-জীবনীর ভূমিকায় লিখেছিলেন ঃ যে কোন ব্যক্তির প্রকৃত জীবনের হদিশ মিলে তার মস্তিষ্কে। সেই জীবনের সঠিক তথ্য সে নিজে ছাড়া অপর কেউই জানে না।···প্রচলিত জীবনীগ্রন্থগুলি সেই ব্যক্তির পোশাক-আশাক ও জামা-প্যান্টের বোতাম বৈ তো নয়—কোন ব্যক্তির যথার্থ জীবনী রচনা করা অসম্ভব। তৎসত্ত্বেও ব্যক্তি-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর মধ্য দিয়েই সহজেই ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা আঁচ করা যায়। প্রকৃত ব্যক্তি, "সে-যে কোঠার মধ্যে চোর-কুঠুরি", প্রকৃত ব্যক্তি ধরাছোঁয়ার প্রায় বাইরে। স্মৃতিকথার দোষ হল, তার মধ্যে যে ব্যক্তি সম্বন্ধে স্মৃতি, সেই ব্যক্তির অতিরিক্ত স্মৃতিকর্তার ব্যক্তিত্ব স্থান দখল করে বসে। সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ না করলে এ-দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এসব তত্ত্বকথা জেনে-শুনেই তাঁর সম্বন্ধে অনেক স্মৃতির সামান্য কিছু চয়ন করে পাঠককে উপহার দেব।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ। হরিদ্বার গিয়েছি। মায়াকুণ্ডে আমাদের কুটীরে তপস্যা করছিলেন এক প্রাচীন সাধু। তাঁর কোন দোষের জন্য সাধারণ সম্পাদকের কাছে তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছিল। তাঁর মুখে শুনলাম ঃ "নির্মল মহারাজ

যখন আমায় এই শাস্তি দিয়েছেন এতে আমার নিশ্চয় কল্যাণ হবে।" একথা শুনে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। সাধারণ সম্পাদক 'নির্মল মহারাজ'-এর চরিত্র-মাহাত্ম্য আমার মনের মুকুরে ঝলক দিয়ে উঠল। এই 'নির্মল মহারাজ'-এরই পোশাকী নাম 'স্বামী মাধবানন্দ'।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ। একজিমার জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে তিনি হাসিমুখে সংঘের গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন। নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদ থেকে সদ্য সাক্ষরদের জন্য শ্রীমায়ের একটি ছোট মাপের জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল। আমি সে-সময়ে পরিষদের কর্মী। একদিন মঠে এসে মায়ের প্রিয় সন্তান মাধবানন্দজীকে সসঙ্কোচে এককপি বই দিয়ে প্রার্থনা জানালাম, মহারাজ যদি অনুগ্রহ করে পড়েন। তিনি চটপট উত্তর দিলেন—অমুক দিন এসো। নির্ধারিত দিনে তাঁকে এসে প্রণাম করতেই বইখানি দেখিয়ে বললেন—"বেশ হয়েছে। দুটো বানান ভুল আছে।" আমার গর্ব চূর্ণ হল। আমার মনোভাব আঁচ করতে পেরে দুটি উৎসাহবাক্য বলে আমাকে চাঙ্গা করে তুললেন। জীবনের শেষ প্রান্তে সংঘাধ্যক্ষ হয়েও তিনি ঈশারউডের 'Ramakrishna and His Disciples' গ্রন্থের চূড়ান্ত প্রুফখানি দেখে দিয়েছেন। তাঁর ভাব ছিল—এটাও যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ। সেজন্য সেকাজে তাঁর সময়ের অভাব হয়নি।

তাঁর ঘরের পাশেই ছিল মঠের লাইব্রেরী। একদিন বই নিতে এসেছি। লাইব্রেরিয়ান ত্যাগানন্দজী ঢেকুর তুলছিলেন। অনেকের মুখেই শুনেছিলাম অপরের দৃষ্টি আকর্ষক তাঁর ঢেকুর তোলা ছিল উদ্দেশ্যমূলক। লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে বেরুচ্ছি। মাধবানন্দজী মহারাজ তাঁর ঘরের দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে বললেন চন্দ্র মহারাজকে (ত্যাগানন্দজীকে) ডেকে দিতে। পরে শুনলাম মহারাজের জন্য বরাদ্দ ছিল এক পোয়া দুধ। মাধবানন্দজী সে-দুধের অর্ধেকটা ত্যাগানন্দজীকে নেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যাপার-স্যাপার দেখে অন্য সাধুগণ মহাবিরক্ত। আমি কিন্তু ত্যাগানন্দজীর খেয়ালীপনা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি মাধবানন্দজী মহারাজকে এরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করতে দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

কত ঘটনাই মনের দুয়ারে ভিড় করেছে। সব বলা যাবে না, প্রয়োজনও নেই। তবে একটি ঘটনা বলতে হবেই। তিনি তখন প্রেসিডেণ্ট। থাকেন প্রেসিডেণ্ট মহারাজের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িতে। কি কাজে এসে মঠবাস করছিলাম। পরদিন ভোরে শুনলাম প্রেসিডেণ্ট মহারাজ পড়ে গিয়েছেন। তাঁর নেকফিমার হাড়টি ভেঙ্গে গেছে। ছুটে গেলাম। আরও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত। সেবকেরা ছোটাছুটি করছেন। বিছানায় মশারি টাঙানো। তিনি চেয়ারে বসে। মুখে আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্তভাব। মহারাজের দিক থেকে আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল তাঁর বিছানায় টাঙানো মশারি। অসংখ্য তালি। আমি গুনতে

থাকলাম। দুর্ঘটনার পরিস্থিতিতে অনবধানতাবশতঃ সেবক মশারি তুলতে ভুলে গেছিলেন। সংঘের প্রেসিডেণ্ট। তাঁর মশারির এই অবস্থা। তাঁর সহজ অথচ দৃঢ় ত্যাগের ভাবটি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

শুনেছিলাম, দেখেওছিলাম যে মাধবানন্দজীর জীবন স্বামীজীর সেবাদর্শের উজ্জ্বল নিদর্শন। বহু ঘটনাই মনে পড়ছে। শোনা একটি ঘটনা বলি। তখন তিনি সাধারণ সম্পাদক। সন্ধ্যারতির পর মহারাজ নিজের ঘরে ধ্যান করছিলেন। ধ্যান থেকে উঠে দেখতে পেলেন অপর দিকের বারান্দায় এক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে 'History of Ramakrishna Math & Mission'-এর প্রুফ। জানতে চাইলেন, তিনি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। আধঘণ্টা অপেক্ষা করছিলেন জানতে পেরে ধমক দিয়ে বললেন—"কেন আমাকে ডাকনি?" তিনি বললেন, "আপনি যে ধ্যান করছিলেন।" তখন মহারাজ বললেন, "কেন? ধ্যানটা ঠাকুরের কাজ আর এই কাজটা ঠাকুরের নয়?" চিরাচরিত ধারণায় বদ্ধ আমি মহারাজের এই কাহিনী শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। এরূপ কথা অনেকেই বলতে পারেন, কিন্তু জীবনে করতে পারেন কজন? 'সাধু সাজতে' পারে অনেকে, কিন্তু 'সাধু হতে' পারে কজন? আবার সাধু হতে পারে যে কয়জন, তারমধ্যে কতজন সাধুজীবনে পূর্ণতালাভে সমর্থ? এরূপ অতি সামান্য সংখ্যকদের অন্যতম স্বামী মাধবানন্দ। তাঁর উদ্দেশে নিবেদন করি আমার শতকোটি প্রণাম।

স্বামী মাধবানন্দজীর অনুপম জীবনকথা আলোচনা করতে গেলেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি কলি, "ধূপ আপনারে বিলাইতে চাহে গন্ধে।" মহারাজ ধূপের মতো নিজের আত্মবিলুপ্তি ঘটিয়ে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর মাহাত্ম্য-সৌরভে পরিণত হয়েছেন। নিঃশেষিত ধূপের মতো প্রায় তিন দশক তিনি চোখের আড়াল হলেও সেই সৌগন্ধের মধ্যে মহারাজের ভাবমূর্তিখানি দেখবার চেষ্টা করেন ভক্তগণ। কোন কোন ভাগ্যবান ভক্ত জাগ্রত চেতনায় অনুভব করেন ঠাকুর-মা-স্বামীজীর মাহাত্ম্যের মধ্যে মহারাজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে নিজের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যে চির প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। এই বিশেষ কারণে তাঁর জীবনকথা শ্রবণমঙ্গল, মননমঙ্গল।

॥ স্বামী মাধবানন্দ জীবনকথা ॥

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের এক মেধাবী ছাত্র। বয়স মাত্র সতের বছর। এফ. এ. পড়েন তরতাজা যুবকটি। ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকেন। দুরারোগ্য টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হলেন তিনি। হোস্টেলে সেবা ও দেখাশুনোর সুবিধা ছিল না। যুবকটিকে বাধ্য হয়ে চলে আসতে হল পিতার কর্মস্থল বোলপুরে। যুবকের শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে। বহু ডাক্তার-বদ্যি করা হল। কিন্তু কিছুই হল না। যুবকের জীবন সংশয় উপস্থিত—যমে-মানুষে টানাটানি। সকলেই তাঁর সেবায় তৎপর। বাক্‌শক্তিও হারিয়ে ফেললেন তিনি। বাড়ির সবাই এক অজানা আশঙ্কায় দিশেহারা। হঠাৎ যুবকের পিতার মনে পড়ল তাঁর জন্মস্থানের এক শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসীর কথা। ভাবলেন, হয়তো সন্ন্যাসী পারবেন তাঁর প্রিয়তম পুত্রের জীবন বাঁচাতে। শেষ চেষ্টা করে দেখাই যাক না। ছুটলেন সেই সন্ন্যাসীর কাছে। অকপটে সব বললেন তাঁকে। অসহায়ভাবে কাতর প্রার্থনা জানালেন সন্ন্যাসীর কাছে তাঁর পুত্রের জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করতে। সব শুনে শান্ত সমাহিত সন্ন্যাসী খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন—তারপর জলদগম্ভীর স্বরে বললেন যুবকের পিতাকে, "এ ছেলে মরবে না! এ এখন অনেকদিন বাঁচবে—জগতের অনেক কাজ এ করবে। এ ছেলে সামান্য নয়—এ অনেক বড় হবে।" সন্ন্যাসী গাছের শিকড় বা অন্য কিছু দিয়েছিলেন পিতাকে। প্রায় পনেরো দিন পর বাক্‌শক্তিরহিত যুবকের মুখে ফুটল কথা। দেখা দিল জীবনের স্পন্দন। প্রায় যমের দুয়ার থেকে প্রত্যাগত সেই যুবকই হলেন পরবর্তীকালের রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নবম সংঘাধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ। ঐ সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছিল।

নদীয়া জেলার ঐতিহ্যসম্পন্ন বাগআঁচড়া গ্রাম। বাগআঁচড়া প্রখ্যাত বৈষ্ণব-তীর্থ শান্তিপুর থেকে প্রায় সাড়ে নয় কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে।[১] বাগআঁচড়া গ্রামের বসু বংশ বিশেষ প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী। বসুদের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার পাঁচড়া গ্রামে। এই বংশের পূর্বতন সপ্তম পুরুষ যাদবেন্দ্র বসুর পুত্র ভৃগুরাম বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন বাগআঁচড়ার দত্ত পরিবারে। বিবাহের পরে ভৃগুরাম স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন বাগআঁচড়ায়। তবে

---

১. শান্তিপুর রেলস্টেশন থেকে কাঁচা পথে অথবা ৩৪ নং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন দিগ্‌নগরের কাছে সালিয়াডাঙ্গার মোড় থেকে পিচের শাখা-রাস্তা ধরে বাগআঁচড়া গ্রামে যাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে দত্ত পরিবারের কেউ এখানে বাস করেন না। ভৃগুরাম থেকেই বিশাল বসু বংশের বিস্তার হয় বাগআঁচড়ায়। বসু বংশের অনেকেই কৃতবিদ্য, প্রথিতযশা, ধার্মিক, ধনশালী, দাতা, এবং রাজকাজে ও সরকারী উচ্চপদে আসীন ছিলেন। এই বংশের একজন সন্ন্যাসী হয়েছিলেন বহু পূর্বে। এই বসু বংশে নির্মল জন্ম-গ্রহণ করেন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর শনিবার (১লা পৌষ, বাংলা ১২৯৫ সাল) শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে।

নির্মলের পিতামাতার নাম হরিপ্রসাদ ও বিন্দুবাসিনী দেবী। নির্মল তাঁদের জ্যেষ্ঠ সন্তান। নির্মলের এক ভাই বিমল ও দু' বোন সরযূবালা ও সুনীতিবালা।[২]

অনুজ বিমল শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের স্বনামধন্য সন্ন্যাসী স্বামী দয়ানন্দ, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। হরিপ্রসাদ ছিলেন চারিত্রিক গুণে বসু বংশের এক উজ্জ্বল রত্ন। তিনি উচ্চশিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ, নিষ্ঠাবান, শাস্ত্রজিজ্ঞাসু, সাত্ত্বিকপ্রকৃতি, অমায়িক ও নিরহঙ্কারী ছিলেন। সংসারী হয়েও অসংসারী। এম. এ. বি. এল. পাশের পর বীরভূম জেলার বোলপুর আদালতে প্রধান উকিল হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হরিপ্রসাদের সাহিত্যে অনুরাগ ছিল। 'গীতার আভাস' নামে একটি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। বসু বংশ শাক্ত মতাবলম্বী। কিন্তু একমাত্র হরিপ্রসাদবাবু বৈষ্ণবধর্মে অনুরক্ত ছিলেন। বিন্দুবাসিনী দেবী ছিলেন অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি ও স্নেহশীলা। সংসারের সকল কর্ম তিনি সম্পাদন করতেন প্রসন্ন মনে ও অবিচল নিষ্ঠায়। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। পিতামাতার বহু গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন নির্মল।

---

২ স্বামী মাধবানন্দজীর বংশপরিচয়
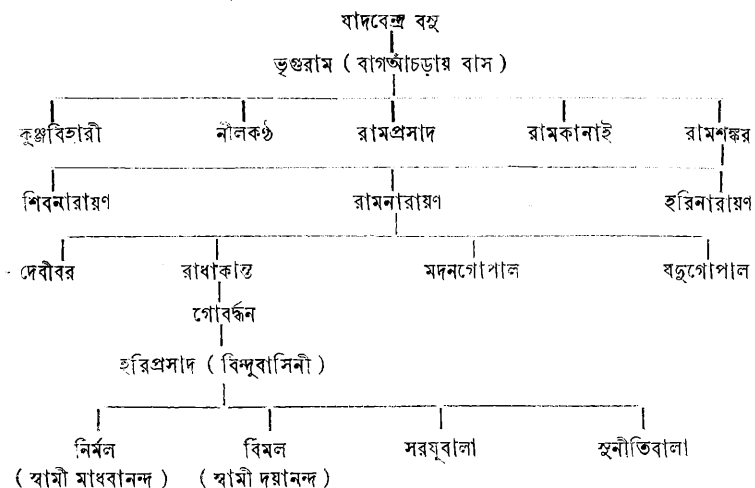
নদীয়া জেলা
০ ৮ মাইল
০ ১২'৮ কি.মি.
জেলার সীমানা
থানার সীমানা
বড় রেলপথ, নদী
ছোট রেলপথ
পুরাকীর্তিস্থল, অন্যান্য স্থান
পিচের রাস্তা, থানা সদর
মুর্শিদাবাদ
রাজশাহী
কুষ্টিয়া
বাংলাদেশ
বর্ধমান
যশোহর
হুগলী
২৪-পরগনা
জলঙ্গী
সুন্দলপুর
শিকারপুর
করিমপুর
চুরুটিয়া
বেলডাঙ্গা
বেতাই
পলাশী
মানিকডিহি
মেহেরপুর
সাধুবাজার
পলশুণ্ডা
বড় চাঁদঘর
কালীগঞ্জ
পাগলাচণ্ডী
তেহট্ট
জুড়ানপুর
দেবগ্রাম
সোনাডাঙ্গা
মাটিয়ারী
নাকাশীপাড়া
বড়গাছি
গাংরা
চাকুন্দী
বিল্বগ্রাম
বৃত্তিহুদা
চাপড়া
দর্শনা
কাচকুলী
মুড়াগাছা
ধর্মদহ
বিষ্ণুপুর
আমঘাটা
কৃষ্ণগঞ্জ
বল্লালদীঘি
বামনপুকুর
চায়াপুর
কৃষ্ণনগর
নবদ্বীপ
হাঁসখালী
বগুলা
ভাজনঘাট
শিবনিবাস
কপোতাক্ষ
দিগনগর
বাদকুল্লা
বাগআঁচড়া
আড়ংঘাটা
বীরনগর
কালনা
শান্তিপুর
ফুলিয়া
রাণাঘাট
আইশমালী
দেবগ্রাম
হরধাম
আনুলিয়া
যশোড়া
চাকদহ
ভাগীরথী নদী
নেউলিয়া
পালপাড়া
শ্রীনগর
সরপপুর
বনগ্রাম
বেনাপোল
কাঞ্চনপল্লী
কল্যাণী
বিরহী
হরিণঘাটা
ঘোষপাড়া
ব্যাণ্ডেল
কুলিয়া
নৈহাটি
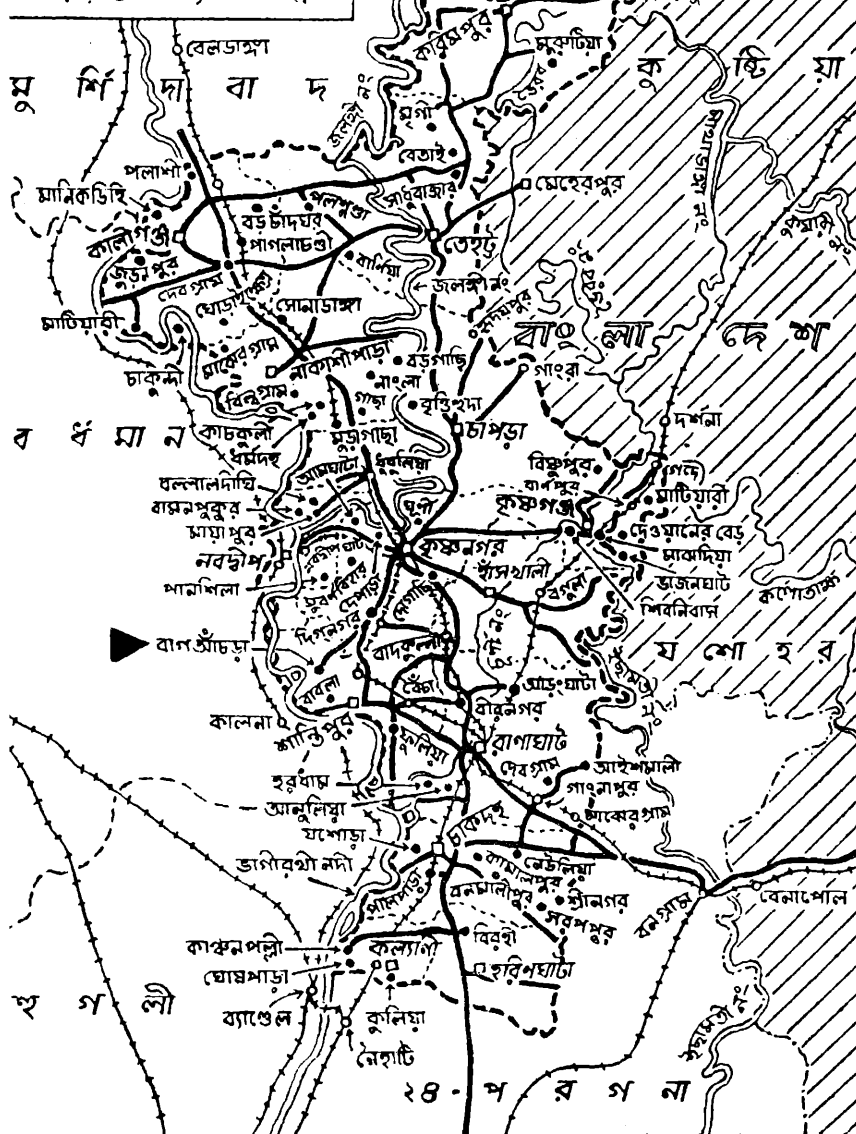
স্বামী মাধবানন্দের জন্মভিটা সংলগ্ন স্থানের মানচিত্র ঃ

৮২৬—স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দের জন্মভিটার স্থান, ৮৪১—স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দের পৈত্রিক বৈঠকখানা বাড়ির স্থান, ৮৫১—স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দের পৈত্রিক কাছারীবাড়ির স্থান (বর্তমানে কিয়দংশে বৈদ্যনাথ বসু প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত), ৮৪৩—স্বামী মাধবানন্দের পঠনস্থল গ্রামের পূর্বতন পাঠশালার স্থান, ৮৪৯—বাগআঁচড়া পঞ্চায়েত ভবন, ৬৯১ ও ৬৯২—প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৮৪৫—পোষ্টঅফিস, ৮৭৩—নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি, ৬৪৯ ও ৬৫০—চাঁদ রায়ের মন্দির।

একটি ঐতিহাসিক দলিল ঃ স্বামী মাধবানন্দজীর পূর্বপুরুষ রামশঙ্কর বসুকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত 'মহাত্রান' সম্মানসূচক ভূমিদানের সনদ—সময়কাল ১১৬১ বঙ্গাব্দের ৭ই ভাদ্র।

গীতার আভাস

শ্রীহরিপ্রসাদ বসু এম-এ, বি-এল

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিমিটেড,

১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৯২৩

 মূল্য ৸৹ আনা।

"হরিপ্রসাদের সাহিত্যে অনুরাগ ছিল। 'গীতার আভাস' নামে একটি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি।"—পৃষ্ঠা ২
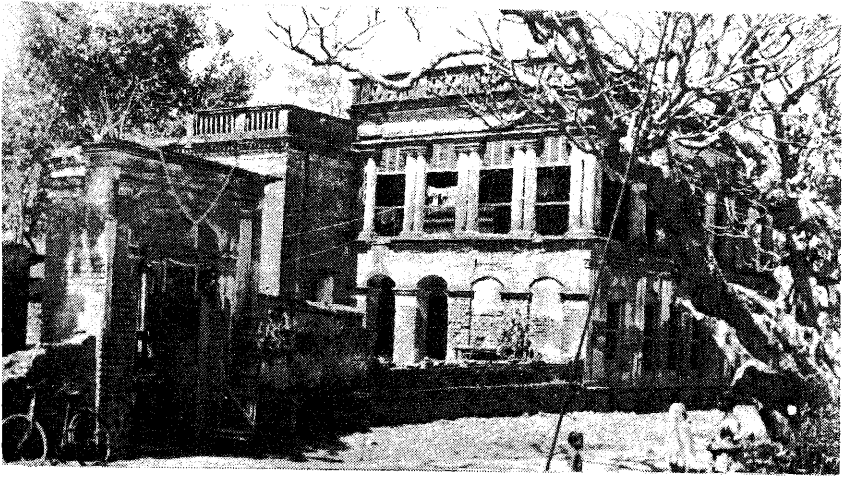
"বাগআঁচড়া গ্রামের বসু বংশ বিশেষ প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী।"—পৃষ্ঠা ১
বাগআঁচড়া বসুবাটীর ঠাকুরদালান ও প্রধান প্রবেশদ্বার
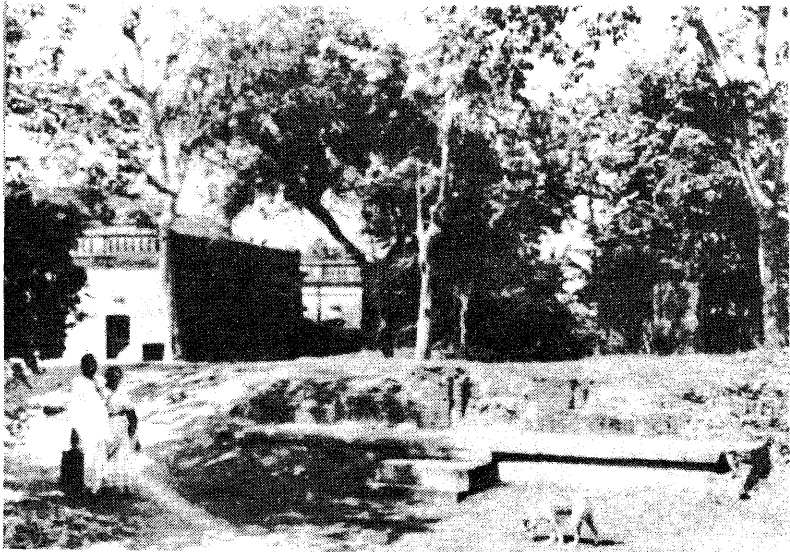
"এই বসু বংশে নির্মল জন্মগ্রহণ করেন।"—পৃষ্ঠা ২
স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী দয়ানন্দজীর জন্মভিটার স্থান।
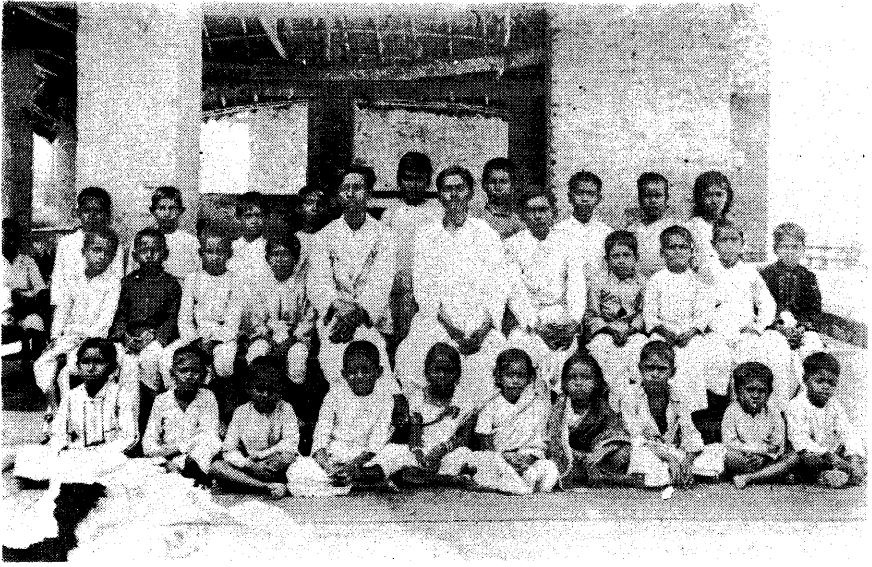
"নির্মলের বিদ্যারম্ভ হয় বাগআঁচড়ার পাঠশালাতে।"—পৃষ্ঠা ৩

স্বামী মাধবানন্দজীর পাঠশালাজীবন সাঙ্গ হওয়ার বেশ কিছু পরে গৃহীত বাগআঁচড়া পাঠশালার একটি প্রাচীন চিত্র।
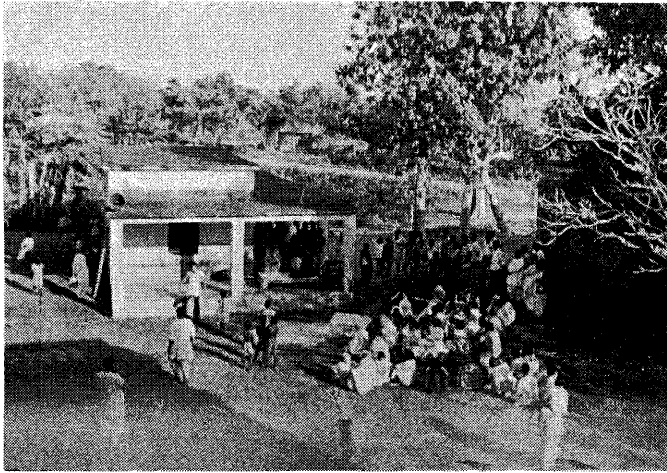
বাগআঁচড়া পাঠশালার বর্তমান রূপ—'বৈদ্যনাথ বসু অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়'। স্বামী মাধবানন্দজীর জ্যেঠামহাশয় বৈদ্যনাথ বসুর স্মৃতিতে নামাঙ্কিত।

নির্মলের পিতামাতা উভয়েই শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের মন্ত্রশিষ্য।[৩] পিতা সন্ধ্যাবন্দনাদিতে নিষ্ঠাবান। নির্মলের মাতাই তাঁর মধ্যে উদ্দীপ্ত করেছিলেন সেবাধর্মের বীজটি। নির্মলের উপর বেশ প্রভাব পড়েছিল তাঁর বৃদ্ধা পিতামহীর কর্মকুশলতার। ইনিই ছিলেন বসু পরিবারের সর্বময় কর্ত্রী। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর সংসার পরিচালনার অদ্ভুত কর্মকুশলতা নির্মলের মনে চিরদিন অঙ্কিত ছিল।

নির্মলের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছে গ্রামের শান্তিময় পরিবেশ ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে। গ্রামে যেমন নিত্য আরাধিত ৺বাগ্‌দেবী ও শিবঠাকুর ছিলেন তেমনি ছিল বসু পরিবারে বার মাসে তের পার্বণ। বসুবংশে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত ৺দুর্গাপূজা, ৺কালীপূজা, ৺জগদ্ধাত্রী পূজা, ৺কার্তিক পূজা, ৺সরস্বতী পূজা, ৺রক্ষাকালী পূজা, ৺শীতলা পূজা ও ৺গঙ্গা পূজা। গ্রামের অদূরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী প্রবহমানা। প্রকৃতির কোলে লালিত শান্তশিষ্ট নির্মলের মন স্বভাবতঃই পাড়ি দিত কোন এক অজানা রাজ্যে। যে সময়ে বালকেরা ক্রীড়ার আনন্দে মত্ত থাকে, সে সময়ে অন্তর্মুখী নির্মল কোন স্থানে একেবারে চুপচাপ বসে থাকতেন। অনন্ত-প্রবাহের সন্ধানে থাকত তাঁর অন্তর্লীন মন। তাঁর বাল্যজীবন সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল পিতামহী, পিতামাতা, জ্যেষ্ঠতাত ও অন্যান্য অভিভাবকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

নির্মলের বিদ্যারম্ভ হয় বাগআঁচড়ার পাঠশালাতে। প্রথম থেকেই তিনি মেধাবী ও তীক্ষ্ন বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় তিনি নদীয়া জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এজন্য পেয়েছিলেন বৃত্তি। চট্‌পটে ও বিনয়ী স্বভাবের জন্য সুদর্শন নির্মল সকলেরই প্রিয়। সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল মধুর। বাল্যকাল থেকে তাঁর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা প্রবল। পরবর্তীকালে এই স্পৃহা আরো বর্দ্ধিত হয়েছিল।

নির্মলের পিতৃদেব হরিপ্রসাদ বসু প্রথমে কিছুকাল কলকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। পরে হরিপ্রসাদ বসু ওকালতি পেশার সূত্রে বোলপুরে চলে আসেন। বাগআঁচড়া ছেড়ে নির্মল ভর্তি হলেন বোলপুরে বাঁধগোড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে। এই সময়ে বিভিন্ন দিকে তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৯/১০ বছর। মেধাবী

---

৩. ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত 'স্বামী মাধবানন্দ' নামক বইয়ে হরিপ্রসাদ বসু শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরির মন্ত্রশিষ্য বলে উল্লেখ আছে। শ্রীশঙ্করনাথ রায় প্রণীত 'ভারতের সাধক' গ্রন্থে এবং শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত 'শান্তিপুর পরিচয়' গ্রন্থে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বিশিষ্ট শিষ্যরূপে হরিপ্রসাদ বসুর (কোন কোন স্থলে হরিদাস বসুর) উল্লেখ আছে। এখানে বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত বইয়ের তথ্যকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও হরিপ্রসাদ বসু যে তৎকালে একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন এবিষয়ে দ্বিমত নেই।

ছাত্ররূপে তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রধান শিক্ষক নির্মলকে পুত্রসম ভালবাসতেন। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হবার পরেও তিনি নিয়মিত খবরাখবর করতেন তাঁর প্রিয় ছাত্রের। যখন নির্মল টাইফয়েড রোগে শয্যাশায়ী, তখন এই প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য কয়েকজন শিক্ষক নির্মলের সেবা-শুশ্রূষা মন প্রাণ দিয়ে করেছিলেন। এমনই ছিল তাঁদের সঙ্গে গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক।

বাল্যকালে নির্মলের বিচক্ষণতার একটি ঘটনা। তখন তিনি ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁদের গ্রামের ডাকঘরে সেদিন পোষ্ট মাষ্টার আসতে পারেননি কোন কারণে। কাজ চালাবার জন্য পোষ্ট মাষ্টারের ইংরেজী অনভিজ্ঞ ভাইপো এসেছেন ডাকঘরে। সরকারী নিয়ম—প্রতিদিনের কাজের হিসাব নির্দিষ্ট ফরমে লিখে পাঠানো। ফরম ইংরেজীতে ছাপানো। ভাইপোর দুশ্চিন্তা—কি করে ফরম পূরণ করবেন। বিশেষ করে 'Documents sent' ও 'Stamp required' দুটি স্তম্ভে কি লিখবেন ভেবে আকুল একদিনের পোষ্ট মাষ্টার। দৈব প্রেরিত হয়ে নির্মল যেন সেখানে উপস্থিত হলেন। পোষ্ট মাষ্টার সমস্যার কথা বললেন তাঁকে। নির্মল একটুও ভয় পেলেন না। ফরমটি পড়লেন মনোযোগের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলেন বড় ডাকঘরে কিছু পাঠাবার এবং স্ট্যাম্পের প্রয়োজন আছে কিনা। জানলেন দুটোর কোনটাই দরকার নেই। অভিজ্ঞ পোষ্ট মাষ্টারের মতো নির্মল ঐ দুটি স্থানে ক্রশ চিহ্ন বসিয়ে দিলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন পোষ্ট মাষ্টারের ভাইপো।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রবেশিকা পরীক্ষায় নির্মল সসম্মানে উত্তীর্ণ হন বোলপুরের বাঁধগোড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। এই পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন তিনি। এরপর তিনি ভর্তি হন এফ. এ. ক্লাসে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। কিন্তু টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হওয়ায় নির্মলের প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ. এ. পড়া সম্ভব হল না। বোলপুরে তাঁকে ফিরে যেতে হয়। এই সময় তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য তাঁকে মুঙ্গেরে তাঁর জ্ঞাতি সম্পর্কে জ্যেষ্ঠতাত বৈদ্যনাথ বসুর কাছে গিয়ে কিছুকাল থাকতে হয়। তখন বৈদ্যনাথ বাবু ছিলেন মুঙ্গের কলেজের অধ্যক্ষ। পূর্বে বৈদ্যনাথ-বাবু ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ে প্রথমে প্রধান শিক্ষক এবং পরে কলেজের অধ্যক্ষ। শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দজী (বাবুরাম মহারাজ) ছিলেন উক্ত বিদ্যালয়ে বৈদ্যনাথ বাবুর প্রিয় ছাত্র। বৈদ্যনাথ বসু শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়েও স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন এবং একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন নির্মলের পিতা হরিপ্রসাদ বসু কিছুকাল এই কলেজে অধ্যাপনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেহত্যাগের

বসু বংশের পর্যায় পরিচিতি

ওঁ
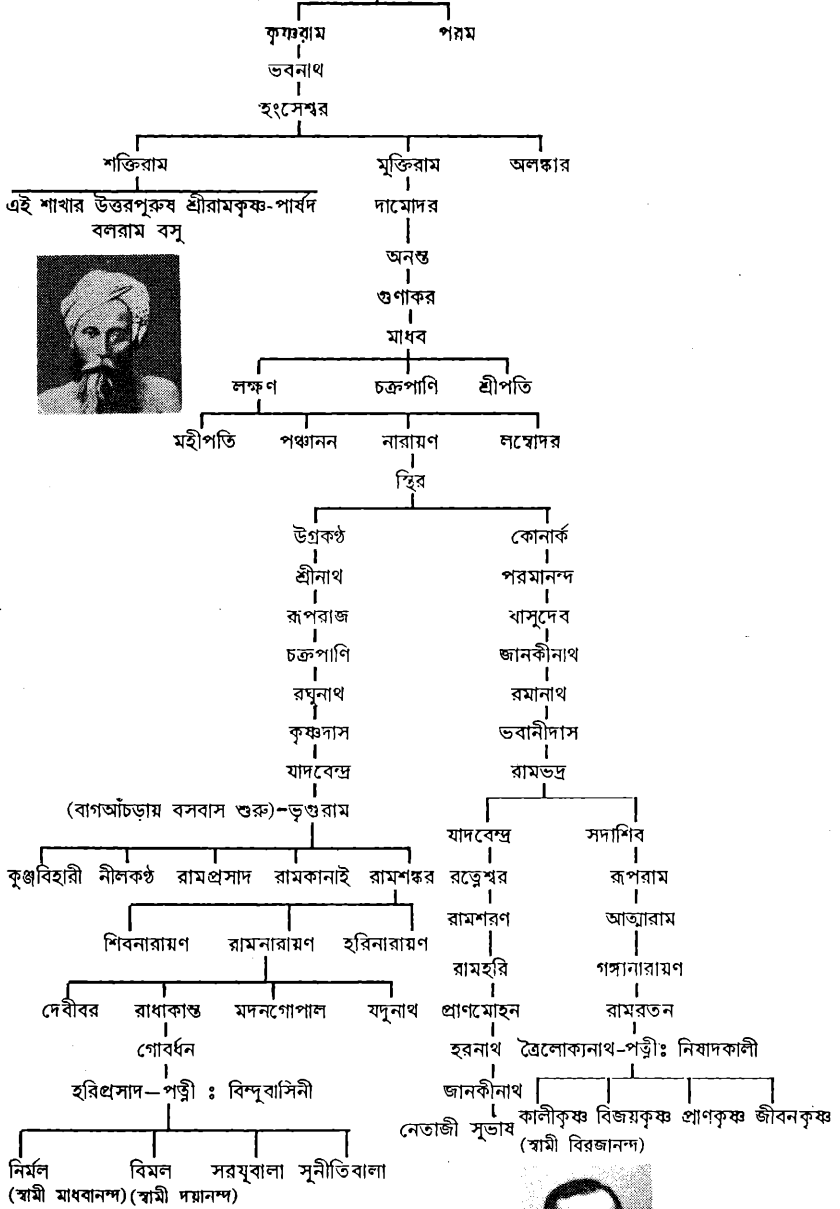
Prabuddha Bharata **Mayavati, Via Champawat**
Dt-Almora, U. P. 28-8-20

My dear Hemdada,

আজ অমৃতবাজারে হঠাৎ জ্যেঠামহাশয়ের পরলোকগমনের সংবাদে যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। তাঁহার জীবন আদর্শস্বরূপ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কলিযুগে অন্নদান ও বিদ্যাদান তিনি বহু লোককে করিয়া গিয়াছেন। অতি সামান্য অবস্থার মধ্য হইতে স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি যেরূপ উচ্চ সম্মানের পদ অধিকার করিয়াছিলেন, অথচ যেরূপ প্রকৃত উদার ও নিরভিমান ছিলেন, তাহা আজকালকার অনেকেরই পক্ষে অনুকরণীয়। সুতরাং তাঁহার লোকান্তরগমনে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

শেষে তাঁহার কি অসুখ হইয়াছিল, এবং কোথায় তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বোপার্জ্জিত দিব্যলোকে গমন করিলেন সময়মত জানাইবে। আমার একবার কোন সময়ে মুঙ্গেরে ২/১ দিন halt করিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু জ্যেঠাইমার ও সম্প্রতি আবার জ্যেঠামহাশয়ের ইহলোক পরিত্যাগে সে আগেকার charm-এর অধিকাংশই চলিয়া গেল। তুমি ও বৌদিদি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবে এবং সকলের কুশলসংবাদে সুখী করিবে।

ইতি—

তোমাদের
মাধবানন্দ
(নির্ম্মল)

Sri Hem Chandra Basu
Vakil
Monghyr
(Bihar)
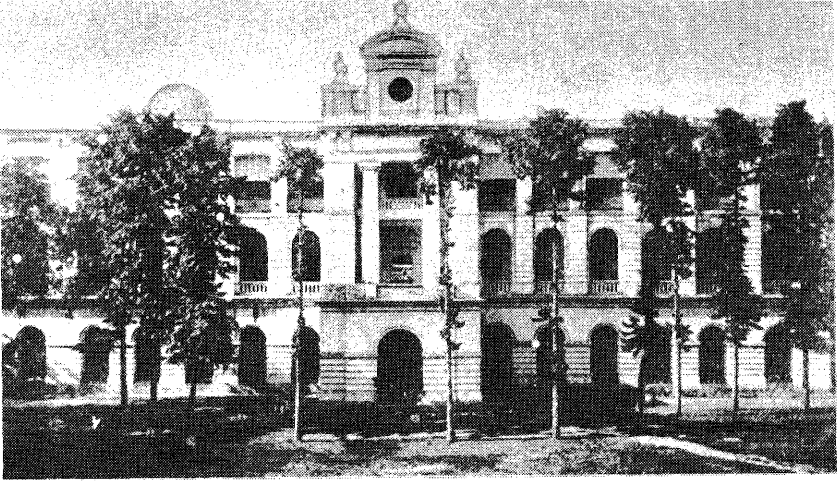
"তিনি আবার প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. ক্লাসে ইংরেজী অনার্স সহ পড়া আরম্ভ করেন"—পৃষ্ঠা ৫

হেনরী রবার্ট জেমস্

এইচ এম পার্সিভাল

পর তাঁর পুত্র মেট্রোপলিটন কলেজকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে দাবী করায় যে মামলার উদ্ভব হয় তাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান সহকর্মী বৈদ্যনাথ বসুর সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই মেট্রোপলিটন কলেজ জনসাধারণের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়। বৈদ্যনাথ বসুর সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা, অধ্যবসায় প্রভৃতি চারিত্রিক গুণের প্রভাব নির্মলের ওপর ছিল অপরিসীম। বৈদ্যনাথ বসুর দেহত্যাগের পরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট মায়াবতী থেকে একটি চিঠিতে স্বামী মাধবানন্দজী লিখেছিলেন, "জ্যেঠামহাশয়ের পরলোকগমনের সংবাদে যারপরনাই দুঃখিত হইলাম। তাঁহার জীবন আদর্শস্বরূপ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কলিযুগে অন্নদান ও বিদ্যাদান তিনি বহু লোককে করিয়া গিয়াছেন। অতি সামান্য অবস্থার মধ্য হইতে স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি এরূপ উচ্চ সম্মানের পদ অধিকার করিয়াছিলেন। অথচ যেরূপ প্রকৃত উদার ও নিরভিমান ছিলেন, তাহা আজকালকার অনেকেরই পক্ষে অনুকরণীয়।" জ্যেঠামহাশয়ের কাছে মুঙ্গেরে বায়ু পরিবর্তনে এসে নির্মল মুঙ্গের কলেজে আবার এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই তিনি উত্তীর্ণ হন এফ. এ. পরীক্ষায়।

এদিকে নির্মলের শরীর সুস্থ হয়ে উঠেছে। তিনি আবার প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. ক্লাসে ইংরেজী অনার্স সহ পড়া আরম্ভ করেন। থাকতেন কলেজের পাশেই ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। ইডেন হোষ্টেলে তাঁর ঘর ছিল ১৯ নম্বর। ঐ সময়ে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি স্বর্গীয় ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। তিনিও ইডেন হোষ্টেলের আবাসিক। নির্মলের চেয়ে তিনি এক ক্লাস উঁচুতে পড়তেন। হোষ্টেলে নিয়ম ছিল—সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রকে 'প্রিফেক্ট' মনোনীত করা। যে ছাত্র পড়াশুনা, নেতৃত্ব, চরিত্র প্রভৃতি গুণে সকলের শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতেন, তাঁকেই দেওয়া হত ঐ সম্মানজনক পদ 'প্রিফেক্ট'। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন ছিলেন হোষ্টেলের 'প্রিফেক্ট'। রাজেন্দ্রপ্রসাদের পরেই নির্মল নির্বাচিত হন সম্মানীয় 'প্রিফেক্ট' পদে। চারিত্রিক গুণ, অমায়িক ব্যবহার ও মধুর ভাষণের জন্য সকল ছাত্রের প্রিয় তিনি। আদর্শবাদী ছাত্র হিসাবে তিনি সকলের কাছে পরিচিত হন। এমনকি কলেজ কর্তৃপক্ষও নির্মলের মতামতকে মূল্য দিতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডঃ পার্সিভালের বিশেষ স্নেহভাজন ছাত্র ছিলেন নির্মল।[৪]

---

৪. বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত 'স্বামী মাধবানন্দ' গ্রন্থে স্বামী মাধবানন্দজীর পাঠ্যাবস্থায় ডঃ পার্সিভাল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রেসিডেন্সী কলেজ রেজিষ্টার' এবং ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রেসিডেন্সী কলেজ সেন্টিনারী ভলুম' অনুসারে ডঃ পার্সিভাল ইংরেজী বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ থেকে ৮ মাস ১৫ দিনের জন্য

কলেজের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সর্বদা প্রথম স্থান অধিকার করতেন নির্মল। নির্মলের ভাই বিমলও (স্বামী দয়ানন্দ) প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ. এ. ও পদার্থবিদ্যায় অনার্স সহ বি. এস. সি. পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনিও ইডেন হিন্দু হোস্টেলের আবাসিক। পরবর্তীকালে স্বামী দয়ানন্দ আমেরিকায় কিছুকাল বেদান্ত প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দক্ষিণ কলিকাতার সুপরিচিত রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। স্বামী দয়ানন্দ মঠের একজন অছি (trustee) নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ছাত্রাবাস জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছিল নির্মলের ভবিষ্যৎ জীবনকে। এখানে একটি বন্ধুগোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল, যাঁরা ছিলেন একান্ত ধর্মপিপাসু ও আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনে উন্মুখ। অবসর সময়ে এই গোষ্ঠী সময় অতিবাহিত করতেন ধর্মপ্রসঙ্গ ও সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠে। দলের নেতা ছিলেন সীতাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সহপাঠী। সীতাপতিও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে সন্নাসীরূপে যোগদান করেন। নাম হয় স্বামী রাঘবানন্দ। সীতাপতিও মেধাবী ছাত্র—বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঈশানবৃত্তি' প্রাপক। সুরেশ ভট্টাচার্য নামে আর একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সুরেশ বি. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং সংস্কৃতে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় স্বর্ণপদক লাভ করেন।[৫] সুরেশও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের একজন বরেণ্য সন্ন্যাসী স্বামী যতীশ্বরানন্দ। ইনিও ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুকাল বেদান্ত প্রচার করেন। স্বামী যতীশ্বরানন্দও মঠের অছি (trustee) এবং পরে সহ-সংঘাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের এই ধর্মালোচনা চক্রে নির্মলের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার স্ফুরণ হয়। তাঁর মনের আনাচে-কানাচে উঁকি-ঝুঁকি মারত নানান জিজ্ঞাসা। এই সময় নির্মল দর্শন লাভ করেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা মাষ্টার মহাশয়ের। ধর্মগোষ্ঠীর নেতা সীতাপতির সঙ্গে

কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষের দায়িত্ব বহন করেন তখন মাধবানন্দজীর পাঠ্যাবস্থা প্রায় সাঙ্গ হয়েছে। শেষোক্ত দুটি সূত্র অনুসারে মাধবানন্দজীর পাঠ্যাবস্থায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন হেনরী রবার্ট জেমস্। তিনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর থেকে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে অবধি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তবে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ থেকে ১২ই ডিসেম্বর তিনি ছিলেন Officiating Director of Public Instruction, Eengal। ঐ সময়ে ডঃ পার্সিভাল প্রেসিডেন্সী কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ছিলেন।

৫, অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত 'স্বামী যতীশ্বরানন্দ' গ্রন্থে এবং সূর্যসারথি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' গ্রন্থে প্রেসিডেন্সী কলেজে স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর ছাত্রজীবন সংক্রান্ত উপরোক্ত তথ্যের উল্লেখ আছে। যদিও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রেসিডেন্সী কলেজ রেজিষ্টার' এবং ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রেসিডেন্সী কলেজ সেন্টিনারী ভল্যুম' গ্রন্থে এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় না।
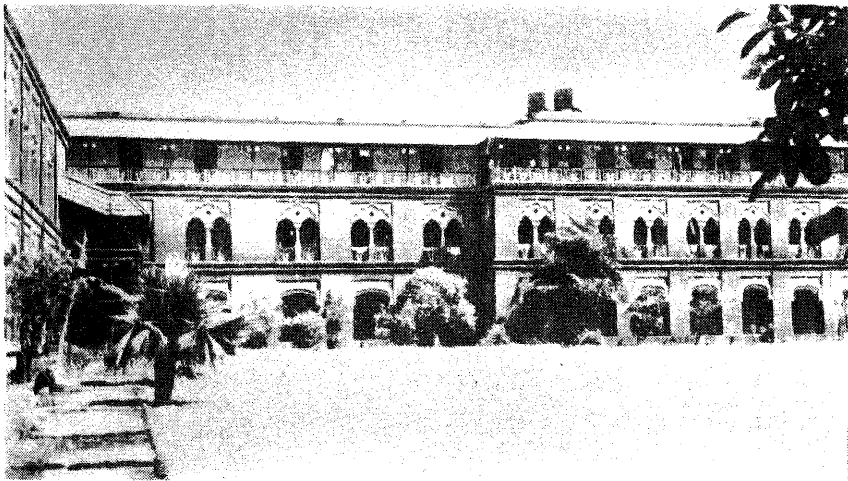
"নির্মল থাকতেন কলেজের পাশেই ইডেন হিন্দু হোস্টেলে।"—পৃষ্ঠা ৫

দেশব্যাপী তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হিন্দু হোস্টেলের অদূরে সার্পেন্টাইন লেনে পুলিশ অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জীকে গুলি করে হত্যা করলেন বিপ্লবী শ্রীশ পাল ও রণেন গাঙ্গুলী। এই নন্দলাল ব্যানার্জী মজঃফরপুর রেল ষ্টেশনে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেফতার করতে গেলে প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন। এর আগে ১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিলেন শহীদ ক্ষুদিরাম বসু। স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল প্রেসিডেন্সী কলেজের অলিন্দে, হিন্দু হোস্টেলের কক্ষে কক্ষে। নির্মলের সহপাঠী রমেশচন্দ্র মজুমদার উত্তরকালে তাঁর 'জীবনের স্মৃতিদ্বীপে' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "আমি যখন হিন্দু হোস্টেলে থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. পড়ি তখন রাত্রে আমার একটি ছাত্রবন্ধু আমাকে ডেকে নিয়ে হোস্টেলের মাঠে নির্জন স্থানে বসে গুপ্ত সমিতির বিষয়ে অনেক গল্প করত, আমিও তার সঙ্গে যোগ দিতাম। আমার কথায় উৎসাহিত হয়ে অবশেষে সে একদিন আমাকে খোলাখুলি এসে জিজ্ঞাসা করল আমি এইরূপ সমিতিতে যোগদান করতে প্রস্তুত আছি কিনা। অবশেষে যোগ করল—'তুই খুব ভাল ছেলে, পুলিশ তোদের সন্দেহ করবে না, এইজন্যেই তোদের মতো সদস্য দরকার।' কয়েকদিন বাদে আমার বন্ধুটি এসে বলল যে, 'বড় বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছি। বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি যে আজ রাত্রে পুলিশ আমাদের কয়েকজনের ঘর অনুসন্ধান করবে। আমাদের ঘরে দুটি রিভলভার আছে। পুলিশ ছদ্মবেশে নিশ্চয়ই কাছাকাছি ঘুরছে—আমরা যে কয়জন মার্কামারা আছি তারা বাইরে গেলেই সন্দেহ করে আমাদের খানাতল্লাস করে।' আর একটি ছাত্রের নাম করে বলল, 'তোরা দুজনে আলোয়ান গায়ে যদি রিভলভারদুটো নিয়ে বাইরে কোথাও রেখে আসিস তবে আমরা এ যাত্রা রক্ষা পাই।' আমরা দুজনে আলোয়ান গায়ে দিয়ে বিকেলে গোলদিঘিতে বেড়াতে যাচ্ছি এইভাবে অগ্রসর হয়ে কলকাতা ইউনিভর্সিটি ইনষ্টিটিউটে গেলাম। পরবর্তীকালে এই ইনষ্টিটিউট এক বিশাল ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন ঐ ভবনের পশ্চিম দিকের ক্ষুদ্র রাস্তাটির ওপারে একটি একতলা বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর একটি ঘরে একগাদা পুরনো সংবাদপত্রের নীচে রিভলভারদুটো রেখে আমরা চলে এলাম। সেই রাত্রে পুলিশ সত্যসত্যই হিন্দু হোস্টেলের কয়েকটি ঘর খানাতল্লাসী করেছিল।" নির্মলের উপর সমকালীন এই ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব সম্পর্কে ইতিহাস কিন্তু নীরবই থেকে গেছে।

বিংশ শতকের প্রথম ভাগে (১৯০৫—১৯১৫) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে প্রেসিডেন্সী কলেজের অবদান।

স্বামী মাধবানন্দ

স্বামী যতীশ্বরানন্দ

স্বামী রাঘবানন্দ

স্বামী নির্বেদানন্দ
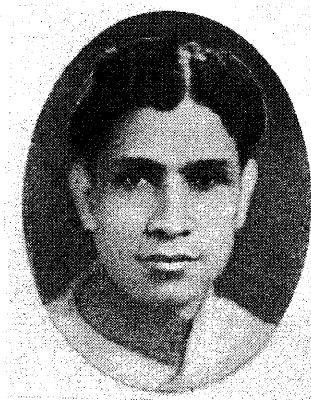
স্বামী দয়ানন্দ

নির্মল ও অন্যান্যরা নিয়মিত যাতায়াত করতেন মাষ্টার মহাশয়ের বাড়িতে। সেখানেই সন্ধান পান আধ্যাত্মিক রত্নরাজি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব সমুদ্রের। আকণ্ঠ পান করেন শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

নির্মলের আধ্যাত্মিক চেতনার উৎস এই 'কথামৃত'। পরবর্তীকালে তাঁর নিত্যপাঠ ও নিত্যসঙ্গী ছিল কথামৃত। মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি ছিল তাঁর পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা। কলকাতায় বা বেলুড় মঠে থাকাকালে তিনি প্রতিবছর বিজয়ার প্রণাম করতে যেতেন মাষ্টার মহাশয়ের কাছে। মাষ্টার মহাশয়ও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁরই অনুরোধে মাষ্টার মহাশয় কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্র সংবাদ সংযোজিত করেন পরিশিষ্টে। নির্মলের কাছে 'কথামৃত' ছিল ধর্মজগতের অতুলনীয় গ্রন্থ। মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি তাঁর অনুপম শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ "উহার (কথামৃতের) অমর লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা মাষ্টার মহাশয় 'শ্রীম' এই ছদ্মনামে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ জীবনের শেষাদ্ধে বহু শত তরুণ ও পরিণত বয়স্ক ভক্ত তাঁহার পূত সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।···ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্ত ভাবের সমষ্টি ছিলেন। তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তগণের জীবনে ঐ সকল ভাবের কতকগুলি সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরের উপদিষ্ট 'নারদীয় ভক্তির' বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।···'শ্রীম' সংসারে থাকিয়াও ত্যাগের আদর্শকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিতেন। তাঁহার সংস্পর্শে অনেক যুবক সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়া জীবসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছে।" একবার তিনি মাষ্টার মহাশয়কে অনুরোধ করেছিলেন কথামৃতের ডায়েরীটি হুবহু ছাপিয়ে দিতে। (তখন পঞ্চম খণ্ড লেখা হয়নি)। লোকেরা উল্টো মানে বুঝবে বলে মাষ্টার মহাশয় রাজী হননি।

মাষ্টার মহাশয়ের কাছে যাতায়াত কালে বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর ও উদ্বোধন কার্যালয়ের কথা জানতে পারেন নির্মল। কলেজের ছুটির দিনে বা অন্য অবসর সময়ে ধর্মগোষ্ঠীর বন্ধুদের সঙ্গে নির্মল কখনও বেলুড় মঠে, কখনও দক্ষিণেশ্বরে বা উদ্বোধনে যেতেন। সেখানে কিছু সময় অতিবাহিত করতেন সৎপ্রসঙ্গে ও ধ্যান ধারণায়। এই সময়েই তিনি জানতে পারেন শ্রীমা সারদা দেবীর পুণ্য কথা। দর্শন ও পুণ্যসঙ্গলাভ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের। ব্রহ্মানন্দজী, প্রেমানন্দজী, সারদানন্দজী প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল তাঁদের।

নির্মলের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল ইডেন হোষ্টেলে বাসকালে। নির্মলের সৌভাগ্য হয়েছিল জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লাভের। সেই সঙ্গে কামারপুকুর দর্শন। স্মৃতিচারণ করে তিনি লিখেছিলেন ঃ "১৯০৮ সালের শেষ ভাগে পাঠদ্দশায় তিন বন্ধুর সহিত জয়রামবাটীতে

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন লাভ করি। দুঃখের বিষয় সেই দর্শনের অস্ফুট স্মৃতিই এখন মনে রহিয়াছে।” নির্মলের মনে না থাকলেও তাঁর সঙ্গী এক বন্ধুর স্মৃতি থেকে সেই দিনটির বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি হলেন শ্রীশ্রীমার কৃপাপ্রাপ্ত ৺অনুকূলচন্দ্র সান্যাল। এই দলে অন্যতম যাত্রী ছিলেন সীতাপতিও। অনুকূল বাবুর মণিকোঠায় সঞ্চিত স্মৃতি ঃ “১৩১৫ সনের কথা।·· হেমন্তের এক কুহেলীময় প্রভাতে গোমো-হাওড়া প্যাসেঞ্জারে তিনটি বন্ধুসহ রওনা হইয়াছিলাম বর্তমান জগতের পুণ্যতীর্থদ্বয়—কামারপুকুর ও জয়রামবাটী দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে।···বিষ্ণুপুর স্টেশনে এক ভদ্রলোক (ট্রেনের কামরায় তাঁহার সহিত আমাদের জীবনে সর্বপ্রথম পরিচয় হইয়াছিল সেইদিনই) আমাদিগকে তাঁহার বাসায় জলযোগ করাইয়া কামারপুকুরে লইয়া যাইবার জন্য রাত্রিতে গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরের দিন কামারপুকুরে পেঁৗছিতে পেঁৗছিতে অপরাহ্ন প্রায় অতীত হইয়া গেল। সন্ধ্যা আগত প্রায়। মুস্কিল হইল কামারপুকুর গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া। যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়—'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাড়িটি কোথায়?'—সেই বলে একই কথা—'বলতে লারবো বাবু।'···জনৈক বন্ধু রহস্য করিয়া বলিলেন,—'ঠাকুর জিলিপি খেতে ভালবাসতেন, এইতো সামনে জিলিপির দোকান, দোকানদারের বাবা কিংবা ঠাকুরদাদা নিশ্চয়ই তাঁকে জিলিপি তৈয়ারী করে খাইয়েছেন, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন।' জিজ্ঞাসিত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ থাকিবার পর সেই ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—'ও বুঝতে পেরেছি বাবু, চাটুজ্যেদের বাড়ি—তাই বলনা বাবু—উ-ই যে বটেক, উ-ই দেখা যাচ্ছে।' মুস্কিলের আসান হইয়া গেল। ঠাকুরের বাড়িতে পেঁৗছিয়া শিবুদাকে পাইলাম।···কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দেখিয়া পরদিন অপরাহ্নে হাঁটিয়া আমরা জয়রামবাটী রওনা হইলাম। শ্রীশ্রীমা তখন তাঁহার ভাইয়ের বাড়িতেই থাকিতেন। হাত মুখ ধুইবার পর আমি দলের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলাম বলিয়া বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম। বন্ধুরা তখন বহির্বাটীতে বসিয়া মামাদের এবং পাড়ার লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছেন। আমি যে কখন হঠাৎ বাড়ির ভিতর গিয়া বসিয়াছি, তাঁহারা লক্ষ্যই করেন নাই। ভিতরে গিয়া মাকে প্রণাম করিলাম। তিনি তখন বারান্দায় বসিয়াছিলেন।··· বন্ধুরাও আমি বাড়ির ভিতরে গিয়াছি জানিতে পারিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়াছিলেন।··দ্বিপ্রহরে আমরা আহার করিতে বসিলাম। সেই দিনই বিকালবেলা আমাদের কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা। মা স্বহস্তে নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া আমাদের খাওয়াইলেন। দু'এক গ্রাস মাত্র ভাত খাইয়াছি, এমন সময় বন্ধুদের একজন হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—'অনুকূলবাবু, মাকে গিয়ে বলুন, আমরা তাঁর প্রসাদ খাব'।

উচ্ছিষ্ট হাতে সেই অবস্থায় মা যেখানে ছিলেন, আসন হইতে উঠিয়া তথায় গিয়া মাকে ঐকথা বলিলাম। করুণাময়ী সেই অবস্থায়ই একটি বাটির ভিতর ভাত, ডাল, তরকারী সব একত্রিত করিয়া উহাকে ভক্তের জন্য প্রসাদে পরিণত করিয়া, আমরা যেখানে খাইতেছিলাম নিজেই সেখানে লইয়া আসিলেন এবং বাটিটি হইতে সেই প্রসাদ কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের প্রত্যেকের পাতে পরিবেশন করিলেন।···বিকালবেলা আমরা যখন কলিকাতা আসিবার জন্য রওনা হইলাম, তখন মা বাড়ির বাহিরে একটুখানি দূরে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। কিয়দ্দূরে আসিয়া আমি পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও দাঁড়াইয়া আছেন আমাদের দিকে চাহিয়া। করুণাময়ী, অপার তোমার করুণা—যে যত অযোগ্য, যে যত অধম, তাহারই প্রতি তোমার তত অধিক করুণা।"

কামারপুকুর-জয়রামবাটী ও শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যদর্শনের স্মৃতি বর্ধিত করল নির্মলের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা। মনের মধ্যে দেখা দিল দ্বন্দ্ব। একদিকে ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা, অন্যদিকে পরম সত্যকে জানবার ব্যাকুল আহ্বান। একদিকে সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনের যশ-গৌরবের বিদ্যুৎচ্ছটা, অপরদিকে ঈশ্বরলাভের গৈরিক হাতছানি। নির্মলের মন আরও গভীরভাবে নিবিষ্ট হল কথামৃত ও স্বামীজীর রচনাবলীতে। পুস্তকপাঠ আরও ইন্ধন জোগাল তাঁর আধ্যাত্মিক-অগ্নিকে। কলেজের পড়াশুনাতে আর মন লাগে না। হয়ে পড়লেন বেশ অমনোযোগী। চুপচাপ নিরিবিলিতে থাকাই তাঁর বেশি পছন্দ। বাড়িতে গেলেও তিনি নিজেকে আবদ্ধ করেন দোতলার ছোট্ট ঘরে। বেশি কথা বলতেন না কারুর সঙ্গে। অন্যের সঙ্গে মেলামেশাও কম ছিল। দিনরাত্রি ঐ ছোট্ট ঘরে ধর্মীয় বই ও সৎ চিন্তায় ডুবে থাকতেন। আবার এদিকে কলেজের শেষ পরীক্ষাও সামনে।

এই সময়ে তীব্র বৈরাগ্য নির্মলের মনকে পার্থিব যাবতীয় বিষয়ে বীতস্পৃহ করে তুলল। কি করবেন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলেন না তিনি। ঠিক তখনই তাঁর এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর কাছে যেতে। বন্ধু বললেন: 'আপনার যখন ভক্তি ভাল লাগে, তখন শশী মহারাজের কাছেই চলে যান।' বন্ধুর পরামর্শ মনে ধরল নির্মলের। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত রচিত 'পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' পাঠে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শশী মহারাজের নিরলস সেবা ও দাস্য ভক্তির কথা নির্মলকে অভিভূত করেছিল। বরাহনগর ও আলমবাজার মঠেও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শশী-মহারাজের অতুলনীয় সেবা-নিষ্ঠার কাহিনী তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। ভাবলেন—শশী মহারাজের অধীনে তিনি সাধুজীবন আরম্ভ করবেন। আবার বাড়ি থেকে বহু দূরে বাড়ির লোকের উপদ্রবও এড়ানো যাবে। ঠিক করলেন, মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠেই ব্রহ্মচারীরূপে যোগদান করবেন। উদ্বোধন কার্যালয়ে গিয়ে,

স্বামী সারদানন্দকে সব নিবেদন করলেন নির্মল এবং প্রার্থনা জানালেন একটি পরিচয়পত্র দিতে। সব শুনে সানন্দে রাজী হলেন স্বামী সারদানন্দ। পরিচয়পত্র ও যথোচিত পরামর্শও দিলেন তাঁকে। এদিকে কলেজের পরীক্ষাও দিলেন। শেষদিন পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়েই নির্মল রওনা হলেন মাদ্রাজের পথে।[৬]

এই যাত্রা সম্বন্ধে তাঁর নিজ স্মৃতি : "১৯০৯ সালের ২২শে এপ্রিল। সাড়ে এগারোটা নাগাদ মাদ্রাজ স্টেশনে পেঁৗছি। থার্ডক্লাস টিকিট ছিল। তখন ওখানে ট্রাম চলত। একজনকে পথের সন্ধান জিজ্ঞেস করি। কিছু পরে দেখি, পথ ভুল করে অন্য পথে অনেক দূরে চলে গেছি। আবার জিজ্ঞেস করে চলতে থাকলুম। দুপুর রোদে ঘুরে ঘুরে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে অবশেষে মঠে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম।

"মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) তখন সেখানে বিশ্রাম করছিলেন। শশী মহারাজ বাইরেই বসেছিলেন। উনি আমার স্নান খাবার-দাবার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ভাত, দই ইত্যাদি যা ছিল, আমার বেশ হয়ে গেল। মহারাজ ততক্ষণে বিশ্রাম করে উঠতেই দেখা হল। শরৎ মহারাজ আমাকে বাড়িতে খবর দিয়ে যেতে বলেছিলেন। তাই কলকাতা ছাড়বার সময় বাবাকে একটা চিঠি দিয়ে এসেছিলাম।

"মহারাজ জানতেন শরৎ মহারাজ আমার জন্য শশী মহারাজকে চিঠি দিয়েছিলেন। তবুও বেশ মজা করলেন। আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মঠের সেক্রেটারী শরৎ মহারাজকে তুমি চেন?' আমি 'হ্যাঁ' বলতে, দেওয়ালে টাঙানো একখানি ছবি দেখিয়ে বলেন, 'দেখ দেখি, চিনতে পার কি না।' আমি একটু হাসলুম। মহারাজ বলে উঠলেন, 'চিনতে পারলে না তো।' আসলে ফটোটি ছিল ওঁরই।..."

একদিন শশী মহারাজ নির্মলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, নির্মল সাধু হবে কিনা। নির্মল জানালেন যে তাঁর আসার উদ্দেশ্য—তাঁদের পুণ্যসঙ্গলাভ ও পবিত্র জীবন যাপন করা। তখন শশী মহারাজ বললেন : "এ একই কথা। এই হিসাবে তুমি ঠিক জায়গায় এসেছ। এই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারের যে শরণ নেবে,

---

৬. এইস্থানের ঘটনা বর্ণনায় বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত 'স্বামী মাধবানন্দ' গ্রন্থের সঙ্গে 'বেদান্ত কেশরী', আগস্ট, ১৯৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী মাধবানন্দজীর স্বলিখিত প্রবন্ধের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 'স্বামী মাধবানন্দ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, বি. এ. পরীক্ষার পর বৈরাগ্যের প্রেরণায় এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এক বন্ধুর পরামর্শে মাধবানন্দজী মাদ্রাজে যান। কিন্তু উপরোক্ত প্রবন্ধে মাধবানন্দজী লিখছেন, "পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে সোজা মাদ্রাজের ট্রেন ধরলাম। টিকিট আগেই কাটা ছিল।" এখানে স্বামী মাধবানন্দজী লিখিত প্রবন্ধের বর্ণনাকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

সে নিশ্চয়ই ঈশ্বর দর্শন করবে। যদি তুমি অর্থ ও যশ চাও, তাহলে ফিরে যাওয়া ভাল এবং এম. এ. পড়।" নির্মলের উত্তর ছিল নেতিবাচক।

যখন নির্মল রাজা মহারাজকে দর্শন করেছিলেন, তখন রাজা মহারাজ নির্মলের হাত দেখেছিলেন। কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না। নির্মল পরে শুনেছিলেন রাজা মহারাজের ভবিষ্যৎ বাণী। তিনি বলেছিলেন যে নির্মলের এখন সাধু হওয়া হবে না, তাঁকে ফিরে যেতে হবে। রাজা মহারাজের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছিল মাত্র আটদিনের পর। এই আটদিন নির্মল বিচরণ করেছিলেন এক স্বর্গীয় সুখে। অবসান হল আনন্দের দিনগুলির। বাড়িতে বাবা খবর পেয়ে নির্মলকে ফিরিয়ে আনবার জন্য লোক পাঠালেন মাদ্রাজে। এরপর নির্মলের স্মৃতি ঃ "বেশ আনন্দেই আছি। এদিকে বাবা খবর পেয়ে, আমাদের স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারকে পাঠিয়ে দেন। তিনি কয়েকদিন পরেই এসে হাজির। ততদিনে মহারাজ পুরীতে রওনা হয়ে গেছেন। ব্যাপার বড় জটিল হয়ে দাঁড়ালো। শশী মহারাজ কাঞ্চিপুরম দেখে যেতে বললেন। আমি বললাম, 'এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাই—মাকে বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার চলে আসব।' এই বলে চলে এলাম। কিন্তু সেটি ভুল হয়েছিল।··· শশী মহারাজ বলে দিয়েছিলেন, 'পুরী হয়ে যাও। সেখানে সাক্ষাৎ জীবন্ত জগন্নাথ দর্শন হবে।' মহারাজকে mean (উদ্দেশ্য) করেই বলেছিলেন। আমি তাই করেছিলাম। মহারাজ একজনের কাছে বলেছিলেন, 'ছেলেটাকে যেন Body warrant করে নিয়ে গেল। আমার দেখে কষ্ট হচ্ছে।'

"কলকাতায় এসে হাওড়াতে ট্রামে চড়তে হল। সেকেণ্ড মাষ্টারমশাই তো আমাকে পাহারা দিয়ে দিয়ে নিয়ে চলেছেন। আমি ট্রাম থেকে নেমে পড়েছি—উনিও তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পড়ে গেলেন। হাঁটুতে খুব লেগেছিল। তিনি ভাবছিলেন, আমি বুঝি তাঁর হাতছাড়া হলেই পালিয়ে যাব। আহা, বেশ ক'দিন ভুগতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি স্কুলে অঙ্ক পড়াতেন। তাঁর বদলে স্কুলে অঙ্ক ক্লাস কয়েকদিন আমাকেই নিতে হয়েছিল। বেশ মাষ্টারি করাও হল ক'দিন।" কিছুদিন পরে নির্মলের কাছে এল শশী মহারাজের চিঠি। চিঠিতে ছিল নির্মলের এক বন্ধুর কথা। ঐ বন্ধুটির মাদ্রাজ মঠে সাধু হবার কথা ছিল। কিন্তু তাকে বাড়ি ফিরে যেতে হয়। শেষে শশী মহারাজ লিখছেন ঃ 'আজকের দিনের অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলেদের সাধু হবার অনুমতি দেবার চেয়ে বরং বিপথে যাওয়া বেশি পছন্দ করেন।'

এদিকে বি. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল। অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন নির্মল। বাংলা সাহিত্যেও প্রথম স্থান অধিকার করলেন তিনি। স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করলেন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "বঙ্কিম পদক"। কিন্তু তাঁর বৈরাগ্য প্রদীপ নির্বাপিত না হয়ে

উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে লাগল। বাড়ির লোকেদের একান্ত অনুরোধে নির্মল বাধ্য হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন। থাকতেন সিমলা স্ট্রীটের একটি মেসে। এখানেও তৈরী হল একটি ধর্মবন্ধুগোষ্ঠী। সকলেই ছাত্র। নির্মল তাঁদের নেতা। নেতৃসুলভ মনোভাব ছিল তাঁর সহজাত। সঙ্গীরাও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। তাঁদের মধ্যে দু' একজন ছিলেন তাঁর আত্মীয়। তাঁরা হলেন দ্বিজেন (পরবর্তীকালে স্বামী গঙ্গেশানন্দ, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ও দ্বিতীয় সংঘাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের সচিব) এবং ডাক্তারী এল. এম. এস্. ক্লাসের ছাত্র ও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত যতীন্দ্রমোহন মিত্র (পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন মিত্র বলে সুপরিচিত)। সকলেই এক মন, এক প্রাণ। ধর্মালোচনায় ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যপাঠে অতিবাহিত হত তাঁদের দিনগুলি। স্থিরীকৃত হয়েছিল নির্মলের নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথ। নিজেকে তিনি তৈরি করে নিচ্ছিলেন। ডুব দিয়েছিলেন অন্তর্জীবনের জিজ্ঞাসায়। এম. এ পড়া ছিল বাহ্যিক একটা বিষয় মাত্র। যিনি ভবিষ্যতে এক বিরাট আন্দোলনের কর্ণধার হবেন, নেতৃত্ব দান করবেন, তাঁর পক্ষে কি মায়াময় ক্ষয়িষ্ণু জগতে আবদ্ধ থাকা সম্ভব?

এইকালে নির্মলের আধ্যাত্মিক জীবন এক নতুন দিকে মোড় নিল। যে আধ্যাত্মিক স্রোতের ফল্গুধারা এতদিন অন্তর্বাহী ছিল, এখন তা স্ফুরিত হল। নির্মল লাভ করলেন শ্রীশ্রীমার কৃপা। শ্রীশ্রীমা তাঁকে পবিত্র মন্ত্রদীক্ষাদানে কৃতার্থ করলেন। এতদিনে নির্মল পেলেন তাঁর অভীপ্সিত বস্তু। এতে ছিল রাজা মহারাজের পূর্ণ সম্মতি। তবে শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা গ্রহণের পরামর্শ-দাতা ছিলেন শশী মহারাজ। উত্তরকালে নির্মল স্মৃতিচারণ করেছেন: 'মনে পড়ে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের একটি দিনের কথা। পূজনীয় শশী মহারাজ—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—তখন কলিকাতায়, বলরামবাবুর বাটীতে।" আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সহায়করূপে তিনি অন্য দু'চার কথার পরে নির্মলকে বলিলেন, 'আর, মার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে নাও। তাহ'লে সব হবে।' শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা নিয়ে নির্মলের 'সব' হয়েছিল—এ কথার সাক্ষী পরবর্তীকালের ইতিহাস। পরম বৈরাগ্যদীপ্ত যুবক নির্মলকে দেখে আনন্দে মন্তব্য করেছিলেন শ্রীশ্রীমা—"এ যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।" একবার শ্রীশ্রীমা তাঁর কয়েকজন সন্ন্যাসী সন্তানদের বসিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন। স্বামী মাধবানন্দও ছিলেন সেই দলে। শ্রীশ্রীমা নির্মল মহারাজকে দেখিয়ে বলেছিলেন, "এই ছেলেটি 'কবি' হবে। 'কবি' মানে জান? 'কবি' মানে জ্ঞানী।" জগজ্জননী শ্রীশ্রীমায়ের এই অমোঘ আশীর্বাদে স্বামী মাধবানন্দ হয়েছিলেন জ্ঞানবান ও বিদ্বান। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নির্মলকে বলেছিলেন: 'এম. এ.-তে এমন বিষয় নাও, যাতে বেশি পরিশ্রমের প্রয়োজন না হয়।' উত্তরে নির্মল বলেছিলেন যে, তিনি তাই করেছেন।

শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন শশী মহারাজ।

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভের পর আরও অন্তর্মুখী হল নির্মলের মন। তিনি সাধনভজনে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন। তুচ্ছ হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা। আরও অধিকতর প্রিয় হয়ে উঠল জপ-ধ্যান। পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা খুলতে একেবারে অনীহা। একেবারে অমনোযোগী হয়ে পড়লেন পড়াশুনায়। নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না তিনি। অন্তরের বৈরাগ্য-অনলের প্রবাহে সোজা পুরীধামে রাজা মহারাজের কাছে উপস্থিত হলেন নির্মল। হৃদয়ের আকুতি অকপটে নিবেদন করলেন তাঁর নিকটে ঃ 'মহারাজ, সংসার ভাল লাগছে না। তাই আপনার কাছে এসেছি।' রাজা মহারাজ প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন নির্মলকে। একটি মাত্র কথা বললেন ঃ 'ভগবানই শুভ, সংসার অশুভ।" কিন্তু এবারেও হল না সংসার ত্যাগ। বিধি বাম! এল বাধা। খবর পেয়ে বাড়ি থেকে জনৈক আত্মীয় পুরীতে এলেন নির্মলকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। আত্মীয়টি জোর করে কলকাতায় নিয়ে এলেন তাঁকে। উপদেশ দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করতে। বাবা হরিপ্রসাদবাবুও পুত্রের কাছে প্রথমে রাখলেন আবেদন। তারপরে মৃদু শাসন। বহু চেষ্টা করলেন পুত্রকে সংসার-জালে আবদ্ধ করার জন্য। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লোভনীয় চিত্র তুলে ধরলেন তাঁর সামনে। এম. এ. পাশের পর পিতার ইচ্ছা পুত্রকে বিলাত পাঠানো। উদ্দেশ্য, আরও উচ্চশিক্ষা লাভ। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল। বৈরাগ্যের দীপ্তিতে দীপ্তিমান নির্মল। লক্ষ্যে তিনি অটল। তাঁর সংকল্প থেকে কোন প্রকারেই বিন্দুমাত্র টলানো গেল না তাঁকে। তাঁর ভাগ্যলিপি যে অন্যরূপে লিখে রেখেছেন ভাগ্যবিধাতা! নির্মলের হস্তগত হল স্বামীজীর 'Inspired Talks' বইটি। এক নিঃশ্বাসে বইটিকে পড়ে শেষ করে ফেললেন। প্রতি পৃষ্ঠায় বৈরাগ্যের দ্যুতি। স্বামীজীর উদ্দীপনাময়ী শক্তি ও পরম সত্যকে লাভ করার আকুল আহ্বান। এতে গভীরভাবে আলোড়িত হল নির্মলের বৈরাগ্যপ্রবণ মন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা তাঁর কাছে খড় কুটোর মত ভেসে গেল। তিনি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। এইকালে নির্মলের মানসিক চিত্র ঃ 'তখন কলকাতায় একটা private mess-এ থাকতাম। স্বামীজীর 'Inspired Talks' আমার হাতে আসে। এই বই পড়ে আমার মনে বৈরাগ্যের আগুন আবার জ্বলে উঠল। মনে হল, কী হবে এই ছাই University-র degree নিয়ে। কিছুদিন পরেই মঠে চলে আসি। এই তৃতীয় বার। এবার কিন্তু successful।' এতদিনে নির্মল তাঁর 'নিজ আবাসে' এলেন। বহু আকাঙ্ক্ষিত পরম লক্ষ্যে পেঁৗছে সব উদ্বেগের হল চির অবসান। মন আনন্দে উদ্বেল। সার্থক হল কয়েক বছরের ধ্যান-ধারণা। জয় হল বৈরাগ্যের। সময় ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী।

নির্মল চলে এসেছেন। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ পত্রযোগে খবর পাঠালেন পিতা হরিপ্রসাদবাবুকে। এবারেও পিতা পুত্রকে ফিরে পাবার আশায় শেষ চেষ্টা করলেন। মঠে পাঠালেন নির্মলের জ্যেষ্ঠতাত বৈদ্যনাথ-বাবুকে। উত্তরকালে নির্মলের স্মৃতিচারণ : "এবার জ্যাঠামশাই বৈদ্যনাথবাবু আসেন। বাবুরাম মহারাজ ওঁর ছাত্র। কাজেই তিনি ওঁকে খুশি করার জন্য আমাকে বললেন, 'উনি এত কষ্ট করে এত দূর এসেছেন। তা তুমি বাড়ি গেলে আমাদের কোন আপত্তি নেই।' আমার কিন্তু ফিরে যাবার ইচ্ছে আর একদম নেই। অথচ বাবুরাম মহারাজ জ্যাঠামশাইয়ের সামনে বার বার বলছেন যাবার জন্য। ওদিকে সুধীর মহারাজ (শুদ্ধানন্দজী) কিছু দূরে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে, চোখ ইশারা করে আমায় যেতে নিষেধ করছিলেন দেখলুম। যাক সুধীর মহারাজের ইঙ্গিতে বুকে যেন বল পেলুম।[৭] শেষ পর্যন্ত যেতে হল। তবে একসঙ্গে না গিয়ে একই ট্রেনে পৃথক ভাবে Return Ticket করে যাই। এ বুদ্ধিও সুধীর মহারাজই দিয়েছিলেন। ওঁরা গেলেন হাওড়া হয়ে, আর আমি গেলুম বালি থেকে—কিন্তু একই ট্রেনে। জ্যাঠামশাই পরে বলেছিলেন, 'একসঙ্গে এলে কী দোষ ছিল? একসঙ্গে এলি না কেন?' আমি কিন্তু ইচ্ছে করেই ওঁদের সঙ্গে যাইনি। ওঁরা গেরস্থ—gulf of difference। যাক তিন-চারদিন বাড়িতে থেকে সবাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার মঠে চলে আসি। আর কোন হাঙ্গামা হয়নি। আসবার সময় মায়ের চোখে জল দেখেছিলাম।"

পুত্রস্নেহের সুকোমল অনুভূতির স্বাভাবিক প্রকাশ এই অশ্রুজল কিন্তু উত্তরকালে স্থায়ী হয়নি। প্রথমে নির্মল এবং পরে ছোট ছেলে বিমল সন্ন্যাসী হওয়ায় হরিপ্রসাদ বসু এবং বিন্দুবাসিনী দেবী কিন্তু বিচলিত হননি। দুই পুত্রের অন্তরের তীব্র আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা তো পিতামাতার আধ্যাত্মিক চেতনা থেকেই সঞ্জাত। সেজন্য রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতি তাঁদের কোন বিরূপ মনোভাব ছিল না। সংঘের বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকায় একাধিকবার হরিপ্রসাদ বসু রচিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, 'জীবনের হিসাব-নিকাশ'—(উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ এবং পৌষ, ১৩৩৫), 'মানবের সুখান্বেষণের মূল ও তাহার পরিণতি' (উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩২৬)। এমনও হয়েছে যে পুত্র নির্মলকে দেখতে এসে হরিপ্রসাদবাবু অনেকবার মঠবাস করে গিয়েছেন।

বাবুরাম মহারাজের শিক্ষকরূপে নির্মলের জ্যাঠামহাশয় বৈদ্যনাথ বসুর সঙ্গে তো মঠ-মিশনের যোগাযোগ চিরকাল অবিচ্ছিন্ন ছিলই। পরবর্তীকালে বৈদ্যনাথ

৭, বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত 'স্বামী মাধবানন্দ' গ্রন্থে এস্থলে স্বামী শুদ্ধানন্দের উল্লেখ আছে। যদিও স্বামী অকুণ্ঠানন্দ প্রমুখ প্রাচীন সন্ন্যাসীদের মতে এস্থলে ইঙ্গিতকারী ব্যক্তি ছিলেন স্বামী ভূমানন্দ।

বসুর সুযোগ্য পুত্র মুঙ্গেরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী রায়বাহাদুর হেমচন্দ্র বসুর সময়েও এই যোগসূত্র অক্ষুন্ন থাকে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিহারে প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে মুঙ্গের, ভাগলপুর প্রভৃতি অঞ্চল প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রামকৃষ্ণ মিশন ঐ অঞ্চলে সেবাকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তখন মঠ ও মিশনের সংঘাধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ। পূজনীয় মহারাজ বিপদগ্রস্ত মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনে সেবাকার্য পরিচালনার জন্য নিজে মুঙ্গেরে যান। হেমচন্দ্রের সুরম্য অট্টালিকা তখন ভূমিকম্পে প্রায় বিধ্বস্ত। অবশিষ্ট অংশের একটি ঘরে আতিথ্য গ্রহণের জন্য হেমচন্দ্র সানুনয়ে পূজনীয় অখণ্ডানন্দ মহারাজকে অনুরোধ জানান। সেই অনুসারে পূজনীয় মহারাজ সাতদিন মুঙ্গেরে হেমচন্দ্রের বাড়িতে অধিষ্ঠান করেন। ঐ সময় গৃহস্বামী হেমচন্দ্র নিজে বাড়ীর অনতিদূরে পথিপার্শ্বে একটি তাঁবুতে বাস করেছিলেন। এই ত্রাণকার্য উপলক্ষে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ) প্রমুখ সন্ন্যাসীবৃন্দও ঐ সময় হেমচন্দ্রের বাড়িতে ছিলেন। শহরে হেমচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়েছিল। উল্লেখ্য হেমচন্দ্রকে নির্মল এবং বিমল স্বীয় অগ্রজের মত দেখতেন এবং তাঁদের জীবনে 'হেমদার' প্রভাবের কথা প্রায়ই উল্লেখ করতেন।[৮]

ব্রহ্মচারী নির্মল মঠে যোগদানের পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। পেয়েছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা ও দর্শন। খুব কাছে থেকে তাঁদেরকে দেখেছিলেন। দিন কাটিয়েছিলেন তাঁদের পুণ্য সাহচর্যে। তাঁদের রঙে নিজের জীবনটি রাঙিয়ে ছিলেন ব্রহ্মচারী নির্মল। ব্রহ্মানন্দজী, অদ্বৈতানন্দজী, রামকৃষ্ণানন্দজী, প্রেমানন্দজী, শিবানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী, অদ্ভুতানন্দজী, অভেদানন্দজী, অখণ্ডানন্দজী, সুবোধানন্দজী, বিজ্ঞানানন্দজী ও সারদানন্দজী—এই বারজন শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের দর্শন ও পবিত্র সান্নিধ্য লাভের বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন ব্রহ্মচারী নির্মল। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত গুপ্ত সাধু। পরবর্তীকালে তিনি এঁদের কথা খুব কম বলতেন। সুলেখক ও প্রখর স্মৃতিধর হয়েও তাঁদের স্মৃতিকথা প্রায় অনুচ্চারিতই থেকে গেছে। ব্রহ্মচারী নির্মলের ইহ-পর জন্মের মুক্তিদাত্রী ও আশ্রয়কর্ত্রী শ্রীশ্রীমার স্মৃতিচিত্রও অত্যন্ত অল্প। জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে কয়েকবার দর্শন করেছিলেন তিনি। তাঁর মধুর স্মৃতিঃ "দ্বিতীয়বার জয়রামবাটী যাই ১৯১০ সালের গ্রীষ্মের প্রারম্ভে মঠের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ পূজনীয় বিরজানন্দ স্বামীর সহিত। তখন তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। মনে আছে, মা তাঁহার প্রিয় সন্তানকে অতি যত্নের সহিত খাওয়াইতে ব্যগ্র ছিলেন। সেই সময়ে

৮. মুঙ্গেরে হেমচন্দ্র বসুর বাড়িতে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের অধিষ্ঠান সম্পর্কে স্বামী দিব্যাত্মানন্দ লিখিত প্রতিবেদন 'উদ্বোধন' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনি যে, ঠাকুরই সব ; সাধন-ভজন সকলের সহজসাধ্য নয়, উহা মাথা ঠান্ডা রাখিয়া করিতে হয় এবং সংঘের কাজ ঠাকুরেরই সেবা। ১৯১৩ সালের শেষের দিক হইতে বৎসর দুই কাল উদ্বোধনে ('উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক রূপে) থাকিবার সময় শ্রীশ্রীমা কলিকাতা আসিলে তাঁহার নিত্য দর্শন লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার কথা মনে উঠে নাই। তাঁহার চরণতলে বাস করিতেছি, ইহা ভাবিয়াই তৃপ্তিবোধ করিতাম। তাঁহার শেষ দর্শন লাভ করি জয়রামবাটীতে ১৯১৮ সালে। কি উদ্বোধনে, কি অন্যত্র, অনেক ছোটখাট ব্যাপারের মধ্য দিয়া তাঁহার সহজ অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ ও অহেতুক করুণার নিদর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছি। ইহাতে আমাদের গুণপনা কিছুই নাই, ইহা তাঁহারই জগজ্জননী-সুলভ মাহাত্ম্য। পরে যখন ভক্তগণ রচিত তাঁহার স্মৃতিকথা পাঠ করি, তখন এক একবার মনে হইয়াছে, মাকে ঐরূপ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত ভাল হইত। কিন্তু তাঁহারই উক্তি হইতে আমরা ইহা জানিয়া আশ্বস্ত হই যে, তিনি দীক্ষা-দান কালে শিষ্যের যাহা কিছু করণীয় সব করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ গুরু হইতে এইখানেই তাঁহার পার্থক্য।"

শ্রীশ্রীমায়ের দ্বিতীয় দর্শনকালে জয়রামবাটীতে যখন নির্মল মহারাজরা যান, তখন গ্রীষ্মকাল। সবেমাত্র কালীমামার দোতলা খড়ের বাড়ি তৈরী হয়েছে শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন বাড়ির সম্মুখে। তাঁরা ঐ বাড়ির নীচের তলায় দাওয়ায় মশারি খাটিয়ে ঘুমোতেন। এই সময় কলকাতা ও শিলং হতে কয়েকজন যুবক আসেন জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভের জন্য। নির্মল মহারাজ তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সুপরিচিত বেদান্ত-পণ্ডিত স্বামী জগদানন্দ ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

শ্রীশ্রীমায়ের দেবীত্ব সম্বন্ধে সদা সচেতন ছিলেন নির্মল মহারাজ। তখন তিনি সাধারণ সম্পাদক। শ্রীশ্রীমায়ের একটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রচ্ছদে শ্রীশ্রীমায়ের একটি ছবি অঙ্কন করেছেন জনৈক শিল্পী। তা দেখে এক সন্ন্যাসীর মন্তব্য : "কী সব কাণ্ড! মায়ের ঠোঁটে খানিক লাল রঙ লাগিয়ে বসে আছে!" নির্মল মহারাজের ঝটিতি উত্তর, "তাতে কি? মা দুর্গার ঠোঁটেও তো লাল রঙ দেওয়া আছে।" শ্রীশ্রীমায়ের একটি অমৃতবাণী ছিল নির্মল মহারাজের আজীবন সঙ্গী। একবার শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "বাবা, আমরা তো মেয়ে মানুষ। সংসারের কাজ তো ছাড়া যাবে না। এই জল দিয়ে ভাতের হাঁড়িটা চাপালাম। চাল ফুটতে লাগল। সেই ফাঁকে একটু জপ সেরে নিলাম। আবার ডালের জল চাপালাম। গরম হতে লাগল। আবার একটু জপ করে নেওয়া গেল। একটু পরে ডাল ছেড়ে আবার জপ। এই রকম আর কি বাবা···।" শত কাজ থাকলেও, শরীর অসুস্থ হলেও, এমনকি ট্রেনেও—ঠিক সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত জপ-ধ্যান করতেন নির্মল মহারাজ। এ নিষ্ঠার ব্যতিক্রম কখনও

হয়নি। আবার যখন জপধ্যানের সময়ে সংঘের কাজ এসে পড়ত তখন তিনি সেই কাজই করতেন। কাজ শেষ হবার পর আবার জপধ্যানে বসতেন। একবার কলকাতা থেকে সন্ধ্যায় এক সন্ন্যাসী এসেছেন তাঁর কাছে একটি চিঠিতে সই নেবার জন্য। সন্ন্যাসী এসে দেখেন যে স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের ঘর বন্ধ হয়ে গেছে। দু'ঘণ্টা পর তিনি দরজা খুললেন। সেই সন্ন্যাসী তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে চিঠিটি দিলেন সই-এর জন্য। নির্মল মহারাজ সব জিজ্ঞাসা করলেন। সন্ন্যাসীকে খুব বকুনি দিলেন তাঁকে না ডাকার জন্য। বললেন ঃ "সংঘের কাজ প্রথম। এতক্ষণ শুধু আমার জন্য সময় নষ্ট করলে। এরকম আর যেন না হয়।" যখন অন্তিম সময়—হাসপাতালের শয্যায় শায়িত, সে সময়ও তিনি শুয়ে শুয়ে মালা জপ করছেন। এই দৃশ্য এক ভক্ত-শিষ্য ক্যামেরায় ধরে রাখার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি।

বিভিন্ন সময়ে নির্মল মহারাজের সুযোগ হয়েছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দের পূত সান্নিধ্য লাভের। মাদ্রাজ মঠে রাজা মহারাজের পুণ্যস্মৃতি তাঁর মনে চির জাগরূক ছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে রাজা মহারাজের উপস্থিতিতেই সকলে হৃদয়ে একটি অপূর্ব প্রসন্নতা অনুভব করতেন। রাজা মহারাজ বালকের মত সকলের সঙ্গে কৌতুক করতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে নির্মল মহারাজ শুনেছিলেন একটি ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের বলেছিলেন, "রাখাল আমাদের রাজা। আমরা তার প্রজা।" নির্মল মহারাজ আশ্চর্য বোধ করেছিলেন রাজা মহারাজের তাস খেলা দেখে। এ নিয়ে একদিন শশী মহারাজ নিজে থেকেই তাঁকে বললেন, "আমাদের মঙ্গলের জন্য মহারাজ তাস খেলেন! তিনি থাকেন আধ্যাত্মিকতার একেবারে উচ্চস্তরে। যদি তিনি সর্বদা ঐ অবস্থায় থাকেন তাহলে তাঁর শরীর বেশী দিন থাকবে না। সেজন্য আমরা তাঁর সঙ্গে তাস খেলা চালু করেছি, যাতে তাঁর মন অন্তত কিছু সময়ের জন্য সাধারণ ভূমিতে থাকে।" নির্মল মহারাজ লজ্জিত হলেন তাঁর ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রাজা মহারাজের মত বিরাট আধ্যাত্মিক মহাপুরুষকে বিচার করার জন্য। কনখলেও কিছুদিন তিনি ছিলেন রাজা মহারাজের স্নেহের আশ্রয়ে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ ময়মনসিংহ, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে যান। সঙ্গে অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর সঙ্গে নির্মল মহারাজও ছিলেন। ময়মনসিংহে ভক্ত জিতেন দত্তের বাড়িতে তাঁদের বাসস্থান হয়। দুই মহাপুরুষের দিব্য উপস্থিতিতে সেসময়, ঐসব জায়গায় একটা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল একটা আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল। এটি নির্মল মহারাজের অন্তরের অনুভূতি।

ময়মনসিংহে শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর নবনির্মিত কক্ষের উদ্বোধনের দিন স্বয়ং রাজা মহারাজের শ্রীশ্রীঠাকুরের অপরূপ আরতি করার অপূর্ব দৃশ্যের সাক্ষী

ছিলেন নির্মল মহারাজ। বাবুরাম মহারাজের আদেশে ময়মনসিংহের আনন্দ-মোহন কলেজে ও টাউন হলে স্বামীজীর সেবাধর্ম সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়েছিলেন নির্মল মহারাজ। ঢাকাতেও সেই একই আনন্দের স্রোত। একদিন ঢাকার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ বিস্ সাহেব আসেন রাজা মহারাজের দর্শনে। রাজা মহারাজ বিশিষ্ট ভক্ত শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র দত্তকে আদেশ দেন, "তুমি গিয়ে নির্মলকে বল যে আমি তাকে বিস্ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে বলেছি।" আদেশ পালন করলেন নির্মল মহারাজ। বিস্ সাহেবকে অতি সহজ সরল ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বুঝিয়ে দিলেন তিনি। আনন্দিত হলেন বিস্ সাহেব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে কার্জন হলে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল নির্মল মহারাজকে। সে সভায় বাবুরাম মহারাজও উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রাজা মহারাজদের সঙ্গে নির্মল মহারাজ দর্শন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য নাগ মহাশয়ের জন্মভিটা দেওভোগ গ্রাম। এখানে তাঁদের শুভাগমন উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল সংকীর্তনের। কীর্তনের তালে তালে বাবুরাম মহারাজ আরম্ভ করলেন মনোহর নৃত্য। অতঃপর "বাবুরাম নৃত্য করিবার চেষ্টা করিতেই মনে হইল—নীচে হইতে ঢেউয়ের মতো কিছু একটা মহারাজের বুকের উপর উঠিয়া গেল।" ভাবসমাধিতে মগ্ন হলেন শ্রীমহারাজ। নৃত্যকালে 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ' বলে উদ্দাম সঙ্গীতের রোল সকলকে মুগ্ধ করেছিল। ঢাকাতেও নির্মল মহারাজ দেখেছিলেন, "বাবুরাম মহারাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া একটু নৃত্যের ভঙ্গি করিলেন। তখন তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল।" এই দুই মহাপুরুষের অনুপম নৃত্য ও ভাবসমাধির মনোমুগ্ধকর দৃশ্য অবলোকনে নির্মল মহারাজের মন পরম তৃপ্তিলাভ করেছিল। নারায়ণগঞ্জেও শীতলক্ষ্যা গ্রামে রাজা মহারাজের আদেশে তাঁকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়েছিল। এই সুখস্মৃতি তাঁর মনে চিরস্থায়ী ছিল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সম্বন্ধে স্বয়ং স্বামী ব্রহ্মানন্দ নির্মল মহারাজকে বলে-ছিলেন, "এখানে (মাদ্রাজ মঠে) তুমি এই সাধুর কাছে থাক। ওঁর সেবা কর।" রাজা মহারাজের বাক্য শিরোধার্য করে নবীন নির্মল মহারাজ রামকৃষ্ণানন্দজীর কিছু ব্যক্তিগত সেবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মাদ্রাজ মঠে নির্মল মহারাজের অন্যতম কাজ ছিল মেঝে ঝাঁট দেওয়া। একদিন তিনি একটি মাকড়সাকে আস্তে করে সরিয়ে ঝাঁট দিচ্ছিলেন। তা দেখতে পেয়ে শশী মহারাজ ঝাড়ুটি কেড়ে নিয়ে মাকড়সাটিকে মেরে বললেন, "যদি তুমি তাদেরকে না মেরে ফেল, ওরাই তোমাকে মারবে।" নির্মল মহারাজের মর্মানুভূতি : "তিনি চেয়েছিলেন যে, আমার অযথা নমনীয় ভাব দূর হোক।" শশী মহারাজের কাছে তিনি শিখেছিলেন সংস্কৃতের বিশুদ্ধ উচ্চারণ। দুর্গা-সপ্তশতীর পঞ্চম অধ্যায়ের পাঠ দিয়েছিলেন শশী

মহারাজ। তাঁর উপদেশে নির্মল মহারাজ পড়েছিলেন মহাভারতের শান্তিপর্ব। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকের অনুভূতি-লব্ধ মায়ার ব্যাখ্যা শশী মহারাজের কাছে শুনেছিলেন তিনি। এক সময় স্বামীজীর 'Inspired Talks'-এর নিম্নোক্ত অংশটি শশী মহারাজের আদেশমত পাঠ করেছিলেন ঃ "People who report about sects with which they are not in sympathy are both conscious and unconscious liars. A believer in one sect can rarely see truth in others" (July 1, 1895). এবং "Until you are ready to change any minute, you can never see the truth ; but you must hold fast and be steady in the search for truth," (July 5, 1895)। এই অংশটির অপূর্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন শশী মহারাজ। নির্মল মহারাজের স্মৃতি ঃ "যে-কিছুদিন তাঁর (শশী মহারাজ) সঙ্গে ছিলাম, তিনি আমার প্রতি বরাবরই দয়ালু। এমনকি তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে আমাকে অনেক কিছু বলতেন, যা আমার মত একজন নবাগত ব্রহ্মচারীর কাছে সম্পূর্ণ অভাবিত ছিল। সাধারণতঃ তিনি আমার সঙ্গে বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করতেন।" শশী মহারাজের কাছে তিনি শুনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদদের প্রসঙ্গ। স্বামী প্রেমানন্দ সম্বন্ধে শশী মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন, "এই বাবুরাম অনন্ত শক্তির আধার। কিন্তু সে তা প্রকাশ করে না।" শশী মহারাজের কর্মযোগ, ধ্যান-ধারণা, আরাত্রিক প্রভৃতির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন নির্মল মহারাজ। শশী মহারাজের ত্যাগ, তিতিক্ষা, নিষ্ঠা নির্মল মহারাজের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়েছিল। শশী মহারাজকে শেষ দর্শন করেন, যখন তিনি বেলুড় মঠে। তখনও নির্মল মহারাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁর পুণ্যস্মৃতি ঃ "তিনি (শশী মহারাজ) জ্বরে ভুগছিলেন। তবুও তাঁর মুখে হাসি। তাঁর জন্য কিছু ফল কিনতে আমাকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল। পরে আমি শুনেছিলাম যে, তিনি আমার শীঘ্রই (সংঘে) যোগদানের দিন গুণছিলেন। আমি এইটিকে তাঁর আশীর্বাদস্বরূপ নিয়েছিলাম এবং খুবই উৎসাহিত বোধ করেছিলাম।" নির্মল মহারাজের উপর শশী মহারাজের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

নাগাধিরাজ হিমালয়ের প্রশান্ত গম্ভীর কোলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মঠে যোগদানের কিছুকাল পরেই মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কর্মীরূপে নির্মল মহারাজ মনোনীত হন। জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের পর আশ্রম অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দের (ষষ্ঠ সংঘাধ্যক্ষ) সঙ্গে তিনি মায়াবতী গিয়েছিলেন। সেখানে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে নির্মল মহারাজকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করেন স্বামী বিরজানন্দ। মায়াবতীতে তিনি ছিলেন মাত্র দু'বছর। মায়াবতীতে নির্মল মহারাজ জানতে পারলেন শশী

মহারাজের যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার কথা। মাদ্রাজ থেকে সুচিকিৎসার জন্যে শশী মহারাজকে তখন উদ্বোধনে আনা হয়েছে। এ রোগ আরোগ্য হবার নয় জেনে নির্মল মহারাজ মর্মাহত হলেন। নির্মল মহারাজের তীব্র ইচ্ছা তাঁকে শেষ দর্শন করবার। কিন্তু সুদূর মায়াবতী থেকে চট করে আসাও সে-সময়ে সম্ভব ছিল না। মাসখানেকের মধ্যে খবর পেলেন শশী মহারাজের মহাসমাধির কথা। সমগ্র আশ্রম শোকাচ্ছন্ন। শোকস্তব্ধ নির্মল মহারাজের মনে উদয় হল শশী মহারাজের স্নেহ-ভালবাসার কথা।

এরপর নির্মল মহারাজকে দেখি তপস্বীরূপে। তপস্যা ছিল তাঁর যেন সহজাত প্রবৃত্তি। রাজা মহারাজের আদেশে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের অধিকাংশ কাল তিনি তপস্যায় রত ছিলেন কনখল, হরিদ্বার ও হৃষীকেশে। মাধুকরী বৃত্তি ছিল তাঁর জীবনধারনের একমাত্র সম্বল। পরবর্তীকালে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "Consequently, the happy experience that followed were partly at least due to his (Raja Maharaj) blessings." যখন তিনি মঠ-মিশনের সহকারী সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদক পদে বৃত, সেসময়ও তিনি একমাস বা আরও বেশী সময় কাজকর্ম থেকে অবসর নিতেন। তাঁর কাছে অবসরের অর্থ ছিল একান্তে সাধন-ভজন ও তপস্যাদি করা। এভাবে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ছিলেন—কাশী (১৯১৭) ; মায়াবতী (১৩ এপ্রিল —সেপ্টেম্বর ১৯৪৯, ১৯ মার্চ—১০ জুন ১৯৫৫) ; কালিম্পং (২২ এপ্রিল— ২৫ জুন ১৯৪৭, ১৪ মে—জুন ১৯৫৪, ২৯ মে —১৭ জুন ১৯৬০)। তাঁর বিশ্রামের প্রিয় স্থান ছিল কালিম্পং আশ্রম। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে ছয় মাসের ছুটি নিয়ে কেদারনাথ-বদরীনারায়ণ দর্শন করেন। এই সময় বিভিন্ন আশ্রমে তিনি ধ্যান-ধারণায় ডুবে থাকতেন। অন্য কোন সময়ে একবার তিনি গঙ্গোত্রী ও অন্যবার অমরনাথ তীর্থ দর্শন করেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জুন-জুলাই মাসে তিনি শ্যামলাতালে একমাস ছিলেন। সংঘাধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ তখন সেখানে ছিলেন। স্বামী মাধবানন্দ শ্যামলাতালে এসে দেখেন, স্বামী বিরজানন্দ খাবার ঘরে প্যাকিং বাক্সের উপর বাক্স সাজিয়ে আশ্রমের গাছের আমগুলি বাছাই ও সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত। তাঁকে স্বামী বিরজানন্দ বললেন ঃ "দেখ না, আমার সেবকদের এই কাজের ভার দিলে ওরা সামান্য নরম আমগুলো 'পচা' বলে ফেলে দেয়। তাই নিজেই সকালে চা খাবার পর বেছে রাখি।" স্বামী মাধবানন্দ হাসলেন মাত্র। একবার সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব হতে অব্যাহতি পেয়ে তিনি মায়াবতী, শ্যামলাতাল, কনখল, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ, বারাণসী, কিষেনপুর প্রভৃতি আশ্রমে দুই বৎসর কাল (এপ্রিল ১৯৪৯—এপ্রিল ১৯৫১) অতিবাহিত করেছিলেন গভীর জপ-ধ্যানে।

প্রথমবারে হৃষীকেশে তপস্যার সময় মঠ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে

বন্যাত্রাণ সেবায় নির্মল মহারাজ আত্মনিয়োগ করেন। সময় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট। দামোদরের বন্যায় বর্ধমান বিভাগের হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যাপীড়িত জনসাধারণের জন্য খানাকুল (হুগলী জেলা), হাদালনারায়ণপুর (বাঁকুড়া) ও মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমায় রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণকার্য করেছিল। নির্মল মহারাজ এই ত্রাণসেবা কিছুকাল করেছিলেন।

এরপর নির্মল মহারাজ কর্মী হন উদ্বোধন কার্যালয়ের। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শেষের দিক থেকে প্রায় দু'বছর 'উদ্বোধন' পত্রিকা পরিচালনায় স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দের সুযোগ্য সহকারী ছিলেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে নির্মল মহারাজই ছিলেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক—মাঘ ১৩২০ থেকে পৌষ ১৩২২ পর্যন্ত। শ্রীশ্রীমা এখানে থাকলে অতিরিক্ত সুযোগ ছিল শ্রীশ্রীমায়ের নিত্য দর্শন ও সান্নিধ্য। এখানে থাকাকালীন স্বামী শুদ্ধানন্দের কাছে প্রশাসনিক কাজে শিক্ষালাভ হয় তাঁর। স্বামী শুদ্ধানন্দের সহায়তা ও সাহচর্যে নির্মল মহারাজ পরবর্তীকালে আদর্শ প্রশাসক হতে পেরেছিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে স্বামী সারদানন্দ মূত্রাশয়ের (Kidney) অসুখে কিছু-দিনের জন্য শয্যাগ্রহণ করেন। নির্মল মহারাজ তখন উদ্বোধনের কর্মী। তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল অসুস্থ স্বামী সারদানন্দের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থেকে সেবা করবার। উত্তরকালে স্বামী মাধবানন্দ বলেছিলেন, "শরৎ মহারাজ সুস্থ অবস্থায় সচরাচর কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন না।"

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মতিথি। নির্মল মহারাজের কাছে এই দিনটি ছিল বিশেষ স্মরণীয়। এই পবিত্র দিনে শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র সংঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভুবনেশ্বর মঠে তাঁকে পূত সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন। নির্মল মহারাজের নতুন নাম হল স্বামী মাধবানন্দ।

কনখলে তপস্যার সময় স্বামী মাধবানন্দ হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দ) পবিত্র সংস্পর্শে আসেন। হরি মহারাজ স্বামী মাধবানন্দের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির ভবিষ্যৎ ইঙ্গিতও নাকি হরি মহারাজ দিয়েছিলেন। কনখলে স্বামী মাধবানন্দের সৌভাগ্য হয়েছিল বেদান্তের প্রতিমূর্তি হরি মহারাজের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করার। তাঁকে সাধন-ভজনে খুব উৎসাহ দিতেন হরি মহারাজ। স্বামী মাধবানন্দ তখন কাশীধামে। তপস্যায় জীবন-যাপন করছেন অদ্বৈত আশ্রমে। হরি মহারাজ আলমোড়ায়। হরি মহারাজ দুটি উদ্দীপনাময়ী চিঠি লিখলেন তাঁকে (তারিখ ৩।৫।১৯১৬): "আমি পূর্বেই তোমার কাশী আগমন অবগত হইয়াছিলাম এবং তোমার মহদুদ্দেশ্য সফল হউক, এই কথা স্বতই প্রভুকে জানাইয়াছিলাম। মনুষ্যজীবনে ভগবান লাভ করাই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। আর মনুষ্যজীবনেই ভগবান লাভ সম্ভব বলিয়া মনুষ্যজীবনই

শ্রেষ্ঠ জীবন। ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগাদি যাহা কিছু তাহা অন্য জীবনেও হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবান লাভ এক মনুষ্যজীবন ছাড়া আর কোন জীবনেই হইবার নয়। দার্শনিকের ভাষায় সকল দুঃখের নিবৃত্তি ও পরম আনন্দ প্রাপ্তিই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য—এই কথা বলা হয়। কিন্তু বলিবার প্রথা ভিন্ন হইলেও বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই। ভক্তের ভাষায় ভগবান বলিতে যাহা বুঝায়, যোগী তাঁহাকেই পরমাত্মা শব্দে লক্ষ্য করিয়া থাকেন এবং তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্ম শব্দে তাঁহাকেই নির্দেশ করেন। সুতরাং ভগবানলাভ, জ্ঞানলাভ বা মুক্তিলাভ একই কথা এবং ইহাই জীবমাত্রের অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রের চরম লক্ষ্য সন্দেহ নাই। তোমরা পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ; অতএব তোমাদের যে এই অবস্থা লাভ করিবার প্রবৃত্তি হইবে, ইহা অতিশয় স্বাভাবিক ও সমীচীন।

"যে যা চায় সে তা পায়, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। আন্তরিক আগ্রহ, টান হইলেই প্রার্থিত বস্তুলাভ হইয়া থাকে। অনুরাগ হইলেই···তাঁর দর্শন হয়, এসব শুনিয়াছ। এখন জীবনে তাহা ঘটাইতে পারিলেই কাজ হইয়া যাইবে। তদ্‌গতান্তরাত্মা হওয়া চাই। ঠাকুর বলিতেন, 'ডাইলিউট হয়ে যাও।'

'মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।'

"জপ-ধ্যান আবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতেই যে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, তাহার নিশ্চয় নাই। তাঁর কৃপাই তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়, অন্য উপায় নাই। স্বামীজী বলিতেন, 'এ কি শাক মাছ যে এত দাম দিলুম, আর নিয়ে এলুম ! ভগবানের কি দাম আছে যে, এত জপ এত তপ করে তাঁকে লাভ করবে ?' তাঁর কৃপা হলে তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁর দ্বারে ঠিক ঠিক পড়ে থাকতে পারলে তাঁর কৃপা হয়। আমি নিরুৎসাহ হবার জন্য এরূপ বলিতেছি না। জপ-তপ খুব কর ; কিন্তু প্রাণভরে আত্মসমর্পণ করতে পারলেই সে সকলের সাফল্য—এই কথা বলিতেছি। তাঁকে সব দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—এই কথাই বলিতেছি। চল তাঁর দিকে যত পার। তারপর তিনিই সব করিয়ে নেবেন।··· তাঁর দ্বারে পড়িয়া থাকিলে তিনি সময়ে সকল আশা পূর্ণ করেন। কিন্তু নিরাশ হইয়া থাকিতে পারিলে তিনি অধিকতর সুখী হন। 'আছে মাত্র জানাজানি আশ, তাও প্রভু কর পার।'—স্বামীজী এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন।"

অন্য পত্রটি (১৪।৮।১৯১৬) আরও উৎসাহব্যঞ্জক ঃ "···অদ্বৈত আশ্রমে থাকিয়া তাঁহার স্মরণ মনন করিতেছ ইহা আমি মধ্যে মধ্যে প্র-র নিকট হইতে অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করি। সব মনটা তাঁর শ্রীপাদপদ্মে দিতে পারিলেই তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। দিতে পারা যায় না—দেবার চেষ্টা করিলেই প্রভু আপনি উহা টানিয়া লন। ঠাকুর বলিতেন—'তাঁর দিকে দশ পা এগুলে তিনি একশ পা এগিয়ে আসেন।' তা যদি না হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে কেহ কি

লাভ করিতে পারিত? মানুষের চেষ্টায় কি তাহা সম্ভব? স্বামীজী একসময় আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হরি ভাই, ভগবান কি শাক মাছ যে এত দাম দিয়া অর্থাৎ এত জপ, এইরূপ তপ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবে? তাঁহাকে লাভ করিতে কেবল তাঁহার কৃপা!' 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।' তবে কি জপ-তপ করিবে না? করিবে বইকি—প্রাণ ভরিয়া যতদূর সাধ্য করিতে হইবে। তবে জানিতে হইবে যে, আমি জপ-তপ করিতেছি বলিয়াই যে ভগবান দেখা দিবেন, তাহা নহে। কৃপাময় তিনি। কৃপা করিয়াই অনুগ্রহ করিবেন। আমি জপ-তপ না করিয়া থাকিতে পারিনা, তাই জপ-তপ করি। এই জপ-তপ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক হওয়া চাই। ইহা প্রাণ জুড়াইবার উপায় মাত্র। ভগবানলাভ ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে, আমার জপ-তপের উপর নহে—এই বিশ্বাস, এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকা একান্ত আবশ্যক। সাধন-ভজন কেবল ডানা-বেদনা করিবার জন্য। ডানা-বেদনা হইলেই বসিবার ইচ্ছা হয়। তখন পক্ষীর মাস্তুল ভিন্ন অন্য কোন বিশ্রামের স্থান না থাকায় সেই মাস্তুলেই আশ্রয় লইতে হয়। অনন্ত আকাশে উড়িয়া উড়িয়া কোথাও কোন বিশ্রামের স্থান নাই নিশ্চয় না হইলে, অনন্যশরণ হওয়া যায় না। তাই ধ্যান-ভজন, জপ-তপ প্রভৃতি যথাশক্তি করিতে হয়; করিয়া কিন্তু পরে এই বিশ্বাসেই আসিতে হয় যে, সাধন-ভজন সব কোন কর্মেরই নহে। 'আমার জপের মালা, ঝুলি কাঁথা জপের ঘরে রৈল টাঙ্গা।' তখন সাধক বলেন, 'নিজগুণে যদি রাখ, কমলাকান্তেরে দেখ / নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া / সে-সব কথা ভূতের সাঙ্গা।' 'সাঙ্গা' মানে বিবাহ। ভূতের বিবাহ কখনও হয়নি, হবে না—সাধন-ভজন করে কেউ তোমাকে পায়নি, পাবে না। কেবল 'নিজগুণে যদি রাখ, কমলাকান্তেরে দেখ' তবেই কিছু সম্ভব। নহিলে শ্রীরামপ্রসাদ কেন বলিলেন—'কেন ডাক মা মা বলে মার দেখা তো আর পাবে নাই / থাকলে দেখা দিত আসি, সর্বনাশী বেঁচে নাই।' কিন্তু এ হতাশ ক্রন্দন নহে, কারণ তিনি যদিও জানেন যে, ইহা 'সন্তরণে সিন্ধুগমন', তথাপি বলিতেছেন,

'মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না,
ধরবে শশী হয়ে বামন।'

তিনি যে প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, তাঁকে না পেলে কি রক্ষা আছে, পেতেই হবে। তবে 'সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।' সে অবস্থা তিনিই করে দেন। তাঁকে প্রাণ মন এক করে ডাকতে ডাকতে তিনি হৃদয়ে উদয় হয়ে সব ঠিক ঠিক জানিয়ে দেন, তখনই 'ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখা' হয়। প্রভু অচিরে তোমাদের সেই ভাব এনে দিন—তাঁহার নিকট আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি।"

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস। কাশী সেবাশ্রমের নতুন জমির উপর

পাঁচটি নবনির্মিত গৃহের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ কাশীধামে এসেছেন। কিছুদিন পরে স্বামী তুরীয়ানন্দও আলমোড়া থেকে এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। বহু সাধুর মেলা। স্বামী মাধবানন্দও তখন সেখানে। স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু মহারাজ) কাশীর সোনাপুরায় থাকেন। মাঝে মাঝে বাবুরাম মহারাজ সাধুদের নিয়ে লাটু মহারাজের কাছে যান। একদিন বাবুরাম চলেছেন সোনাপুরায়। সঙ্গে পাঁচজন সাধু—স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী রাঘবানন্দ, স্বামী শান্তানন্দ ও স্বামী বাসুদেবানন্দ। লাটু মহারাজ দড়ির খাটিয়ায় মুড়ি দিয়ে শুয়ে। এই দুই শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের সেদিনের মধুর ভালবাসা মাখা কথোপকথনের অন্যতম শ্রোতা ছিলেন স্বামী মাধবানন্দ। বাবুরাম মহারাজ লাটু মহারাজকে দেখে বললেন, “আরে পরমাত্মা উঠো উঠো।” লাটু মহারাজ মুড়ি দিয়েই বলতে লাগলেন, “কাহে দিক্ করতে হো, কাল রাতমে বিলকুল নিদ্ নহী হুয়ী।” বাবুরাম মহারাজ বললেন, “আরে জী উঠো উঠো, হমলোগ জানতে হৈ, তুম ধ্যান করতে হো।” যা হোক তারপর তিনি উঠে পড়লেন। পরস্পর কুশল-প্রশ্নাদি হল। পরে ছাদ থেকে ঘরে গিয়ে বসা হল। তাঁরা দুজনে খাটে বসলেন। বাকী সকলে মেঝেতে সতরঞ্চির উপরে বসলেন। একথা সে কথার পর বাবুরাম মহারাজ লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা, ঠাকুর আমাদের কেমন ভালবাসতেন বল দেখি?” লাটু মহারাজ উত্তরে বললেন, “আরে উ কহনেকী বাত নেহি। ঈশ্বরের ভালবাসা জীব কি করে বুঝবে? ভাগবত শুনে আমরা বৃন্দাবনের গোপগোপীদের ভালবাসাই বুঝতে পারি; কিন্তু তিনি তাঁদের কিরূপে ভালবাসতেন তা কি করে আমরা বুঝব, বই পড়ে শুনে তাঁর ভালবাসার আভাসও পাওয়া যায় না। গোপীরা অজ্ঞান হয়ে তাঁতে ঝাঁপিয়ে পড়ত, আর বুঝতেও পারত না এ টান কিসের। লোহা জানেও না কেমন করে চুম্বক তাকে টানে।” বাবুরাম মহারাজ স্বামী মাধবানন্দ প্রমুখ সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, “দেখ্ একবার তোরা। এমন ব্যাখ্যা কখনও শুনেছিস। বেশ খতিয়ে নে, ঠাকুর যা বলেছিলেন।” অতঃপর প্রশ্ন হল, “ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ—শ্লোকটির মানে কি? জ্ঞানীকে কি করে ভক্তি অভিভূত করে।” লাটু মহারাজ বলতে লাগলেন, “জ্ঞানী না হলে ভগবান যে ‘এক-ভক্তির’ কথা বলেছেন, তা হবে কি করে?…একই বস্তু, আর সব অবস্তু, এর উপলব্ধি না হলে, এক-ভক্তি হবে কি করে? দ্বৈতজ্ঞান থাকতে ‘এক-ভক্তি’ হয় না। জ্ঞানী তো ভেদ-বুদ্ধিতে ভগবানকে দেখে না, সে ভগবানকে নিজের আত্মা বলে মানে। কাজে কাজেই আত্মার চাইতে আর কি প্রিয় বস্তু থাকতে পারে?”

স্বামী মাধবানন্দ আবার মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কর্মীরূপে মনোনীত হলেন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। স্বামীজীর প্রিয় আশ্রম। তিনি নিজেও সেখানে গিয়েছিলেন। স্বামী শিবানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের

△

"নাগাধিরাজ হিমালয়ের প্রশান্ত গম্ভীর কোলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম।" —পৃষ্ঠা ১৯। উপরে ইনসেটে আশ্রম-গৃহ।

"মায়াবতীতে গৃহীত ছবিতে দেখা যায় তাঁর শরীর রোগা, কিন্তু মুখমণ্ডল বালকোচিত কমনীয় ও সংস্কৃতিসম্পন্ন। ...তিনি সলজ্জ, আপন চিন্তায় বিভোর।" — পৃষ্ঠা ২৮

◁
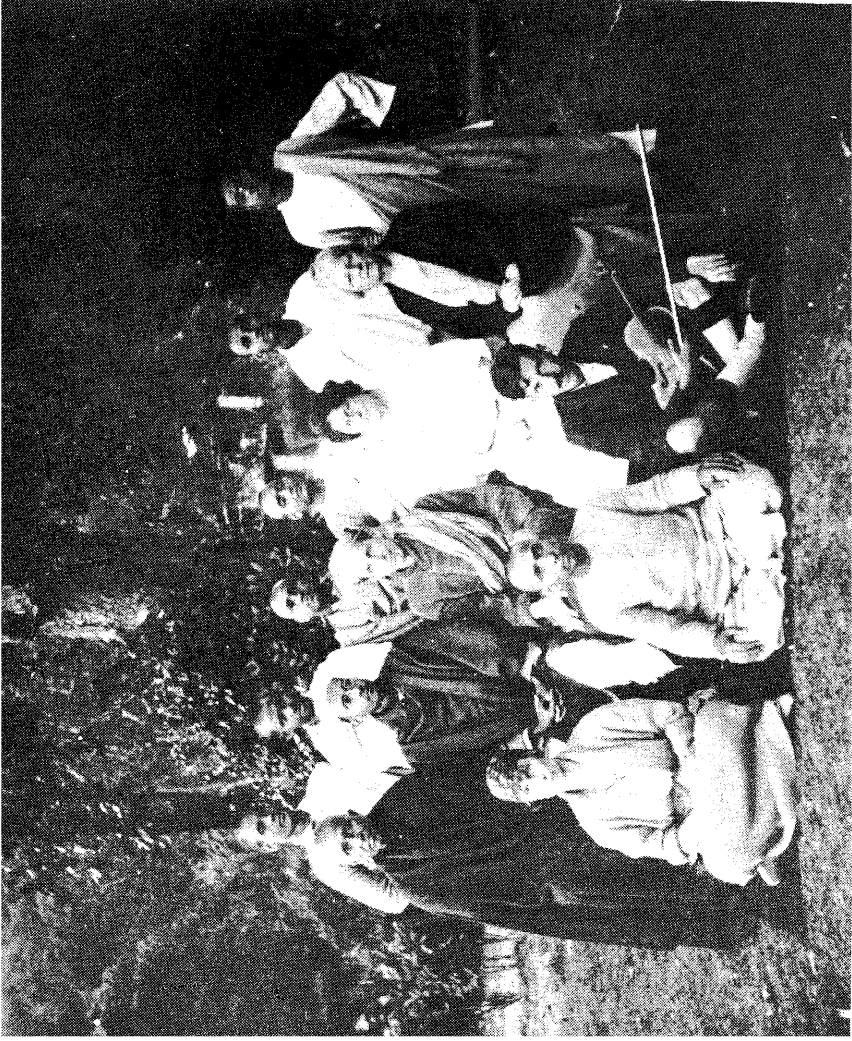
"মায়াবতীর ইতিহাসে তাঁর অধ্যক্ষতাকাল স্বর্ণযুগ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।"—পৃষ্ঠা ২৫

দণ্ডায়মান (বাম হইতে) : ১। স্বামী পবিত্রানন্দ (?), ২। স্বামী অভয়ানন্দ, ৩। স্বামী আত্মবোধানন্দ, ৪। স্বামী যতীশ্বরানন্দ, ৫। স্বামী নিখিলানন্দ, ও ৬। স্বামী অশোকানন্দ (?)। চেয়ারে উপবিষ্ট (বাম হইতে) : ১। স্বামী শ্রীবাসানন্দ, ২। স্বামী মাধবানন্দ, ৩। স্বামী অতুলানন্দ, ৪। রেবেকা ফক্স, ৫। সারা ফক্স। নীচে মধ্যে উপবিষ্ট : স্বামী বিবিদিষানন্দ।

পাদস্পর্শে ধন্য অদ্বৈত আশ্রম। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামীজীর শিষ্য স্বরূপানন্দজী। এখান থেকে নিজস্ব প্রেসে প্রকাশিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'। স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর প্রকাশের স্থান এই অদ্বৈত আশ্রম। পরের বছরই তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানন্দের আকস্মিক তিরোধান হয়। এরপরই অর্থাৎ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বামী মাধবানন্দ অদ্বৈত আশ্রমের বহু সম্মানিত অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তিরিশ বৎসর। ঐ বছরেই ২০শে জুন তিনি অদ্বৈত আশ্রমের অছিও (Trustee) নির্বাচিত হন। মায়াবতীর ইতিহাসে তাঁর অধ্যক্ষতাকাল স্বর্ণযুগ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তাঁর নেতৃত্বে আশ্রম সর্বদিকে উন্নতি লাভ করেছিল। সাধুরাই সব কাজ করতেন। প্রেসে ছাপা ফর্মাগুলিকে বাঁধাই করা প্রভৃতি ছোট কাজ করতে হত সবাইকে। আঠা লাগানো, সেলাই করা, ছাঁট-কাট করা ইত্যাদি সামান্য কাজ-গুলিও অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে করতেন আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দও। রাঁধুনী অসুস্থ হলে বা অন্য কারণে সে রান্না করতে অসমর্থ হলে রান্না করতেও অন্যান্য সাধুদের সাহায্য করতেন তিনি। তিনি সবায়ের সঙ্গে আটা ঠাসা, রুটি সেঁকা বা খাবার তৈরী করতেন। ঝাড়ুদারের অনুপস্থিতির সময়ে অপর কাউকে বিরক্ত না করে, তিনি নিজেই পায়খানা সাফ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করতেন না। তিনি সব কাজকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা বলে মনে করতেন। তবুও বাস্তব ক্ষেত্রে আসক্তি-নিরাসক্তি সম্বন্ধে কর্মী-সাধক মাত্রই জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। কখনও বা ভ্রান্ত ভাবনায় অভিভূত। নিরাসক্তির সাধকের কর্ম-কৌশল অভ্যাস করতে হয়। অথচ সঙ্গে সঙ্গে কাজকর্মে সত্যিকারের আঁট বা শ্রদ্ধাপূর্ণ কর্মতৎপরতাও আয়ত্ত করতে হয়। স্বামী মাধবানন্দ এবিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ৩।১২।১৯২৫ তারিখে তিনি জনৈক সাধুকে চিঠিতে লিখেছেন, "power to attach—এটা একটা মস্ত গুণ, সুতরাং অরুচিকর হইলেও জোর করিয়া করা উচিত।"

স্বামী মাধবানন্দ লক্ষ্য করলেন এই নির্জন দূর প্রদেশে ছাপাখানায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও স্বামীজীর গ্রন্থাবলী ছাপানো ব্যয়সাপেক্ষ, অযথা পরিশ্রম করতে হয় ও ব্যবহারিক দিক থেকে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। তাই তিনি কলকাতায় প্রকাশনা বিভাগটি স্থানান্তর করবেন বলে মনস্থ করলেন। সেই অনুসারে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলকাতায় শঙ্কর ঘোষ লেনে স্থানান্তরিত প্রকাশনা বিভাগের কাজ শুরু হল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মতিথি তাঁর এবং অপর দুই গুরুভাই স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী তুরীয়ানন্দের উপস্থিতিতে কাশীধামে মহাসমারোহে পালিত হল। এই উৎসবে যোগ দিতে বহু সাধু ব্রহ্মচারী কাশীতে এলেন। স্বামী মাধবানন্দও এই আনন্দযজ্ঞে

যোগদান করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ অদ্বৈত আশ্রমে অবস্থান করছেন। স্বামী সারদানন্দ, যোগীন মা, বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল প্রভৃতি লক্ষ্মী নিবাসে আছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ পূর্ব হতেই কাশীতে ছিলেন। মূর্তিমান আনন্দস্বরূপ স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপস্থিতি কাশীর উভয় আশ্রমে আনন্দের লহরী তুলেছিল। উৎসব রাত্রে প্রতিমায় শ্রীশ্রী৺কালীপূজা সম্পন্ন হল। পূজক স্বামী শর্বানন্দ। পূজার পর স্বামী শুভানন্দ সহ চারজনকে সন্ন্যাস প্রদান করেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। উৎসবের অবসরে স্বামী শুদ্ধানন্দ এবং স্বামী মাধবানন্দ একদিন লক্ষ্মী নিবাসে স্বামী সারদানন্দের সমীপে উপস্থিত হয়ে সাংগঠনিক বিষয়ে কিছু আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে সেবাধর্মের কথা উঠল। তখন স্বামী সারদানন্দ বললেন, "এ দেশের বদ্ধ ধারণা জপ-ধ্যান কাজ-কর্ম অপেক্ষা বড়। তাই সকলে বলে, জপ-ধ্যান করব। স্বামীজীর সেবাধর্ম যে জপ-ধ্যানের সমান কল্যাণপ্রদ তা আমরা এখনও বিশ্বাস করতে শিখিনি। জপ-ধ্যান করতে গিয়ে যদি বাজে কথা ভাবে তবুও বিশ্বাস করবে রোগী সেবার চাইতে সে কাজ অনেক ভাল। আমার কিন্তু মনে হয় জপ-ধ্যান ও সেবা উভয় কাজই আদর্শ বজায় রেখে করতে হবে, তা যে না পারবে তার জপ-ধ্যানেও কোন ফল হবে না, সেবা করেও কল্যাণ হবে না"।

আরেকদিন সকালে স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী যতীশ্বরানন্দ প্রমুখ সাধুগণ স্বামী ব্রহ্মানন্দের পদতলে সমবেত হলেন। পূজনীয় মহারাজ প্রথমেই স্বামী যতীশ্বরানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, "সাধন-ভজন কি রকম চলছে?" স্বামী যতীশ্বরানন্দ উত্তর দিলেন, "অনেক কাজ করতে হয়, বিশেষ সময় পাই না।" মহারাজ তখন বললেন, "কাজের জন্য সময় পাওয়া যায় না, এরকম মনে করা ভুল। মনের চঞ্চলতার জন্যেই এরকম হয়।" পুনরায় খুব ভাবের সঙ্গে তিনি বললেন, "work and worship একসঙ্গে করে মনকে তৈরী করতে হয়।"

পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ ও শরৎ মহারাজের এই উপদেশাবলী স্বামী মাধবানন্দের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মায়াবতীর নিজস্ব প্রেসটিও বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রকাশনা বিভাগও পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় স্থানান্তরিত হল। তবে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদকীয় দপ্তর ও অন্যান্য কাজ মায়াবতীতেই রইল।

স্বামী মাধবানন্দের প্রচেষ্টায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের বহুল প্রচার হয়েছিল। এই সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি ভ্রমণ করেন। এর মধ্যে গুজরাট-ভ্রমণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে রাজকোট ভ্রমণকালে সেখানকার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ রাজকোটে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য স্বামী মাধবানন্দকে বিশেষ

অনুরোধ জানান। এরপর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামী মাধবানন্দ পুনরায় রাজকোটে এসে সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের নূতন আশ্রম স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এই কাজের পূর্বে তখন নাগপুরে অবস্থানরত সংঘাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের নিকট থেকে স্বামী মাধবানন্দ আশীর্বাদ নিয়ে আসেন।

অদ্বৈত আশ্রম থেকে 'সমন্বয়' নামে একটি হিন্দী মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন তিনি। সম্পাদনা নিজেই করতেন। সহযোগী ছিলেন বিখ্যাত হিন্দী কবি 'নিরালা' (সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী)। স্বামীজী যখন মায়াবতীতে এসেছিলেন তখন একদিন 'Fire place'-এর পাশে বসে বলেছিলেন, "আমি যদি এক লক্ষ টাকা পাই, তবে অন্যান্য ভাষায় আমার এই ভাব প্রচার করি, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র কাজ হইবে।" ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'সমন্বয়' পত্রিকা প্রকাশের প্রাক্কালে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় বলা হয়ঃ "The object of the magazine will be to disseminate among the Hindi-knowing public the life-giving truths of the Scriptures interpreted in the light of the teachings of Sri Ramakrishna and the Swami Vivekananda" 'সমন্বয়' পত্রিকাকে জনপ্রিয় করার জন্য মাধবানন্দজী দিকে দিকে প্রচারক প্রেরণ করেন। এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে স্বামী দয়ানন্দ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর মায়াবতী থেকে যাত্রা করেন। শ্যামলাতাল হয়ে টনকপুর, পিলিভিট, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, ওনাও, ফতেপুর, এটাওয়া, দিল্লী, সীতাপুর, কাশী প্রভৃতি শহরে ঘুরে ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে দেড়শ'র বেশী গ্রাহক সংগ্রহ করেন। বিশিষ্ট হিন্দী লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নতুন লেখা সংগ্রহেরও চেষ্টা করেন। এরপর কলকাতায় ফিরে তিনি ১৮২/৩, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটে অদ্বৈত আশ্রমের কলকাতা শাখায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে 'সমন্বয়' পত্রিকার City Editor-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একই উদ্দেশ্য নিয়ে স্বামী নিখিলানন্দকে অন্য প্রান্তে প্রেরণ করেন স্বামী মাধবানন্দ। রাজপুতানা ও গুজরাট অঞ্চলে প্রচারকার্যকালে স্বামী নিখিলানন্দ 'সমন্বয়' তথা অদ্বৈত আশ্রমের জন্য দানস্বরূপ অনেক অর্থ সংগৃহীত করেন। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা মারফৎ স্বামী মাধবানন্দ এই সকল দাতাদের সহায়তা ও আন্তরিকতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

স্বামী মাধবানন্দের অধ্যক্ষতাকালে বিভিন্ন সময়ে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন স্বামী রাঘবানন্দ ও স্বামী যতীশ্বরানন্দ। কর্মী ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী বিবিদিষানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ, স্বামী নিখিলানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী পবিত্রানন্দ প্রমুখ যাঁরা পরবর্তীকালে সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

তাঁর অধ্যক্ষতাকালের এক সাধুকর্মীর স্মৃতি : "তাঁর (স্বামী মাধবানন্দের) পূর্বসূরীদের ন্যায় তিনি ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত ও সত্যিকারের ভক্ত। বাহ্যিক দিক দিয়ে তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রজ্ঞানন্দের (পূর্বতন আশ্রম-অধ্যক্ষ) থেকে পৃথক। যখন তিনি অধ্যক্ষ হন, তখন তাঁর বয়স মাত্র তিরিশ। মায়াবতীতে গৃহীত ছবিতে দেখা যায় তাঁর শরীর রোগা, কিন্তু মুখমণ্ডল বালকোচিত কমনীয় ও সংস্কৃতিসম্পন্ন।...তিনি সলজ্জ, আপন চিন্তায় বিভোর, সর্বদা প্রচার-বিমুখ। যাঁরা তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হতেন, তাঁরাই একমাত্র জানতে সক্ষম হতেন তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্কের মহান গুণগুলি। তিনি মায়াবতীতে নীরবে প্রয়োজনীয় আট বছর কাজ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সকলের প্রিয় 'নির্মল মহারাজ'। এত ব্যস্ততার মধ্যে ঠিক সময় করে সংস্কৃত পুস্তকের সহজ সরল ইংরেজী অনুবাদ করতেন, যা বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠী কর্তৃক সুপ্রশংসিত।" স্বামী মাধবানন্দের মায়াবতী ত্যাগকালে 'প্রবুদ্ধ ভারত' মন্তব্য করেছিল, "...He has shown great ability, and during this period the institution showed remarkable progress in all departments."

মায়াবতীতে শত কাজের মধ্যেও স্বামী মাধবানন্দ নিয়মিত জপ-ধ্যান ও শাস্ত্র-চর্চা করতেন। তপস্যার ভাবে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে হরি মহারাজের পত্রালাপ হত। হরি মহারাজও তাঁকে উৎসাহ দিতেন সাধন-ভজনে। তাঁর অন্তর্নিহিত উৎসাহ-অগ্নিকে তিনি উসকে দিতেন যাতে স্বামী মাধবানন্দ স্বীয় লক্ষ্যপথে এগিয়ে যেতে পারেন। পুরীধাম থেকে হরি মহারাজ তাঁকে লিখছেন (২৮/৭/১৯১৭) : "মায়াবতীতে তোমার শরীর-মন বেশ ভাল আছে এবং শাস্ত্র-চর্চা ও সাধন-ভজন সুন্দররূপে হইতেছে জানিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আন্তরিকতা থাকিলে এবং ইচ্ছার প্রাবল্য হইলে সকল সুবিধা হইয়া থাকে। প্রভু অন্তর্যামী, তিনি ভিতর দেখেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ভিতর থেকে তাঁকে যেরূপ প্রার্থনা জানাইবে দেখিবে শীঘ্র অথবা বিলম্বে সে বাসনা তিনি পূর্ণ করিবেনই করিবেন। অমন স্থানে ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া তাঁহাকেই অন্তরে বাহিরে সতত অনুধ্যান করিয়া জীবন ধন্য কর—ইহাপেক্ষা আর অধিক কি প্রার্থনা থাকিতে পারে? তোমার হৃদয়ের আবেগ, প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বাস দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। অচিরে অভীষ্ট লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হও—প্রভুর নিকট এই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।" হরি মহারাজের আর একটি চিঠি (৭/৯/১৯১৭) : "...প্রথমে বিচার করিয়াই বুঝিতে হয়, তারপর দৃঢ় ও নিঃসংশয় হইলেই সাক্ষাৎকার। সংশয়, অসম্ভাবনা, বিপরীত-ভাবনা রহিত হইলেই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি স্থির হয় এবং তাহার নামই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার। প্রভুর কৃপায় 'কালেনাত্মনি বিন্দতি' হইয়া থাকে।"

মায়াবতীতে স্বামী মাধবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ইংরেজী জীবনীর অভাব অনুভব করেন। সে সময় স্বামী নিখিলানন্দ ছিলেন ওখানকার কর্মী। তিনি স্বামী নিখিলানন্দকে অনুরোধ করেন শ্রীরামকৃষ্ণের ইংরেজী জীবনী রচনা করতে। প্রায় দু' বছরে পান্ডুলিপি তৈরী করলেন স্বামী নিখিলানন্দ। মাধবানন্দজী পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপ্রান্ত সংশোধন করেন। তাঁর কথামত স্বামী নিখিলানন্দ মঠে এসে স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দকে পাণ্ডুলিপি দেখান ও কিছু অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন তাঁদের কাছ থেকে। জীবনীটি প্রকাশিত হলে স্বামী সারদানন্দ অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন, "ঠাকুরের একখানি ইংরেজী জীবনী লেখার ইচ্ছা আমার ছিল। তা দেখছি, ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল সেটা অন্য কাউকে দিয়ে লেখানো।"

সত্যের প্রতি স্বামী মাধবানন্দ ছিলেন অবিচল। এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো ছিল না। তখন মায়াবতীতেই আছেন তিনি। গ্রীষ্মকাল। আশ্রমের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে দাতব্য চিকিৎসালয়। চিকিৎসালয়ের ছাদ শ্লেট পাথরে নির্মিত। কিন্তু কাঠামো পাইন গাছের তক্তায় গঠিত। পাশেই কাঠের গুদাম ঘর। চারদিকে পাইন ও অন্যান্য গাছ। শুষ্কপত্র স্তূপাকারে ছড়িয়ে আছে চারদিকে। জনৈক সন্ন্যাসীর অসাবধানে দুপুরে আগুন লাগে কাঠের গুদামে। অচিরেই অগ্নির লেলিহান শিখা গ্রাস করল পাইন গাছগুলিকে। আশ্রমে জলের অভাব। আশ্রম-বাড়ি ও দাতব্য চিকিৎসালয় আগুনের হাত থেকে রক্ষা করা একান্ত দরকার। কেউ কেউ পার্শ্ববর্তী ঝরণার জল ও মাটি দিয়ে অগ্নি নির্বাপণের চেষ্টা করছেন। কেউ বা চেষ্টা করছেন গাছের ডালপালা দিয়ে। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ করজোড়ে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে কাতর প্রার্থনা করছেন আশ্রম রক্ষার জন্য। শেষ পর্যন্ত আশ্রম-বাড়ি ও দাতব্য চিকিৎসালয় রক্ষা পেল অগ্নিদেবের রোষ থেকে। আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ জানতে পারলেন এই লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছে জনৈক সন্ন্যাসীর দোষে। আশ্রম ডায়েরী-লেখক সাধুকর্মীকে তিনি আদেশ করলেন কোন প্রকারে ঘটনা বিকৃত না করে উক্ত জনৈক সন্ন্যাসীর দোষসহ ঘটনাটি ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করতে।

তখন তিনি মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক পদে আছেন। বেলুড় মঠের প্রধান কার্যালয়ে দোতলায় একটি ঘরে তাঁর অফিস ও শয়ন ঘর। বিদ্যুৎ নেই। চারদিক অন্ধকার। একজন ব্রহ্মচারী একটি ছোট হ্যারিকেন নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে রাত ১১টার সময়। ব্রহ্মচারী বললেন যে, তাঁর ব্যবহারের জন্য হ্যারিকেনটি এনেছেন। স্বামী মাধবানন্দ বলে উঠলেনঃ "না, না, আমার দরকার নেই। সন্তোষ (অফিস কর্মী) একটা এনেছিল, তাকেও না করে দিয়েছি।" তবুও ব্রহ্মচারী ল্যাম্পটি রেখে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন, "কি ব্যাপার ?" ব্রহ্মচারীজীর উত্তরঃ "মহারাজ, এখন আপনার রাখার

প্রয়োজন নাও হতে পারে, কিন্তু যখন আপনি মশারী টাঙাবেন তখন আপনার আলো দরকার হবে।" কঠিন স্বরে তিনি বললেনঃ "না, না, তুমি আমাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করছ। আমি কি সন্তোষকে বলিনি যে, আমার ল্যাম্পের প্রয়োজন নেই ? সুতরাং তুমি ল্যাম্প নিয়ে চলে যাও।"

গরমকালে প্রতিদিন বিকালে স্বামী মাধবানন্দকে এক গ্লাস শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদী সরবৎ দেওয়া হত। এক ব্রহ্মচারী রোজ বিকালে তাঁকে ঐ সরবৎ দিয়ে যেতেন। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, ব্রহ্মচারী নিজে কোনদিন ঐ সরবৎ পান করেছে কিনা। উত্তরে 'না' বলাতে তিনি গম্ভীর স্বরে আদেশ করলেনঃ "আগামীকাল থেকে প্রসাদী সরবৎ নিয়ে আসবে না। যদি তুমি আন তাহলে তুমিই বুঝবে!" যেহেতু ব্রহ্মচারীরা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদী সরবৎ পান না, সেজন্য তিনি নিজের জন্য প্রসাদী সরবৎ আনতে বারণ করে দিলেন। ব্রহ্মচারী ভুলে গেছেন পূজনীয় মহারাজের আদেশ। পরের দিন বিকাল ৪টায় প্রসাদী সরবৎ নিয়ে তিনি যথারীতি হাজির। মহারাজের ঘরে গ্লাস রেখে দিয়ে চলে গেলেন। একটু পরে মাধবানন্দজী ডাকলেন তাঁকে। ব্রহ্মচারী যেতেই ঐ প্রসাদী সরবতের গ্লাসের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে তিনি বললেন, "এটি নিয়ে যাও।" গতকালের আদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ব্রহ্মচারী নিজের ভুল বুঝতে পেরে পূজনীয় মহারাজকে অনুরোধ করলেন সেদিনের মত ঐ সরবৎ গ্রহণ করতে। তখন তিনি জোরে বলে উঠলেনঃ "তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বানাতে চাও ? এখুনি এটা তুমি খেয়ে ফেল।" ব্রহ্মচারীজী নত-মস্তকে আদেশ পালন করলেন।

'তিতিক্ষা'র কথা আমরা শাস্ত্রে পড়েছি। কিন্তু স্বামী মাধবানন্দ ছিলেন তিতিক্ষার জ্বলন্ত উদাহরণ। নিজের শারীরিক কষ্ট বা ব্যাধি অপরের কাছে তো বলতেনই না, বরং সহ্য করতেন হাসিমুখে। তিনি প্রথম মাদ্রাজে দেখেছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বহু পুরাতন ত্বকের রোগযন্ত্রণা। আশ্রমে তখন বিদ্যুৎ আসেনি, তার উপর মাদ্রাজে পাঁচ মাস গরম ও সাত মাস আরো প্রচণ্ড গরম। এই নিদারুণ গরমে শশী মহারাজ যন্ত্রণায় প্রচণ্ড কষ্ট পেতেন; কিন্তু একেবারে ভ্রূক্ষেপ করতেন না তিনি। তিনি ছিলেন শাস্ত্রোক্ত 'তিতিক্ষা'র প্রতিমূর্তি। মাধবানন্দজীর অন্তরে শশী মহারাজের এই তিতিক্ষার দৃশ্য চিরঅম্লান ছিল। তাঁরও ছিল দীর্ঘস্থায়ী একজিমা রোগ। মায়াবতীর অসহ্য ঠাণ্ডায় তিনি খুব কষ্ট পেতেন। রাত্রিতে ভালভাবে বিছানায় শয়ন করাও সম্ভব ছিল না। পা দুটিকে লম্বা করে রাখতেন উঁচু করা কাঠের বাক্সে। শরীরের বাকী অংশ থাকত বিছানায়। এভাবে তিনি রাত কাটাতেন। সে এক দুঃসহ অবস্থা! কিন্তু একদিনের জন্যেও মুখ ফুটে কাউকে সে বিষয়ে কিছু বলেননি বা কারুর কাছে

কোন অনুযোগ জানাননি।

তখন তিনি সাধারণ সম্পাদক। এক এক সময় যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি পেত যে তাঁকে কাঁচ কলাপাতায় শুইয়ে রাখা হত। কিন্তু তিনি কোন দৃক্‌পাত করতেন না। কেউ একজিমার ব্যথার কথা জিজ্ঞাসা করলে তাঁর ছোট্ট উত্তর : "কেন, আমি খুব ভাল আছি।" কেউ আবার পীড়াপীড়ি করলে বলতেন : "দুঃখ করো না। শরীরের ক্ষয় হওয়া শরীরের ধর্ম। যত দিন যাবে, ততই তা হবে। সেজন্য এর নাম 'শরীরম্' বলা হয়। কেউ কিছু সাহায্য করতে পারবে না।" সারাটা জীবন তিনি এ-ভাবে অসহনীয় ব্যথা নীরবে হাসিমুখে সহ্য করেছেন। "স্বামী মাধবানন্দের এই স্বভাবসিদ্ধ তিতিক্ষা ও সেবার ভাবটি তাঁহার উত্তর জীবনেও এমনকি, শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘনায়কের অতি মহনীয় আসনে যখন আসীন হইয়াছেন, তখনও সমান উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার জীবনের ইহা এক অনবদ্য সৌন্দর্য।"

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ মাধবানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠের অছি (Trustee) এবং রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই সঙ্গে অছি নির্বাচিত হন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী শর্বানন্দ ও স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ। শোনা যায়, স্বয়ং রাজা মহারাজ 'নির্মল' ও 'জিতেন'-এর নাম প্রস্তাব করে বলেছিলেন যে বয়স কম হলেও এরা সকল দিক দিয়ে যোগ্য।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বেলুড় মঠে। তদানীন্তন সংঘাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ ছিলেন মহাসম্মেলনের সভাপতি। স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দের মত শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদরা উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে। বিভিন্ন কেন্দ্রের অনেক সাধু ও নানান দেশের বহু গুণী ব্যক্তিরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন সম্মেলনে। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্বামী মাধবানন্দও ছিলেন অন্যতম। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১লা থেকে ৮ই এপ্রিল। স্বামী মাধবানন্দ একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন ৫ই এপ্রিল বৈকালিক অধিবেশনে। সভাপতি ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। স্বামী মাধবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উপদেশাবলী বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, "In other words, sincerity in endeavour constitutes the burden of their practical teachings. The goal we must and are sure to reach. And we shall be highly benefited if at every step in the journey we carefully and assiduously study and follow the masters on whom the Truth dawned. Blessed indeed are they who illumine the world from time to time with the radiance of the Light of Truth reflected in their lives."

এরপরে স্বামী মাধবানন্দকে দেখি আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকরূপে। সানফ্রান্সিস্কোতে বেদান্ত সোসাইটি গড়ে তুলেছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। তিনিই প্রথম ওখানে 'হিন্দু মন্দির' নির্মাণ করেছিলেন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মহাসমাধির পরে সোসাইটির অধ্যক্ষ হন বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী প্রকাশানন্দ। কুড়ি বছর বেদান্ত প্রচারের পর স্বামী প্রকাশানন্দের দেহাবসান হয় ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী। তখন মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামী মাধবানন্দকে সেখানকার অধ্যক্ষরূপে প্রেরণ করতে মনস্থ করেন। দেবাত্মা হিমালয়ের প্রশান্ত কোল ত্যাগ করে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল স্বামী মাধবানন্দ রওনা হলেন আমেরিকার উদ্দেশে। মাত্র দু'বছর তিনি আমেরিকায় ছিলেন—১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জুন থেকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের জুন পর্যন্ত। স্বামী দয়ানন্দকে এক বছর আগেই সানফ্রান্সিস্কোতে পাঠানো হয়েছিল স্বামী প্রকাশানন্দের সহকারী রূপে। দুই ভাইয়ের গীতা ও বেদান্তের ক্লাস আমেরিকাবাসীদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। স্বামী মাধবানন্দের সম্পর্কে জনৈক আমেরিকান বেদান্ত-অনুরাগীর উক্তি : "(He) had left an indelible impression behind of his character which is always loving and faithful to the highest principles and ideals of Hindu life."

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের আরো বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে স্বামী মাধবানন্দকে বেলুড় মঠে ডেকে আনা হল আমেরিকা থেকে। স্বামী মাধবানন্দের কাছ থেকে সানফ্রানসিস্কো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন স্বামী দয়ানন্দ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। স্বামী মাধবানন্দ ইউরোপ হয়ে মঠে উপস্থিত হলেন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন। কলকাতার নাগরিকবৃন্দ স্বামী মাধবানন্দকে এলবার্ট হলে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন ২১শে অক্টোবর। সভাপতি ছিলেন কলকাতার তদানীন্তন মেয়র শ্রী জে. এম. সেনগুপ্ত। রুপার ক্যাসকেটে দুটি অভিনন্দন-পত্র তাঁকে প্রদান করা হয় একটি ইংরেজীতে ও একটি বাংলায়। সংবর্ধনার উত্তরে স্বামী মাধবানন্দ এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "অশিক্ষিতের মুক্তিলাভ অসম্ভব। ভারতের বিরাট সভ্যতা ছিল, কিন্তু যদি প্রত্যেক ভারতবাসী শিক্ষিত না হয়, তাহা হইলে মানবজাতির উন্নতির অভিযানে তাহাকে পিছাইয়া পড়িতে হইবে। পাশ্চাত্যের নিকট হইতে বহিঃশিক্ষা আমাদের লাভ করিতে হইবে এবং তাহার পরিবর্তে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকতা দান করিতে হইবে। আদান-প্রদান ছাড়া কোন জাতি বাঁচিতে পারে না। সাম্প্রদায়িক বিরোধ যেন আমাদের কোন রূপে প্রকাশ না পায়।"

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে স্বামী মাধবানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। আরো দু'জন সহকারী সম্পাদক ছিলেন—স্বামী শঙ্করানন্দ ও স্বামী শর্বানন্দ। তখন মঠ-মিশনের সম্পাদক ছিলেন স্বামী
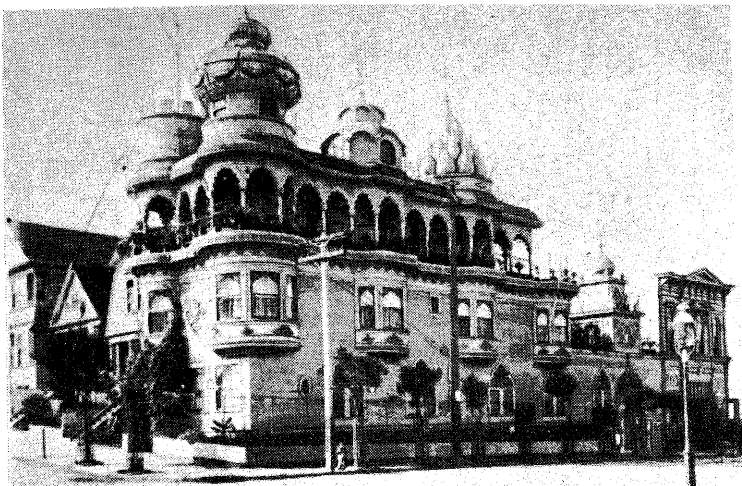
"সানফ্রানসিস্কোতে বেদান্ত সোসাইটি গড়ে তুলেছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। তিনিই প্রথম ওখানে 'হিন্দু মন্দির' নির্মাণ করেছিলেন।"
—পৃষ্ঠা ৩২
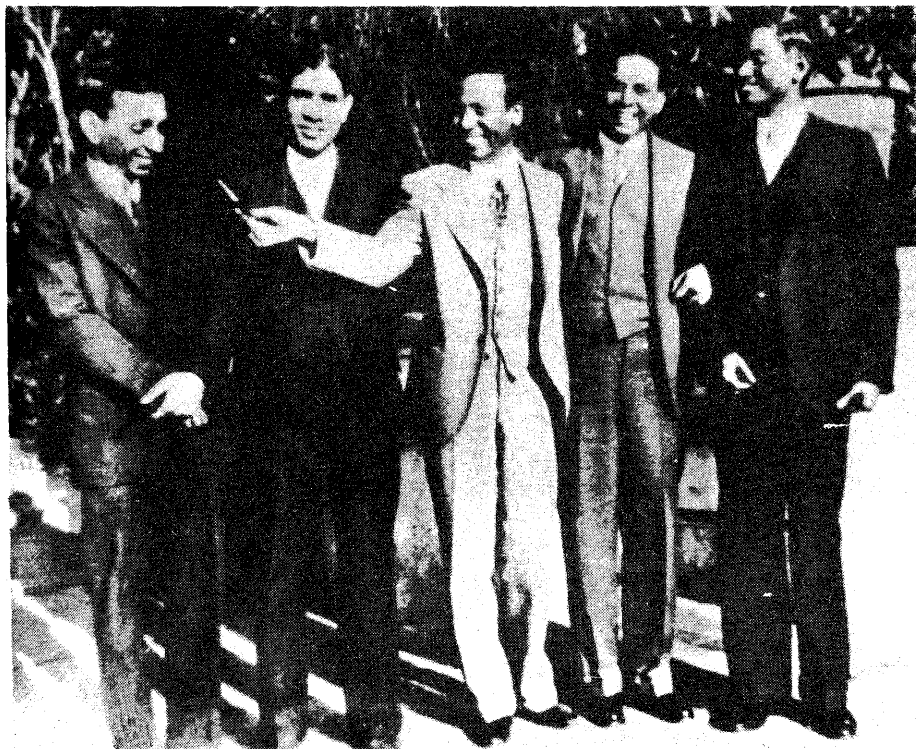
"স্বামী দয়ানন্দকে এক বছর আগেই সানফ্রানসিস্কোতে পাঠানো হয়েছিল।"—পৃষ্ঠা ৩২

বাম হইতে ঃ ১। স্বামী বিবিদিষানন্দ, ২। স্বামী দয়ানন্দ, ৩। স্বামী প্রভবানন্দ, ৪। স্বামী অখিলানন্দ ও ৫। স্বামী অশোকানন্দ—পাশ্চাত্যে গৃহীত চিত্র।
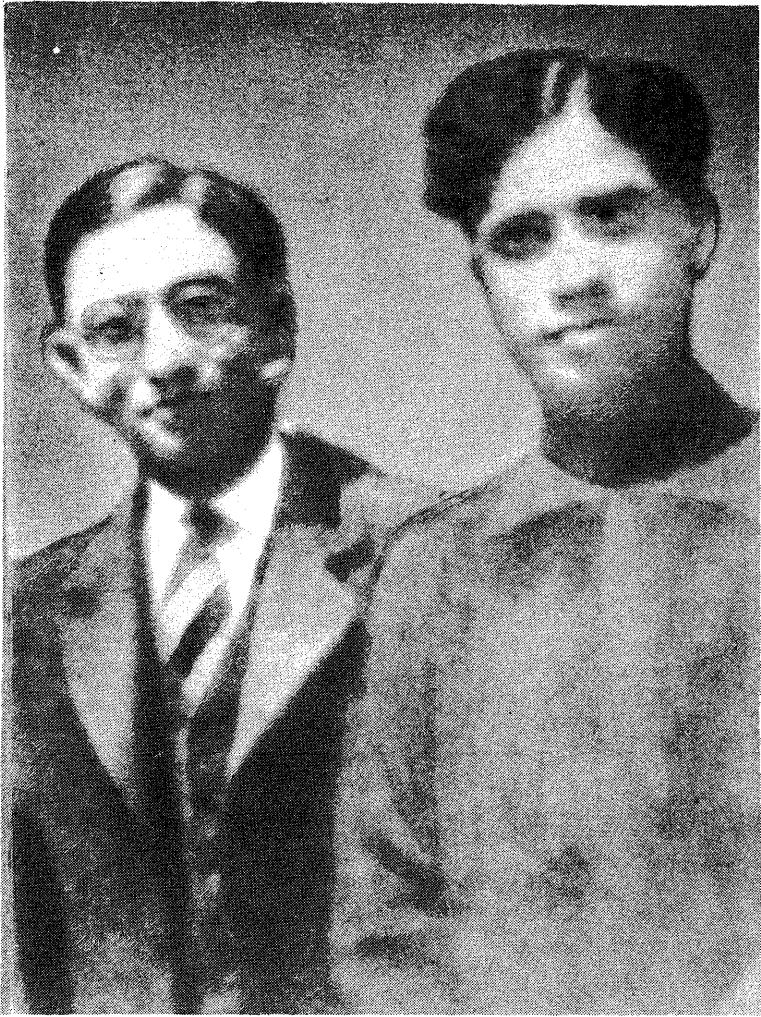
“স্বামী মাধবানন্দের কাছ থেকে সানফ্রানসিস্কো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন স্বামী দয়ানন্দ।” —পৃষ্ঠা ৩২

শুদ্ধানন্দ। পরে সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন স্বামী বিরজানন্দ। সহকারী সম্পাদক পদে স্বামী মাধবানন্দ ছিলেন প্রায় নয় বছর। নয় বছরে তিনবার (১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মে থেকে ২০শে নভেম্বর, পরের বছর ১লা জুন থেকে নভেম্বর এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত) তাঁকে অস্থায়ী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। তিনবারই স্বামী বিরজানন্দ ঐসময় ছুটি নিয়েছিলেন। পরে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন (স্বামী মাধবানন্দের সময় থেকেই 'সম্পাদক' পদটি 'সাধারণ সম্পাদক' হয়) এবং এই পদ সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর অলংকৃত করে তিনি এক গৌরবময় অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। তিনি ছিলেন দক্ষ প্রশাসক। তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বে মঠ-মিশনের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী "সংঘের কাজ ঠাকুরেরই সেবা" ছিল স্বামী মাধবানন্দের মূল মন্ত্র। মায়াবতীতে অতি সামান্য কাজেও আনন্দ পেতেন তিনি। যেহেতু ঐ কাজই ঠাকুরের সেবা। আর একটি ঘটনা। তখন তিনি সহকারী সম্পাদক। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ। কাশী থেকে উদ্বোধন কার্যালয়ে এসেছেন শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য-সেবক স্বামী অরূপানন্দ (রাসবিহারী মহারাজ)। চোখের ডাক্তার দেখাবেন সন্ধ্যার পর। স্বামী মাধবানন্দ কিছু ফাইল-পত্র নিয়ে উদ্বোধনে উপস্থিত। শ্রীশ্রীমাকে প্রণামাদি করে সন্ধ্যার মুখে একসঙ্গে তিনি ও রাসবিহারী মহারাজ বেরিয়ে পড়লেন। রাসবিহারী মহারাজের সঙ্গে একজন সাহায্যকারী। সাহায্যকারীর রসঘন বিবরণ: "হ্যাঁ ভাই নির্মল, কোথায় চলেছ—ফাইল-পত্র নিয়ে এই সন্ধ্যেবেলা?" রাসবিহারী মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন।

"এটর্নি'র বাড়ি রাসবিহারীদা, মঠের পশ্চিমের জমিটা নেওয়া হচ্ছে—তারই পরামর্শ" মাধবানন্দজী উত্তর দিলেন।

রাসবিহারী মহারাজ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন, তারপর গম্ভীরস্বরে বললেন, "আচ্ছা ভাই আমরা যখন এসেছি তখন কি দেখেছি?—আর এখন যারা আসছে—তারা কি দেখছে?"

নির্মল মহারাজের সপ্রতিভ উত্তর: "যাদের যেমন ভাগ্য।"

রাসবিহারী মহারাজ বলে চলেছেন—কতকটা নিজের ভাবে: "আমরা এসে দেখলাম—জপধ্যান সাধনভজন—মনে আছে তো সব?"

"মনে থাকবে না কেন?—তার জোরেই তো চলেছি।"

"আর এখন এরা এসে কি দেখছে? টেবিল, চেয়ার, টাইপরাইটার, হিসাব আর ফাইল। কি নিয়ে চলবে এরা?" রাসবিহারী মহারাজ প্রশ্ন করলেন।

"তাহলে রাসবিহারীদা, আমিও বলি, যিনি এদের এনেছেন, তিনিই এদের চালাবেন। আমরা বলিনা, আমাদের দেখে চলতে শেখো। আমরা যাঁদের কাছে এসেছিলাম তাঁদের সেই জীবন দেখে যতটা পেরেছি, শিখতে চেষ্টা

করেছি। শেষে তাঁরাই বলেছেন কাজ কর, ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ, তাঁদের আদেশ-নির্দেশ ভেবেই কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। জানি, তাঁরা পেছনে আছেন—তাঁরা দেখছেন—তাঁরা দেখবেন" মাধবানন্দজী বললেন।

"আর এদের কি হবে? এরা তো তাঁদের ধ্যান ভজনও দেখেনি, তাঁদের আদেশ-নির্দেশও পায়নি—শুধু কাজ করে করে শেষ পর্যন্ত এদের কি হবে?"

"রাসবিহারীদা, এদের কি আমরা ডেকে আনতে গিয়েছিলুম?—এরা এসেছে ঠাকুর-স্বামীজীর বই পড়ে, তাঁদের কথা শুনে, তাঁদেরই আকর্ষণে, তাঁদের আদর্শ ভালবেসে, তাঁদের কাজে জীবন যাপন করবে বলে। এরাও কি কম? এই ভাবই এদের চালিয়ে নিয়ে যাবে; আমাদের দেখে এদের শিখতে হবে না।"

দুজনেই গম্ভীর হয়ে পথ চলেছেন। তখনকার দিনের কলকাতার জনবিরল পথে নিজেদেরই পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর নির্মল মহারাজ আবার বলে উঠলেন, "রাসবিহারীদা, গঙ্গোত্রী, হৃষীকেশ, হরিদ্বারে গঙ্গার জল স্বচ্ছ পরিষ্কার, দক্ষিণেশ্বর বেলুড়ে সে জল ঘোলা ময়লা, কত কিছু ভাসছে, তা বলে গঙ্গার পাবনী শক্তি তো কমে যায়নি।" বলতে বলতে আমরা শ্যামবাজার মোড়ে এসে পড়লাম। তখন ২নং বাস ছাড়ত ভবনাথ সেন ষ্ট্রীটের মোড় থেকে, একটা গাড়ি প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। নির্মল মহারাজ টপ্ করে লাফিয়ে বাসে উঠে একটু হাত নেড়ে বললেন—"আজ তাহলে আসি রাসবিহারীদা।"

আমরা ডাক্তারের বাড়ির পথ ধরলাম। কিছুক্ষণ নীরবতার পর রাসবিহারী মহারাজ বললেন: "শুনলি সব কথা?—দেখলি কি প্রতিভা?—বেলুড়ের গঙ্গায় হরিদ্বার হৃষীকেশের স্বচ্ছতা নেই, তা বলে পাবনী শক্তি তো কমে যায়নি।"

১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী-বৎসর। পুরো এক বছর ব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সাড়ম্বরে শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল। উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য অনেকগুলি শতবার্ষিকী কমিটি গঠিত হয়। সাধারণ কমিটির (General Committee) অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন স্বামী মাধবানন্দ। কার্যকরী কমিটিরও (Executive Committee) সদস্য তিনি। শতবার্ষিকী উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল টাউন হলে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভা (১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১-৭ মার্চ)। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সব পণ্ডিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তিরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ধর্মমহাসভাকে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি সাব-কমিটি তৈরী করা হয়। অধ্যাপক বিনয় সরকার ও ব্যারিষ্টার বিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জীর সঙ্গে স্বামী মাধবানন্দ ছিলেন ধর্মমহাসভার সাব-কমিটির যুগ্ম সম্পাদকের গুরু দায়িত্বে। ধর্মমহাসভার দ্বিতীয় দিনে (২ মার্চ) বৈকালিক অধিবেশনে স্বামী মাধবানন্দ 'The Need of the Modern World' শীর্ষক এক

সুচিন্তিত ভাষণ দেন। তিনি বলেছিলেন, "In our age, Sri Ramakrishna, whose Centenary we are celebrating here, gave expression to those noble thoughts which were again and again repeated in this ancient land. This is the purpose for which great personages are incarnated in the world. They pick out from the traditional lore of spirituality those gems that are best suited to the requirements of modern times, to remove our obstacles and miseries and take us directly and in the most expeditious manner to Peace and Blessedness".

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর মহাপ্রয়াণ হল পঞ্চম সংঘাধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধানন্দের। মঠে যোগদান করার প্রথম দিনটি থেকেই তাঁর সঙ্গে স্বামী মাধবানন্দের একটা বিশেষ নিবিড় সম্পর্ক ছিল। স্মরণ-সভায় স্বামী শুদ্ধানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে স্বামী মাধবানন্দ বলেছিলেন, "শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট যে সকল উপদেশ শুনিয়া ভাল বুঝিতে পারিতাম না, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইত না, সেইসকল বিষয়ে প্রশ্ন এবং তর্কবিতর্ক করিয়া বুঝিবার সুবিধা হইত স্বামী শুদ্ধানন্দের নিকটে। স্বামীজীর মধ্যে যে সামঞ্জস্যের ভাব ছিল তাহা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল স্বামী শুদ্ধানন্দের ভিতরে। তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান এবং ভক্তির সামঞ্জস্য। তিনি অসাধারণ কর্মী ছিলেন, খুব পড়াশুনা এবং চিন্তা করিতেন। আবার তিনি ভক্তিমার্গের সাধকও ছিলেন, ধ্যান ধারণাও তাঁহার ছিল যথেষ্ট। তিনি ছিলেন একাধারে গুরু এবং বন্ধু।" স্বামী মাধবানন্দের প্রথমবার আমেরিকা যাত্রার সময় শুদ্ধানন্দজী তাঁকে একটি কলম উপহার দিয়েছিলেন। বহুদিন পরেও স্বামী মাধবানন্দ ঐ কলমটি সযত্নে রেখে ব্যবহার করতেন। দীর্ঘ ব্যবহারে কলমটির নিব্ তখন ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল।

প্রশাসনিক কাজে স্বামী মাধবানন্দকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হত। বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে প্রায়ই কাজকর্ম পরিদর্শন করতে যেতেন তিনি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি প্রকাশনা সংক্রান্ত 'প্রুফ' দেখতেন। 'প্রুফ' দেখা অত্যন্ত ক্লান্তিজনক কাজ। সাধারণতঃ কেউ করতে চান না। তিনি কিন্তু খুব আনন্দের সঙ্গে এই কাজটি করতেন 'শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ' বলে। তাঁর কাছে কাজের কোন পার্থক্য ছিল না। মন্দিরে পূজা করা ও ঝাড়ু দেওয়া দুইই ছিল তাঁর কাছে সমান। দুপুরে আহারাদির পরেও কাজ করতেন। কাজের পরিবর্তনই ছিল তাঁর কাছে বিশ্রাম। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। সহকর্মীদের কাছ থেকেও ঠিক কাজ আদায় করে নিতেন। এক কথায় "হার্ড টাস্ক মাস্টার"। "বস্তুতঃ

পক্ষে, সমগ্র মঠ-মিশন, তথা সারা বিশ্বের কাছে তাঁহার সাধারণ-সচিবত্বকালের পরিচয়ই সর্বাধিক সুবিদিত। তাঁহার অসাধারণ নেতৃত্বকুশলতা, সৃজন প্রতিভা, আদর্শনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি অটুট আধ্যাত্মিক মনোবল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে বহুধা পরিবিস্তৃত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে। কঠোর নীতিপরায়ণতা ও সঙ্গে সঙ্গে অক্ষম দুর্বলের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি—প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং ঐ সাথে অনন্ত উদারতা—অনন্যসাধারণ জ্ঞানবত্তা এবং তৎসহ বালকের সরলতা—গরিমার চরম উৎকর্ষ আর একই সঙ্গে আশ্চর্য নিরভিমানতা—এই পরস্পরবিরোধী ভাবসামঞ্জস্যই মাধবানন্দকে এত বড় সংঘনেতা তৈয়ারী করিয়াছে"।

স্বামী মাধবানন্দের সুদক্ষ নেতৃত্বে মঠ-মিশনের বিভিন্ন সেবাযজ্ঞ ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছিল। তাঁর সময়ে সংঘের বহু শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ভক্তদের পরিচালিত কোন কোন আশ্রমও তাঁদের অনুরোধে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। আর প্রতিবছর ত্রাণসেবা তো ছিলই। দুটি ত্রাণসেবা বিশেষ উল্লেখ করার মত। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া বাংলাকে গ্রাস করেছিল। মঠ-মিশন প্রায় দীর্ঘ দু'বছর নানান স্থানে ত্রাণসেবায় আত্মনিয়োগ করে। আবার ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় বিধ্বস্ত মানুষের কাছে মঠ-মিশন অকুতোভয়ে সেবার ডালি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। এই ত্রাণসেবাও প্রায় দু'বছরের বেশী চলে। স্বামী মাধবানন্দ অপার বুদ্ধিমত্তা ও প্রখর প্রশাসনিক বিচক্ষণতায় এই দুই সেবাকার্য পরিচালিত করেছিলেন।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে বেলুড় মঠে মঠবাড়িতে স্বামীজীর ঘরের উপরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন তদানীন্তন সহাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ এবং অফিস বাড়ির উপরে আর একটি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন স্বামী মাধবানন্দ।

স্বাধীনতা লাভের পর দেশে দ্রুতগতিতে শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ স্বামী মাধবানন্দ গ্রহণ করেছিলেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধে ও সহযোগিতায় মঠ-মিশনের অধীনে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির পঠন-পাঠন ও পর্ষদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় খুব ভাল ফলাফল সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এ-বিষয়ে তাঁর দূরদর্শিতার কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। এরূপ এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সন্ন্যাসীর উত্তরকালের স্মৃতিচারণঃ "কিন্তু এ-সকল প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে ক্রমিক পর্য্যায়ে তাদের দ্রুত অগ্রগতির যে ঋজু-কুটিল ইতিহাস—সে ইতিহাসের প্রকৃত নিয়ামক কে ছিলেন, কার সজাগ দৃষ্টি ও গভীর উদ্বেগ সে ইতিহাসের পদক্ষেপ অলক্ষ্যে নিয়মিত করেছে—সে প্রশ্নের উত্তরে যদি অনেকের মধ্যে কোন একজন মাত্র ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে দেখতে হয়, তবে নিঃসংশয়ে সে ব্যক্তি পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দ। এ শুধু আমার

একার অভিমত নয়। আমার বিশ্বাস—একাল মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মসাধনায় যাঁরা কোন-না-কোনভাবে অংশগ্রহণ করেছেন—তাঁদের প্রত্যেকেরই এই সুচিন্তিত অভিমত।”

স্বামী মাধবানন্দ অল্প কথায় বক্তার মনোভাব বুঝে নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতেন। তাঁর কাছে সতর্কভাবে বক্তব্য নিবেদন করতে হত বক্তাকে। একটিও অপ্রয়োজনীয় কথা তাঁকে বলা সম্ভব ছিল না। তাঁর বক্তব্য হত প্রাসঙ্গিক ও সুস্পষ্ট। প্রয়োজনীয় আলোচনাও করে নিতেন সহকর্মীদের সঙ্গে। তিনি ছিলেন মানসিক অনুশাসনের পক্ষপাতী। কোন কর্মীকে শাস্তি দিতে চাইলে তাঁকে এমন কথা বলতেন, যাতে তাঁর মনে বিচার ও স্পষ্ট ভাবের উদয় হয়। তিনি প্রত্যেকের ভিতর দেখতেন আত্মশ্রদ্ধা। প্রত্যেকের ভিতরে শুধুমাত্র ভাল গুণগুলিকে সচেতন করে দিতেন। তাঁর মধুর বাক্যালাপে তাঁদের কর্তব্যবোধ জাগ্রত হত। তখন ঐ দোষী কর্মী নিজের ভুল শুধরে নিতেন। স্বামী মাধবানন্দের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললে সাধুদের মনে হত কোন কাজই কঠিন নয়। কাজে সফলতা আসবেই আসবে। যাঁরা বিভিন্ন কাজে তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের একথা বার বার বলতে শোনা যায়। একজন তরুণ সন্নাসীকে দিলেন এক বিরাট হাসপাতালের দায়িত্ব। তরুণ সন্ন্যাসী বললেনঃ “মহারাজ, আমার কোন অভিজ্ঞতাই নেই হাসপাতালের কাজের। কোনদিন কোন হাসপাতালেও ছিলাম না। এ দায়িত্ব পালন করব কি করে?” স্বামী মাধবানন্দের উত্তরঃ “তুমি ঠিক পারবে।” সাহস দিলেন, যথোচিত পরামর্শ দিলেন তাঁকে। সেই তরুণ সন্ন্যাসী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে একটি হাসপাতাল নয়, দু'দুটি বিরাট হাসপাতাল অতি নিপুণভাবে পরিচালনা করেছিলেন। আর এক তরুণ সন্ন্যাসীকে ভার দিয়েছিলেন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করতে। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম আজ ভারত-জোড়া। এমন কি যখন তিনি অন্তিম শয্যায় সে-সময়ও এক নবীন ব্রহ্মচারীকে অভয় দিচ্ছেনঃ “তুমি পারবে, তোমার উপর সংঘের আশীর্বাদ থাকবে।” এই ব্রহ্মচারী বেলুড়মঠে ৺দুর্গাপূজায় পূজক নির্বাচিত হয়েছেন। সাহস পাচ্ছেন না ব্রহ্মচারী। তখন স্বামী অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারীকে নিয়ে গিয়েছেন স্বামী মাধবানন্দের কাছে। ঐকথা বলেই ব্রহ্মচারীকে সাহস দিয়েছিলেন মাধবানন্দজী। ব্রহ্মচারীও ৺দুর্গাপূজা খুব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন।

অপরের মতামতের মূল্য দিতেন তিনি। একবার এক আশ্রমের অধ্যক্ষ কোন কর্মীকে তিরস্কার করে বেলুড়মঠে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঐ আশ্রম-অধ্যক্ষ এসেছেন মঠে। তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই স্বামী মাধবানন্দ বললেনঃ “ওকে তুমি পাঠালে কেন? ও ওখানে থাকবে। দরকার হলে তোমাকে আমরা অন্যত্র বদলি করে দেব।” আশ্রম-অধ্যক্ষ সব ঘটনা জানিয়ে করজোড়ে

বললেন, "তাই হবে মহারাজ।" এরপর আশ্রম-অধ্যক্ষ কলকাতা গিয়েছেন কাজে। এদিকে একটু পরে স্বামী মাধবানন্দ খোঁজ করলেন আশ্রম-অধ্যক্ষকে। জানলেন তিনি মঠে নেই। অফিসে বলে রাখলেন ঐ সন্ন্যাসী ফিরে এলেই যেন তাঁকে সংবাদ দেওয়া হয়। বিকালে তিনি মঠে এলে স্বামী মাধবানন্দ তাঁকে ডাকলেন। বললেন, "ভুল হয়ে গেছে। তোমার কথাই ঠিক। ওই কর্মীকে আমরা তোমার ওখান থেকে বদলি করে দেব।" আশ্চর্য হয়ে গেলেন আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দের ব্যবহারে। এক ব্রহ্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা পরিত্যাগ করে সংঘে যোগদান করেছেন। যে আশ্রমে যোগদান করেছেন, সেখানকার সম্পাদক ব্রহ্মচারীকে বলেছেন পড়াশুনা শেষ করতে। স্বামী মাধবানন্দ তখন সংঘগুরু। তাঁর কাছে আশ্রম সম্পাদক ও ব্রহ্মচারী এসেছেন। সব বলা হল তাঁকে। তিনিও ব্রহ্মচারীর মতামত জানলেন। তিনি ব্রহ্মচারীর ইচ্ছাতেই সম্মতি জানালেন। এ সকল গুণের জন্য তিনি সকলের প্রিয় 'নির্মল মহারাজ' হয়েছিলেন।

অতি ক্ষুদ্র ঘটনার প্রতিও তাঁর ছিল তীক্ষ্ন দৃষ্টি। কোন এক আশ্রমের ছাত্রাবাস থেকে একটি ছাত্র নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। তাকে বেশ কয়েকদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সে-সংবাদ দৈনিক-সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় স্বামী মাধবানন্দ ঐ আশ্রমে গেছেন পরিদর্শনের জন্য। আশ্রমে পেঁছেই আশ্রম-সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করলেন ঐ নিরুদিষ্ট ছাত্রের কথা। আশ্রম-সম্পাদক ও উপস্থিত সন্ন্যাসী-শিক্ষকেরা অবাক হয়ে গেলেন ঐ ছোট্ট সংবাদের প্রতি তাঁর নজর দেখে। যে শিক্ষকের প্রহারে ছাত্র না বলে পালিয়েছিল, সেই শিক্ষককে তিনি বললেন, "Sympathy is the key word।" প্রেম ও সহানুভূতির মাধ্যমে মানুষের জীবন পরিবর্তন করাই শিক্ষকের প্রকৃত কাজ। তিনি আরও বলেছিলেন যে ছাত্রটি কয়েকদিনের মধ্যেই ছাত্রাবাসে ফিরে আসবে। হয়েছিলও তাই। ঘটনাটি একেবারে নগণ্য, কিন্তু সংঘের কর্ণধার রূপে অতি সামান্য ঘটনার প্রতিও তাঁর ছিল সজাগ প্রখর দৃষ্টি।

স্বামী মাধবানন্দ সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন স্বামীজীর তিনটি ও শ্রীশ্রীমায়ের একটি স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ন হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল—বেলুড় মঠকে কেন্দ্র করে নানান ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। ধীরে ধীরে সেগুলি একটি সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেবে। আর সেখানে শিক্ষা দেওয়া হবে প্রাচীন গুরুকুল প্রথায়। এখানে ছাত্রদের ঐহিক শিক্ষার সঙ্গে থাকবে পারমার্থিক ও নৈতিক শিক্ষাদান। স্বামীজীর এই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য মঠের পাশেই প্রথমে একটি আবাসিক কলেজ—'বিদ্যামন্দির' স্থাপন করা হয় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে। এই উদ্দেশ্যে এক শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল 'সারদাপীঠ' নামে, যার অধীনে গড়ে উঠল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার স্থান কাশীপুর উদ্যানবাটীকে মঠের অন্তর্ভুক্ত করা হল। স্বামীজীর ভাষায়ঃ "কাশীপুরের কৃষ্ণগোপালের বাগানটা নিলে ভাল হয় না ?...আমার মতে আপাততঃ ওটা লওয়াই ভাল, বাকী ধীরে ধীরে হবে। ও বাগানের সহিত আমাদের সমস্ত association (স্মৃতি) জড়িত। বাস্তবিক ওটাই আমাদের প্রথম মঠ।...ওটা তো নিতেই হবে, আজ না হয় কাল।" এই ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত কাশীপুর উদ্যানবাটীর বাড়িসহ অর্ধেক অংশ মঠ কর্তৃপক্ষ ক্রয় করেন ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্টে। বাকী অংশ কেনা হয় পরের বছর এপ্রিলে। প্রায় ঊনপঞ্চাশ বছর পর স্বামীজীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল।

তৃতীয়তঃ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভিটা বেলুড় মঠ কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল। ইতিপূর্বে অবশ্য ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মস্থানের পৈত্রিক বাড়ির কিছুটা অংশ কিনেছিলেন স্মৃতি-মন্দির করার জন্য। পরের বছর ২৭শে জুলাই শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্যরা পৈত্রিক বাড়ির কিছু জমিও বেলুড় মঠকে দান করেছিলেন। কিন্তু সংলগ্ন বাকী জমি না পাওয়ায় এপর্যন্ত কোন স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। মিশন কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেন সংলগ্ন জমি অধিগ্রহণ করে দিতে, যাতে একটি জাতীয় স্মৃতি-মন্দির গড়ে তোলা যায়। অবশেষে তা সম্ভব হয় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে। কাশীপুর ও কামারপুকুরে জমি ক্রয় ও অধিগ্রহণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জনৈক সন্ন্যাসীর (বর্তমানে প্রবীণ সন্ন্যাসী) কাছে মাধবানন্দজীর কর্মকুশলতা, বুদ্ধিমত্তা, সহৃদয়বত্তা ও দূরদৃষ্টির কথা বহু শুনেছি। কামারপুকুরে একটি নতুন আশ্রম আরম্ভ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের পৈত্রিক বাড়ি ও বৈঠকখানা সযত্নে রক্ষা ও শ্রীরঘুবীরের মন্দির পাকা করা হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর পরিকল্পিত নক্সা অনুযায়ী একটি মন্দির নির্মিত হয়। অতঃপর ঐ মন্দির ও শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মর-মূর্তি উৎসর্গীকৃত করা হয়। কামারপুকুর গ্রামে মিশনের অধীনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করা হয়।

চতুর্থতঃ স্বামীজীর পরিকল্পনা ছিল শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে স্ত্রী-মঠ গঠনের। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের পত্র লিখেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে ঐ স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্য। পরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, "মাকে কেন্দ্র করে গঙ্গার পূর্বতটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন করতে হবে। এ মঠে যেমন ব্রহ্মচারী সাধু—সব তৈরী হবে, ওপারে মেয়েদের মঠেও তেমনি ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী—সব তৈরী হবে।...এখনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে স্ত্রী-মঠ Start (আরম্ভ) ক'রে দিয়ে যাব। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁদের Central figure

(কেন্দ্রস্বরূপা) হয়ে বসবেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদের স্ত্রী-কন্যারা ওখানে প্রথমে বাস করবে। কারণ, তারা ঐরূপ স্ত্রী-মঠের উপকারিতা সহজেই বুঝতে পারবে। তারপর তাদের দেখাদেখি কত গেরস্ত এই মহাকার্যে সহায়ক হবে।" এতদিন পর্যন্ত এ-বিষয়ে কোন কিছু করা সম্ভব হয়নি। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে মঠের সাধু সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে আগামী ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে এই কাজের সূচনা হবে। সেই অনুসারে ঐ বছরে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথিতে (২৭শে ডিসেম্বর) মঠ-মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যুক্ত সাতজন ব্রতধারিণীদের ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন তদানীন্তন সংঘাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ। ঐ দিনই মঠ-প্রাঙ্গণে আহূত বৈকালিক ধর্মসভার সভাপতি স্বামী মাধবানন্দ সমবেত ভক্ত ও সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে এই শুভবার্তা ঘোষণা করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে স্বামী মাধবানন্দের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। এক বছর ব্যাপী শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য অন্যান্য কমিটির সঙ্গে একটি Provisional Executive Committee গঠিত হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন স্বামী মাধবানন্দ। উৎসবের জন্য এই কমিটি চোদ্দ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেন। উৎসবের অঙ্গরূপে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় মহিলা সম্মেলন। সভাপতি ছিলেন সংঘাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ। তিনি থাকতে না পারায় অতঃপর স্বামী মাধবানন্দ সভা পরিচালনা করেন। জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানে তিনদিন ব্যাপী (৭ এপ্রিল-৯ এপ্রিল ১৯৫৪) এক অবিস্মরণীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই শুভ উৎসব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্বামী মাধবানন্দের সভাপতিত্বে একটি ছোট কমিটি গঠিত হয়। ঐ সময় শ্রীশ্রীমায়ের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও নাটমন্দির নির্মিত হয়। প্রথম দিন সকালে একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের নির্মিত মৃত্তিকা-মূর্তি ও অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-লীলার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বামী মাধবানন্দ। স্বামী শঙ্করানন্দ প্রমুখ কয়েকজন প্রাচীন সন্ন্যাসী জয়রামবাটীর অদূরে কোয়ালপাড়ায় ভক্ত জগন্নাথ কোলের বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন।

শ্রীসারদা মঠের জন্য দক্ষিণেশ্বরের কাছে গঙ্গাতীরে বাড়িসমেত জমি ক্রয় করা হয় ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে। দেখা যায় যে সেটি বাসোপযোগী করা বেশ সময় সাপেক্ষ। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্যা-সেবিকা সরলা দেবীকে কাশীতে সমস্ত সংবাদ জানান হয়। সরলা দেবী ও সাতজন ব্রহ্মচারিণী কলকাতার এণ্টালীতে মিশনের একটি বাড়িতে বসবাস করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়। এক ভক্ত ঐ বাড়িটি দিয়েছিলেন নারীকল্যাণকল্পে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই সরলাদেবী ও অন্যান্য ব্রহ্মচারিণীরা আসেন। তদানীন্তন সংঘাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ সরলা

“শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে স্বামী মাধবানন্দের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মর্তব্য।”—পৃষ্ঠা ৪০

শ্রীশ্রীমায়ের শতাব্দী-জয়ন্তীর উদ্বোধন উপলক্ষে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩ বেলুড় মঠে আয়োজিত জনসভায় শুভেচ্ছাবাণী পাঠরত সংঘাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ। পাশে উপবিষ্ট সভার সভাপতি স্বামী মাধবানন্দ।

শ্রীশ্রীমায়ের শতাব্দী-জয়ন্তী উপলক্ষে ২রা এপ্রিল, ১৯৫৪ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী শঙ্করানন্দ, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী মাধবানন্দ।
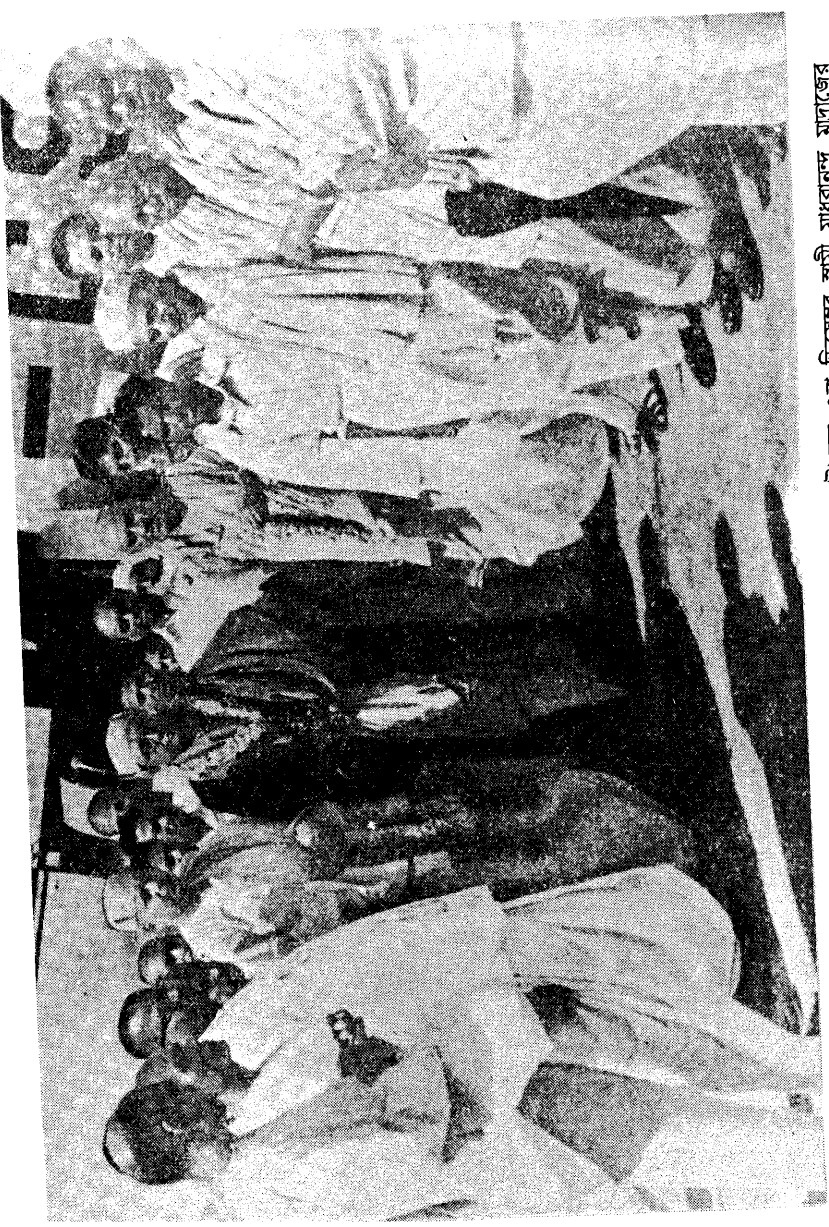
শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর স্বামী মাধবানন্দ মাদ্রাজের মীনামবক্কম বিমানবন্দরে পৌঁছলে স্থানীয় ভক্তগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

দেবীর বহুদিনের পূজিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা-সারদাদেবীর প্রতিকৃতি সিংহাসনে স্থাপন করেন শুভ মুহূর্তে। উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী অভয়ানন্দ। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বরে স্ত্রী-মঠের উদ্বোধন হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজীর নতুন ছবি সিংহাসনে স্থাপন ও প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন স্বামী শঙ্করানন্দ। উপস্থিত ছিলেন স্বামী মাধবানন্দ সহ মঠের সন্ন্যাসীবৃন্দ। এতদিনে স্বামীজীর স্ত্রী-মঠের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল।

স্ত্রী-মঠ স্থাপনে স্বামী মাধবানন্দের দক্ষতা, সুচিন্তিত মতামত, প্রভৃত স্থিতধী ও ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায় একথা বহু প্রাচীন সন্ন্যাসীদের বলতে শোনা যায়। আরো কয়েক বছর পরে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে বেলুড় মঠে সরলাদেবী ও সাতজন ব্রহ্মচারিণীকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন তদানীন্তন সংঘাধ্যক্ষ এবং সেইদিন থেকে 'শ্রীসারদা মঠ' পৃথক সংস্থার রূপে নেয়।

এই সঙ্গে গঠিত হল রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন। রামকৃষ্ণ মিশনের যেসব শাখাকেন্দ্রে নারীকল্যাণমূলক সেবাকাজ হচ্ছিল সেগুলি রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ এরপর সারদা মিশনকে হস্তান্তর করেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ দমদমে রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের মহিলা কলেজ 'বিদ্যাভবনের' উদ্বোধন হয়। পরের দিন ঐ উপলক্ষে এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী মাধবানন্দ। তিনি উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে অনুরোধ করেন সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মত সমভাবে সাহায্য করতে। তিনি বলেন, "Today we feel happy that we have been able to fulfill the responsibility that Swamiji had placed on us. As the blessings of the Master and the Holy Mother are on them, so will they be on all who will help them."

সাধারণতঃ সংঘাধ্যক্ষ বা সহ-সংঘাধ্যক্ষ মঠ-মিশনের কোন প্রকল্পের ভিত্তিস্থাপনা বা উদ্বোধন করেন। স্বামী মাধবানন্দ সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন সংঘাধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী শঙ্করানন্দ, পরে কিছুকালের জন্য স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। সহ-সংঘাধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী অচলানন্দ ও শেষোক্ত দুজন। তাঁরাও বিভিন্ন কেন্দ্রে যেতেন ঐসব অনুষ্ঠানে। কিন্তু তাঁদের অসুবিধা থাকলে সাধারণ সম্পাদক মাধবানন্দের উপরেও ছিল ভিত্তিস্থাপনা বা উদ্বোধনের গুরুদায়িত্ব। এই প্রসঙ্গে প্রদত্ত তালিকা উল্লেখযোগ্য ঃ—

১৯৩৭	উদ্বোধন	—ঢাকা	—বিদ্যালয় গৃহ।
১৯৪০	উদ্বোধন	—রেঙ্গুন	—সোসাইটির নতুন বাড়ি

১৯৪০	উদ্বোধন	—কালাড়ি	—আশ্রম গৃহ
		ত্রিচুর	—বিদ্যালয় গৃহ
	ভিত্তিস্থাপন	—বিশাখাপত্তনম্	—আশ্রম গৃহ
		মাদ্রাজ	—সারদা বিদ্যালয় গৃহ
১৯৪১	উদ্বোধন	—বিশাখাপত্তনম্	—ছাত্রাবাস
		বাঁকুড়া	—দাতব্য চিকিৎসালয়
		নারায়ণগঞ্জ	—ছাত্রাবাস
	ভিত্তিস্থাপন	—শিলচর	—শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির
		নারায়ণগঞ্জ	—দাতব্য চিকিৎসালয়
১৯৪৩	উদ্বোধন	—বৃন্দাবন	—হাসপাতালের নতুন বাড়ি
		রাজকোট	—লাইব্রেরী হল
১৯৪৭	ভিত্তিস্থাপন	—বেলুড় মঠ	—অতিথি ভবন
১৯৪৮	উদ্বোধন	—কালিকট	—আশ্রমের নতুন ব্লক
		কালাড়ি	—হরিজন ছাত্রাবাস ও পাঠকক্ষ
		সালেম	—দাতব্য চিকিৎসালয়ের নতুন বাড়ি
১৯৪৯	ভিত্তিস্থাপন	—সারদাপীঠ	—কলেজের হাসপাতাল
১৯৫০	উদ্বোধন	—মহীশূর	—শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির
	ভিত্তিস্থাপন	—কাঁকুড়গাছি	—সাধুনিবাস
		রহড়া	—ছাত্রাবাস
১৯৫১	উদ্বোধন	—বোম্বাই	—স্বামীজীর মূর্তি
		রাজমহেন্দ্রী	—মঠ
		বিশাখাপত্তনম্	—ছাত্রাবাসের পরিবর্দ্ধিত অংশ
১৯৫২	উদ্বোধন	—সিঙ্গাপুর	—শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ও মর্মর মূর্তি
১৯৫৪	ভিত্তিস্থাপন	—রাঁচী	—টি. বি. স্যানেটোরিয়ামে সাধুদের ওয়ার্ড
		বাঙ্গালোর	—ছাত্রাবাস
১৯৫৫	উদ্বোধন	—রহড়া	—রান্নাঘর, খাবারঘর ও ভাঁড়ার ঘর
		রাজকোট	—লাইব্রেরীর পরিবর্দ্ধিত অংশ
	ভিত্তিস্থাপন	—কনখল	—ডাক্তারদের বাসস্থান
১৯৫৬	উদ্বোধন	—রেঙ্গুন	—আউটডোর বিল্ডিং
		হলিউড	—শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির
১৯৫৭	উদ্বোধন	—পাটনা	—সভাগৃহ
১৯৫৮	উদ্বোধন	—মেদিনীপুর	—বিদ্যালয়ের নতুন ভবন।
১৯৫৯	উদ্বোধন	—রহড়া	—শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির

১৯৫৯	উদ্বোধন	—উদ্বোধন কার্যালয়	—সংলগ্ন নতুন বাড়ি
১৯৬০	উদ্বোধন	—কামারপুকুর	—অতিথিভবন ও সাধুনিবাস
		কাঁথি	—শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির
		নরেন্দ্রপুর	— ছাত্রাবাস
		জয়রামবাটী	—সাধুনিবাস
		অদ্বৈত আশ্রম	—ডিহি এণ্টালী রোডে নতুন বাড়ি
	ভিত্তিস্থাপন	—জয়রামবাটী	—অতিথিভবন
		সারদাপীঠ	—কলেজের রসায়ন পরীক্ষাগার
		নিবেদিতা বিদ্যালয়	—শিশু বিভাগ
১৯৬১	ভিত্তিস্থাপন	—রহড়া	—এসেম্বলি হল।

স্বামী মাধবানন্দ ছিলেন বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় সমান দক্ষ। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকীয়, 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'বেদান্ত কেশরী'তে প্রকাশিত তাঁর সুচিন্তিত মূল্যবান প্রবন্ধগুলি তারই প্রমাণ। অনেক সময় ছদ্মনামেও প্রবন্ধ লিখতেন তিনি। স্বামী মাধবানন্দের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে ইংরেজী অনুবাদক হিসাবে। দুরূহ জটিল শাস্ত্রগ্রন্থের প্রাঞ্জল ইংরেজীতে অনুবাদ করা খুবই কঠিন। পণ্ডিতেরা একথা স্বীকার করেন। কিন্তু স্বামী মাধবানন্দের শাস্ত্রগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ সকল বিদগ্ধ মহলে সুপ্রশংসিত। এইসব অনুবাদ-গ্রন্থে একদিকে শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও সেইসঙ্গে ইংরেজী ভাষায় দখলের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবতে অবাক লাগে যে, সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকাকালীন বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ করার পরেও তিনি এইসব অনুবাদের কাজ করেছিলেন। স্বামী মাধবানন্দের ইংরেজী অনুবাদ-গ্রন্থের তালিকা ঃ

(1) Vivekachudamani of Sri Sankaracharya (1921), এটি প্রথমে 'প্রবুদ্ধ ভারতে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় (প্রকাশকাল জানুয়ারী ১৯১৮—ফেব্রুয়ারী ১৯২০)।

(2) Sri Krishna and Uddhava—Part-I (1924) and Part-II (1929)। পরে একসঙ্গে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। নতুন নামকরণ হয় 'The Last Message of Sri Krishna'। শেষ সংস্করণে (১৯৮৭) আবার নাম পরিবর্তিত হয়েছে—'Uddhava Gita' or 'The Last Message of Sri Krishna.'

(3) The Brihadaranyaka Upanishad with the Commentary of Sri Sankaracharya (July 1934) with an Introduction by Mahamahopadhyaya Prof. S. Kuppuswami Shastri.

(4) Bhasa-Pariccheda with Siddhanta-Muktavali by Visvanatha Nyaya-Panchanan (January 1940) with an Introduction by Dr. Satkari Mukherjee.

(5) Vedanta-Paribhasa of Dharmaraja Adhvarindra (April 1942) Foreworded by Dr. Surendra Nath Dasgupta.

(6) Mimamsa-Paribhasa of Krishna Yarjan (November 1948).

(7) Vairagya-Satakam of Bhartrihari, প্রথমে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (জুন ১৯১৪—মে ১৯১৬) প্রকাশিত ও পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত।

(8) Minor Upanishads—প্রথমে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (জুন ১৯১১—সেপ্টেম্বর ১৯১৭) প্রকাশিত। পরে 1st এবং 2nd Part যথাক্রমে প্রকাশিত হয় ১৯১৩ এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। দুই খণ্ড একত্রে প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে।

স্বামী মাধবানন্দ অনূদিত শাস্ত্রগ্রন্থগুলি সম্পর্কে তৎকালীন কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তি এবং সংবাদপত্রের অভিমত এখানে উদ্ধৃত করা হল।

Bhasa-Pariccheda :

"...the book will be greatly appreciated by those for whom it is intended and will find a wide publicity"—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ।

"...Swami Madhavananda's work...is a substantial contribution to a correct understanding of the principles of Nyaya-Vaiseshika"—The Hindu.

The Brihadaranyaka Upanishad :

"The translator's rendering is always to the point and illuminating; and, his avowed aim throughout being 'practical rather than scholastic,' he has achieved a remarkable success in this somewhat difficult task."

—The Statesman.

The Edition of the Brihadaranyaka Upanishad with the Commentary of Sri Sankaracharya and the excellent translation of Swami Madhavananda is after my modest opinion just the ideal type asked for.... The especial value of this volume consists in the achievement of the

translation, which removes all the difficulties which might hurt the understanding, and keeps the true essence of Sankaracharya's teachings. It is a book which might accompany its reader to be studied again and again, might be consulted at the same time as a classical interpretation of one of the most important texts."

—Heinrich Zimmer, Professor of Sanskrit, Heidelberg University, Germany.

স্বামী মাধবানন্দ বাংলাতে অনুবাদ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতার 'The Master as I saw him' বইটি। তাঁর এই অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩২২—চৈত্র ১৩২৪)। তখন নাম ছিল—'আচার্য শ্রীবিবেকানন্দ' ঃ যেমনটি দেখিয়াছি। বহু পরে পুস্তকরূপে আত্মপ্রকাশ করে (কার্তিক ১৩৬১)। নতুন নামকরণ হয়—'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি'। এছাড়া ইংরেজী ও বাংলাতে বহু প্রবন্ধ তিনি অনুবাদ করেছিলেন।

হিন্দী ভাষাতেও স্বামী মাধবানন্দের দক্ষতা ছিল। 'সমন্বয়' হিন্দী পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়া 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র ও স্বামীজীর অনেক পুস্তকের তিনি হিন্দী অনুবাদ করেন। 'Hindi Grammer at a glance' এবং 'Bengali Grammer at a glance' নামে দুটি ব্যাকরণেরও তিনি রচয়িতা।

অনুবাদ ব্যতীত স্বামী মাধবানন্দ মঠ-মিশনের বহু পুস্তকের সম্পাদনা করেছেন। এবিষয়ে তাঁর নাম চিরস্মরণীয়। তাঁর অসাধারণ মণীষার পরিচায়কও বটে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মশতবার্ষিকীতে প্রকাশিত 'The Cultural Heritage of India' স্মারক গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 'The Great Woman of India' পুস্তকের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন স্বামী মাধবানন্দ এবং তাঁর সহপাঠী ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। এই বইটির সম্পাদনা স্বামী মাধবানন্দের অক্ষয় কীর্তি। ঐসময় বাংলায় শ্রীশ্রীমায়ের সুবৃহৎ প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন স্বামী গম্ভীরানন্দ। বইটির সম্পাদনা স্বামী মাধবানন্দ করবেন জেনেই স্বামী গম্ভীরানন্দ এটি লিখতে রাজী হয়েছিলেন। 'শ্রীমা সারদা দেবী' নামে এই বইটির সচিত্র হিন্দী সংস্করণ অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়। এলাহাবাদের অধ্যাপক জয়রাম মিশ্র, সাহিত্যরত্ন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির অধ্যাপক ভুবনেশ্বর ঝা, সাহিত্যভূষণ, যৌথভাবে বইটির হিন্দী অনুবাদ সম্পন্ন করেন। হিন্দী ভাষাতে দক্ষ স্বামী মাধবানন্দ এই অনুবাদ-গ্রন্থটিও সহস্তে সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত অন্যান্য পাণ্ডুলিপির তালিকা ঃ

১) History of Ramakrishna Math and Mission—Swami Gambhirananda (1957).

২) Ramakrishna and His Disciples—Christopher Isherwood (1964).

৩) শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ (১৯৫৩)।

৪) অতীতের স্মৃতি (স্বামী বিরজানন্দ ও সমসাময়িক স্মৃতিকথা)—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (মাঘ, ১৩৬৩)।

৫) শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা পদ্ধতি—উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত (বৈশাখ, ১৩৬৮)।

৬) Sri Ramakrishna and spiritual Renaissance—Swami Nirvedananda.

এইসব জনপ্রিয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সম্পাদনাকালে স্বামী মাধবানন্দের ভূমিকা কি রকম ছিল ? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ এক গ্রন্থকারের বর্ণনা ঃ "এই আমি প্রথম দেখলাম—সম্পাদনা কাকে বলে। লেখকের লেখা যতদূর সম্ভব রেখে, ভাষা একটু অদল বদল করে ভাবটি ঠিক ঠিক ফুটিয়ে তোলার কায়দা দেখলাম। কালিতে নয়—পেনসিলেই মহারাজ সংশোধন করেছেন এবং বললেন, 'তুমি যে সব সংশোধন মনে-প্রাণে মেনে নেবে, সেগুলিই কালি দিয়ে লিখে নেবে, বাকী সব রবার দিয়ে মুছে দেবে।' তাই সেই সম্পাদনার গুণেই 'শ্রীশ্রীমা সারদা' ছোট বড় সকলের কাছে আজও প্রিয়।"

"…'উদ্বোধন' পত্রিকার কার্যভার দেবার সময় পূজনীয় মহারাজ বলেছিলেন, 'কি হাতে কলম পেলেই সকলের লেখা কাটতে হবে নাকি ? keep if you can, cut where you must (যতদূর পারবে লেখকের লেখা রাখবে, যখন একান্তই প্রয়োজন তখনই কাটবে)।' মনে হয়, কথাগুলি সম্পাদকীয় রীতিনীতির মূল সূত্র।"

"বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর সময় 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র সম্পাদনার ভার দিয়ে মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ; যেতেই বললেন, 'কি, কি রকম সব করবে কিছু ভেবে এসেছ তো ?' 'ভারতে বিবেকানন্দ' নিয়ে গেছলাম, বললাম, 'অনুবাদের ভাষা ও বানান সব আধুনিক করতে হবে।'

"মহারাজ বললেন, 'হ্যাঁ, বানান 'চলন্তিকা' অনুসরণ করবে। আর ভাষা, কি রকম কি পরিবর্তন করবে ?' বললাম, 'সমভিব্যাহারে, ভগবল্লাভাকাঙ্খী—এসব চলবে না।' 'কি করতে চাও ?' 'সহজ কথা দিতে হবে, সমভিব্যাহারে একেবারে অচল—সঙ্গে বা সহিত করতে হবে॥ আর ভগবল্লাভাকাঙ্খীকে করতে হবে—ভগবান লাভ করতে ইচ্ছুক বা ঈশ্বরলাভেচ্ছু।' প্রথম পৃষ্ঠা পড়তে পড়তে মহারাজ বললেন, 'আচ্ছা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় কি করবে ?' দুজনে

হেসে উঠলাম, বললাম, 'কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবো।' এইরকম হাসিখুশির ভেতর দিয়েই এই গুরুগম্ভীর কাজের সূত্রপাত হল।"

স্বামী মাধবানন্দ সুচিন্তিত ভূমিকা লিখে চারটি পুস্তকের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। বইগুলি হল, স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মালিকা' (১লা বৈশাখ ১৩৫৯), স্বামী অব্জজানন্দ রচিত 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' (১৩ই অক্টোবর ১৯৬৩), রামচন্দ্র দত্ত রচিত 'পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত' (ষষ্ঠ সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫২) এবং 'শ্রীম-কথা' স্বামী জগন্নাথানন্দ প্রণীত (পৌষ ১৩৪৮)। স্বামী মাধবানন্দ যখন কলেজের ছাত্র তখন তিনি শ্রীম'র পূত সান্নিধ্যে আসেন। 'শ্রীম-কথা' পুস্তকের ভূমিকায় সেই অতীতের স্মৃতিই যেন ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়া স্বামী তেজসানন্দ রচিত 'The Ramakrishna Movement : Its ideals and activities' ইংরেজী পুস্তকের ভূমিকা স্বামী মাধবানন্দ লিখেছিলেন।

স্বামী মাধবানন্দ ছিলেন বাগ্মী। ইংরেজী ও বাংলা—উভয় ভাষায় সুবক্তা। তাঁর মনোমুগ্ধকর ও সুচিন্তিত বক্তব্য শ্রোতাদের মন সহজেই জয় করে নিত। তা না হলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণ তাঁদের উপস্থিতিতে তরুণ স্বামী মাধবানন্দকে জনসভায় ভাষণ দিতে আদেশ করতেন! পুরাতন 'উদ্বোধন', 'প্রবুদ্ধ ভারত' বা 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকার পৃষ্ঠা ওল্টালেই দেখা যায় তাঁর বক্তৃতা-সফরের কর্মসূচী। প্রশাসনিক কাজে যখন যেখানে তিনি গিয়েছেন, তখন সেখানেই তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা ও ইংরেজী বক্তৃতা খুব আদৃত হয়েছিল বিদেশেও। সুললিত ভাষায় গভীর ভাব উদ্দীপনকারী তাঁর বক্তৃতার কিছু অংশ উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথির এক ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী মাধবানন্দের ভাষণের অংশবিশেষ "…অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) নাম শুধু বাংলা দেশ অথবা ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যেখানে ধর্মের জন্য মানুষের মন ব্যাকুল হইয়াছে, যেখানে আসিয়াছে সন্দেহ, সেখানে তাঁহার মহতী বাণী দিয়াছে পথের সন্ধান, মানুষ পাইয়াছে আলোকস্তম্ভের সন্ধান। তাঁহার উপদেশ এবং আদর্শ কেবলমাত্র ভারতবাসীর নহে, সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণের পথ দেখাইয়াছে। নানাভাবে, নানা পথ দিয়া একই ভগবানকে পাওয়া যায়, নানা ধর্মমত যে একই ভগবানকে লাভ করিবার বিভিন্ন উপায়, ঠাকুর জগতবাসীকে সেই শিক্ষাই দিয়াছেন।" শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বেলুড় মঠে আয়োজিত ধর্মসভার সভাপতি স্বামী মাধবানন্দের ভাষণের কিছু অংশ : "পঞ্চাশ বৎসরের জীবনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে কাজ শেষ করিতে পারেন নাই—শ্রীসারদাদেবী তাহা সম্পূর্ণ করার কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন।…শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সকলের কল্যাণের জন্য

উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। অতিকষ্টের মধ্যে তিনি তাঁহার জীবন যাপন করেন। অপরের কল্যাণ কিভাবে হয়, ইহাই ছিল তাঁহার চিন্তা ও সাধনা। আধ্যাত্মিক দিক দিয়াও তিনি অসাধারণ ছিলেন। আজিকার দিনে তাঁহার পবিত্র জীবনের ভাবধারা যত আলোচনা হয় এবং তাঁহার আদর্শ যতটা গ্রহণ করা হয়, ততই দেশ ও সমাজের পক্ষে মঙ্গল।" কলকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটিতে স্বামীজীর এক জন্মোৎসবে তাঁর অভিভাষণের কিছু অংশ ঃ "স্বামী বিবেকানন্দ এ জগতে আসিয়াছিলেন এক নব যুগধর্ম প্রবর্তিত করিতে। ···তাঁহার জন্ম জগদ্ধিতায়। ···তিনি ছিলেন অসাধারণ মানব, কারণ এত অল্প কালের মধ্যে তিনি যে সত্যের জীবন্ত ও তেজোপূর্ণ বাণী জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ মানবে সম্ভব নহে। তাঁহার কঠোর সাধনা ও অভিজ্ঞতা হইতে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে প্রেম ও সেবাধর্মই মানুষকে শান্তিদান করিতে পারে; অর্থ বা অন্যান্য সম্পদ পারে না। তিনি এই সত্য যাহাতে লোকে যথার্থ গ্রহণ ও উপলব্ধি করিতে পারে তজ্জন্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যে তিনি এই সত্যের অপেক্ষাকৃত গভীর তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, কারণ তথায় লোকে ভোগসুখের বিড়ম্বনা অনেকটা ভোগ করিয়া সত্যলাভে অধিক উৎসুক; কিন্তু প্রাচ্যে—যেখানে লোক দারিদ্রে, অশিক্ষায়, নানা অভাবে জর্জরিত, সেখানে বেদান্তের ঐ সত্য ঐভাবে বলা বৃথা জানিয়া, এই সংসারের অভাব দৈন্য দূরীকরণে বেদান্তের উচ্চতত্ত্ব কিরূপ সহায়ক হইতে পারে, তদুদাহরণে 'কর্মজীবনে বেদান্তের' নতুন তত্ত্ব দান করিলেন। তিনি ঐ উচ্চ তত্ত্বকে আদর্শ রাখিয়া সাধারণের যেমন যেমন অভাব তাহা দূর করিবার জন্য সেবা-সংঘ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আরম্ভ করিয়া গেলেন। এইরূপে সমগ্র বিশ্বের জন্য তিনি একাধারে সেবা ও আধ্যাত্মিক ধর্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

স্বামী মাধবানন্দের নিরভিমানতা ছিল অতুলনীয়। নিজে সুপণ্ডিত, সুবক্তা ও সুলেখক হয়েও তিনি ছিলেন নিরহঙ্কারী। সংঘের উচ্চপদে আসীন হয়েও তিনি বাসে-ট্রামে যেতে কখনও অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি। একবার তিনি কিষেনপুর থেকে দিল্লী এসেছিলেন বাসে করে। এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের চেম্বারে তাঁর একজিমা রোগ দেখাতে ও ওষুধ আনতে তিনি নিজেই যেতেন বাসে করে। ট্রেনের মধ্যম শ্রেণীতে ভ্রমণ করা তিনি পছন্দ করতেন। নিজের ঘরে কখনও দুপুরে (বা রাতেও) খাবার আনতে দিতেন না। গঙ্গাস্নান করে মাথায় গামছা জড়িয়ে দুপুরে আহারে যেতেন। সেখানে খেতেন সকল সাধুদের সঙ্গে।

একবার রাঁচী আশ্রম থেকে শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী শান্তানন্দ মঠে এসেছেন। সবেমাত্র মঠভূমিতে পদার্পণ করেছেন তিনি। সংঘগুরু
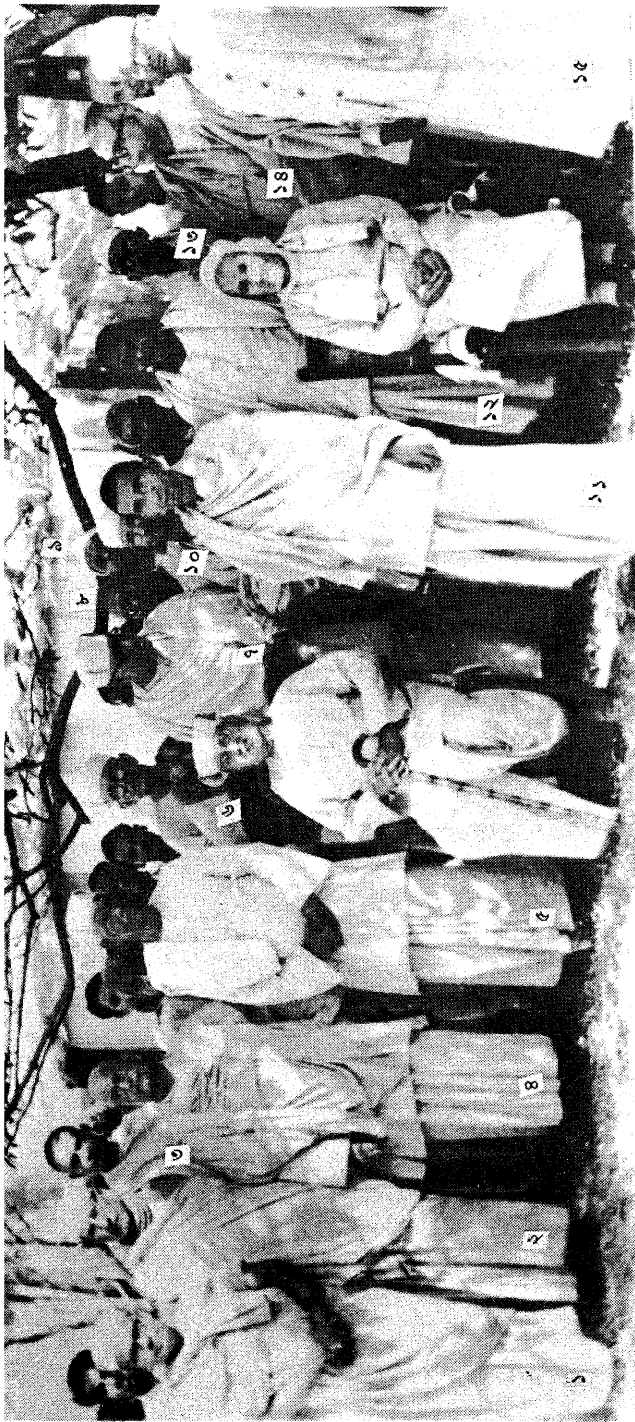
"রাঁচী আশ্রম থেকে শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী শান্তানন্দ মঠে এসেছেন।"—পৃষ্ঠা ৪৮

উপবিষ্ট : স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী শান্তানন্দ। দণ্ডায়মান (বাম হইতে দক্ষিণে) : ১। স্বামী গোকুলানন্দ, ২। স্বামী অসঙ্গানন্দ, ৩। স্বামী সংজ্ঞানন্দ ৪। স্বামী যতীশ্বরানন্দ, ৫। স্বামী অভয়ানন্দ, ৬। স্বামী অজরানন্দ, ৭। স্বামী বিমুক্তানন্দ, ৮। স্বামী ভব্যানন্দ, ৯। স্বামী চিৎসুখানন্দ, ১০। স্বামী প্রমথানন্দ, ১১। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, ১২। স্বামী দিব্যাত্মানন্দ, ১৩। স্বামী তপনানন্দ, ১৪। স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ ও ১৫। স্বামী যোগাত্মানন্দ—১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে বেলুড় বি. টি. কলেজ মাঠে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী প্রদর্শনী উপলক্ষে গৃহীত চিত্র।

"স্বামী প্রেমেশানন্দ তাঁকে বলেন, 'এতদিনে ঠাকুর আপনাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছেন—যোগ্য আসনে আপনাকে বসিয়েছেন। ....আমাদের প্রেসিডেন্টকে আমি তো ঠাকুরেরই প্রতিমা জ্ঞান করি। ....দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়—আবার আর একখানি প্রতিমা তার জায়গায় বসিয়ে পূজা করা হয়। আমাদেরও এক একজন সংঘগুরু চলে যাচ্ছেন—শূন্যস্থানে আবার আমরা নতুন প্রতিমা বসাচ্ছি। এ প্রতিমা ঠাকুরেরই প্রতিমা।'
করজোড়ে স্বামী মাধবানন্দের তৎক্ষণাৎ উত্তর, 'প্রতিমা যদি বললেন, তবে প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠাটিও আপনি করে দিন। আপনি মার প্রিয় সন্তান—সবই পারেন।"—পৃষ্ঠা ৪৯

স্বামী মাধবানন্দ সকলের সামনে মঠ প্রাঙ্গণেই প্রণাম করলেন আগত সন্ন্যাসীকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সংঘগুরু সকলের প্রণম্য। শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমেশানন্দ তাঁকে বলেন, "এতদিনে ঠাকুর আপনাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছেন—যোগ্য আসনে আপনাকে বসিয়েছেন।...আমাদের প্রেসিডেণ্টকে আমি তো ঠাকুরেরই প্রতিমা জ্ঞান করি। ৺দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়—আবার আর একখানি প্রতিমা তার জায়গায় বসিয়ে পূজা করা হয়। আমাদেরও এক একজন সংঘগুরু চলে যাচ্ছেন—শূন্যস্থানে আবার আমরা নতুন প্রতিমা বসাচ্ছি। এ প্রতিমা ঠাকুরেরই প্রতিমা।" করজোড়ে স্বামী মাধবানন্দের তৎক্ষণাৎ উত্তর, "প্রতিমা যদি বললেন, তবে প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠাটিও আপনি করে দিন। আপনি মার প্রিয় সন্তান—সবই পারেন।" কেউ পূজনীয় মহারাজের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন কোন উৎসবের সফলতার জন্য। তিনি পাঠিয়েছেন আশীর্বাদ-পত্র। পরে তাঁর কাছে চিঠি এসেছে ঃ "মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে সব কিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।" উত্তরে তিনি লিখলেন, "No credit is due to me. If any credit is to be given, it is to you for your hard work." তিনি সর্বদা নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন। তাঁর স্বভাব ছিল সবার অলক্ষ্যে থাকা।

স্বামী মাধবানন্দ সারাজীবন বেদান্তচর্চা করেছেন। দুরূহ বেদান্তের বই অনুবাদ করেছেন ইংরেজীতে। বাইরে তিনি চরম বেদান্তবাদী; কিন্তু তাঁর অন্তরে প্রবাহিত হত ভক্তির ফল্গুধারা। তিনি প্রতিদিন দু'বেলা প্রণামে যেতেন মঠের চারটি মন্দিরে, সকালে জপ ধ্যান এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর। মন্দিরে তাঁর প্রণাম দেখবার মত—পরম শরণাগতির ভাব। মন্দিরে সৃষ্টি হত অপূর্ব স্নিগ্ধ গম্ভীর পরিবেশ। ডাক্তারের নিষেধে বা শরীর খুব অসুস্থ হলে তাঁর মন্দিরে যাওয়া হত না। বিছানা থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির লক্ষ্য করে প্রণাম করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজী, শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদগণ, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিদের শুভ আবির্ভাব তিথিগুলিতে তিনি থাকতেন উপবাসী। ঐ বিশেষ দিনগুলিতে তাঁর বেশি সময় অতিবাহিত হত জপ-ধ্যানে। ৺দুর্গাপূজার সময় তিনদিন ভোরে সমগ্র ৺চণ্ডী পাঠের অভ্যাস ছিল তাঁর। গঙ্গাবারি তাঁর কাছে 'ব্রহ্মবারি'। নিত্য গঙ্গাস্নানে তিনি পরম তৃপ্তিবোধ করতেন। এমনকি ডাক্তারের বারণ সত্ত্বেও গোপনে গঙ্গাস্নানে যেতেন তিনি। এমনি ছিল তাঁর গঙ্গাপ্রীতি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃতের কয়েকটি কথা মাধবানন্দজীর ছিল নিত্য ধ্যেয় ঃ

"শ্রীরামকৃষ্ণ (যুবকের প্রতি)—তুমি জ্ঞানচর্চা ছাড়—ভক্তি নাও—ভক্তিই সার!—আজ তোমার কি তিনদিন হল?

"ব্রাহ্মণ যুবক (হাত জোড় করিয়া)—আজ্ঞা হ্যাঁ।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—বিশ্বাস কর—নির্ভর কর—তা হ'লে নিজেকে কিছু করতে হবে না ! মা কালী সব করবেন !

"জ্ঞান সদর মহল পর্যন্ত যেতে পারে। ভক্তি অন্দরমহলে যায়।"

স্বামী মাধবানন্দ কখনও সময় নষ্ট করতেন না। বলতেন, "Waste not, want not." কোন সন্ন্যাসী তাঁকে একবার বলেছিলেন যে সময়ের অভাবে চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না। উত্তরে মাধবানন্দজী বলেছিলেন, "যাদের কম কাজ থাকে, তারা দু'একটি চিঠি লিখতেও সময় পায় না। আর যারা বেশি কাজ করে, তারাই অনেক চিঠি লিখতে সময় বের করে নেয়।" তিনি সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেন। অছি পরিষদের সভা হচ্ছে। তারই ফাঁকে তিনি হয় কোন বই সম্পাদনা করছেন বা প্রুফ দেখছেন। আবার মাঝে মাঝে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন ও মন্তব্য করছেন। এভাবে তিনি সময়ের সদ্ব্যবহারে দক্ষ ছিলেন। একবার তাঁর খুব জ্বর—তাপমাত্রা ১০৩ ডিগ্রি। সেই অবস্থায়ও তিনি কাজ করছেন। এক ব্রহ্মচারী (বর্তমানে প্রাচীন সন্ন্যাসী) প্রাতরাশ নিয়ে এলেন। তিনি কাজে এত মগ্ন যে ব্রহ্মচারীর উপস্থিতিই টের পেলেন না। ব্রহ্মচারী প্রাতরাশ রেখে দিয়ে চলে গেছেন। বেশ কিছুক্ষণ পর ব্রহ্মচারী দেখেন যে পূজনীয় মহারাজ খাবারই স্পর্শ করেন নি—কাজেতেই ব্যস্ত। ব্রহ্মচারী তখন বাধ্য হয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তখন তিনি মুখ তুলে চাইলেন। বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। ঐ ঠাণ্ডা খাবারই খেলেন। ব্রহ্মচারী অবাক হয়ে গেলেন মাধবানন্দজীর একাগ্রতার নজির দেখে।

মাধবানন্দজীর জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও বাহুল্য-বর্জিত। আহারে-বিহারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধা। একটু কিছু ফল বা অন্য কিছু খাবার বেশি দিলে তিনি বলতেন ঃ "আমার রেশন বৃদ্ধি কোরো না।" অতিরিক্ত কোন জিনিস তিনি কখনও রাখতেন না। এমনকি একটি ছোট্ট তোয়ালে রাখবার জো ছিল না। একবার একজন তাঁর ছেঁড়া পুরাতন জুতো জোড়ার পরিবর্তে নতুন সুন্দর এক-জোড়া জুতো রেখেছিলেন। সেবককে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কি ব্যাপার ?" সব শোনার পর তিনি ঐ নতুন জুতো জোড়া সরাবার আদেশ করলেন। পুরাতন জুতোই ব্যবহার করতে লাগলেন। রেঙ্গুন থেকে এক সন্ন্যাসী খুব ভাল চেয়ার পাঠিয়েছিলেন স্বামী মাধবানন্দের ব্যবহারের জন্য। তা দেখে সেবককে বললেন ঃ "যে যা পাঠাবে, তাই আমাকে ব্যবহার করতে হবে নাকি ?" কেউ ভক্তিভরে তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলে তিনি বলতেন ঃ "ওঠো হে বাপু ! বেশি প্রণাম করতে হয় তো মন্দিরে যাও। সেখানে তিনি সাক্ষাৎ বসে আছেন সকলের প্রণাম নেবার জন্য। তাঁর কাছে না গিয়ে, শুধু মানুষের কাছে লুটোপুটি খাচ্ছ।" অতি সহজভাবে বলতেন ঃ "ভগবানকে নিজের করে নাও—যেন তোমার আর পাঁচজন আত্মীয়ের মত। এইভাবে চল। আন্তরিকতা থাকলে

এই জীবনেই তাঁর দর্শন পাবে।" মাধবানন্দজী খড়ম ব্যবহার করতেন। একবার খড়মটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সেবকের কাছে কেরলের হাল্কা এক জোড়া খড়ম ছিল। তিনি মাধবানন্দজীকে ঐ খড়মজোড়া দিলেন। তবে ঐ খড়মের ছোট ছোট পেরেক মাঝে মাঝে পায়ে কষ্ট দিত। তা দেখে সেবক কাশীধামে চিঠি লিখে একজোড়া ভাল হাল্কা খড়ম আনালেন। এদিকে এক আসবাবপত্র-ব্যবসায়ী ভক্তও আর একজোড়া খড়ম উপহার দিলেন মহারাজকে। তিনি বলে উঠলেন: "না, না। এক জোড়ার বেশি রাখা অসাধুজনোচিত কাজ।" বাস্তবিক, মাধবানন্দজী ছিলেন অপরিগ্রহের প্রতিমূর্তি।

স্বামী মাধবানন্দের জীবনে বিন্দুমাত্র বিলাসিতা প্রবেশ করতে পারেনি। পদাধিকারে প্রাপ্য ব্যক্তিগত আরাম গ্রহণ করতে খুবই কুণ্ঠাবোধ করতেন তিনি। সাধারণের মত বাস বা নৌকাতে যাতায়াতই তাঁর পছন্দ ছিল বেশি। অনেক কৌশল করে তাঁকে গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হত। তাঁকে বলতে হত: "এ গাড়ি তো আপনার জন্যই শুধু যাচ্ছে না। কলকাতায় একটা জরুরী কাজে এ গাড়িকে যেতেই হবে, আপনাকে সেইসঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে, এই মাত্র।" এমনকি যখন তিনি সংঘাধ্যক্ষ, সে-সময়ও শরীর অসুস্থ হলে ডাক্তার দেখাতে বা ইনজেকশন নিতে তিনি নিজেই সেবা প্রতিষ্ঠানে যেতেন। ডাক্তাররা নিজেরাই মঠে এসে তাঁকে দেখে যেতে পারতেন। কিন্তু এতে ছিল তাঁর ঘোরতর আপত্তি—ডাক্তাররা কেন এত সময় নষ্ট করে ও কাজের ক্ষতি করে আসবে? যতদিন তাঁর সামর্থ্যে কুলিয়েছে, ততদিন নিয়মিত সপ্তাহে বা পনেরো দিন অন্তর সেবা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছেন তিনি। অবশেষে সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর জন্য গাড়ির বন্দোবস্ত করা হয়। তখন তিনি সাধারণ সম্পাদক। মন্দিরে প্রণামের ফাঁকে সেবক তাঁর বিছানা ঝেড়ে মুছে রাখলে, তা দেখে তিনি সেবককে বলতেন: "আমি তোমার কাজ বাড়াতে চাই না। আমাকেই সব করতে দাও।" একটি ছোট ব্যাগের মধ্যে থাকত তাঁর সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। কোথাও ট্রেনে গেলে একটি সতরঞ্জিতে ছোট্ট বিছানা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত। হোল্ড-অল কিছুতেই ব্যবহার করতেন না। তা নিয়েই তিনি বিভিন্ন আশ্রম পরিদর্শনে যেতেন। একবার এক পল্লীগ্রামের আশ্রমে গেছেন। তাঁর ব্যবহারের জন্য মোটর গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। তা দেখে খুব বিরক্ত হয়ে বললেন: "এখানকার লোকে কি মোটর গাড়িতে চড়ে?" শুনলেন রিক্সাই একমাত্র বাহন। তখন তিনি বললেন, "আমার জন্যও রিক্সার ব্যবস্থা রাখলেই চলবে।" তিনি তাঁর নিজের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসী মাধবানন্দজীকে উপহার দিয়েছেন একটি সুন্দর পশমের আসন। সেবক আসনখানি তাঁর বিছানায় পেতে রেখেছেন। তিনি হাত দিয়ে স্পর্শ করে বললেন, "আসনখানি তাকে ফেরৎ দিয়ে দাও। তাকে বল যে, নরম

আসনে বসে, বা এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে কেউ কখনও ভগবান লাভ করতে পারে না।" বাঙ্গালোর আশ্রমে আছেন তিনি। স্নানের জন্য তাঁর প্রয়োজন আধ বালতি গরম জল। একজন নবীন ব্রহ্মচারী উৎসাহে একটু বেশি গরম জল দিয়েছিলেন বালতিতে। সে বাড়তি গরম জল সরিয়ে নেবার পর তিনি স্নান করতে গিয়েছিলেন। উদ্বোধনে দুপুরে উপরের ঘরে প্রসাদ খাচ্ছিলেন তিনি। জানলা দিয়ে একফালি রোদ পড়েছিল তাঁর শরীরের উপর। এক ব্রহ্মচারী ছাতা ধরেছিলেন যাতে রোদ না লাগে। বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, "আমাকে কি তোমরা ননীর পুতুল পেয়েছ যে একটু রোদে গলে যাব? ছাতাটি সরিয়ে ফেল।" একটু ছায়া বা একটু বাড়তি গরম জল তাঁর কাছে মনে হয়েছিল বিলাসিতা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ব্যবহারের পরিবর্তন হয়নি মাধবানন্দজীর। মহাসমাধির মাত্র দু'চার দিন বাকী আছে। ঘুম হচ্ছে না তাঁর। ঘুম পাড়াবার জন্য সেবক মাথায় অডিকোলন লাগাবার চেষ্টা করছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার মাথায় কি লাগাচ্ছ?" সেবক, "অডিকোলন"। অমনি তিনি বলে উঠলেন, "অডিকোলন লাগিয়ে ঘুম? ও তো luxury।"

যাতে অপরের কোন কষ্ট না হয় সেদিকে মাধবানন্দজী খুব হুঁশিয়ার ছিলেন। অফিসে তিনি নিজের জন্য পাখা চালাতেন না। কিন্তু বাইরে থেকে তাঁর কাছে কেউ এলে তখন পাখা ব্যবহার করতেন। একবার তিনি ও স্বামী দয়ানন্দ পূর্বাশ্রমে গেছেন মা-বাবাকে দেখতে। পেঁছিতে রাত্রি হয়ে গেছে। আগে থেকে খবরও দেননি। পেঁাছে দেখলেন সবাই দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছেন। দু'ভাই কাউকে ডাকলেন না, পাছে বাড়ির সবাই বিব্রত হয়ে পড়েন। সারারাত বাড়ির বাইরে রোয়াকে কাটিয়ে দিলেন। দিল্লী আশ্রমে গেছেন। স্নানের ঘরে আয়না নেই। মিস্ত্রীকে ডেকে আনা হয়েছে। তিনি মন্দিরে প্রণাম করতে যাবেন, সেই ফাঁকে মিস্ত্রী কাজ করবে— তা তিনি জানতে পারলেন। তখনও তাঁর মন্দিরে যাবার সময় হয়নি। তাঁর জন্য মিস্ত্রী অপেক্ষা করবে কেন? তাই তিনি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মন্দিরে প্রণামে চলে গেলেন, যাতে মিস্ত্রীর সময় নষ্ট না হয়। আবার দাড়ি কামাবার সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে আয়না ব্যবহার করতেন না তিনি। বেলুড় মঠে প্রধান কার্যালয়ের পাশেই পোষ্ট বক্স। রোজ বিকালে পিয়ন আসে বাক্স থেকে চিঠি নিতে। সে-সময় একদিন অফিসের এক সাধু পিয়নটিকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন। মাধবানন্দজী চিঠি সই করে দিলে পিয়ন নিয়ে যাবে। তিনি তা জানতে পেরে সাধুটিকে ধমকালেন এবং বললেন: "সরকারী পিয়নকে তুমি কষ্ট দিচ্ছ কেন? এ অন্যায়।" সংঘাধ্যক্ষ হয়েও তাঁর এই স্বভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন লক্ষিত হয়নি। ট্রেনে যাচ্ছেন। সহযাত্রীর যাতে

কোন অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে তিনি ছিলেন বিশেষ সচেষ্ট। হয়ত কাউকে ডেকে পাশে বসতে বলছেন—কোন অপরিচিত প্রগলভ যুবক জ্বলন্ত সিগারেট হাতে সংঘাধ্যক্ষের গায়ে ধাক্কা মেরে দুম করে বসে পড়লেন। তিনি কিন্তু নির্বিকার। চলন্ত ট্রেনে জলপান করতে হলে সেবকের ভাল গ্লাসের জলের চেয়ে নিজের কমণ্ডলুর জল পান করা বেশি পছন্দ করতেন তিনি। মাধবানন্দজীর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা। তখন তিনি সংঘাধ্যক্ষ। তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি ছিল খুবই ক্ষীণ। চশমা ছাড়া তাঁর পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব ছিল না। সেই প্রয়োজনীয় চশমাটির কাঁচ একদিন ভেঙে যায় কোন সেবকের অসাবধানতায়। সেবকের তখন অনুশোচনার অন্ত নেই। নিজেকে খুব অপরাধী মনে করলেন। সব নিবেদন করলেন পূজনীয় মহারাজের কাছে। সব শুনে স্মিত হাস্যে তিনি বললেন ঃ "তাতে কি আর হয়েছে? স্বামীজী বলেছিলেন, 'ওসব এমনি ভাবেই ভেঙে যায়।' ও কিছু ভেব না"। মাধবানন্দজী ভাঙা কাঁচ সহ চশমাটি নির্লিপ্ত চিত্তে ব্যবহার করলেন যতদিন না নতুন চশমা তৈরী হয়।

নবীন ব্রহ্মচারীদের প্রতি মাধবানন্দজী ছিলেন খুবই সহানুভূতিশীল। সাধুজীবনের বনিয়াদ যাতে সুদৃঢ় হয় সেদিকে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। তাঁরা যাতে ঠিক পথে চালিত হন, সেজন্য তিনি যথোচিত মূল্যবান উপদেশ দিতেন। জনৈক নবীন সন্ন্যাসী (বর্তমানে প্রাচীন সন্ন্যাসী) তাঁর মায়ের অসুখের সংবাদ পেয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁর মাতৃবিয়োগের সংবাদ জানিয়ে মাধবানন্দজীকে তিনি পত্র দিয়েছেন। সেই চিঠির উত্তরে তিনি যথোচিত উপদেশ দিয়ে লিখেছিলেন ঃ "শ্রাদ্ধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে সন্ন্যাসীর কোন ভূমিকা নেই। প্রাচীন মতানুসারে সন্ন্যাসীর উপস্থিতি এই ধরনের অনুষ্ঠানের হানি করে। অতএব তুমি ঐ সকল অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে দূরে রাখিবে। ···ঠাকুর সকল ভক্তদের শ্রাদ্ধের অন্ন খেতে নিষেধ করতেন। আমাদের সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে ইহা আরো বেশী প্রযোজ্য।" একবার এক নবীন ব্রহ্মচারী (বর্তমানে প্রাচীন সন্ন্যাসী) সমস্যায় পড়েন ভোরে ঘুম থেকে ওঠা নিয়ে। ভোর ৪·৩০ মিনিটে সকলকে ঠাকুর ঘরে জপ-ধ্যান করতে হবে—আশ্রম-অধ্যক্ষের কড়া নির্দেশ। ব্রহ্মচারী ঐ সময়ে শয্যা ত্যাগ করলে সারাদিন অনুভব করেন ক্লান্তি, জপ করতে বসেই আচ্ছন্ন হন ঘুমে। যদি আধঘণ্টা দেরিতে ওঠেন, তাহলে তাঁর কোন অসুবিধা হয় না। মাধবানন্দজী গিয়েছেন ঐ আশ্রমে। ব্রহ্মচারী নিঃসঙ্কোচে সব নিবেদন করে উপদেশ চাইলেন তাঁর কাছে। তিনি সব শুনে সমবেদনার সুরে বললেন ঃ "আধঘণ্টা পরে ঘুম থেকে উঠলে যদি তোমার সব দিক দিয়ে সুবিধা হয়, তাহলে তাই করবে।" ব্রহ্মচারী বললেন ঃ "এখানে আমার অসুবিধা হবে না। আমি ভয় পাচ্ছি—

অন্য আশ্রমে বদলি হলে তখন কি হবে।" মাধবানন্দজীর শান্ত উত্তর ঃ "যদি কোন আশ্রমের অধ্যক্ষ এর বিরোধিতা করেন, তাহলে তুমি তাঁকে বলবে যে আমি তোমাকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছি।" ব্রহ্মচারী নির্বাক হয়ে গেলেন মাধবানন্দজীর হৃদয়স্পর্শী কথাতে। তাঁর কর্মপন্থা সম্বন্ধে এক প্রবীণ সন্ন্যাসীর মূল্যায়ন ঃ "মানুষ মাত্রেই ভুল করে থাকে, অন্যায়ও করে ফেলে—কিন্তু যদি তার মধ্যে কপটতা না থাকে, মতলববাজী না থাকে, তবে সে ভুল বা অন্যায়ের জন্য দণ্ডবিধান সঙ্গত নয়। তাকে সুযোগ দিতে হবে, নির্দেশ ও ভালবাসা দিয়ে ঠিক পথে তুলে নিতে হবে—এই ছিল তাঁর কথা, ছিল কর্মপন্থা।" হয়ত কখনও কোন ব্রহ্মচারীর মনে সংশয় সন্দেহ দেখা দিয়েছে সাধন-ভজন ও কাজকর্ম নিয়ে ; তিনি সেই ব্রহ্মচারীকে সুস্পষ্টভাবে বললেন, "জপ-ধ্যান ও সাধন-ভজন না করলে নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব নয়।"

সাধারণ সম্পাদক পদে থাকাকালে মাধবানন্দজী ব্যক্তিগত সেবা নিতে একদম পছন্দ করতেন না। জোর করে বা কৌশল করে তাঁর সেবা করতেন কোন ব্রহ্মচারী। তাও আবার কাপড় কাচা, কাপড়ে গেরুয়া রঙ করা ইত্যাদি টুকিটাকি কাজ মাত্র। এতেই সেবককে তাঁর সঙ্গে রীতিমত লড়াই করতে হত। একবার মহারাজের একজিমা খুব বেড়ে যায়। ডাক্তাররা ব্যবস্থা দিলেন 'bran bath' করার। এজন্যে দুজনের প্রয়োজন। কিন্তু মহারাজ দুজনকে কিছুতেই তাঁর সেবা করতে অনুমতি দিলেন না। অনেক বোঝানোর পর একজনের সেবা করার অনুমতি পাওয়া গেল। তিনি যখন 'bran bath' নিচ্ছিলেন তখন তাঁর জনৈক সহকর্মী এলেন। সেই সহকর্মী মহারাজকে বললেন, "ব্রহ্মচারীদের কাছ থেকে সেবা নিতে আপনি এত কুণ্ঠা বোধ করেন কেন ? আপনার সেবা করলে ওদেরই উপকার হবে। আমি এখনই আর একজন ব্রহ্মচারীকে বলে দিচ্ছি।" তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদের স্বরে মাধবানন্দজী বললেন, "না, না। তুমি তো জান, প্রত্যেক আশ্রম থেকে বার বার অনুরোধ আসছে আরো সাধুকর্মী পাঠানোর জন্য। এখন আমি যদি আমার ব্যক্তিগত সেবার জন্য দুজন কর্মীকে আটকে রাখি, তা অন্যায় হবে। একজনকেও রাখা ঠিক নয়। এতে শ্রীগুরুমহারাজ নিশ্চয় অসুখী হবেন।" তখন তাঁর সহকর্মী আর কিছু বলতে পারলেন না।

মাধবানন্দজী অপচয় করার বিরোধী ছিলেন। কোন জিনিসকে অযথা নষ্ট করতেন না বা করতে দিতেনও না। দৈনিক চিঠিপত্র, বুকপোষ্ট, প্যাকেট ইত্যাদি ডাকে আসত। যত প্যাকেটের কাগজ, দড়ি, সুতো ইত্যাদি আবর্জনার বাক্সে না ফেলে গুছিয়ে রাখতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ঃ "কাজ শেষ হবার পর কেউ ঝুড়ি-কোদাল ফেলে দেয়। কেউ আবার অপরের জন্য গুছিয়ে রাখে।" অফিসের এক সাধু একদিন বুকপোষ্টের দড়ি ও কাগজ

খুলে আবর্জনার বাক্সে ফেলে দিলেন। লক্ষ্য করলেন মাধবানন্দজী। ডাকলেন সাধুটিকে। সহাস্যবদনে তাকালেন তাঁর দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে যে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছেন কিনা। ইতিবাচক উত্তর পেয়ে স্বামী মাধবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের একটি ঘটনা বললেন: "বিদ্যাসাগর প্যাকেটের দড়ি-সুতোকে সুন্দর করে তাঁর শোবার ঘরে পেরেকে ঝুলিয়ে রাখতেন। এতে তাঁর নাতনি ঠাট্টা করত দাদুর এই অপ্রয়োজনীয় বাজে কাজের জন্য। বিদ্যাসাগরও ওৎ পেতে রইলেন নাতনিকে শিক্ষা দেবার আশায়। একদিন রাতে বিদ্যাসাগর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন মাত্র। হঠাৎ অন্ধকারে খুট খুট শব্দ। বিদ্যাসাগর আলো জ্বাললেন। নাতনি ঐ দড়ি নিচ্ছে। খপ্ করে তাকে পাকড়াও করলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করতে নাতনি বলল যে মশারী টাঙাবার দড়ি নেই। তাই চুপিচুপি এসেছিল দড়ির জন্য। তখন নাতনি বুঝেছিল দাদু বিদ্যাসাগরের বাজে কাজের রহস্য।" গল্প বলেই মাধবানন্দজী তাকিয়ে রইলেন সাধুটির দিকে। সেই সাধু তখন অনুধাবন করতে পেরেছেন গল্পের মর্মার্থ ও বুঝতে পারলেন মাধবানন্দজীর ইঙ্গিত।

সংঘের ঐতিহ্য যাতে সর্বতোভাবে রক্ষিত হয়, সেদিকে তিনি ছিলেন বিশেষ সচেষ্ট। সংঘের ঐতিহ্য—সত্যকে ধরে রাখা, অসত্যকে প্রশ্রয় না দেওয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে আহার্য দ্রব্যাদির উপর সরকার প্রবর্তন করেছেন নিয়ন্ত্রণ প্রথা। কিন্তু বাজারে ব্যবসায়ীরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অত্যধিক মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করতে লাগলেন। কোন এক আবাসিক বিদ্যালয়ে আবাসিকের সংখ্যা তখন দুশো। যুদ্ধারম্ভের কিছুকাল পরেই নিঃশেষিত হয়ে গেল বিদ্যালয়ের মজুত ভাণ্ডার। তখন বিদ্যালয়-অধ্যক্ষ ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করলেন সরকারী মূল্যে জিনিসপত্র দিতে। ব্যবসায়ীরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, সরকারী মূল্যে কোন খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব নয়। তবে তাঁরা ক্যাশমেমোতে সরকারী দরই লিখে দেবেন। বাড়তি মূল্যের জন্য অন্য ক্যাশমেমোতে অন্য দ্রব্য ক্রয় করা হয়েছে বলে লিখে দেবেন। তখন নিরুপায় বিদ্যালয়-অধ্যক্ষ ঐ ব্যবস্থা মানতে বাধ্য হয়েছিলেন আবাসিক ছাত্রদের জীবন রক্ষার কথা চিন্তা করে। এই ঘটনা জানতে পেরে মাধবানন্দজী খুবই বিরক্ত হলেন। ডেকে পাঠালেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে। তিনি কড়া নির্দেশ দিলেন: "তোমরা সাধু হয়ে এরূপ অসত্যের প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন? অসত্যের প্রশ্রয় কখনও দিও না। এতে যদি বিদ্যাপীঠ বন্ধ করে দিতে হয়, তাও শ্রেয়।" তিনি কিছুতেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বুঝতে চাইলেন না। তখন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ মাথা পেতে নিলেন তাঁর আদেশ। সংঘের প্রতি স্বামীজীর নির্দেশ: "ভিক্ষের পয়সা যে উদ্দেশ্যে লোকে দেয়, তাহা হইতে একটুও এদিক-ওদিক

করিবার আমাদের অধিকার নেই।” স্বামীজীর এই বাক্য মাধবানন্দজী অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। একবার একটি আশ্রমের সীমানা ঘেঁষে কর্পোরেশনের নিয়ম না মেনে জনৈক প্রতিবেশী বাড়ি তৈরী করেছিলেন। তিনি জানলা রেখে-ছিলেন আশ্রমের অতিথি নিবাসের দিকে। তাতে আশ্রমের কর্তৃপক্ষের নিষেধে কর্ণপাত করলেন না সেই প্রতিবেশী। তখন তাঁকে বলা হল যে তাঁর সীমানা ঘেঁষে আশ্রম থেকে প্রাচীর তুলে দেওয়া হবে। তখন হুঁশ হল প্রতিবেশীর। তিনি অনুরোধ করলেন অন্ততঃ দু'হাত ছেড়ে যেন সীমানা প্রাচীর তোলা হয়। আশ্রমের কার্যনির্বাহক কমিটি তা অনুমোদন করলেন। একবার স্বামী মাধবানন্দ কার্যোপলক্ষে ঐ আশ্রমে এলেন। প্রাচীর দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আশ্রমের অধ্যক্ষকে ঃ “এরূপে তুমি কার জমি ছেড়ে দিয়েছ ?” আশ্রম অধ্যক্ষ সব বললেন। কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি তাঁদেরকেও ঐরূপ বললেন। জনৈক সভ্য বললেন ঃ “আপনারা সাধু, ঐটুকু জমির জন্য কেন এরূপ বলছেন ?” উত্তরে অতি দৃঢ়স্বরে স্বামী মাধবানন্দ বললেন ঃ “আমরা সেরূপ সাধু নয়। জনসাধারণ বিশ্বাস করে যে কাজের জন্য আমাদিগকে ঐ জমিটুকু দিয়েছেন, তার একচুলও অন্যথা করবার অধিকার আমাদের নাই। আমরা উহার ট্রাষ্টী মাত্র। যে কাজের জন্য আমরা যাহা গ্রহণ করি, তা সেই কাজের জন্যই ব্যবহার না করিলে আমাদিগকে বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হতে হবে।” সকলেই বুঝলেন কথাটি। এরূপ ছিল তাঁর সংঘপ্রীতি ও সত্যানুরাগ।

স্বামী মাধবানন্দ ছিলেন প্রখর স্মৃতিধর সন্ন্যাসী। যা একবার শুনতেন বা পড়তেন, তা ভুলতেন না। যখন তিনি সংস্কৃত বইগুলির ইংরেজী অনুবাদের সম্পাদনা করতেন, তখন তাঁর মূলবই দেখবার প্রয়োজন হত না। তাঁর স্মৃতিশক্তির কথা কিংবদন্তীর মত ছিল। একদিন এক ব্রহ্মচারীকে তিনি ‘কথামৃতের’ তৃতীয় ভাগের কয়েকটি লাইন খুঁজে দিতে বললেন। ব্রহ্মচারী সেটি পেলেন না। কিছু পরে অধোবদনে তিনি এলেন মাধবানন্দজীর কাছে। মহারাজ বুঝতে পেরে বললেন, “অমুক পরিচ্ছেদে অমুক পৃষ্ঠায় অমুক তারিখে দেখ—পেয়ে যাবে। ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ বই খুলে দেখলেন মহারাজের কথাই ঠিক। তিনি অবাক হয়ে গেলেন মাধবানন্দজীর স্মৃতিশক্তি দেখে। আর একবার ময়মনসিংহের এক পরিচিত ভক্ত এসেছেন মহারাজের কাছে। মাধবানন্দজী সদ্য মঠে ফিরেছেন আমেরিকা থেকে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পর। বিভিন্ন প্রসঙ্গ হচ্ছে, পুরাতন ঘটনার স্মৃতিচারণ হচ্ছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের ময়মনসিংহে শুভ পদার্পণের প্রসঙ্গ উঠল। ভক্তটি বললেন ঃ “আমরা ১৯১৫ সালের জানুয়ারীতে পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজের সঙ্গে ময়মনসিংহে আপনাকে প্রথম দর্শন করি। এতকাল পূর্বের পরিচয়—এতেই আনন্দ হয়।” তৎক্ষণাৎ ভক্তটির

ভুল সংশোধন করে স্বামী মাধবানন্দ বলেছিলেন ঃ "তুমি ভুল করলে, ১৯১৫ সালে নয় ১৯১৬ সালে।" ভুল স্বীকার করলেন ভক্তটি। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি পূজনীয় মহারাজের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে। ছেচল্লিশ বছর আগের ঘটনা তাঁর ঠিক স্মরণে ছিল।

মাধবানন্দজীর মিতব্যয়িতা চোখে পড়বার মত ছিল। অত্যন্ত সাধারণ ভাবে থাকতেন। তিনি প্রণামী বাবদ কিছু অর্থ পেতেন। তা থেকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করতেন তিনি। অর্থাৎ টুথপেষ্ট, টুথব্রাশ, সাবান, বিছানার চাদর ইত্যাদি ক্রয় করতেন। এজন্য তিনি মঠের অর্থ নিতেন না। বছরের শেষে কিছু অর্থ থাকলে, তা তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় দিতেন।

প্রতিদিন তাঁর পাঠ্য ছিল 'কথামৃত'। মাঝে মাঝে গীতা পাঠও করতেন। 'Reader's Digest', 'Time' এবং 'Astrological Magazine' ছিল তাঁর প্রিয় পত্রিকা। এগুলি তিনি নিয়মিত পড়তেন।

মাধবানন্দজী সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে। তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব, নানান চিন্তায় ব্যাপৃত থাকত তাঁর মন। তবুও দেখা যেত মাঝে মাঝে তিনি উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন ঘরের বাইরের জানলার দিকে। যেন দূরে একটা কিছু দেখছেন নিবিষ্ট চিত্তে। কৌতূহলী কোন নবীন সন্ন্যাসী খুব সাহস করে একদিন জিজ্ঞাসা করে বসলেন, তিনি কী দেখেন অমন অপলক নেত্রে একদৃষ্টিতে বাইরের দিকে। একটু চুপ করে থাকার পর মাধবানন্দজী মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন ঃ "ঐ নারকেল গাছটিকে দেখ।" সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসু চোখ ফেরালেন সেদিকে। নারকেল গাছের পাতাগুলি দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ "যেমন মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, তালে তালে পাতাগুলোও কখনো দুলছে ডাইনে—বাঁয়ে, কখনো আবার সামনে—পিছনে, কখনো বা স্থির হয়েও আছে—যেন অচঞ্চল। আর এই কারণেই ঝড় ঝাপটাতে ওদের কিছু করতে পারে না—ওরা ভেঙে পড়ে না—অক্ষতই থাকে। আমরাও যদি অমনিভাবে সব সময়ে ঠাকুরের ইচ্ছার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারতাম।" এমনিভাবে তিনি নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন ঈশ্বরচিন্তায়। আর একদিন এক তরুণ সাধু মাধবানন্দজীর মাথা মুণ্ডন করে দিচ্ছিলেন। আত্ম-প্রশংসায় উৎসাহের বশবর্তী হয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ "মহারাজ, আমি কিন্তু দক্ষ নাপিতের মত ভাল কামাতে পারি।" একটু মুচকি হেসে মহারাজ উত্তর দিলেন ঃ "মানুষকে বা অন্য কোন প্রাণীকে অনুকরণ কোরো না। সব ব্যাপারে একমাত্র ঈশ্বরকেই অনুসরণের চেষ্টা করবে। 'আমার চিন্তা-ভাবনা, চলা-ফেরা, কাজকর্ম দেবতার মত! আমি শিবের মত বসেছি, শিবের মত ধ্যান করি'—এই রকম কথাই সর্বদা ভাবতে ও বলতে চেষ্টা করবে।" তারপর বললেন একটি মজার গল্প ঃ "শুয়োরের ঘেঁ্যাৎ-ঘেঁ্যাৎ আওয়াজ নিজের গলায় অনুকরণ করে, পাড়ার লোককে

তাই শুনিয়ে শুনিয়ে একটা লোক বেশ কিছু টাকা রোজগার করে জমিয়েছিল। হায় এত কষ্টের রোজগার! একদিন ঘরে ডাকাত ঢুকে লোকটির ঐ জমানো টাকাকড়ি সব লুটপাট করে নিয়ে গেল।" মাধবানন্দজীর সর্বদা সব কিছুর মধ্যে ছিল ভগবদ্দৃষ্টি।

মাধবানন্দজীর গুরুগাম্ভীর্য, বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজের চিন্তা ও আধ্যাত্মিক ভাব-তন্ময়তার মধ্যেও দেখা যেত সরস কথাবার্তায় ও হাসি-ঠাট্টাতে তাঁর জুড়ি নেই। তিনি ছিলেন রসিক সন্ন্যাসী। কৌতুককর কথায় তিনি ছিলেন পারদর্শী, অপরকেও হাসাতেন খুব। 'Reader's Digest'-এর 'tit-bits' ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। একদিন তিনি রাত্রির প্রসাদের পর খাওয়ার ঘর থেকে আসছিলেন নিজের ঘরের দিকে। তাঁর পিছন পিছন আসছিলেন একজন নবীন সন্ন্যাসী। অফিসবাড়িতে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছাকাছি পোঁছে মাধবানন্দজী লক্ষ্য করলেন পিছনে আগত সন্ন্যাসীকে। অতঃপর আলো জ্বালিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আলোটি আর নেভালেন না তিনি। গিয়ে বসলেন তাঁর নিজের ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে সেই নবীন সন্ন্যাসীও প্রবেশ করলেন সেই ঘরে। পূজনীয় মহারাজ একটু হেসে বললেন তাঁকে ঃ "তুমি জান 'প্রসাদী হাওয়া' কাকে বলে ?" সন্ন্যাসীর উত্তর নেতিবাচক জেনে তিনি বললেন ঃ "এক গুরুদেব গরমকালে পাখা দিয়ে নিজেই হাওয়া খাচ্ছিলেন। সেই সময়ে নিঃশব্দে এক শিষ্য এসে বসলেন গুরুর পিছনে। একটু পরে শিষ্যের প্রতি নজর পড়ল গুরুদেবের। উদ্বিগ্ন গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন শিষ্যকে যে সে অসুস্থ কিনা। উত্তর দিলেন শিষ্য ঃ "না গুরুদেব, আমি আপনার প্রসাদী হাওয়ায় ধন্য হবার জন্য এমনি করে বসে আছি।" গল্প শেষ করে মাধবানন্দজী বললেন ঃ "তুমি আজ প্রসাদী আলো পেলে।" বলেই হেসে উঠলেন উভয়েই। তারপরেই তিনি বললেন, "ভদ্রলোকের এক কথা বলে একটি কথা আছে তুমি জান ?" সন্ন্যাসী ইতিবাচক উত্তর দিলেন। মহারাজ বললেন, "কি রকম শোন, তুমি যদি কোন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা কর 'আপনার বয়স কত ?' ধর, তিনি উত্তর দেবেন 'বত্রিশ বছর।' দু'তিন বছর বাদে আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলবেন, 'কেন, আমার বয়স বত্রিশ বছর।' কারণ কি জান ? কারণ তিনি একজন ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের এক কথা।" আবার হাসির রোল উঠল। এমনকি অসুস্থতার মধ্যেও তিনি রসিকতা করে অবাক করে দিতেন সকলকে। তখন তিনি সংঘাধ্যক্ষ। হঠাৎ বাম পায়ের হাড় ভেঙে সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেন। বড় ধরণের অস্ত্রোপচার করাও হল। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন তিনি। একদিন এক প্রাচীন সন্ন্যাসী তাঁকে দর্শন করতে গেছেন সেবা প্রতিষ্ঠানে। প্রাচীন সন্ন্যাসী বলছেন ঃ "ঠাকুর সব যোগাযোগগুলি কেমন করে দিলেন! ডাক্তার, সার্জেন, সব ঐ সময়ে পাওয়া গেল—আরও যা যা দরকার তাও সব যোগাড় হয়ে গেল।

"তিব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামা পাঞ্চেন লামাকে সঙ্গে নিয়ে বেলুড় মঠ দর্শনে এসেছিলেন ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারীতে। সঙ্গে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সিকিমস্থ ভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধি শ্রী আপ্পাসাহেব পন্থ।" —পৃষ্ঠা ৯ ▽

◁ "প্যাসাডেনায় মীড্ ভগিনীত্রয়ের যে বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ তিন সপ্তাহ বাস করেছিলেন, সে বাড়িটি একটি উপাসনাগারে রূপান্তরিত করা হয়। এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানেও তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন।" —পৃষ্ঠা ৫৯

"তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে মঠের সব মন্দির দর্শন করিয়েছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও স্বামী মাধবানন্দ।"—পৃষ্ঠা ৫৯

ঠাকুরের অসীম কৃপা।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের সরস উত্তর : "ঠাকুরের এত যদি কৃপা, তা হলে accident-টিও না করালেই পারতেন।" একবার তাঁর অসুখের সময় ডাক্তার এক বিস্বাদ ওষুধের ব্যবস্থা দিলেন। তিনিও সে ওষুধ দিনের পর দিন নিয়মিত খেতেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। একদিন ওষুধ খাবার সময় উপস্থিত কোন সাধুকে কৌতুক করে বলেছিলেন, "দেখ, এই ওষুধটিকে আমার ডাক্তার তাঁর নিজের ছেলের চেয়েও বেশি ভালবাসেন। কিছুতেই তাই এটিকে আর বদলান না। আমিও দেখনা তাই আদর করে খেয়েই চলেছি।"

তিব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামা পাঞ্চেন লামাকে সঙ্গে নিয়ে বেলুড় মঠ দর্শনে এসেছিলেন ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারীতে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সিকিমস্থ ভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধি শ্রী আপ্পা সাহেব পন্থ্। তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে মঠের সব মন্দির দর্শন করিয়েছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও স্বামী মাধবানন্দ। পরে তাঁদের সংঘাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মাধবানন্দজী। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় পুস্তক উপহার দেওয়া হয়েছিল তাঁদের।

মাধবানন্দজী আমেরিকায় প্রথম যান বেদান্ত প্রচারকরূপে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে। তারপরেও কয়েকবার বিদেশে গিয়েছিলেন তিনি—সিঙ্গাপুরে তিনবার (১৯৫২, ১৯৫৯ ও ১৯৬৪), কুয়ালালামপুরে একবার (১৯৫৯), রেঙ্গুনে দু'বার (১৯৫৯ ও ১৯৬৩) এবং আমেরিকায় ও ইউরোপে দু'বার (১৯৫৬ ও ১৯৬১)। সংঘাধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করার পরেও ভক্তদের আন্তরিক আগ্রহে তাঁকে সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনে যেতে হয়েছিল। সংঘাধ্যক্ষরূপে তিনিই প্রথম বিদেশযাত্রী। প্রথমবারে সিঙ্গাপুরে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন স্বামী যতীশ্বরানন্দ, স্বামী ওঙ্কারানন্দ ও স্বামী ভাস্বরানন্দ। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও মর্মরমূর্তি উৎসর্গ করেন মাধবানন্দজী। এর সাত বছর পরে তিনি আবার সেখানে যান স্বামী যতীশ্বরানন্দকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষে রেঙ্গুনে যান। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী নির্বাণানন্দকে সঙ্গে করে মাধবানন্দজী গিয়েছিলেন আমেরিকার হলিউডে বেদান্ত সমিতিতে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি সেখানকার সান্তা বারবারা শ্রীসারদা মঠে বেদান্ত-মন্দিরের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান কার্য সম্পাদন করেন তিনি। এই উপলক্ষে আমেরিকায় মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসী ও ভক্তেরা উপস্থিত ছিলেন। প্যাসাডেনায় মীড ভগিনীত্রয়ের যে বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ তিন সপ্তাহ বাস করেছিলেন, সে বাড়িটি একটি উপাসনাগারে রূপান্তরিত করা হয়। এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানেও তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন। হলিউড কেন্দ্র ব্যতীত বস্টন, প্রভিডেন্স, উত্তর কালিফোর্নিয়া, সানফ্রানসিস্কো, বার্কলে, স্যাক্রামেন্টো, সিয়াটল, পোর্টল্যান্ড, চিকাগো, সেন্ট লুইস ও নিউইয়র্ক কেন্দ্রগুলিতেও তাঁদের শুভাগমন হয়েছিল। এই সকল স্থানে মাধবানন্দজী বক্তৃতা, স্মৃতিচারণ ও সৎ-প্রসঙ্গাদি করেছিলেন। বিভিন্ন

অনুষ্ঠানে যোগদানেরও সুযোগ হয়েছিল তাঁর। হলিউডে তিনি দিয়েছিলেন দুটি বক্তৃতা—'বিবেকানন্দ ও তাঁহার বাণী' ও 'কর্মজীবনে বেদান্ত'। গীতা ও কথামৃতের ক্লাসও নিয়েছিলেন তিনি। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের নিয়ে করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ। সানফ্রানসিস্কো ও বস্টনে ধর্মপ্রসঙ্গ ও প্রশ্নোত্তরের ক্লাস তাঁকে নিতে হয়। এই দুটি কেন্দ্র ও প্রভিডেন্সে তাঁর বক্তৃতাগুলি ছিল—'প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্ত', 'বেদান্ত', 'শ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র'।

কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক উইলসন পাওয়েল তাঁদের দেখান পরমাণু বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত সাইক্লোট্রন যন্ত্র। 'মুর বনানী'তে বিখ্যাত হাজার বছর বয়সের রেডউড বৃক্ষ এবং গোল্ডেন গেট পার্কে ষ্টীনহার্ট মৎস্য-সংরক্ষণালয় ও বিজ্ঞান শিক্ষালয় প্রভৃতিও তাঁরা পরিদর্শন করেন। উত্তর কালিফোর্নিয়ার সকল বেদান্ত-কেন্দ্র ও সভ্যগণের পক্ষ থেকে মাধবানন্দজী ও নির্বাণানন্দজীকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয় ৩রা মার্চ। সভাপতি ছিলেন স্বামী অশোকানন্দ। ১৬ই মার্চ সিয়াটল বেদান্ত কেন্দ্রে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান হয়। এই সভায় স্বামী মাধবানন্দ 'বর্তমান ভারতের একজন দেবমানব' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সেখানকার স্থানীয় সংবাদপত্র 'The Seattle Post-Intelligence' (১৪ই মার্চ) লিখেছিল: "ভারতবর্ষ হইতে দুইজন ধর্মনেতা মঙ্গলবার সিয়াটলে পেঁাছিয়াছেন—উদ্দেশ্য স্থানীয় রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রটি পরিদর্শন এবং হিন্দুধর্মের 'বাণী প্রচার'। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর হাল্কা ধূসর রংয়ের পোষাকে তাঁহাদিগকে বেশ মর্যাদাসম্পন্ন ও স্বচ্ছন্দ দেখাইতেছিল। যে ধর্মান্দোলনের দ্বারা ভগবানের বাণী প্রতি বৎসর বেশী লোকের নিকট পেঁাছিতেছে, তাঁহারা উহার কথা বলিতে ছিলেন। স্বামী মাধবানন্দের মতে, যে প্রবর্ধিত ধর্মভাব আমেরিকায় কাজ করিতেছে উহা ভারতে সক্রিয়। তিনি বলেন—'এই ধর্মীয় চেতনা হইতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে মানসিক উত্তেজনা রহিয়াছে উহা কমিয়া আসিবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সহিত একত্ব বোধ করেন, তিনি বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ—জগতের সব সমস্যারই তিনি সমাধান।' শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গে বক্তা বলেন যে, গভীর ভগবৎ-সান্নিধ্যই তাঁহাকে সক্ষম করিয়াছিল মানুষকে বুঝিতে ও শান্তি দিতে। স্বামী মাধবানন্দ আরও বলেন, 'বেদান্তের সার্বভৌম আদর্শে অনুপ্রাণিত হিন্দু কোন দলের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে যান না। খৃষ্টধর্ম বেদান্তেরই একটি দিক প্রকাশ করে। ঈশ্বরের প্রতি আবেগময় ভালবাসার ভাব দুয়েতেই বর্তমান এবং এই ভাবসাদৃশ্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে সম্মিলিত করিবে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই ঘটিবে উভয়ের মিলন।"

আমেরিকার পর ইউরোপে লণ্ডন ও ফ্রান্সের বেদান্ত কেন্দ্র এবং রোম,

এথেন্স ও কায়রো পরিদর্শন করে মোট চার মাস পরে ৫ই মে তারিখে মঠে ফিরলেন মাধবানন্দজী। লণ্ডনে ক্যাক্সটন হলে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সভাতেও তিনি একটি সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী ভাষণ দেন। সভাপতিত্ব করেন ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রদূত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। এখানেও বেদান্ত অনুরাগীরা একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন মাধবানন্দজীকে। সভায় অন্যতম বক্তা ছিলেন প্রখ্যাত লেখক ও চিকিৎসক মিঃ কেনেথ ওয়াকার। স্বামী মাধবানন্দ তাঁর ভাষণে বলেন: "ভারতীয় দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান অবদান হইল তাঁহার সেবাধর্মের উপদেশ। এই মহান ঋষি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, অখিল সৃষ্টি হইল ঈশ্বরেরই বিভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ। দরিদ্র এবং পীড়িতকে আমরা 'সাহায্য' করিতে পারি এইরূপ মনে করা অর্থহীন, কেননা তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরকেই 'সাহায্য' করিতে বসিয়াছি। তবে আমরা মানুষরূপী ভগবানকে সেবা করিতে পারি। এইরূপে জীবনের যে কোন কর্মক্ষেত্রে আমরা যাহাই করি না কেন, সবই ভগবানের পূজা বা উপাসনার ভাবে করা উচিত। অবশেষে আমরা দেখিতে পাইব এইভাবে ভগবানের সেবা করিয়া আমরা নিজেদেরই উপকার করিয়াছি।"

মাধবানন্দজী শেষবার আমেরিকায় যান স্বাস্থ্যের কারণে। তিনি মস্তিষ্কে দুষ্ট ব্রণতে (Brain tumor) আক্রান্ত হন। চিকিৎসকেরা পরামর্শ দেন আমেরিকায় গিয়ে অস্ত্রোপচার করাতে। কিন্তু সেখানে ব্যয়বহুল এই চিকিৎসায় মাধবানন্দজীর একান্ত আপত্তি ছিল। তিনি বলেছিলেন যে এ দেহ নশ্বর। আজ না হয় কাল তো যাবেই। এর জন্য সংঘের মূল্যবান অর্থ ব্যয় করা একান্ত অনুচিত হবে। চিকিৎসকদের অভিমত, শুভার্থীগণের অনুরোধ এবং প্রাচীন সাধুদের পীড়াপীড়ি কোন কিছুতেই তাঁকে রাজী করানো যায়নি। এই সময় নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁকে একটি চিঠিতে জানান যে, চিকিৎসার সব ব্যয় তিনি বহন করবেন। স্বামী নিখিলানন্দের এই চিঠি পাওয়ার পরে মাধবানন্দজী তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং আমেরিকায় চিকিৎসা করাতে যেতে রাজী হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিউইয়র্ক যান ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। নিউইয়র্ক হাসপাতালে ২৬শে এপ্রিল তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়। নিউইয়র্কে মহিলা সেবিকাদের সেবা নিতে তিনি অসম্মতি জানান। ফলে নিখিলানন্দজীকে পূজনীয় মহারাজের সেবার জন্য পুরুষ নার্সের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল—যা আমেরিকায় ছিল দুস্প্রাপ্য। টিউমারটির আকৃতি ছিল মুরগীর ডিমের মত। অস্ত্রোপচারের পর প্রথম কয়েকদিন একেবারে শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। কিছুদিন পরে ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। নিজের হাতে 'wish' লিখে সকলকে জানান। প্রথমে তরল পদার্থ, পরে কঠিন

খাবার গ্রহণ করেন তিনি। তিন সপ্তাহের পর তিনি চেয়ারে বসতে সমর্থ হয়েছিলেন। ২৭শে মে তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নিউইয়র্কের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রে বিশ্রাম নেন। একমাস পরে আরও বিশ্রামের জন্য থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যান। আগস্টে লাঠির সাহায্যে হাঁটতে আরম্ভ করেন। সেপ্টেম্বরে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক থেকে নিজের হাতে একটি চিঠি লিখে মঠে প্রেরণ করেন, "We shall go back to New York on the 7th September. Thereafter consulting the doctor we shall decide about further operation (for cataract). The reading glass that Dinesh (Swami Nikhilananda) procured me before coming here, are serving fairly well. The double vision persists—but not all the time.

"I am walking about a mile everyday and part of the distance without a stick. But the balance of the body is still very poor, atleast on uneven ground, particularly, in steps or staircases."

ডিসেম্বরে তাঁর দুই চোখের ছানিও (cataract) অস্ত্রোপচার করা হয়। আরো কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে মাধবানন্দজী মঠে প্রত্যাবর্তন করলেন ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী।

সংঘাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দের মহাপ্রয়াণ হল ১৩ই জানুয়ারী। তাঁর স্থানে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হলেন অষ্টম সংঘাধ্যক্ষ। সেইসঙ্গে ১৬ই মার্চ সহ-সংঘাধ্যক্ষ পদে বৃত হলেন মাধবানন্দজী। পুরো পাঁচ মাস অতিক্রান্ত না হতেই স্বামী বিশুদ্ধানন্দ চলে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-লোকে। এরপরে সংঘাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন স্বামী মাধবানন্দ ৪ঠা আগষ্ট ১৯৬২। তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায় ব্যয়িত হয়েছিল মানুষের আধ্যাত্মিক কল্যাণ কামনায়। যদিও তাঁর অধ্যক্ষতাকাল ছিল স্বল্প—প্রায় চার বছর, তবুও সংঘের ইতিহাসে তা খুবই প্রেরণাপ্রদ ও অনুকরণীয়।

এইকালে সংঘটিত হয়েছিল বিশ্বব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব। এই উপলক্ষে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির প্রথমে সহ-সভাপতি ছিলেন স্বামী মাধবানন্দ। স্বামী বিশুদ্ধানন্দের আকস্মিক মহাসমাধির পর শতবার্ষিকী সাধারণ কমিটির সভাপতির পদে তিনিই অভিষিক্ত হন। তিনি এই শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করেন ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী স্বামীজীর শুভ জন্মতিথিতে বেলুড় মঠে। এই উপলক্ষে মঠ বাড়ির দোতলার বারান্দায় বসে স্বামী মাধবানন্দ পাঠ করেছিলেন ইংরেজীতে রচিত তাঁর বাণী। পরে তাঁরই আদেশে এক সন্ন্যাসী বঙ্গানুবাদ পাঠ করে শোনান উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ও

জনসাধারণকে। সংঘাধ্যক্ষের এই বাণী বেতার-যোগে প্রচারিত হয় দেশে-বিদেশে। তাঁর বাণীর শেষ অংশে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন দেশবাসীর কাছে—"এই শতবার্ষিকী বৎসরে স্বামীজীর চিন্তা দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইবে এবং মানুষের গঠনমূলক আধ্যাত্মিক শিক্ষার চিরন্তন উৎস হইয়া থাকিবে। এগুলি হইতে মানুষ লাভ করিবে এক দিব্যদৃষ্টি, আরও লাভ করিবে মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে একত্ব, সমন্বয় ও সহযোগিতা আনয়ন করিবার সঙ্কল্প। স্বামীজীর যে বিরাট ভাব ভারতকে জাগ্রত করিয়াছিল এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলিত করিয়াছিল, সেই ভাব আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজের মুক্তির জন্য ও জগতের কল্যাণের জন্য—এই জীবনপ্রদ নীতির আলোকে আমরাও যেন ঐ উদ্দেশ্যে জীবনব্যাপী কার্য করিতে পারি।" শতবার্ষিকী কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হয়েছিল তাঁর এই বাণী।

শতবার্ষিকীর সমাপ্তি উৎসবের অঙ্গরূপে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সাত দিনের ধর্মমহাসভার উদ্বোধক ছিলেন তিনি। তবে তিনি অসুস্থ থাকার দরুণ তাঁর লিখিত উদ্বোধনী ভাষণটি পাঠ করেছিলেন স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ। স্বামীজীর শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে স্বামী মাধবানন্দ শুভাগমন করেছিলেন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন আশ্রমে। আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিল ভক্তমণ্ডলী। তাঁর দর্শনে সকলের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়েছিল উৎসাহের জোয়ার। তিনিও সকলের অন্তরে জাগ্রত করেছিলেন স্বামীজীর মর্মবাণী। যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই তাঁর পদপ্রান্তে ছুটে এসেছে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শত শত জিজ্ঞাসু মানুষ।

শ্রীশ্রীমার কৃপাধন্য সন্তান স্বামী মাধবানন্দের লক্ষ্য ছিল মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ পথে চালনা করা—আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গে পরিচালিত করা; যাতে জীবন পূর্ণ হয় পরম প্রশান্তিতে। যে আনন্দময় রাজ্যে তিনি ছিলেন বিচরণকারী সেখানে তিনি উন্নীত করতে চেয়েছিলেন সকলকে। সংঘাধ্যক্ষ হয়ে তিনি তখন দীক্ষাগুরুর পদে আসীন। মন্ত্রদীক্ষাদি-দানব্রতে তিনি ব্রতী। তাঁর এই কাজে তিনি ছিলেন চির অকৃপণ। আগ্রহী প্রার্থীকে যথোচিত সাধন-উপদেশাদি দানে কখনও বিমুখ করতেন না তিনি। অধ্যক্ষ হয়ে তিনি যেন সাক্ষাৎ 'মা' হয়ে যান। কোথায় সাধারণ সম্পাদকের কাঠিন্য ও গম্ভীরতা—সব দ্রবীভূত হয়ে গেল করুণার সাগরে। তাঁর নিজের উক্তি: "মা যদি বেছে-টেছে কৃপা করতেন তাহলে কি আমি তাঁর কৃপা পেতাম? ওসব বাছবিচারে আমি নেই। মায়ের দেখানো পথেই আমি চলব।" একবার একজন তাঁর কলঙ্কময় জীবনের কথা জানিয়ে কৃপা ভিক্ষা করে মাধবানন্দজীকে একটি চিঠি লেখেন। তাঁর সচিব-সেবক সঙ্কোচে চিঠির মর্মার্থ জানালেন মহারাজকে এবং বললেন: "ইণ্টারভিউ-এর জন্য বরং একদিন ওঁকে আসতে চিঠি

দিই একটা ?" মহারাজের স্নেহ মাখানো উত্তর ঃ "মা তো আমাকে ইণ্টারভিউ নিয়ে কৃপা করেননি, তুমি ওকে দিন (দীক্ষার) ঠিক করে আসতে লিখে দাও।" তিনি নিজেকে কখনও গুরু বলে মনে করতেন না। বলতেন ঃ "শ্রীশ্রীঠাকুরই গুরু।" তিনি আরো বলতেন, "তোমরা কেউ মন্দিরে কাজ কর, বাগানে কাজ কর, রান্নাঘরে কাজ কর। আমিও কাজ করি দীক্ষা দিয়ে। এর বেশি কিছু নয়।"

অধ্যাত্ম-পিপাসুদের জটিল সমস্যা ও সন্দেহের অতি সহজ সমাধান করে দিতেন মাধবানন্দজী তাঁর সাধারণ ছোট ছোট সরল কথায় ও উপদেশে। হয়ত সম্প্রতি দীক্ষাপ্রাপ্ত তাঁর শিষ্য হতাশ চিত্তে তাঁর কাছে নিবেদন করেছেন ঃ "মহারাজ, যেমন আপনি বলে দিয়েছেন, জপ-ধ্যান তো নিয়মিত তেমনই করে যাচ্ছি, কিন্তু কিছুই তো উপলব্ধি হচ্ছে না।" তিনি সহাস্যে উত্তর দিলেন ঃ "তুমি দুধের বাটিটি হাতে নিয়েই কি শরীরের Strength বুঝতে পার ? অনেকদিন দুধ খেতে হয়, খেয়ে হজম করতে হয়, তারপরে আস্তে আস্তে তার পুষ্টি উপলব্ধি করা যায়। তোমাদের এই তরুণ বয়স—এই তো সবে মাত্র শুরু। ধৈর্য ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে চলতে থাক। হতাশ হবার কিছু নেই।" একজন পত্রে জানিয়েছেন যে তাঁর আলোর প্রয়োজন। তিনি জবাব দিচ্ছেন, "তুমি 'আলোর প্রয়োজন' লিখিয়াছ। কি হারাইয়াছ—যাহার জন্য পথ অন্ধকার হইয়াছে ?" জনৈক ভক্ত মহারাজের সংবাদ না পেয়ে চিন্তিত—চিঠি দিয়েছেন। উত্তরে তিনি লিখলেন, "আমার পত্র না পাইলে মন খারাপ করিবার কি আছে ? ঠাকুর কি আমাকে দেখিতেছেন না ? যাহার অন্য কোন কাজ নাই—সেই এইরূপ মন খারাপ করে। আমার প্রতি সর্বদা নির্ভর না করিয়া তোমার অন্তরে ঠাকুর আছেন—তাঁহারই সর্বদা শরণ লইবে। তোমার প্রার্থনা আন্তরিক হইলে তিনি পূর্ণ করিবেনই।" কোন দীক্ষিত শিষ্য মনের চঞ্চলতায় দিশেহারা হয়ে চিঠিতে জানিয়েছেন তাঁকে। তিনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন, "মন স্বভাবতই চঞ্চল। আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। সেই সকল মনকে বিক্ষিপ্ত করে। কাজেই নিরন্তর চেষ্টা করিয়া বশে না আনিলে সে তো অশান্ত থাকিবেই। মন স্থির হউক বা না হউক তুমি নিয়মিত জপ-ধ্যানে বসিতে ছাড়িবে না। এইরূপ করিতে করিতে মন ধীরে ধীরে বশে আসিবে। ·· কোন বিরুদ্ধ চিন্তা অর্থাৎ পবিত্র চিন্তা করা উচিত, যেমন ঠাকুরের নিষ্পাপ জীবনের চিন্তা করা। নিজের মনকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য নহে। বরং সাবধানে তাহার মোড় ফিরাইয়া লওয়া উচিত। ঠাকুর ও মায়ের চরণে তুমি মনে মনে প্রত্যহ আন্তরিক প্রার্থনা জানাইবে, যাহাতে তাঁহারা ঐ সকল মানসিক দুর্বলতা দূর করিয়া দেন।" কেহ হয়ত উপদেশ প্রার্থনা করেছেন তাঁর কাছে। শুনিবামাত্র তাঁর জবাব, "উপদেশ ? কথামৃত, মায়ের কথা ও স্বামীজীর বই পড়বে। তাতেই সব পাবে।"

তবুও ভক্তেরা মহারাজের কাছে আবদার করতেন, তাঁকে প্রার্থনা জানাতেন

কিছু শোনবার জন্য। সমবেত ভক্তদের আবদার এড়াতে পারতেন না তিনি। তাই মাঝে মাঝে তাঁর ঘরে বসত ভগবৎ প্রসঙ্গের আসর। কেউ হয়ত দু'একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন তাঁকে। তিনিও উত্তর দিতেন। কথা উঠেছে গুরু-করণের। তিনি বলছেন, "শাস্ত্র গুরুকরণের কথা বলেছেন। সদ্‌গুরু কৃপা করে শিষ্যকে ইষ্টমন্ত্র দিয়ে সাধন পদ্ধতি বলে দেন। 'ইষ্ট' কথার মানে প্রিয়। ভগবানের প্রিয় যে রূপ—সেই আমার ইষ্টমূর্তি। আর তাঁর প্রিয় যে নাম—আমার ইষ্টমন্ত্র। গুরু শিষ্যকে তাই বলে দেন। ভগবান কৃপা করে মন্ত্রের মধ্যে সব শক্তি দিয়েছেন। নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও আগ্রহের সঙ্গে ঐ মন্ত্র জপ করে যেতে হয়। অনেকে মনে করেন, মন্ত্র নিলেই সব হয়ে গেল, কাজেই আর কিছু করতে হবে না। এটি একেবারে ভুল ধারণা। মন্ত্র পেলে মানে প্রথম পৈঠাতে পা দিলে। যত পথ চলবে—পথের দূরত্ব তত কমে আসবে। মন্ত্রে বিশ্বাস রেখে সাধন করে যেতে হয়। মনে রাখতে হবে সচ্চিদানন্দই আসল গুরু। আবেদন-নিবেদন যা কিছু তাঁর কাছেই করতে হয়।" কথা উঠেছে ভগবানের কৃপালাভের অন্তরায় কোথায়? মহারাজের উত্তরঃ "আমাদের অহঙ্কারই হল যত অনর্থের মূল। ঠাকুর তাই বললেন, অহঙ্কার ত্যাগ করতে না পারলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না, তিনি ভার লন না। এই 'আমি' 'আমার' জন্য আরো অনেক জাগতিক কামনা বাসনা এসে পড়ে। তাই তাঁকে পাই না। আর এই কামনা-বাসনাগুলি পূরণ করার জন্য আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। তিনি যেগুলি পূরণ করা প্রয়োজন মনে করেন সেগুলিই দেন। ছেলে আবদার করে বিষ চাইলে মা কি দেবেন? কখনই না। সে জন্য তাঁর কাছে বড় জিনিস চাইতে হয়। ভক্তি বিশ্বাসই হল আসল। আর 'অহং' তো সহজে যাবে না—কাজেই তাঁরই দাস হয়ে থাকুক। ঠাকুর এই 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি'র কথাই বার বার বলে গেলেন।" মাধবানন্দজী সাহস দিতেন, উৎসাহ দিতেন। তিনি বলতেন, "নিজেকে কখনও ছোট বা দুর্বল মনে কোরো না। ছোট ছেলের আবদার করার মত তাঁকেই সব জানাও। মা বলছেন, আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, তা'হলে আমাকেই তো তুলে পরিষ্কার করতে হবে। ভগবানকে আশ্রয় করে থাকলে তলিয়ে যায় না। একদিন না একদিন দর্শন লাভ করে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে।"

একবার কোন আধুনিক লেখক স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু অশোভন মন্তব্য করে লিখেছেন একটি পত্রিকাতে। জনৈক নবীন সন্ন্যাসী সেবিষয়ে মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি বললেন, "আহা বেচারা! স্বামীজী কৃপা করে যখন তার ভুল ভাঙিয়ে দেবেন, তখন সে নিশ্চয়ই অনুতাপ করবে। তিনি সকলের মধ্যেই রয়েছেন—যাকে যেমন বোঝাচ্ছেন, সে সেইরকমই বুঝেছে। জগতে তিনি ছাড়া কিছুই নেই। তোমরা কিছুই ভেবনা, কালে সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা ঠিক দেখবে, জগতে এমন দিন আসবে, যখন

সারা বিশ্বে স্বামী বিবেকানন্দই উপাস্য হবেন।" যুবকদের মধ্যে স্বামীজীর আদর্শ ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের অগ্নি প্রজ্বলিত করতে তিনি ছিলেন সদা উৎসাহী। তিনি তাঁদের মনে গেঁথে দিতেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ অভিন্ন। কোন বৈরাগ্যবান যুবকের সংসার ত্যাগের সঙ্কল্পে তিনি খুব খুশী হতেন। এক যুবককে তিনি একবার লিখেছিলেন, "যদি সাধু হইতে চাও, তবে অনর্থক সময় নষ্ট করিও না। বেশী বয়স হইলে তখন শুধু হিসাবই মনে হইবে। ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হইবে না। আমাদের সংঘের যাবতীয় কাজই শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা বলিয়া আমরা করিয়া যাই। এই যুগের ইহাই নতুন ধর্ম। তুমি কালবিলম্ব না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র একটা মত স্থির করিয়া লও। দেরী করিলে শেষে গৃহস্থাশ্রমেই থাকিতে হইবে। বিবাহ কর আর নাই কর—'The spirit indeed is willing, but the flesh is weak'—এইরূপ হইয়া যাইতে পারে।"

আবার কোন বিবাহিত যুবক হয়ত সংসারের ঝামেলা এড়াবার জন্য সাধু হতে চায়। তার মনের ভাবটি জেনে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, "তুমি গৃহস্থাশ্রমেই থাকিয়া যতটা সম্ভব নিজেকে শ্রীভগবানের চরণে বিকাইয়া দিবার চেষ্টা কর। এই সবেমাত্র বিবাহ করিয়াছ। এখন সংসার ত্যাগের কথা কি বলিতেছ ? ওকথা একেবারে ভুলিয়া যাও।" যোগ্যতা বুঝে, যাকে যেমন তাকে তেমন পথের সন্ধান দিতেন মহারাজ। তিনি ছিলেন আদর্শ ধর্মগুরু।

মাধবানন্দজী লোককল্যাণ-চিন্তায় ছিলেন সর্বদা তৎপর। নিজের অসুস্থ শরীর, বার্ধক্য-জরা, আহার-বিশ্রামাদি কিছুই তিনি গ্রাহ্য করতেন না। একবার জনৈক যুবক সঙ্গদোষে কুপথে পরিচালিত হন। পরে তাঁর মনে আসে অনুশোচনা। অনুতপ্ত হৃদয়ে বেলুড় মঠে সংঘাধ্যক্ষের কাছে নিজের কৃতকর্মের কথা অকপটে নিবেদন করেন তিনি। পরম মমতায় ও অপার সহানুভূতিতে মহারাজ শুনলেন যুবকের আর্তি। তাঁকে আর একদিন আসতে বললেন তিনি। উদ্ভ্রান্ত যুবক হঠাৎ একদিন মঠে উপস্থিত। সাক্ষাতের প্রার্থনা জানালেন সেবকের মাধ্যমে। কিন্তু সেদিন মহারাজ সারা দিনই মঠ-মিশনের কোন বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ কাজে ব্যস্ত। তার উপর, তাঁর শরীরও খুব ভাল নয়। সারাদিনের পরিশ্রমের পর তাঁর শরীর তখন অবসন্ন। কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করাও তখন তাঁর পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু যেই শুনলেন সেই বিপথগামী যুবক তাঁর জন্য সারাদিন অপেক্ষা করে বসে আছেন, অমনি তিনি ভুলে গেলেন নিজের শরীরের কথা। কারুর নিষেধ গ্রাহ্য না করে তিনি যুবকটিকে ডাকলেন তাঁর কাছে। নিভৃতে আলাপ চলল দুজনের। পাছে যুবকটির ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে শরীর খারাপ হয়ে যায়, সেজন্য তিনি একটি বেতের মোড়া আনিয়ে রেখেছিলেন। মহারাজের কথায় আমূল পরিবর্তিত হয়েছিল যুবকটির জীবন। অনুরূপ আর

একটি ঘটনা। মির্চা এলিয়াদের 'লা নুই বেঙ্গলী' গ্রন্থে বর্ণিত যুবক এ্যালেন একবার নৈতিক পদস্খলনের তীব্র অনুশোচনায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন। সেই অবস্থায় একদিন তিনি অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে মধ্য কলকাতা থেকে বেলুড় মঠে আসেন। এ্যালেন মাধবানন্দজীর পূর্ব পরিচিত। মলিন ও হতাশাগ্রস্ত এ্যালেনকে দেখতে পেয়ে মাধবানন্দজী তাঁকে পাশে বসিয়ে কথা বললেন, আহারের ব্যবস্থা করলেন। এ্যালেন ফিরে পেয়েছিলেন মনের শান্তি। দূর হয়েছিল তাঁর অন্তরের গ্লানি। এই ঘটনার অনেক পরে ভারত থেকে বহুদূরে বসে 'লা নুই বেঙ্গলী' গ্রন্থ লেখার সময় মির্চা এলিয়াদ মাধবানন্দজীর সেই মমতাময় সান্নিধ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এরূপ মর্মস্পর্শী কত ঘটনা যে ঘটেছিল পূজনীয় মহারাজের জীবনে তার সংখ্যা কে রাখে!

মাধবানন্দজী তাঁর নিজের ভগ্ন-বৃদ্ধ শরীরের দিকে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করে সংঘাধ্যক্ষরূপে বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি সংঘাধ্যক্ষরূপে বিভিন্ন আশ্রমে শুভাগমন করে ভিত্তিস্থাপন ও উদ্বোধন কার্যাদিও সুসম্পন্ন করেছিলেন।

১৯৬২	উদ্বোধন	—রহড়া	—পোষ্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং কলেজ
		জয়রামবাটী	—রান্নাঘর
		সেবা প্রতিষ্ঠান	—রাজা শ্রীনাথ রায় ব্লক
	ভিত্তিস্থাপন	—বেলুড়	—বিদ্যামন্দির ছাত্রাবাস
		মেদিনীপুর	—বিবেকানন্দ হল
		রহড়া	—বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী ছাত্রাবাস
১৯৬৩	উদ্বোধন	—রেঙ্গুন	—বিবেকানন্দ স্মৃতি হাসপাতাল, পূর্ব পার্শ্বভাগ (পুরুষ ও শিশু বিভাগ)
		রহড়া	—বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী ছাত্রাবাস
	ভিত্তিস্থাপন	—কানপুর	—লাইব্রেরী
		রেঙ্গুন	—বিবেকানন্দ স্মৃতি হাসপাতাল, পশ্চিম পার্শ্বভাগ
১৯৬৪	উদ্বোধন	—কনখল	—স্বামী বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তি
		চেরাপুঞ্জি	—স্বামী বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তি
১৯৬৫	উদ্বোধন	—বোম্বাই	—শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির

সংঘাধ্যক্ষ হবার পর তিনি কাশীধামে যান ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের শেষে। কাশীতে গুরু হলেন স্বয়ং ৺বিশ্বনাথ। সেজন্য কাশীতে তিনি দীক্ষা দেন নি। তবে ১লা নভেম্বর অসী নদীর বাইরে সঙ্কটমোচনে একদণ্ডী আশ্রমে তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন ১৩/১৪ জন অধ্যাত্ম-পিপাসুকে। একজন ব্রহ্মচারীও (বর্তমানে সন্ন্যাসী) ঐ দলে ছিলেন। দীক্ষার পর মহারাজ গম্ভীর স্বরে

বললেন ঃ "তোমরা ভাগ্যবান। কত লোক আছে। কিন্তু কে আর ভগবানকে ডাকতে চায়? মন্ত্র যেন শিকলের মত। কুয়োর অনেক নিচে জল আছে। যত ভগবানকে ডাকবে, নাম করবে, তত জল উপরে উঠবে। তোমাদের কিছু হচ্ছে এটা যেন বুঝতে পারি। যেমন, জলে অনেক মাছ আছে। সেগুলি মাঝে মাঝে জলের উপরে উঠে ভুবড়ি মারে। সে-রকম তোমাদের কিছু হয়েছে, তা যেন দেখতে পাওয়া যায়। তোমাদের হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব— তোমাদের যেন ভগবান লাভ হয়।"

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্টে তিনি গিয়েছিলেন মাদ্রাজের মেরিনা বীচে ১০ ফুট উঁচু স্বামীজীর পরিব্রাজক ব্রোঞ্জ মূর্তির উদ্বোধন উপলক্ষে। উদ্বোধন করেছিলেন ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ। ঐ বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মালদহের ভক্তদের আকুল আহ্বান তিনি এড়াতে পারলেন না। অসুস্থ শরীর নিয়ে দারুণ দুর্যোগময় আবহাওয়ার মধ্যেও তিনি পরিদর্শন করলেন মালদহ আশ্রম। মঠে প্রত্যাবর্তন করলেন ১০ই অক্টোবর। ২৩শে অক্টোবর তাঁর ঘরে ইজিচেয়ার থেকে উঠে দক্ষিণের বারান্দায় যাবার সময় হঠাৎ পড়ে যান তিনি। বাম পায়ে আঘাত লাগে। অনুভব করলেন কোমরের ব্যথাও। ঐ দিনই সেবা প্রতিষ্ঠানে তাঁকে ভর্তি করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে তাঁর বাম পায়ের হাড় ভেঙে গেছে। ২৫শে অক্টোবর অপারেশন করা হয়। বেশ কয়েক মাস সেবা প্রতিষ্ঠানেই ছিলেন তিনি। তারও দু'এক বছর আগে থেকেই তাঁর শরীরে দেখা দিয়েছিল নানান উপসর্গ। একজিমা তাঁর চিরসঙ্গী ছিলই। আমেরিকাতে ব্রেণ টিউমার অপারেশনের পর থেকে শরীর বেশ কাহিল হয়ে গিয়েছিল। তবুও এই ভগ্নদেহ নিয়েই তিনি গিয়েছিলেন রাঁচি (২১শে এপ্রিল ১৯৬৫) দীক্ষার্থীদের ইচ্ছাপূরণ করতে। তারপরেই তিনি গিয়েছিলেন বোম্বাই, জুনের শেষে। সেখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের উদ্বোধন করলেন ২৭শে জুন। সেটাই ছিল তাঁর শেষ বহির্গমন।

বহু ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তা, দীক্ষাকার্য ও সংঘের বহুবিধ দায়িত্ব পূজনীয় মহারাজের ভগ্ন দেহটিকে আরো দুর্বল করে ফেলল। ফলে ২২শে জুলাই ১৯৬৫, সুচিকিৎসার্থে তাঁকে নিয়ে আসা হল সেবা প্রতিষ্ঠানে। সেখানে সাধুনিবাসে থেকেই তাঁর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষাদি চলল। বমি ভাব, পায়খানাও হচ্ছিল বারে বারে, খেতে পারছিলেন না, ওজন কমে যাচ্ছিল, রক্তাল্পতা, দুর্বলতা, ব্লাড সুগারও বাড়ছিল। ক্রমশই তাঁর অবস্থা দ্রুত অবনতির পথে। ফলে শেষ পর্যন্ত সেবা প্রতিষ্ঠানেই তাঁকে ভর্তি করা হল ৪ঠা সেপ্টেম্বর।

অচিরেই তাঁর চিকিৎসা ডাক্তারদের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এত রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাসগুলি অর্থাৎ জপ-ধ্যান, কথামৃত পাঠ ইত্যাদি পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছিলেন। একদিনের জন্যও

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির—বোম্বাই
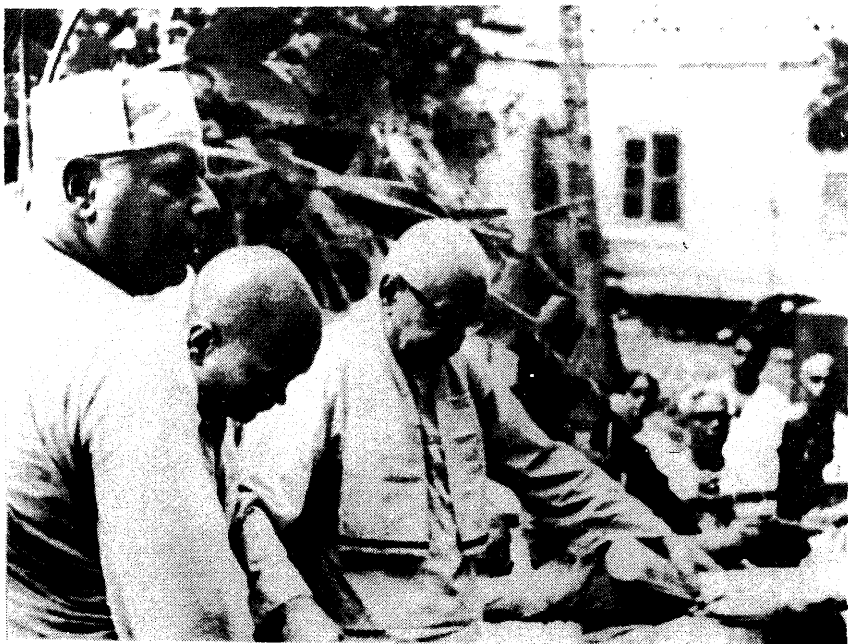
"তিনি গিয়েছিলেন বোম্বাই, জুনের শেষে। সেখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্বোধন করলেন ২৭শে জুন।"—পৃষ্ঠা ৬৮

বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে সমাগত সন্ন্যাসীবৃন্দ : ১। মাধবানন্দ, ২। বীরেশ্বরানন্দ, ৩। নির্বাণানন্দ, ৪। সম্বুদ্ধানন্দ, ৫। সুবিমলানন্দ, ৬। প্রমথানন্দ, ৭। শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, ৮। গৌর মহারাজ, ৯। প্রমাণানন্দ, ১০। সাধন মহারাজ, ১১। নাগরাজ মহারাজ, ১২। দিবাকরানন্দ, ১৩। সগুণানন্দ, ১৪। অভয়ানন্দ, ১৫। দয়ানন্দ, ১৬। হরিপ্রেমানন্দ, ১৭। অমোঘানন্দ, ১৮। গৌরীশ্বরানন্দ, ১৯। সূর্য্যানন্দ, ২০। রঙ্গনাথানন্দ, ২১। অজয়ানন্দ, ২২। নিরাময়ানন্দ, ২৩। লোকেশ্বরানন্দ, ২৪। প্রজ্ঞানন্দ, ২৫। জ্ঞানাত্মানন্দ, ২৬। ভূতেশানন্দ, ২৭। বিমল মহারাজ (ক্ষেত্রী), ২৮। পরাশিবানন্দ, ২৯। ঈশানানন্দ, ৩০। শিশির মহারাজ, ৩১। স্মরণানন্দ, ৩২। ভাস্করানন্দ, ৩৩। জীবানন্দ, ৩৪। ধ্যানাত্মানন্দ, ৩৫। নারায়ণ মহারাজ, ৩৬। নিত্যানন্দ, ৩৭। ত্রিবিক্রমানন্দ, ৩৮। রসজ্ঞানন্দ, ৩৯। সন্তবানন্দ, ৪০। কৈলাসানন্দ, ৪১। সুনীল মহারাজ, ৪২। নিত্যস্বরূপানন্দ, ৪৩। যোগীশানন্দ, ৪৪। সংযমানন্দ, ৪৫। পুণ্যানন্দ, ৪৬। শক্তিরূপানন্দ, ৪৭। বগলানন্দ, ৪৮। অসীমানন্দ, ৪৯। অনুপমানন্দ, ৫০। গৌর মহারাজ (২), ৫১। হিতানন্দ ও ৫২। ব্রহ্মেশ্বরানন্দ।

কোন কিছু বন্ধ করেন নি। এমনকি, মহাসমাধির মাত্র দু'দিন পূর্বে রাত্রি সাড়ে-তিনটায় বিছানায় বসতে চাইলেন। সেবক বহুভাবে তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন—ডাক্তারদের দোহাইও দিলেন। কিন্তু সব ওজর আপত্তি ব্যর্থ হল। বিছানায় তাঁকে বসিয়ে দিতেই হল। তখন বলেছিলেন, "না, তা হোক গে। এই সময়ে বসতে হয়।" একবার সেবককে ভীত দেখে মৃদুহাস্যে বলেছিলেন তিনি, "ভয়ই তো মৃত্যু।"

সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে। কখনও দেওয়ালে টাঙানো শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ছবির প্রতি তাঁর অপলক দৃষ্টি। কখনও বা তিনি ধ্যানাবস্থায়। মধ্যে মধ্যে তাঁর অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ ঃ 'মা' 'মা'। কখনও স্বগতোক্তি—'নারায়ণ', 'নারায়ণ'।

শেষের কয়েকটি দিন ছিল যেন মহামিলনের প্রস্তুতি পর্ব। একফোঁটা জল গ্রহণেও প্রবল অনিচ্ছা। সব কিছুতেই একেবারে নির্লিপ্তভাব। একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। মহাসমাধির পূর্ব দিনে সেবকের অনুযোগ ঃ "মহারাজ, আপনি কিছুই মুখে দিচ্ছেন না—এমন হলে শরীর থাকবে কি করে ?" পূজনীয় মহারাজের সহাস্য উত্তর, "শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা।"

১লা অক্টোবর থেকে ৺দুর্গোৎসব। মঠে মহাসমারোহে যথারীতি মহাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মঠ থেকে আগত সন্ন্যাসীদের কাছে ঔৎসুক্য সহকারে সব খোঁজ-খবরও নিচ্ছিলেন তিনি। মহারাজ তাঁর মহাপ্রস্থানের ইঙ্গিতও দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর সব ব্যবহারাদি ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সেবকদের সঙ্গে ছোটখাট রসিকতা পর্যন্ত করেছিলেন তিনি। ডাক্তারদের চিন্তাগ্রস্ত দেখে একদিন তাঁর ঠাট্টার সুর, "আমার দু'জন ডাক্তার—দু'জনেই চিন্তাশীল।" কখনো বা হেসে হেসে বলতেন, "ডাক্তার কি ভগবান ?" অবস্থা যত খারাপ হতে লাগল, ডাক্তারদের ততই বাড়ছিল উদ্বেগ। একদিন বড় বড় বিশেষজ্ঞদের বৈঠক বসল। সব শুনে পূজনীয় মহারাজের মন্তব্য ঃ "—বলছিল যে আজ নাকি ডাক্তাররা Consult করতে বসেছেন। ডাক্তাররা সব অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইছেন।···উপরে ঠাকুর হাসছেন।"

সংবাদপত্রের মাধ্যমে মহারাজের গভীর অসুস্থতার সংবাদ ইতিমধ্যে জানতে পেরেছিলেন সবাই। দর্শনার্থী, ভক্ত ও সাধুরা দলে দলে এসে তাঁকে নীরবে দর্শন করে যাচ্ছিলেন তাঁর ঘরের বাইরে থেকে। প্রাচীন সন্ন্যাসীগণ ও মঠের কর্তৃপক্ষেরা তাঁকে দেখতে এলে, তিনি তাঁদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছিলেন স্বাভাবিক ভাবে। ৫ই অক্টোবর বিজয়া দশমী। তার আগেই এই অবস্থায় তিনি স্বহস্তে লিখে রেখেছিলেন ৺বিজয়ার চিঠি। আগত সাধু ও ভক্তদের ৺বিজয়ার প্রণামও গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সেদিন হঠাৎ তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা দিল। সকলেরই আনন্দ। কিন্তু তা ছিল দীপশিখা

নির্বাপিত হবার আগে সহসা উজ্জ্বলতর হওয়া। বিছানায় শুয়ে শুয়েই তিনি সন্ধ্যায় মঠ থেকে আনীত শান্তিজল মস্তকে ধারণ করেছিলেন মঠের ৺দুর্গা-পূজার পূজারী ও তন্ত্রধারকের কাছ থেকে। সঙ্গে ছিলেন স্বামী অভয়ানন্দ।

৬ই অক্টোবর ১৯৬৫। মহারাজ সেদিন খুব ভাল আছেন। সকলেই খুব খুশী। তাঁর মুখে-চোখে এক অভূতপূর্ব স্বর্গীয় আনন্দের দীপ্তি। প্রায় দু'এক মিনিট অন্তর তাঁর মুখে শুধু 'মা' 'মা' ডাক! সন্ধ্যায় মঠ থেকে বহু সাধু ও অগণিত ভক্ত এসেছেন তাঁকে দর্শনের আশায়। তিনি শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় পূরণ করেছিলেন সকলের মনোবাঞ্ছা। তাঁর জনৈক প্রিয় চিকিৎসককে তাঁর দেখবার ইচ্ছা প্রবল। সেই ভাগ্যবান চিকিৎসক তখনও দার্জিলিং-এ। পূজনীয় মহারাজের আফ্‌শোস, "ইনি বড্ড দেরী করে ফেলছেন। এখনও আসছেন না।" কি আশ্চর্য, সেদিনই বিকালের দিকে সাড়ে পাঁচটায় সেই চিকিৎসকও হাজির। দেখে মহারাজেরও খুব আনন্দ। চিকিৎসকের বাড়ির সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। তারপর তাঁকেও বিদায় দিলেন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে।

কি একটা কথা হঠাৎ যেন তাঁর মনে পড়ে গেল। কাছের সেবককে ডাকলেন। বললেন যে মঠে তাঁর ঘরে ব্রহ্মচারী শিক্ষণ কেন্দ্রের আপ্তের সংকলিত সংস্কৃত অভিধান আছে। সেটি যেন সেখানকার গ্রন্থাগারে ফেরত দেওয়া হয়।

মহারাজের শারীরিক অবস্থার সংবাদ পেয়ে বিভিন্ন আশ্রম থেকে সাধুরা আসছেন। সেইসব আশ্রমের সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে শুনছিলেন সেখানকার ৺দুর্গাপূজার বিবরণাদি। এক আশ্রম-অধ্যক্ষের স্মৃতিঃ "আজ মনে পড়ে বিগত বৎসরের ৺দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পূজার নানা সংবাদ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কে কে এসেছিলেন পূজার সময়, পূজার আনন্দ সবাই কেমন উপভোগ করেছেন, প্রতিমা বিসর্জন কিভাবে হয়েছিল, ব্যাণ্ডবাদক বালকবাহিনী কোন পোশাকে সেজেছিল, কেমন বাজিয়ে-ছিল—সব জানতে চেয়েছিলেন। তার মধ্যে কত স্নেহ, কত মমতা।" মহাপ্রয়াণের পনের মিনিট আগে পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন ৺বিজয়ার প্রণাম।

তারপর এল শেষ বিদায়ের ক্ষণ। এক প্রত্যক্ষদর্শী সন্ন্যাসীর বিবরণঃ "বললেন, 'বসিয়ে দাও, বসিয়ে দাও'। 'বসলেই কষ্ট হবে মহারাজ—বমির ভাব হবে—বেশ তো আছেন। এমনিই বিশ্রাম করুন'—সেবক বললেন। 'না, বসিয়ে দাও, বসিয়ে দাও।' সেবক আবার আবেদন করলেন, 'না মহারাজ, আপনার যে বড় কষ্ট হয় বসলে।' উত্তরে গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিলেন, 'তোমার মাথায় কিছু নেই, শরীর চলে যাচ্ছে, প্রাণ চলে যাচ্ছে—আর তুমি বসাতে চাচ্ছ না। বসিয়ে দাও।' নিরুপায় সেবক ধীরে সন্তর্পণে তাঁকে বসিয়ে দিলেন। ঘর তখন নীরব। এক অপূর্ব পরিবেশ। নির্নিমেষ নেত্রে পূজ্যপাদ মহারাজজী শ্রীশ্রীঠাকুর-মায়ের পটের দিকে তাকিয়ে আছেন। সে কি দেখা! কি

দৃষ্টি ! কি চাউনি ! ঐ দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল অপরূপ ভক্তি, প্রীতি ও শরণাগতি। ঐ মৌন অপলক দৃষ্টিতে কি কথা হচ্ছিল ভক্ত ও ভগবানে? কে জানে? বেশ কয়েক জন সাধু-ব্রহ্মচারী, নার্সরা তাঁর চারপাশে। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ, যেন বিবশ ! এইভাবে কয়েক মিনিট কাটার পর বললেন, 'ব্যস্, হয়ে গেছে। এবার শুইয়ে দাও।' পাশ ফিরে শয়ন করলেন—কষ্ট হল, বমি হল। উচ্চারিত হল 'মা' 'মা'।" শ্রীশ্রীমায়ের প্রিয় সন্তান শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে চিরআশ্রয় পেলেন। সুদীর্ঘ পঞ্চান্ন বছরের এক উজ্জ্বল সন্ন্যাস জীবনের হল যবনিকাপাত। রামকৃষ্ণ সংঘের সমাপ্তি হল একটি অধ্যায়ের। তখন সন্ধ্যা ৬ ৫০ মিনিট, বুধবার ৬ই অক্টোবর ১৯৬৫ (২০শে আশ্বিন ১৩৭২)। পূজনীয় মহারাজের বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। সেদিন ছিল একাদশী। মঠ ও মিশনের প্রায় সকল কেন্দ্রে তখন চলেছে শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্তন।

কলকাতা বেতারকেন্দ্র সন্ধ্যাকালীন স্থানীয় খবরে প্রচার করেছিল স্বামী মাধবানন্দের মহাসমাধির সংবাদ। সেই দুঃসংবাদ শোনামাত্র কলকাতা ও আশপাশের বহুস্থান থেকে দলে দলে রামকৃষ্ণ সংঘের বহু সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শত শত ভক্ত তাঁদের শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন সেবা-প্রতিষ্ঠানে এসে।

রাত সাড়ে দশটায় তাঁর পূত দেহ সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে আনীত হয় বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে। সেখানেও ফুলের মালা, পুষ্পাঞ্জলি ও কর্পূর আরতির দ্বারা তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়; সেখানেও বহু ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর পবিত্র মরদেহ নিয়ে আসা হয়েছিল বেলুড় মঠে। সারারাত তাঁর পার্থিব শরীর ঘিরে সাধু ব্রহ্মচারীরা বেদপাঠ ও ভজন গান করেন।

পরদিন ৭ই অক্টোবর (২১শে আশ্বিন) সকালে তাঁর পূত-দেহ পুষ্পমাল্য শোভিত পালঙ্কে মঠের পুরাতন মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে রাখা হয়। প্রথমে সাধু-ব্রহ্মচারীগণ ও পরে শেষ দর্শনের জন্য সমবেত কয়েক সহস্র নর-নারী তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। এসেছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও।

বেলা দশ ঘটিকায় তাঁর পূত-দেহ স্বামীজীর ঘরের সম্মুখস্থ গঙ্গার ঘাটে স্নান-আরাত্রিকাদি সমাপনের পর যথাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও রাজা মহারাজের মন্দিরে নিয়ে আসেন সাধু-ব্রহ্মচারীগণ। পরে সাড়ে দশ ঘটিকায় শেষকৃত্যের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। মায়ের প্রিয় সন্তানের পঞ্চভূতের দেহ বিলীন হয়ে গেল শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণতলে।

স্বামী মাধবানন্দের মহাসমাধির পর ত্রয়োদশ দিনে ১৮ই অক্টোবর ১৯৬৫, (১লা কার্তিক ১৩৭২) সোমবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, ভজন-কীর্তন ও ভোগরাগাদি হয়েছিল। এই দিন মঠে উপস্থিত ছিলেন বহু

সাধু-ব্রহ্মচারী, ভক্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। বিকালে মহারাজের সহপাঠী ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক স্মরণ-সভা। এই সভায় স্বামী মাধবানন্দের স্মৃতিচারণ করেছিলেন স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, ডাঃ মহেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ অমিয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়। তাঁরা সকলেই পূজনীয় মহারাজের উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন, অভিমানরাহিত্য, গভীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর চিকিৎসক।

তাঁর প্রয়াণের পর মঠ থেকে প্রকাশিত জীবনীতে বলা হয়েছিল, "সমগ্র মঠ ও মিশনের বিগত পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসকে নির্মল মহারাজের জীবন থেকে মোটেই পৃথক করে ভাবা যায় না। এক কথায়, তিনি যেন মিশনের সঙ্গে প্রায় সমার্থক (Synonymous) হয়ে আছেন। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শানুগ জ্ঞান-ভক্তি ও কর্মের সমবায়ে গঠিত এই মহান সন্ন্যাসীর জীবন শুধু সমকালীনদের জন্য নয়, অনাগতদের কাছেও দৃষ্টান্তস্বরূপ।"

স্বামী মাধবানন্দ ছিলেন সুদক্ষ পরিচালক। সেইজন্যেই তো সংঘজননী শ্রীশ্রীমা তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ "এরা আমার মাথার মণি, যেন জন্মে জন্মে এমন ছেলে পাই।"

একদা স্বামী বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী অচলানন্দ (কেদার বাবা নামে সমধিক পরিচিত, সংঘের সহাধ্যক্ষ, ১৯৩৮-৪৭) স্বামী মাধবানন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ "যদি কেউ জানতে চায় কিভাবে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবল কর্মশীলতা ও গভীর প্রশান্তির মধ্যে বাস করেছিলেন, তাহলে তার উচিত স্বামী মাধবানন্দের জীবন লক্ষ্য করা। তবেই সে কিছু ধারণা করতে পারবে।"

তাঁর মধ্যে হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল বলেই সংঘের সকলেই তাঁকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন ও তাঁর আদেশ পালনে সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর মহাপ্রয়াণে 'উদ্বোধন' পত্রিকা লিখেছিল, "স্বামী মাধবানন্দজীর আদর্শ সন্ন্যাস-জীবন ও কঠোরতা বরণের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত ও সকলের মধ্যে উচ্চ-জীবনের প্রেরণা জাগাইত। তাঁহার পাণ্ডিত্য, প্রতিটি কাজই নিখুঁতভাবে করিবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, কর্তব্যে গভীর নিষ্ঠা, তাঁহার সহজ ব্যবহার ও সরলতা সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিত। নৈতিক ও উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল অনবদ্য। সর্বাবস্থায় তাঁহার ধৈর্য ও ক্ষমা অটল থাকিত। সংঘের সাধু-ব্রহ্মচারীগণের দোষ ত্রুটি তিনি সর্বদা ক্ষমাসুন্দর চক্ষে, সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ ভালবাসা সাধু ভক্ত সকলেরই হৃদয় সমভাবে স্পর্শ করিত।...তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সচিব থাকাকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্মের বিস্তার ও উন্নতির ক্ষেত্রে প্রভূত তৎপরতা ও সাফল্য পরিলক্ষিত

হয়।···তাঁহার অদর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের, আধ্যাত্মিকতার ও নিঃস্বার্থ সেবার জগতে এবং পণ্ডিত মহলে যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়।”

স্বামী মাধবানন্দের মহাপ্রয়াণের পর শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। সুদীর্ঘ এই সময়ের ব্যবধানেও তাঁর সমকালীনদের অন্তরে আজও তিনি পূর্ণমাত্রায় ভাস্বর, সমভাবে প্রদীপ্যমান—বিভাসিত। পরবর্তীকালের নবাগত এবং অনাগত আগামী প্রজন্মের কাছে তাঁর অনন্য জীবনকথা আধ্যাত্মিক পথের পাথেয়, নৈতিক জীবনের আলোকবর্তিকা। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ইতিহাসে প্রাচীন এবং নব্য যুগের সেতুরূপে, সংঘের আধুনিক রূপের অন্যতম প্রধান স্থপতিরূপে তাঁর নাম চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে। জ্ঞান; ভক্তি; কর্ম ও যোগের সমন্বয়ে, ব্যক্তিত্ব; প্রতিভা ও তিতিক্ষার সংমিশ্রণে, উদারতা; আধ্যাত্মিকতা ও নিরভিমানতার বৈভবে তাঁর সাধনপূত ত্যাগৈশ্বর্যময় গরিমাদীপ্ত জীবন রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতিটি উত্তরসাধক তথা অধ্যাত্ম-পিপাসু সাধারণ মানুষের কাছে শাশ্বত প্রেরণার চির-উৎস হয়ে থাকবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আকর-তালিকা

গ্রন্থাবলী

নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি — পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ থেকে প্রকাশিত

বংশ পরিচয় (৫ম খণ্ড) — জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, কলিকাতা

স্বামী মাধবানন্দ — বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত

শান্তিপুর পরিচয় (১ম ভাগ) — কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, কলিকাতা

স্বামী দয়ানন্দ — রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত

শ্রীম-কথা — স্বামী জগন্নাথানন্দ, কলিকাতা

স্বামী যতীশ্বরানন্দ — অদ্বৈত আশ্রম, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত

মহাপুরুষ শিবানন্দ — স্বামী অপূর্বানন্দ, কলিকাতা

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ — বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত

অতীতের স্মৃতি — স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, কলিকাতা

শঙ্করানন্দ গল্পকথা — শ্রীরামকৃষ্ণ-শঙ্করানন্দ সেবাশ্রম, বামুনমুড়া, উঃ ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত

প্রাণপুরুষ — স্বামী নিরাময়ানন্দ, কলিকাতা

শতরূপে সারদা — রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত

শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ — স্বামী অপূর্বানন্দ, বারাসত

শ্রীশ্রীমায়ের কথা — উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

শ্রীমা সারদা দেবী — স্বামী গম্ভীরানন্দ, কলিকাতা

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয় — উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

শ্রীম দর্শন (৩য় ও ৪র্থ ভাগ) — স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, কলিকাতা

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র — উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত

ব্রহ্মানন্দ-চরিত — স্বামী প্রভানন্দ, কলিকাতা

ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা — শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত

স্বামী সারদানন্দ — স্বামী ভূমানন্দ, কলিকাতা

জীবনের পথে — অনুকূলচন্দ্র সান্যাল, কলিকাতা

ভারতের সাধক (৩য় খণ্ড) — শংকরনাথ রায়, কলিকাতা

অমৃতস্য পুত্রাঃ — সূর্যসারথি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা

চতুরি চামার — সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী, নিউদিল্লী

লা নুই বেঙ্গলী — মির্চা এলিয়াদ, কলিকাতা

Swami Madhavananda — Published by Ramakrishna Mission, New Delhi

Presidency College Register (1927) — Published by Education Department, Govt. of West Bengal

Presidency College Centenary Volume (1955) — Published by Presidency College, Calcutta

The Ochre Robe — Published by George Allen and Unwin Ltd., London

Blessed Days of Association with a Saint: Memorabilia — Published by L. Saraswathi Devi, Madras

Glimpses of Holiness — Swami Shastrananda, Bangalore

History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission — Swami Gambhirananda, Calcutta

Ramakrishna and His Disciples — Christopher Isherwood, Hollywood, U. S. A.

The Ramakrishna Math and Mission Convention 1926 — Published by Belur Math

The Religions of the World (Vol-2) — Published by Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta

Worldwide Celebrations of Swami Vivekananda Centenary 1863—1963 — Swami Vivekananda Centenary Committee, Calcutta

Swami Ramakrishnananda : The Apostle of Sri Ramakrishna to the South — Swami Tapasyananda, Madras

পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য

'উদ্বোধন' (কলিকাতা থেকে প্রকাশিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মাসিক মুখপত্র) ঃ সন ১৩৩৫ (পৌষ), ১৩৩৬ (অগ্রহায়ণ), ১৩৩৯ (বৈশাখ), ১৩৪৫ (পৌষ), ১৩৪৬ (শ্রাবণ ও আশ্বিন), ১৩৫০ (মাঘ), শ্রীশ্রীমা শতবর্ষ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৫২ (জ্যৈষ্ঠ ও অগ্রহায়ণ), ১৩৫৩ (বৈশাখ), ১৩৫৭ (পৌষ), ১৩৬০ (মাঘ), ১৩৬১ (বৈশাখ—আষাঢ়), ১৩৬৩ (বৈশাখ, আষাঢ় ও ভাদ্র), ১৩৬৮ (শ্রাবণ), ১৩৬৯ (ভাদ্র), ১৩৭০ (জ্যৈষ্ঠ ও মাঘ), ১৩৭২ (কার্তিক), ১৩৭৩ (বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন ও মাঘ), ১৩৭৪ (অগ্রহায়ণ) ১৩৯০ (অগ্রহায়ণ), ১৩৯১ (জ্যৈষ্ঠ), ১৩৯২ (আষাঢ়)

'নিবোধত' (কলিকাতা থেকে প্রকাশিত শ্রীসারদা মঠের বাংলা ত্রৈমাসিক পত্রিকা) ঃ সন ১৩৯৬ (চৈত্র)

'সন্দীপন' (বেলুড় শিক্ষণ মন্দির থেকে প্রকাশিত বাংলা বার্ষিক পত্রিকা) ঃ ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৬৬

'বিদ্যামন্দির পত্রিকা' (বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা) ঃ ১৯৬৫

'বিবেক ভারতী' (ইটাচুনা হুগলী থেকে প্রকাশিত প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের বাংলা ত্রৈমাসিক পত্রিকা) ঃ শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৮৫

'আশ্রম' (রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকা) ঃ সন ১৩৭২

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব স্মরণিকা (১৯৬৭)—শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব কমিটি, দমদম এয়ারপোর্ট থেকে প্রকাশিত

'Prabuddha Bharata' (English Monthly Journal of the Ramakrishna Order published from Mayavati) : Years 1911-1921, 1927-1929, 1936, 1938, 1950 and 1956

'Vedanta Kesari' (English Monthly Journal published from Ramakrishna Math, Madras) : Years 1967 and 1968

'Bhavan's Journal' (English Fortnightly Journal published by Bharatiya Vidya Bhavan from Bombay) : 31st December 1988, 15th January 1989 and 31st January 1989.

Old files of Belur Math

স্মৃতিকথা

বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত স্বামী আত্মস্থানন্দ, স্বামী শশাঙ্কানন্দ এবং স্বামী অচ্যুতানন্দ রচিত স্মৃতিসন্দর্ভ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে স্বামী মাধবানন্দ

মাতৃ-সন্নিধানে

অনুকূলচন্দ্র সান্যাল

[স্বামী মাধবানন্দ প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্রাবস্থায় জয়রামবাটীতে প্রথম জননী সারদা দেবীর দর্শন লাভ করেন। এসম্পর্কে উত্তরকালে তিনি লিখেছেন, "১৯০৮ সালের শেষভাগে পঠদ্দশায় তিন বন্ধুর সহিত জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন লাভ করি। দুঃখের বিষয় সেই দর্শনের অতি অস্ফুট স্মৃতিই এখন মনে রহিয়াছে।" (শ্রীমা সারদাদেবী, উদ্বোধন, শ্রীশ্রীমা শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৬১)। সৌভাগ্যের বিষয় উক্ত তিন বন্ধুর অন্যতম অনুকূলচন্দ্র সান্যাল মাতৃ-সন্নিধানের সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এই প্রবন্ধটি 'শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি' শিরোনামে উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৬০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং পরে লেখকের পুত্র ফণিভূষণ সান্যাল কর্তৃক প্রকাশিত 'জীবনের পথে' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। ফণিভূষণ সান্যাল তাঁর পিতার নিকটে বহুবার এই ঘটনার বর্ণনা শুনেছেন। মূল প্রবন্ধে স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী রাঘবানন্দ প্রমুখের নাম অনুক্ত ছিল]

১৩১৫ সনের কথা। চুয়াল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। হেমন্তের এক কুহেলীময় প্রভাতে গোমো-হাওড়া প্যাসেঞ্জারে তিনটি বন্ধুসহ [নির্মল বসু, সীতাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপর একজন]* রওনা হইয়াছিলাম বর্তমান জগতের পুণ্য তীর্থদ্বয়—কামারপুকুর ও জয়রামবাটী দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে। বন্ধুত্রয়ের মধ্যে দুইজন এখন বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসী, [স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী রাঘবানন্দ] আর একজন হইতেছেন বর্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের জনৈক প্রাচীন উকীল।

বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে এক ভদ্রলোক (ট্রেনের কামরায় তাঁহার সহিত আমাদের জীবনে সর্বপ্রথম পরিচয় হইয়াছিল সেই দিনই) আমাদিগকে তাঁহার বাসায় জলযোগ করাইয়া কামারপুকুরে লইয়া যাইবার জন্য রাত্রিতে গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরের দিন কামারপুকুরে পৌঁছিতে পৌঁছিতে অপরাহ্ণ প্রায় অতীত হইয়া গেল। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। মুস্কিল হইল কামারপুকুর গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া। যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়,—"রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাড়িটি কোথায়?"—সে-ই বলে একই কথা,—"বলতে লারবো বাবু।" আজ লিখিতে বসিয়া মনে হইতেছে ভগবান ঈশার বাণী—"For

---

* এই প্রবন্ধের [ ] বন্ধনীভুক্ত অংশ লেখকপুত্র ফণিভূষণ সান্যালের মতানুসারে প্রদত্ত।

verily I say unto you, a prophet is without honour in his own land." (আমি তোমাদের বলে রাখি শোনো, অবতার তাঁর নিজের জন্মভূমিতে সম্মান পান না)। জনৈক বন্ধু রহস্য করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর জিলিপি খেতে ভালবাসতেন, এই তো সামনে জিলিপির দোকান, দোকানদারের বাবা কিংবা ঠাকুরদাদা নিশ্চয়ই তাঁকে জিলিপি তৈয়ারী করে খাইয়েছেন, ওকেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন।" জিজ্ঞাসিত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ থাকিবার পর সেই ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—"ও বুঝতে পেরেছি বাবু, চাটুজ্যেদের বাড়ি—তাই বল না বাবু—উ-ই যে বটেক, উ-ই দেখা যাচ্ছে।" মুস্কিলের আসান হইয়া গেল। ঠাকুরের বাড়িতে পেঁছিয়া শিবুদাকে পাইলাম। আর পরিচয় হইল শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদারের সহিত। আজ তিনি পরলোকগত। তিনিও কলিকাতা হইতে আমাদের অগ্রে কামারপুকুর দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। বিজয়বাবু তখন ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রামচন্দ্র দত্তের প্রবর্তিত এবং কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান হইতে প্রকাশিত 'তত্ত্বমঞ্জরী'র সম্পাদক ছিলেন। কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিজড়িত স্থানগুলি দেখিয়া পরদিন অপরাহ্নে হাঁটিয়া আমরা জয়রামবাটী রওনা হইলাম। শ্রীশ্রীমা তখন তাঁহার ভাইয়ের বাড়িতেই থাকিতেন। হাতমুখ ধুইবার পর আমি দলের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলাম বলিয়া বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম। বন্ধুরা তখন বহির্বাটীতে বসিয়া মামাদের এবং পাড়ার লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। আমি যে কখন হঠাৎ বাড়ির ভিতর গিয়া বসিয়াছি, তাহা তাঁহারা লক্ষ্যই করেন নাই। ভিতরে গিয়া মাকে প্রণাম করিলাম। তিনি তখন বারান্দায় বসিয়াছিলেন। আমাকে বসিতে বলিয়া মা কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, তোমার বে হয়েছে?"

আমি বলিলাম,—"না।"

মা তখন বলিলেন,—"বাবা, মহীন্দর বই পাঠিয়ে দিয়েছে, তুমি একটু পড়ে শোনাও তো।" এই বলিয়া তিনি ঘরের ভিতর হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয়ভাগ, একখানি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। ঐ বই তখন সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রদ্ধাস্পদ মাষ্টার মহাশয় (শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—শ্রীম) সর্বাগ্রে একখানি শ্রীশ্রীমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম—"প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগরের বাটী।" তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ দিকে যেখানে আছে—"ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না; কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে—তখন আর একবার ছ্যাঁক্ কল্ কল্ করে"—সেই জায়গাটি যখন পড়ি, তখন মা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর ঐ কথাটি খুব বলতেন, কাঁচা লুচি পড়লে আবার পাকা ঘি ছ্যাঁক্ কল্ কল্ করে।" তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয়

"জিজ্ঞাসিত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ থাকিবার পর সেই ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—'ও বুঝতে পেরেছি বাবু, চাটুজ্যেদের বাড়ি—তাই বল না বাবু—উ-ই যে বটেক, উ-ই দেখা যাচ্ছে।"—পৃষ্ঠা ৮০।

"ভিতরে গিয়া মাকে প্রণাম করিলাম। তিনি তখন বারান্দায় বসিয়াছিলেন।" —পৃষ্ঠা ৮০

খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষভাগে যেখানে আছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)' সেখানে মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, মণি কে জান?" আমি উত্তর করিলাম,—"না, মা, জানিনা তো।" মা হাসিয়া বলিলেন,—"মণি, উটি হচ্ছে মাষ্টার মশায় নিজে।" সন্ধ্যা হইয়া গেল। পাঠ বন্ধ হইল। ইতিপূর্বে বন্ধুরাও আমি বাড়ির ভিতরে গিয়াছি জানিতে পারিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর, মা তাঁহার ঘরের ভিতর তক্তাপোশে উপবিষ্টা আছেন, মাটিতে কয়েকটি গ্রাম্য বালক ও বালিকা বসিয়া। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কোথায় বসিব ইতস্ততঃ করিতেছি, কারণ শহুরে শিক্ষার প্রভাবে একদম মাটিতে বসিতে দ্বিধা বোধ হইতেছিল অথচ ঘরে মাটির মেঝেতে কোন রকম আসনও তখন ছিল না। শেষে অনেকটা হতভম্ব হইয়া মাকে বলিলাম,—"মা, আমি আপনার কাছে বসতে পারি এখানে?" মা বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ,—বাবা, বোসো, বোসো।" আমি গিয়া তক্তাপোশের উপর মায়ের নিকটে বসিলাম। এ কাণ্ডজ্ঞান তখনও হয় নাই যে মায়ের সহিত এক আসনে বসিতে নাই। মা ঐ সব গ্রাম্য বালক-বালিকাদিগকে তাহাদের আত্মীয়-স্বজন কে কেমন আছে, ক্ষেতে কি পরিমাণ ধান জন্মিয়াছে—এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মা, এরা সব কে?" উত্তর দিলেন,—"এই সব আশপাশের গ্রামের।" দেখিলাম ঐ সকল বালকবালিকা প্রণাম করিয়া উঠিয়া যাইবার সময় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু প্রসাদ লইয়া যাইতেছে।

রাত্রির আহারের পর তখনই আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম, কারণ সকলেরই শরীর খুব ক্লান্ত ছিল। ভোরে উঠিয়া বাড়ির ভিতরে গেলাম। মাকে তাঁহার শয়নকক্ষের পার্শ্ববর্তী অন্য একটি অপেক্ষাকৃত বড় ঘরের ভিতর পাইলাম। তিনি তখন দাঁড়াইয়া, আমিও তদ্রূপ। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"বাবা, তোমাকে এই নাম দিলাম।" ব্যাপারটি যেন এক মুহূর্তে ঘটিয়া গেল। কি যে হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এতই বোকা ছিলাম যে, আমি কিছুক্ষণ পরেই বাহিরের ঘরে আসিয়া বন্ধুত্রয়ের একজনকে বলিতে উদ্যত হইলাম,—"দ্যাখ্, আজ ভোরে মা ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমাকে বলে উঠলেন, 'দ্যাখো বাবা তোমাকে এই নাম—'।" এই কথাটি এই পর্যন্ত বলা হইলেই বন্ধুবর [নির্মল] আসল ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, —"ওরে চুপ্ চুপ্! ও কথা কাউকেও বলতে নেই, বলতে নেই।" আমি তো আরো হতভম্ব হইয়া গেলাম। জীবনের সেই শ্রেষ্ঠতম দিনে, অতি প্রত্যুষ হইতেই আমার একের পর এক কারণে হতভম্ব হইবার পালা চলিতেছিল! পরবর্তীকালে পুস্তকে পড়িয়াছি, মা একবার বিষ্ণুপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে একটি হিন্দুস্থানী নারীকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মন্ত্রদান করিয়াছিলেন।

দ্বিপ্রহরে আমরা আহার করিতে বসিলাম। সেই দিনই বিকাল বেলা আমাদের কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা। মা স্বহস্তে নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া আমাদের খাওয়াইলেন। দু'এক গ্রাস মাত্র ভাত খাইয়াছি, এমন সময় বন্ধুদের একজন [সীতাপতি] হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"অনুকূলবাবু, মাকে গিয়ে বলুন, আমরা তাঁর প্রসাদ খাব।" মা যেখানে ছিলেন, উচ্ছিষ্ট হাতে সেই অবস্থায় আসন হইতে উঠিয়া তথায় গিয়া মাকে ঐ কথা বলিলাম। করুণাময়ী সেই অবস্থায়ই একটি বাটির ভিতর ভাত, ডাল, তরকারি সব একত্রিত করিয়া উহাকে ভক্তের জন্য প্রসাদে পরিণত করিয়া, আমরা যেখানে খাইতেছিলাম নিজেই সেখানে লইয়া আসিলেন এবং বাটিটি হইতে সেই প্রসাদ কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের প্রত্যেকের পাতে পরিবেশন করিলেন। আমার আজও এই সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর অতীত হওয়া সত্ত্বেও, অতি সুস্পষ্টভাবে মনে আছে যে, সে দিন জয়রামবাটীতে খাইতে বসিয়া মায়ের হাতের রান্না পায়েস যেমন খাইয়াছিলাম, অমন সুস্বাদু পায়েস ইহজীবনে আর কোথাও খাই নাই। বিকাল বেলা রওনা হইবার প্রাক্কালে মাকে একান্তে বলিলাম,—"মা, আপনার একটু প্রসাদ সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই কলকাতায়।" অমনি মা বোঁদে প্রসাদ করিয়া দিলেন, অনেকদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে বলিয়া। তাহা ছাড়া সঙ্গে আরো মিষ্টি দিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সেই প্রসাদের কিয়দংশ আচার্য স্বামী সারদানন্দজীকে এবং ভক্তকুলচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে দিয়াছিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের যে মূর্তি আমি দেখিয়াছি, তাহা স্মরণপথে উদিত হইলেই স্বতঃই মনে আসে আচার্য স্বামী প্রেমানন্দের কথা—"রাজরাজেশ্বরী ঘর নিকুচ্ছেন, ছেলেদের এঁটো পাড়ছেন।" আমার দেখা মা হইতেছেন মা-ই, সন্তানের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামনায় সর্বদা ব্যাপৃতা। তাঁহার ঐশী ভাবের প্রকাশ দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আবার স্বভাবতঃই মনে পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা—'যার যা পেটে সয়। * * * মা ছেলেদের জন্য বাড়িতে মাছ এনেছেন। সেই মাছে ঝোল, অম্বল, ভাজা আবার পোলাও করলেন। সকলের পেটে কিন্তু পোলাও সয় না; তাই কারু কারুর জন্য মাছের ঝোল করেছেন—তারা পেটরোগা। আবার কারুর সাধ অম্বল খায় বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা—আবার অধিকারী ভেদ।"

বিকাল বেলা আমরা যখন কলিকাতা আসিবার জন্য রওনা হইলাম, তখন মা বাড়ির বাহিরে একটুখানি দূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া আমি পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও দাঁড়াইয়াই আছেন আমাদের দিকে চাহিয়া। করুণাময়ী, অপার তোমার করুণা—যে যত অযোগ্য, যে যত অধম, তাহারই প্রতি তোমার তত অধিক করুণা!

কয়েক বৎসর পরে আবার কলিকাতায় মায়ের বাড়িতে (উদ্বোধন অফিসে) পুনরায় তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। একবারের কথা সুস্পষ্টভাবে মনে আছে। সেবার স্বামী—[মাধবানন্দ] দোতলায় মায়ের ঘরের দ্বারে উপস্থিত ছিলেন। আমি দোতলায় গিয়া সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেই তিনি মাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—"মা, এই যে অনুকূল এসেছে। সেই আমরা একত্রে জয়রামবাটী গিয়েছিলুম।" আমি ঘরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মা তখন বসিয়াছিলেন ঘরের পশ্চিম পার্শ্বে তক্তাপোশের উপরে। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, —"মা, আমি কি এখন আপনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারি ?" যতদূর মনে পড়ে, আমি তখন অস্নাত ছিলাম এবং বাস করিতেছিলাম কলেজের মেসে। ঈষৎ হাসিয়া মা বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, বাবা, এস, এস।" আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া পুনরায় প্রণাম করিলাম। কেন বলিতে পারি না, এবারও মা সর্বপ্রথম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেই পূর্বেকার প্রশ্ন,— "বাবা, তোমার বে' হয়েছে ?"—যে প্রশ্ন আমার মানবজীবনের পরম মাহেন্দ্রক্ষণে এক অপরাহ্ণে জয়রামবাটীতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এবার অতি অল্পক্ষণ কথাবার্তা হইয়াছিল, কারণ বহু ভক্ত একের পর এক তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে সেই সময় আসিতেছিলেন।

আজ মনে হয়—তখন অবশ্য বয়সের অল্পতার দরুণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই—মহাশক্তি-স্বরূপিণী হইয়াও নিজের স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া রাখিয়া, কি ভাবে সাধারণ পল্লীবধূরূপে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ দৈনন্দিন কর্ম করিতে হয়, তাহার তুলনারহিত, উপমারহিত দৃষ্টান্ত জগতের সমক্ষে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রশক্তি মদমত্ত নরনারীর সম্মুখে জননী সারদাদেবী রাখিয়া গিয়াছেন—আর রাখিয়া গিয়াছেন, অপার করুণার, অসীম কৃপার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

উপরে বর্ণিত স্মৃতিকথাটি স্বামী চেতনানন্দ কর্তৃক সংকলিত এবং উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'মাতৃদর্শন' নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ পদপ্রান্তে*

(১)

স্বামী মাধবানন্দ

তখন ১৯০৯ সাল।···বেলুড় মঠের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের সস্নেহ ব্যবস্থাপনায় আমি একদিন নিঃশব্দে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে মাদ্রাজ মেলে উঠে বসলাম এবং এ ব্যাপার ঘটল পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে আসার কয়েক ঘণ্টা পরেই।

বাইশে এপ্রিল প্রায় দুপুরবেলায় আমি মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে পেঁাছলাম। এক ভদ্রলোক আমাকে মায়লাপুরে ব্রডিস্ রোডের খুব কাছেই একটা জায়গায় ট্রাম থেকে নামতে বললেন এবং আমাকে বলে দিলেন আমি যেন বড় রাস্তা ধরে না যাই। কিন্তু তাঁর সেই নির্দেশের এক সাংঘাতিক ভুল মানে করে আমি কয়েক গজ দূরের একটি গরুর গাড়ী-চলা পথ ধরে একটি নারকেল বাগানের মাঝখানে গিয়ে পড়লাম। যার ফলে মাদ্রাজ মঠে পেঁাছতে মাত্র কয়েক মিনিটের বদলে ঘুরপথে আমার প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগল।

···সেই সময় মঠ ছিল অতিথি অভ্যাগতজনে পরিপূর্ণ। কারণ রামকৃষ্ণ-সংঘের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ('মহারাজ' নামেই যিনি বেশী পরিচিত ছিলেন) বাঙ্গালোরের নতুন আশ্রম-ভবন উদ্বোধন করে কিছুদিন হল স-পার্ষদ সেখানে এসেছেন।···বিকেলের দিকে 'মহারাজ'-এর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। অন্যান্য কথাবার্তার মাঝে 'মহারাজ' আমার হাতের রেখা দেখলেন, কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না। পরে আমি শুনেছিলাম যে তখনকার মত ফিরে গিয়ে আবার পরে এসে সংঘে যোগদান করব—তিনি এইরকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আমি লক্ষ্য করে দেখেছিলাম যে 'মহারাজ'-এর উপস্থিতি সকলের কাছেই ছিল কৃপা ও আশীর্বাদের অফুরন্ত উৎসস্বরূপ।

তিনি আক্ষরিক অর্থেই আনন্দ বিকিরণ করতেন এবং দীনতম ব্যক্তিও সে আলোর প্রসাদ পেত। তিনি একটি বালকের মতই মজা করে আনন্দ পেতেন। তাঁর সঙ্গে একটি অল্প-বয়সী উড়িষ্যাবাসী পাচক ছিল—যে সামান্যতম প্ররোচনাতেই খুব হাসত। সেইজন্য 'মহারাজ' তাকে নিয়েই বেশী মজা করতেন। আমিও তাঁর পরিহাস ও কৌতুকের একটি পাত্র হয়ে উঠেছিলাম।

---

*'বেদান্ত কেশরী', আগষ্ট, ১৯৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী মাধবানন্দ রচিত 'AT THE FEET OF THE SAINTS IN THE MADRAS MATH' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

বাংলা অনুবাদ—**নচিকেতা ভরদ্বাজ**।

আমার মাদ্রাজ মঠে পৌঁছবার পরের দিনই তিনি সবার সামনেই আমাকে দেওয়ালে ঝোলানো তাঁর একটি সদ্য তোলা ফটোগ্রাফ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি মঠের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দকে চেন ? দ্যাখো তো এই ছবির সঙ্গে মেলে কি না ?"

আমি শুধু একটু হাসলাম। তাতে তিনি বললেন, "ও তাঁকে চেনে না !" যখন উনি শুনলেন যে আমার মাদ্রাজে আসার খবর আমি আমার বাড়িতে জানিয়েছি, তখন বললেন, "কি সর্বনাশ ! তাঁরা সব তোমার খোঁজে এসে পড়বেন যে।" তখন আমি জানালাম যে স্বামী সারদানন্দের নির্দেশেই আমি একাজ করেছি, তাতে তিনি বললেন, "তবু তোমার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।" যাই হোক, সেই আনন্দময় দিনগুলি শীঘ্রই শেষ হয়ে আসছিল। কারণ আমি জানতে পারলাম যে 'মহারাজ' আর তিন দিনের মধ্যেই পুরী রওনা হয়ে যাচ্ছেন।

'মহারাজ'-এর প্রতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের যে শুধুই গভীর ভালবাসা ছিল তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের 'মানসপুত্র' রূপে তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ ভাবও ছিল। এই ব্যাপারে এমনকি তাঁর অন্যান্য গুরুভাইদের চেয়ে তাঁকে অগ্রণী মনে হত। তিনি [স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] আমাকে একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নশ্বর দেহে বর্তমান সেসময় স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁর গুরুভাইদের ডেকে বললেন, "রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম) আমাদের রাজা আর তোমরা সবাই তাঁর প্রজা।" কি করে সকল বিষয়ে পূজ্যপাদ 'মহারাজ'-কে প্রসন্ন রাখবেন,—এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা ও প্রয়াস ! প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায় যে 'মহারাজ'-এর সামান্যতম অসন্তুষ্টিতে তাঁর মর্ম-যন্ত্রণার শেষ থাকত না। অতি দীনভাবে মহারাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্যন্ত তিনি স্থির হতে পারতেন না।

আমি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে' পড়েছিলাম যে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে বলতেন, 'নিত্যশুদ্ধসত্ত্ব সিদ্ধ আত্মা'। তাতে আমার মনে হয়েছিল যে বাহ্যজগতের প্রতি নির্লিপ্ত হয়ে তিনি বোধহয় একমাত্র ঈশ্বর-চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকেন। তার পরিবর্তে দেখলাম তিনি সবার সঙ্গে বসে তাস খেলছেন ! কিন্তু আমি চুপচাপই থাকলাম। একদিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নিজে থেকেই এ প্রসঙ্গটি তুললেন এবং আমাকে বললেন, "এই যে 'মহারাজ' তাস খেলছেন এটা আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। 'মহারাজ' এত উচ্চ আধ্যাত্মিক চেতনার স্তরে থাকেন যে সর্বক্ষণ ঐ উচ্চ ভাবলোকে বিচরণ করলে তাঁর ভৌতিক দেহ বেশীদিন থাকবে না। সেইজন্যই আমরা তাঁকে খেলতে বলি—যাতে তাঁর মন একটু বিশ্রাম পায়।" তখন আমি বুঝতে পারলাম যে তাঁর মত অধ্যাত্ম জগতের একজন বিরাট পুরুষকে সাধারণ মানদণ্ডে বিচার করে আমি কি অবিবেচনার কাজই না করেছি।

পূর্ব-নির্দিষ্ট দিনে 'মহারাজ' চলে গেলেন এবং ষ্টেশনে তাঁকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমাকে বললেন, "মহারাজ-এর মতো একজন উচ্চপর্যায়ের সাধকের জন্য সবকিছু আপনা থেকেই ব্যবস্থা হয়ে যায়। 'মহারাজ' ইওরোপীয়ানদের সঙ্গে ভ্রমণ করতে অস্বস্তি বোধ করেন। কিন্তু তিনি পাখা ও সব ব্যবস্থা সমেত এক শয্যার প্রথম শ্রেণীর একটি কামরাই (coupe) পেয়ে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 'মহারাজ'-এর জন্য খুবই চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং তাঁকে এত সব সুযোগ সুবিধা দিতেন—যা আমরা অন্যান্য গুরুভাইয়েরা কেউ পেতাম না।

এমনকি কখনও কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ 'মহারাজ'-কে কাঁধে তুলে নিতেন। একদিন 'মহারাজ' এমন ছেলেমানুষের মত কাণ্ড করেছিলেন—যা দেখে ঠাকুর কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছিলেন, 'তুই এত সরল! হায়, আমি চলে গেলে তখন তোকে কে দেখবে?' কিন্তু তুমি দ্যাখো,—জগজ্জননী মা তাঁর জন্য সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন!"

রওনা হওয়ার আগে 'মহারাজ' আমাকে বলেছিলেন, "এখানে তুমি এক সাধকের কাছে থাকবে, তাঁর সেবা করে যাও।"

…যে আনন্দমুখর দিনগুলি অতিবাহিত করছিলাম—তা শেষ হয়ে আসছিল। 'মহারাজ'-এর ভবিষ্যদ্বাণীই শেষ পর্যন্ত সত্য হল। আমার একজন প্রবীণ বিদ্যালয় শিক্ষক, এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এখানে চলে এলেন। তাঁর সঙ্গে আমার সমস্ত যুক্তিতর্ক ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ায়—আমি বুঝলাম আমাকে বাড়িতে ফিরে যেতেই হবে।

…শশী মহারাজ [স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] আমাদের কলকাতা যাওয়ার পথে পুরীতে নামতে উপদেশ দিলেন ('মহারাজ'-কে প্রণাম জানিয়ে আসা এবং প্রভু জগন্নাথকে দর্শন করার জন্য—যা আমরা করতামই) ; এবং আমার শিক্ষক মহাশয়কে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বললেন, "আপনি ওখানে জীবন্ত জগন্নাথকে দেখতে পাবেন," (তিনি 'মহারাজ'-এর কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন)।

'মহারাজ'-এর প্রতি কি সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল শশী মহারাজের—তার পরিচয় বহন করছে এই কথা কয়টি।

…পুরীতে আমরা পূজ্যপাদ 'মহারাজ'-কে দর্শন করে ধন্য হয়েছিলাম। সেখানে আমাদের দেখে তাঁর কি মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা চার মাস পরে যখন সেখানেই তাঁর সঙ্গে আবার আমার দেখা হয়েছিল তখন জানতে পেরেছিলাম। তিনি তাঁর একজন বন্ধুকে বললেন: "ছেলেটিকে যেন গ্রেপ্তারি-পরোয়ানা দিয়ে নির্দয় ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে আমার খুবই কষ্ট হয়েছিল!" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যে তাঁকে এ ব্যাপারে সবিস্তারে জানিয়েছিলেন তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

" 'মহারাজ'-এর প্রতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের যে শুধুই গভীর ভালবাসা ছিল তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের 'মানসপুত্র'রূপে তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ ভাবও ছিল।"—পৃষ্ঠা ৮৫

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী অম্বিকানন্দ—১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ মঠে গৃহীত চিত্র।
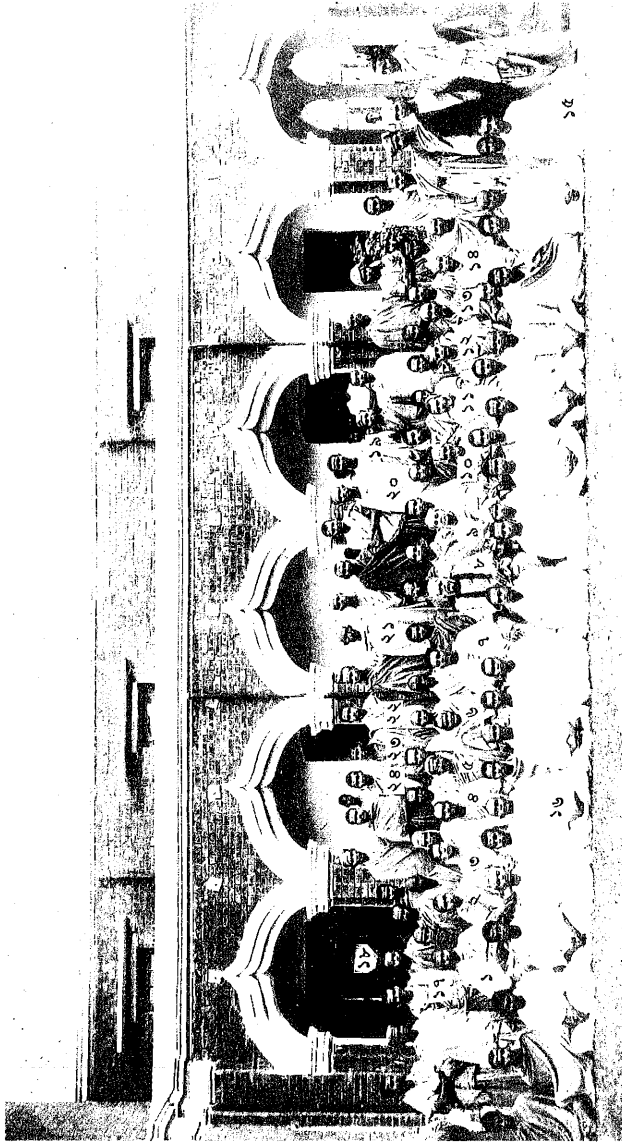
"মহারাজ কাশীতে অদ্বৈতাশ্রমে ও সেবাশ্রমে এক নূতন আধ্যাত্মিক ভাবের স্রোত আনিয়া দেন।"—পৃষ্ঠা ৮৭

৯২১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কাশী সেবাশ্রমে গৃহীত চিত্র : ১। স্বামী দুর্গানন্দ (?), ২। স্বামী মাধবানন্দ, ৩। স্বামী শর্বানন্দ, ৪। স্বামী অম্বিকানন্দ (?), ৫। স্বামী মহির্মানন্দ, । স্বামী সুবোধানন্দ, ৭। স্বামী সারদানন্দ, ৮। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ৯। স্বামী তুরীয়ানন্দ, ১০। স্বামী সচ্চিদানন্দ (বুড়ো বাবা), ১১। স্বামী শুদ্ধানন্দ, ১২। স্বামী শঙ্করানন্দ, ১৩। ামী অচলানন্দ, ১৪। স্বামী শান্তানন্দ, ১৫। স্বামী পবিত্রানন্দ, ১৬। স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ (হেম), ১৭। স্বামী যতীশ্বরানন্দ, ১৮। স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ, ১৯। স্বামী প্রবোধানন্দ নৎ), ২০। স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ, ২১। স্বামী যোগীশ্বরানন্দ (উপুদা), ২২। স্বামী দয়ানন্দ, ২৩। স্বামী রামেশ্বরানন্দ ও ২৪। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ পদপ্রান্তে*

(২)

স্বামী যতীশ্বরানন্দ

[১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল কলেজের ছাত্র তরুণ নির্মল প্রথম দর্শন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দকে। পরম বিস্ময় ও অপরিসীম কৌতূহলের সঙ্গে নির্মল প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক আনন্দময় যোগী পুরুষকে—যিনি তাঁর মত নবাগত এ ক যুবকের সঙ্গে কৌতুক করেন, তাস খেলেন অথবা পাচকের সঙ্গে রঙ্গ করেন। তারপর দীর্ঘ এক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে! সেদিনের নবীন নির্মল এখন স্বামী মাধবানন্দ—রামকৃষ্ণ সংঘের গুরুত্বপূর্ণ শাখাকেন্দ্র মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। বর্তমান ঘটনার সময়কাল ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী। পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে পূজনীয় রাজা মহারাজের পদচ্ছায়াতলে বেশ কয়েকটি দিন অতিবাহিত হল স্বামী মাধবানন্দের। বর্তমান স্মৃতিচারণকার স্বামী যতীশ্বরানন্দ লিখেছেন যে শ্রীশ্রীমহারাজকে এটাই তাঁর শেষ দর্শন। স্বামী মাধবানন্দেরও রাজা মহারাজকে এটাই অন্তিম দর্শন—একথা নিশ্চিত রূপে বলা না গেলেও, অন্তিম পর্বের দর্শন অবশ্যই বলা যায়, কারণ, এই ঘটনার পর কিঞ্চিৎ অধিক এক বছর কাল রাজা মহারাজ স্থূল দেহে বর্তমান ছিলেন। আর সুদূর মায়াবতী থেকে চট করে আসা তখন যে সহজসাধ্য ছিল না—সেকথা মাধবানন্দজী নিজেই উল্লেখ করেছেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহাসমাধিতে মগ্ন হন। উল্লেখ্য, শরীর ত্যাগের ঠিক এক মাস আগে (১০ই মার্চ, ১৯২২) স্বয়ং স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রস্তাবক্রমে স্বামী মাধবানন্দ এবং স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রামকৃষ্ণ মঠের অছি (Trustee) এবং রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এভাবেই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ সংঘের দুই ভবিষ্যৎ কর্ণধারকে নির্ধারিত করে যান।]

শ্রীশ্রীমহারাজকে আমার শেষ দর্শন কাশীতে—১৯২১ সালের প্রারম্ভে স্বামীজীর উৎসবের পূর্বে। আমি তখন পূজনীয় হরি মহারাজের নিকটে ছিলাম। মহারাজ কাশীতে অদ্বৈতাশ্রমে ও সেবাশ্রমে এক নূতন আধ্যাত্মিক ভাবের স্রোত আনিয়া দেন। এই সময় তিনি আমাকেও খুব আধ্যাত্মিক প্রেরণা দেন।

…শ্রীশ্রীমহারাজের ইচ্ছা আমি মায়াবতী গিয়া 'প্রবুদ্ধ ভারতের' ভার লই। আমাকে তিনি নিজে কিছুই বলেন নাই। পূজনীয় সুধীর মহারাজ [স্বামী

---

* অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'স্বামী যতীশ্বরানন্দ' পুস্তকের 'শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

শুদ্ধানন্দ], নির্মল মহারাজ [স্বামী মাধবানন্দ] একাধিকবার আমাকে মায়াবতী যাইবার সম্বন্ধে বলেন। আমি বিশেষভাবে নারাজ হই।

তখন পূজনীয় হরি মহারাজের…সেবার কাজ লইয়া একদিন ব্যাপৃত আছি। সকালে হঠাৎ বোধ করিলাম, আমার ভিতরে কি যেন একটা ভাঙিয়া পড়িতেছে ও প্রাণের ভিতর হইতে কান্না পাইতেছে। চোখ দিয়া খুব জলও পড়িতে লাগিল। চোখের জল মুছি, আবার পড়িতে থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতর একটা খুব শরণাগতির ভাব আসিয়া যাইতেছে দেখিলাম। বুঝিলাম শ্রীশ্রীমহারাজের ইহা একটা লীলা। তিনি কৃপা করিয়া আমার মনের গোঁ ও আরো অন্তরায় ভাঙিয়া দূর করিয়া দিতেছেন। সন্ধ্যা নাগাদ আমার মনটা পরিষ্কার হইয়া গেল।

ইহার পর একদিন সকালে শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিতে গিয়াছি। তখন তিনি আমাকে বলিলেন,—"দেখ্, ওদের [সুধীর মহারাজ, নির্মল মহারাজ প্রভৃতি] সকলের ইচ্ছা তুই মায়াবতী যাস ও 'প্রবুদ্ধ ভারতের' ভার নিস।" ইতিপূর্বেই তিনি আমার গোঁ ভাঙিয়া দিয়াছেন। আমি কোন রকম দ্বিধা না করিয়া বলিলাম—"মহারাজ, আপনি যদি আদেশ করেন নিশ্চয়ই যাইব।" মহারাজ এই উত্তর শুনিয়া খুব প্রসন্ন হইলেন ও আশীর্বাদ করিলেন। এরপর আমার মায়াবতী যাওয়া স্থির হইল।

একদিন সকালে মহারাজকে প্রণাম করিয়া সুধীর মহারাজ, নির্মল মহারাজ প্রভৃতি অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে তাঁহার নিকটে বসি। মহারাজ আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন—"সাধন-ভজন কিরূপ চলিতেছে?" আমি উত্তরে বলি—"অনেক কাজ করিতে হয়। বিশেষ সময় পাই না।" মহারাজ বলিলেন,—"কাজের জন্য সময় পাওয়া যায় না এইরূপ মনে করা ভুল। মনের চঞ্চলতার জন্য ঐরূপ মনে হয়।" এরপর মহারাজের কথার বন্যা খুলিয়া গেল। তিনি খুব ভাবের সহিত বলিলেন—"Work and Worship একসঙ্গে করিয়া মনকে তৈয়ার করিতে হয়।" এইসব কথা 'Spiritual Teachings'*-এর 'Work and Worship' Chapter'-এ আছে।…[তিনি] এই দিন নির্মল মহারাজের সঙ্গে ও সব সাধু-ভ্রাতাদের সঙ্গে আমার এক বিশেষ প্রীতির ভাব স্থাপন করিয়া দেন। [তিনি] বলেন—"নির্মলও যেমন আমার আপনার তুইও তেমনি আমার

---

* অদ্বৈত আশ্রম থেকে ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'স্বামী যতীশ্বরানন্দ' পুস্তকে স্বামী যতীশ্বরানন্দ লিখিত 'শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতি' শীর্ষক স্মৃতিকথায় এস্থলে 'Spiritual Teachings' নামক পুস্তকের উল্লেখ আছে। বাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ থেকে ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Meditation and Spiritual Life' পুস্তকে স্বামী যতীশ্বরানন্দ লিখিত উক্ত স্মৃতিকথার ইংরেজী অনুবাদে এস্থলে 'The Eternal Companion' নামক পুস্তকের উল্লেখ আছে।

আপনার, এমনি সকলেই।"

যখন ভাবি সকলেই তো মহারাজের আপনার তখন সকলকে আমারও আপনার বলিয়া বোধ হয়। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার নিজের শিষ্য ও শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য সকলকেই আপনার মনে করিতেন ও সকলেই ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করিতে আসিয়াছে বলিতেন। একদিন···বলেন—"কর্ম ঠাকুর-স্বামীজীর এই ভাব নিয়ে করলে কোনও বন্ধন তো হইবেই না, অধিকন্তু তার through দিয়ে spiritual, moral, intellectual এবং physical সব রকম উন্নতি হবে। তাঁহাদের পায়ে আত্মসমর্পণ কর। শরীর মন সব তাঁদের পায়ে দিয়ে দে। তাঁদের গোলাম হয়ে যা।"

শ্রীশ্রীমহারাজের এই···উপদেশ জীবনের সম্বল হইয়া আছে।

'Spiritual Teachings of Swami Brahmananda' ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ মঠ থেকে প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের বিষয়বস্তু ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ মঠ থেকে প্রকাশিত 'The Eternal Companion' নামক গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিবর্ধিত সংস্করণে সংযোজিত করা হয়। এই দুটি গ্রন্থ এবং উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' নামক গ্রন্থে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী কাশী অদ্বৈত আশ্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন সন্নিবেশিত হয়েছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ পদপ্রান্তে*

(৩)

[ঘটনাকাল ১৯২১ খৃষ্টাব্দ। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ স্বামী যতীশ্বরানন্দকে অনুরোধ করেন যে মায়াবতীতে গিয়ে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। কাশীতে সাধন-ভজনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে ব্যাপৃত স্বামী যতীশ্বরানন্দ ঐ প্রস্তাবে অসম্মত হন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী কাশী অদ্বৈত আশ্রমে স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী যতীশ্বরানন্দ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ স্বামী ব্রহ্মানন্দের পদতলে সমবেত হলে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রধানতঃ স্বামী যতীশ্বরানন্দকে উদ্দেশ্য করে নিম্নোক্ত উপদেশ দেন।]

স্থান—অদ্বৈতাশ্রম, কাশীধাম

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২১

মহারাজ—সাধন-ভজন কেমন হচ্ছে ?

উত্তর—কাজের জন্য ধ্যান-জপ করবার সময় পাই না।

মহারাজ—মনের গোলমালের জন্য ধ্যান-জপ হয় না। কাজের জন্য ধ্যান-জপের সময় না পাওয়া মনে করা ভুল। Work and worship (কর্ম এবং উপাসনা) এক সঙ্গে করবার অভ্যাস করতে হবে। কেবল সাধন-ভজন নিয়ে থাকতে পারলে ভাল, কিন্তু কয়জনে তা পারে? কিছু না করে অজগরবৃত্তি অবলম্বন করে থাকে এক idiot-রা (জড়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা)—যাদের brain (মস্তিষ্ক) খাটাবার শক্তি নেই, কোনরকমে বেঁচে থাকে, তারাই পারে—আর এক মহাপুরুষরা পারেন, যাঁরা কর্মের পার। গীতায় আছে, কর্ম না করে জ্ঞানলাভ হয় না। কর্মের মধ্য দিয়ে যেতেই হয়। যারা কর্ম ছেড়ে দিয়ে সাধন-ভজন করে, তাদেরও ঝুবড়ি বাঁধতে আর রান্না করতে সময় কেটে যায়। কর্ম ঠাকুর-স্বামীজীর—এই ভাব নিয়ে করলে কোনও বন্ধন তো হবেই না, অধিকন্তু তার through (মধ্য) দিয়ে spiritual, moral, intellectual and physical (আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক এবং শারীরিক) সব রকম উন্নতি হবে। তাঁদের পায়ে আত্মসমর্পণ কর। শরীর-মন সব তাঁদের পায়ে দিয়ে দাও। তাঁদের গোলাম হয়ে যাও। বল—এই শরীর-মন সব তোমাদের দিয়ে দিলুম, এর দ্বারা যা দরকার কর; আমার

---

* উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' পুস্তকের ১০৯-১১৩ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু হয়, করবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তখন তোমার ভার তাঁদের উপর। তোমাকে নিজে আর কিছু করতে হবে না। ঠিক ঠিক এইটি করা চাই। নইলে "রামও বলবে আবার কাপড়ও তুলবে"—এ চলবে না। আমরাও তো পাঁচ-ছ' বছর ঘুরে ঘুরে তারপর কাজে লাগি। স্বামীজী আমাকে ডেকে বললেন, "ওরে, ওতে কিছু নেই—কাজ কর।" আমরাও তখন সব রকম কাজ করেছি। কই তাতে তো কিছু খারাপ হয়েছে বলে বুঝতে পারি নি। তবে আমাদের স্বামীজীর কথায় একটা শ্রদ্ধা ছিল। তোমরাও এঁদের কথায় বিশ্বাস রেখে চলে যাও। কিছুই ভয় নেই। একটা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ। কত লোকে এ কথায় ভাঙচি দেবে—'ও আবার ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ কি?' কারু কথা শুনবে না। জগৎ যদি বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবু ছাড়বে না—যেটা পাকা করে ধরেছ।

প্রশ্ন—শুধু ধ্যান-জপ নিয়ে থাকা বড়ই কঠিন। আমি তো বেশী দিন পারলুম না।

মহারাজ—কর্ম ও উপাসনা এক সঙ্গেই করতে হয়। দু-চার বার পারিস নি বলেই পারবি নি কেন? বারবার চেষ্টা করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, "বাছুরটা দাঁড়াতে গিয়ে শতবার পড়ে যায়, তবুও ছাড়ে না, শেষে দৌড়ুতে শেখে।"

প্রথমতঃ কর্মের মধ্যে থাকলে একটা training (গড়ন) হয়। তখন সেই মনকে সাধন-ভজনে লাগাতে পারা যায়। নইলে ভাসাভাসা রাখলে সাধন-ভজনের সময়ও সেইমত হয়। একটা সময় আসে যখন সব ছেড়ে শুধু জপ-ধ্যান নিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়, তখন কাজ অমনি ছুটে যায়। মন যখন জাগ্রত হয়, তখনই এটা হয়। নতুবা জোর করে করতে গেলে দু-চার দিন ভাল লাগে, তারপরেই আবার monotony (একঘেয়ে ভাব) আসে। কেউ কেউ হয়ত পাগল হয়ে যায়। কেউ কেউ ভাসাভাসা রকমে করে—আর দশটা জিনিসে মন থাকে।

ব্রহ্মচর্যের দ্বারা খুব শক্তি হয়। একটা লোক পঁচিশটা লোকের কাজ করতে পারে। আগেকার ব্রহ্মচর্যের নিয়মের মধ্যে কতকগুলি নিয়ম ছিল—জপ, ধ্যান, স্বাধ্যায়, তীর্থভ্রমণ, সৎসঙ্গ, এই সব। নিজের কিসে ভাল হবে সবাই কি জানতে পারে? সেইজন্য গুরু ও মহাত্মাদের সঙ্গ করতে হয়। তোকে পুরো freedom (স্বাধীনতা) দিচ্ছি। কর দেখি, কয়দিন করতে পারিস? দু-চার দিন। মন এখন কাঁচা বলে, trained (নিয়ন্ত্রিত) নয় বলে যত গোল হচ্ছে। আড্ডার মত শত্রু নেই। ওতে একেবারে ruin (অধঃপতন) এনে দেয়। নির্জনবাস না করলে মনের workings (ক্রিয়া) বুঝতে পারা যায় না—আর সত্য সব ধরতে পারা যায় না। নানা রকম হট্টগোলের মধ্যে থাকলে ভাবের development (বিকাশ) হওয়া ভারী শক্ত।

হিমালয়ের মত জায়গা আছে? কি নির্জন, কেমন পবিত্র! শিবের

স্থান—মাথা ঠাণ্ডা থাকে। চার ঘণ্টার কাজ এক ঘণ্টায় হয়ে যায়। আমি সকলকে স্বাধীনতা দিই, নিজের নিজের ভাবে সকলে এগিয়ে যাক। যখন দেখি পারছে না, তখন help (সাহায্য) করি।

একটা জায়গায় ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ নিয়ে পড়ে থাকা সব রকমে ভাল। এমনি বেশী দিন থাকলে হয়ত তোরও মনে হতে পারে কিছু করি না, বসে বসে খাই—আর অন্য লোকও সে কথা বলতে পারে। একটা কাজ নিয়ে থাকলে মনও থাকে ভাল, শরীরও থাকে ভাল। আমরা যখন কাজ করতুম, তখন শরীর-মন কেমন থাকত! লোকে মনে করে, এঁরা কিছুই কাজ করেন না—যেমন আমি, একটা স্থূল উদাহরণ হিসাবে বলছি; তেমনি আমরাও কাজ না করে থাকব না কেন? ও-রকম বুদ্ধি কখনও করিস নি। অনন্ত জীবন পড়ে রয়েছে। দু-চারটা জন্ম না হয় তাঁদের কাজে দিয়ে দিলি। ভুলও যদি হয়, না হয় দু-চার জন্ম গেলই। কিন্তু তা হয় না। তাঁদের কৃপায় দেখিস হাউইয়ের মত কোথায় উঠে যাবি! ওরকম করে আলগা দিয়ে আর কাটাস নে। ল্যাদাড়ে হলে সাধন-ভজনও হবে না। যেটুকু করবি ষোল-আনা মন দিয়ে করবি—ওই হল কাজের secret (কৌশল)। স্বামীজীও আমাদের এই কথা বলতেন। **লেগে যা। একখানা কাগজ চালান তোদের পক্ষে কিছুই না। কাজ করবার সময় একবার তাঁদের প্রণাম করবি। আবার কাজ করতে করতে মাঝে interval (অবসর) পেলে তাঁদের স্মরণ-মনন করবি। কাজ শেষ করে আবার প্রণাম করবি। তাঁদের কথা, তাঁদের চিন্তা, তাঁদের উপদেশ—এই সব চিন্তা করে দিন কাটাবি। মনে করিস নি যে এইসব নি-এর [নির্মলের] কাজ। ভাববি যে ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ। নি—[নির্মল] কিছু বললে মনে করবি যে বড় ভাই দুটো কথা বলেছে। সব এক পরিবারের লোক, ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন ব্যবহার হয় তেমনি করবি। নি [নির্মল] যেমন আমার আপনার, তুইও তাই। সেই রকম সব।**

মনকে শান্ত করতে হবে। Inertia-র (জড়ত্বের) প্রশ্রয় না দিয়ে স্থিরভাবে মনকে প্রশান্ত করতে হবে। নতুবা reaction (প্রতিক্রিয়া) সামলান যায় না—ফল খারাপ হয়। জপ-ধ্যান দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি আপনিই সংযত হয়ে আসে, কিন্তু প্রথমে উহাদিগকে বশে রাখবার চেষ্টা করতে হয়। জপ-ধ্যান এক sitting-এ (আসনে) অনেকক্ষণ করবার শক্তি ক্রমশঃ হয়। প্রথমে দিনের মধ্যে চার-পাঁচবার বসতে অভ্যাস করা ভাল। মন লাগুক, আর নাই লাগুক জপ করে যাওয়া উচিত। কারণ, বসতে বসতে হয়ত মন আবার একাগ্র হল। এইরূপ হবার খুব সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং, ঐ শান্ত ভাবটার জন্য অনিচ্ছা-সত্ত্বেও জপ-ধ্যান করে যাওয়া ভাল। কুণ্ডলিনী-চৈতন্য হলে রিপুটিপু কোথায় পড়ে থাকে। তখন মনেও হয় না যে, সে-সব আছে।

স্বামী শিবানন্দ সমীপে*

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

[স্বামী মাধবানন্দ ছাত্রাবস্থায় রামকৃষ্ণ সংঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের সান্নিধ্য লাভ করেন। উত্তরকালে মাধবানন্দজী লিখেছেন যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাদ্রাজ মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে যাওয়ার পূর্বে তিনি সে বিষয়ে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ লাভ করেছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্বামী মাধবানন্দ রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন। সেই সময় থেকে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমনের দিন অবধি সুদীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল এই শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের পবিত্র সাহচর্য লাভ করেন স্বামী মাধবানন্দ। প্রথম এক যুগ (১৯১০-১৯২২) স্বামী শিবানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ সংঘের সহাধ্যক্ষ এবং স্বামী মাধবানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের দায়িত্বশীল পদে। দ্বিতীয় এক যুগ (১৯২২-১৯৩৪) স্বামী শিবানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ সংঘের সংঘাধ্যক্ষ এবং স্বামী মাধবানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠের অছি (Trustee) এবং রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন কমিটির সদস্য। এই বিস্তৃত সময়কালে স্বামী মাধবানন্দের জীবনে মহাপুরুষ মহারাজের স্নেহ-সিক্ত কত দিনের স্মৃতি, সান্নিধ্য-ধন্য কত কাহিনী আজ কালস্রোতের অমোঘ গতিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিস্মৃতির অতলে নিহিত সেই অতীতের দুটি দিনের স্মৃতি-বিভাসিত চিত্র সংগ্রহ করে এখানে সন্নিবেশিত হল।]

আজ ১২ই জানুয়ারী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ, পৌষের শুক্লা চতুর্দশী।

শ্রীমহাপুরুষ ইজি-চেয়ারে বসা। পিছনে স্বামীজীর ঘরের বারান্দার দরজা। বাম হাতে প্যাসেজ। সাধুরা মেঝেতে সতরঞ্জির উপর বসিয়াছেন। কেহ খোকা মহারাজের ঘরে। কেহ বা রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পিছনে গঙ্গা।

উপস্থিত—স্বামী শংকরানন্দ, শর্বানন্দ, মাধবানন্দ, ওঙ্কারানন্দ, শাশ্বতানন্দ, নিখিলানন্দ, দেবেশানন্দ, ঈশানানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ।

একজন সাধু বক্তৃতার নোট লইতেছেন। উহা প্রকাশিত হয় উদ্বোধন, প্রবুদ্ধ ভারত ও বেদান্ত কেশরীতে। প্রকাশিত হইলে দেখা যায় উহাতে কিছু বাদ পড়িয়া গিয়াছে। তাই আর একজন সাধুর ডায়েরী হইতে নিম্নে ঐ অংশ সংযোজন করা হইল।

শ্রীমহাপুরুষ—হরি মহারাজকে শ্রীমহারাজ বলতেন শুকদেবতুল্য। সারা

---

* শ্রীম দর্শন, পঞ্চদশ ভাগ, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৮ এবং ৩০১-৩০৩ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম প্রকাশন ট্রাষ্টের অনুমতিক্রমে গৃহীত।

জীবন তপস্যা করেছেন। শেষে তবুও লোকের উপকার হল (অসুখে সেবার সময়)।

স্বামী মাধবানন্দ (শ্রীমহাপুরুষের প্রতি)—কাজ করতে চায় না কেউ, ধ্যান করতে চায়। কাজ করতে গেলে লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। তাই কাজে যেতে চায় না।

শ্রীমহাপুরুষ (করুণামাখা স্বরে, অনুরোধের ভাবে)—তাদের বলতে হয় একটু তলিয়ে দেখতে। এ কাজ আরম্ভ হয় তাঁর (ঠাকুরের) শরীর থাকতে, কাশীপুর বাগানে। সেখানেই কাজের আরম্ভ—তাঁর সেবায়।

এখানে যারা এয়েছে সকলেই জ্ঞানী। তাদের বেশী কিছু বলতে হয় না। আমার তো এই ধারণা। আমরা দেখেছিও তাই। তা আমি তো তাঁর চরণতলে পড়ে রয়েছি। যদি আমাকে বলতে বল, আমিও বলতে পারি।

শ্রীমহাপুরুষ (প্রশ্নের উত্তরে)—প্রথমে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে কাজ করতে হয়। শেষে নিজেই বুঝতে পারে যে কাজেতেও তাঁর সেবা হয়।

কিন্তু বাবা, সাধন ভজন চাই। সাধন ভজন ছেড়ে দিলে কি কাজ করবে ? দিনে দুই তিনবার অন্ততঃ এই বিচার করবে, আমি আর তিনি (ঠাকুর), ঈশ্বর আছেন। শেষে আমিও নাই—কেবল তিনি। ঐ সময় মঠফট, কাজকর্ম সব উড়িয়ে দিবে।

স্বামী শর্বানন্দ—কাজে ধ্যান জপের কাজ হয় না ? কাজ থেকে ধ্যান জপ বড় কি ?

স্বামী ওঙ্কারানন্দ—নিশ্চিত। সমাধিলাভের অব্যবহিত কারণ যখন ধ্যান, তখন ধ্যান বড় বই কি ? বস্তা টেনে টেনে কে কখন সমাধিলাভ করেছে ?

স্বামী মাধবানন্দ—হাঁ, অন্তরঙ্গ সাধন আর বহিরঙ্গ সাধন।

শ্রীমহাপুরুষ পূর্বোক্ত কথোপকথন শুনিয়াই উল্লিখিতরূপ উপদেশ দেন।

স্বামী নিখিলানন্দ—মহারাজ, সংঘের কথা ঠাকুরের আদেশ। সংঘ তো, যাঁরা ওয়ার্কিং কমিটিতে আছেন, কিম্বা যাঁরা ট্রাস্টি—তারাই তো ?

শ্রীমহাপুরুষ (ইহার স্পষ্ট উত্তর না দিয়া)—হাঁ, কাজ করতে হলে একজনের কথা তো শুনতে হয়। না হলে কাজ হয় না।

আমায় যদি বল তো আমি এ্যাপিল করে বলব। আমি দেখেছি, বুঝিয়ে বললে কেউ কখনও অবাধ্য হয় না। সকলেই জ্ঞানী।

স্বামী শংকরানন্দ—মহারাজ পুরীতে থাকার সময়, কেদারবাবাকে ধ্যান জপের কথায় খুব encourage (উৎসাহিত) করতেন।

২১শে অক্টোবর, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ, মঙ্গলবার।

আজ মহাপুরুষের শরীর একটু ভাল। তাই তিনি বেশ প্রসন্ন। এখন সকাল সাড়ে ছয়টা। উনি খাটে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। সম্মুখে ও পার্শ্বে

সাধুগণে গৃহ পরিপূর্ণ। প্রবেশপথও বন্ধ। তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন স্বামী মাধবানন্দ, তপানন্দ, রামেশ্বরানন্দ। তক্তাপোশের উত্তর দিকে দাঁড়ান ডাক্তার মহেশ্বরানন্দ। পুণ্যানন্দ, জিতাত্মানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ, সেবকগণ অপূর্বানন্দ, শিবস্বরূপানন্দ, বৈরাগ্যানন্দ প্রভৃতিও দাঁড়াইয়া কথা শুনিতেছেন। স্বামী মাধবানন্দ প্রণাম করিয়া উঠিতেই নানা কথা হইতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে তন্ত্রের কথা উঠিল।

শ্রীমহাপুরুষ (স্বামী মাধবানন্দের প্রতি)—শরৎ মহারাজের বইতে তন্ত্রের কথা আছে বটে ঠাকুরের সম্বন্ধে। কিন্তু শরৎ মহারাজের ঐ ভাব ছিল কি না! ঐ বই পড়লে মনে হয় যেন তন্ত্রের ভাবই ঠাকুরের বেশী ছিল।

স্বামী মাধবানন্দ—অন্য ভাবও আছে। শাক্ত, বৈষ্ণব, মুসলমান, খৃষ্টান—সবই আছে।

শ্রীমহাপুরুষ—তা হলেও ঐটেই বেশী।

স্বামী মাধবানন্দ—যেসব materials (তথ্য) তিনি পেয়েছেন সেগুলি সব গুছিয়ে লিখতে বেশী হয়ে গেছে বইতে।

শ্রীমহাপুরুষ—ঠাকুরের শুদ্ধ ভাব—purity, purity, purity (পবিত্রতা, পবিত্রতা, পবিত্রতা)—মাতৃভাব। ঠাকুর স্বামীজীর ভাব—pure (বিশুদ্ধ) হতে হবে—to the backbone (আগাগোড়া)। বীরভাব-টাব ও-সব আমাদের এখানে নাই! স্বামীজী একে ভারি ঘৃণা করতেন। তাঁদের pure (বিশুদ্ধ) ভাব।

একজন সাধুর কথা উঠিল।

শ্রীমহাপুরুষ—ও কি করছে ওখানে?…এয়েছিল। আমি খুব বকে দিলাম,…ভাগ্ হিঁয়াসে। জিভে লিখে দেয় সে, ঠাকুরের মত। ঠাকুরের অনুকরণ করে। ওর কতকগুলি চেলা ওখানে আছে,…

স্বামী মাধবানন্দ—উনি তো একরকম বের হয়ে যাচ্ছেন। ওঁর কাছে যারা আছে তারাও সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

শ্রীমহাপুরুষ—তোমরা এই সব লিখে রাখ। আমার তো লিখবার শক্তি নাই। তোমরা লিখে জগৎকে জানাও।

ঠাকুরের শুদ্ধ ভাব, মাতৃভাব। ওখানে ঐ সব (বীরভাব) নাই। মহারাজও condemn (তীব্র নিন্দা) করেছিলেন তন্ত্রের ঐ সব…।

মিস ম্যাকলাউডের কথা উঠিল।

শ্রীমহাপুরুষ—ও বড় ভাল লোক—খোলাখুলি। ক্রিশ্চিন ভিতরবুঁদে ছিল, ম্যাকলাউড বড় খোলা।

ঠাকুর স্বামীজীর কাছে All purity, purity, purity (পবিত্রতা, পবিত্রতা, একেবারে পবিত্রতা)। All love, love, love! (প্রেম, প্রেম, কেবল বিশুদ্ধ

প্রেম)। ব্যস্ (হাততালি) !

একঘর ভর্তি লোক। ডাক্তার মহেশ্বরানন্দ তক্তাপোশের উত্তরে দাঁড়াইয়া আছেন, হাতে স্টেথিস্কোপ।

শ্রীমহাপুরুষ—চেয়ে আছিস, examine (পরীক্ষা) করে করবি কি! শোন্, এই সব কথা শোন্। Mood (ভাব) দেখে বুঝতে পারে না কেমন আছি। শোন্, কথা শোন্ (হাস্য)।

স্বামী মাধবানন্দ—Emotion (উদ্দীপনা) বাড়লে অসুখ বাড়বে। আমাদের ইচ্ছা শরীরটা আরো অনেক দিন থাকে।

শ্রীমহাপুরুষ—হাঁ, হাঁ। এসব কথা নোট কর। লিখে রাখ। পরে কাজ দেবে।

সেবক শিবস্বরূপানন্দ একটি ধোয়া গরদের কাপড় নিয়া ঘরে ঢুকিলেন। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন—দাও, পূজারীকে দাও। আজ পূজা করবে কে?

একজন সাধু—জ্যোতিষ মহারাজ।

শ্রীমহাপুরুষ—ওকে দেওয়া হয় নাই?

সেবক অপূর্বানন্দ—হয়েছে।

শ্রীমহাপুরুষ—তবে অন্যদের দাও। যারা পূজা করবে তাদের জন্য এই সব—যারা ধ্যান জপ করবে। বাবুরাম মহারাজ এইভাবে দিতেন।

স্বামী মাধবানন্দ—যারা কাজ করবে তাদের দিতেন।

শ্রীমহাপুরুষ—যারা পূজা পাঠ জপ ধ্যান করবে তাদের তিনি দিতেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পদমূলে*

স্বামী মাধবানন্দ

তখন ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ। রামকৃষ্ণ সংঘের একটি স্তম্ভস্বরূপ, মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সান্নিধ্যে মাত্র আটটি পবিত্র আনন্দঘন দিন কাটানোর পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত (শ্রীরামকৃষ্ণের একজন প্রথম সারির গৃহী-ভক্ত এবং স্বামী বিবেকানন্দের বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি-ভাই) লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন বৃত্তান্ত' (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বাংলায় প্রকাশিত) গ্রন্থ আমি পড়েছিলাম, সেখানে এঁর সম্পর্কে অনেক আবেগময় প্রশংসার কথা আছে। তরুণ 'শশী' (এই নামেই তখন তিনি পরিচিত ছিলেন) কী ভাবে অক্লান্ত ও আত্মনিবেদিত হয়ে কাশীপুরে তাঁর গুরুদেবের অন্তিম অসুস্থতার সময় তাঁর অতুলনীয় সেবা করেছিলেন তা এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কাছ থেকেও, যাঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন, আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁর সেসময়কার [কাশীপুরে] এবং পরবর্তীকালে বরানগর ও আলমবাজার মঠে একনিষ্ঠ ভক্তির প্রসঙ্গে অনেক কথা শুনেছিলাম। শীঘ্রই আমি মন স্থির করে ফেলেছিলাম যে রামকৃষ্ণ সংঘে আমার নতুন সাধুজীবন শুরু করব স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পদমূলেই। যদিও পূর্বোক্ত সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন স্বামী শিবানন্দ (পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ সংঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কঠোরতা সম্পর্কে পরিহাসছলে আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, কোথাও কিছু ত্রুটি ঘটলেই তাঁর কঠোরতা নির্মম ভর্ৎসনা-রূপে প্রায়ই প্রকাশ পেতে পারে। যাই হোক [শেষ পর্যন্ত] বেলুড় মঠের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের সস্নেহ ব্যবস্থাপনায় …বাইশে এপ্রিল প্রায় দুপুর বেলায় আমি মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে পৌঁছলাম।

…[মাদ্রাজ মঠে] পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি সেখানে কর্মরত তাঁর একমাত্র সহকারী ব্রহ্মচারী রুদ্র চৈতন্যকে আমার

---

* 'বেদান্ত কেশরী', আগষ্ট, ১৯৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী মাধবানন্দ রচিত 'AT THE FEET OF THE SAINTS IN THE MADRAS MATH' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। বাংলা অনুবাদ—**নচিকেতা ভরদ্বাজ**।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি সন্ন্যাসী হতে চাই কি না। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম যে তাঁদের পবিত্র সাহচর্যে থেকে একটি শুদ্ধ জীবন যাপন করাই আমার উদ্দেশ্য। তিনি বললেন—"ঐ একই কথা। তাহ'লে, তুমি ঠিক জায়গাতেই এসে গেছ। এই যুগে যে শ্রীরামকৃষ্ণাবতারের শরণাগত হয়, সেই নিঃসন্দেহে তার অভীষ্ট লাভ করে। তবে যদি তুমি অর্থ ও নামযশ প্রভৃতি চাও, তাহলে বরং ফিরে গিয়ে এম. এ. পড়।" আমি বললাম যে, আমি সেসবের জন্য লালায়িত নই।

…মাদ্রাজ মঠের প্রধান ভবনটি ছিল একটি একতলা সমচতুষ্কোণ বাড়ি। তার মধ্যে একটি ছিল হলঘর এবং চার কোণে চারটি ছোট ঘর। পূব দিকের দুটি ঘর ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের পূজার জন্য নির্দিষ্ট। পূজার ঘরের ঠিক বিপরীত দিকের ঘরে থাকতেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং অপরটিতে তখন ছিলেন 'মহারাজ' [স্বামী ব্রহ্মানন্দ]। বড় হলঘরটি ছিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অফিস ও দর্শনার্থীসহ সকলের বসার ঘর এবং আশ্রমের অন্যান্য আবাসিক সাধু-ব্রহ্মচারীদের শয়নকক্ষও বটে। যদিও মাত্র দু'বছর আগে তৈরী, তথাপি বাড়িটিতে ইতিমধ্যেই বড় ধরনের ফাটল ধরে গিয়েছিল। এই কারণেই পরে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই বাড়িটি পরিত্যক্ত হয় এবং সেই জায়গায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বর্তমানের দোতলা বাড়িটি নির্মিত হয়। এই ঘটনাকে ঠিকাদারের ব্যবসায়িক সততার অভাবের এক করুণ দৃষ্টান্ত বলা যায়। এখানে মশার উপদ্রব যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় হলঘরের ঠিক মাঝখানে মশারী টাঙাবার সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল অভিনব পন্থায়, ছাদের একটি আঙটা থেকে লম্বাভাবে একটি দড়ি বেঁধে তাতে বাঁশের কঞ্চির একটি কাঠামো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল,—যার সঙ্গে যুক্ত করে মশারী টাঙানো হত।

বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। মাদ্রাজকে বলা হয় এমন একটি শহর যেখানে "পাঁচ মাস গরম থাকে এবং বাকী সাত মাস থাকে আরো অধিকতর গরম।" তার ফলে স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম সেখানে গিয়ে স্বাস্থ্যবান স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে (যাঁর ছিল বহুকালের চর্ম রোগ) বছরের পর বছর যে শহীদের মতই আত্মত্যাগ বরণ করতে হয়েছিল—তা সহজেই অনুমান করা যায়। আর তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এমনই ছিল যে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বারাণসী বা উত্তর ভারতের অন্য কোন তীর্থ দর্শনে একটি বারের জন্যও যান নি।

…আমি তাঁর কিছু ব্যক্তিগত কাজ করতে আরম্ভ করলাম—যেমন কখনও তাঁর গা হাত পা টিপে দিতাম কখনও বা পাখার হাওয়া করতাম। কিন্তু আমার শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মনে হত তাঁকে অতি সামান্যই আরাম দিতে পারতাম।

তাই তিনি প্রায়ই আমাকে শক্ত সমর্থ রুদ্র মহারাজকে ডেকে দিতে বলতেন। আশ্রমের ছোট ছোট কাজ আমাকে দেওয়া হত। তার ভিতর একটা কাজ ছিল মেঝে ঝাঁট দেওয়া। একদিন মহারাজ দেখলেন যে আমি একটা মাকড়সাকে আস্তে করে সরিয়ে দিচ্ছি। তিনি আমার হাত থেকে ঝাঁটাখানি নিয়ে ওটাকে মারলেন এবং আমাকে বললেন, "যদি তুমি ওদের না মার, ওরাই তোমাকে মারবে।" তিনি আমার অনুচিত মানসিক কোমলতা দূর করে দিতে চেয়েছিলেন। [তিনি শেখালেন] সংসারে সাধারণ নরনারীর পক্ষে অপ্রতিরোধ অপেক্ষা পারস্পরিক সম-ব্যবহার [অর্থাৎ যে-যেমন তার কাছে তেমন] অনেক বেশী বাস্তবধর্মী জীবন-রীতি। অপ্রতিরোধ উন্নত আত্মার মানুষের পক্ষেই উপযুক্ত।

আর একদিন তিনি আমার সংস্কৃত জ্ঞানের পরীক্ষা করার জন্য দুর্গা-সপ্তশতী (পঞ্চম অধ্যায়) থেকে কয়েকটি সহজ পংক্তির ব্যাখ্যা করতে বললেন। আমি বলার পরে আমাকে বললেন, "দেখছি, তুমি বুঝেছ"। এই প্রসঙ্গে তিনি বাংলা ও সংস্কৃত উচ্চারণের পার্থক্যের কথা এবং এ দুটি যে ভিন্ন ভাষা তা মনে রাখতে বললেন (এই সত্যটা সাধারণতঃ বাঙালীরা বিস্মৃত হন)। তিনি এর উদাহরণ হিসাবে সপ্তশতী থেকে একটি শ্লোক সঠিক উচ্চারণ করে শোনালেন (৫ম, ৩২-৩৪):

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

'যিনি সকল জীবের ভিতরে শক্তিরূপে বিরাজ করেন—সেই দেবীকে বারংবার প্রণাম।' সঠিক উচ্চারণে এই শব্দগুলি ইংরেজী উচ্চারণের চেয়ে অনেক মধুর শোনাল। বাংলা উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে তিনি একটি শব্দগুচ্ছ নির্বাচন করে শোনালেন—যা বর্ণান্তর করলে হবে: 'ওগো শক্তি-স্বরূপিণী'। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে শোনায়: 'ওগো শোক্তি-শোরূপিণী'। তিনি এও মন্তব্য করলেন যে সপ্তশতী ঠিকমত উচ্চারণ না করে পড়লে জগজ্জননী মা দুর্গা অসন্তুষ্ট হন। তিনি আমাকে সংস্কৃত মূল মহাভারতের শান্তিপর্ব পড়ে তার মধ্যে অজানা অপরিচিত শব্দগুলি অর্থসহ লিখে রাখতে উপদেশ দিলেন। একবার তিনি গীতার একটি সুপরিচিত শ্লোক-এর (সপ্তম অধ্যায়: চতুর্দশ শ্লোক) উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন—যাতে বলা হয়েছে যে ঈশ্বরের কাছে একান্তভাবে শরণাগতি নিলেই মায়ার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আরেকবার তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সেসময়ে সদ্য প্রকাশিত 'Inspired Talks'-এর নিম্নবর্ণিত অংশবিশেষ আমাকে পড়তে বলেন এবং সংক্ষেপে নিজেই তার ব্যাখ্যা করে দিলেন: "যার প্রতি কোন সহানুভূতি নেই এমন কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে মানুষ যখন অভিযোগ করে, তখন তারা একই সাথে

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মিথ্যাবাদী। এক সম্প্রদায়ের বিশ্বাসী কদাচিৎ অন্য সম্প্রদায়ের মতাদর্শে সত্যের সন্ধান পায়" (১লা জুলাই), এবং "যতক্ষণ তুমি সত্যের অনুরোধে যে কোন মুহূর্তে বদলাতে প্রস্তুত না থাকছ, ততক্ষণ তুমি কখনই সত্যলাভ করতে পারবে না; অবশ্য তোমাকে দৃঢ় এবং অবিচলিত ভাবে সত্যের অনুসন্ধান করে যেতে হবে" (৫ই জুলাই)।

যে অল্পসময়ের জন্য আমি তাঁর [রামকৃষ্ণানন্দজীর] সান্নিধ্যে ছিলাম, তিনি আমার প্রতি সবসময়েই স্নেহপরায়ণ ছিলেন। এমন কি আমার উপর আস্থা রেখে এমন সব কথা বলেছিলেন যা আমার মত একজন নবাগতকে শোনানোর পক্ষে কদাচিৎ উপযুক্ত ছিল। তিনি সাধারণতঃ আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যেন আমি তাঁর বহুদিনের পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি আমায় বলেছিলেন: "শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি কি সাকার ভগবানে বিশ্বাস কর, না নিরাকারে?' আমি উত্তর দিয়েছিলাম: 'ভগবান আদৌ আছেন কিনা আমি সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত নই। সুতরাং আমার কাছে তাঁর সাকার বা নিরাকারের কোন প্রশ্নই আসছে না।' তিনি আমার সেই উত্তরে খুশী হয়েছিলেন।" একদা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর গাত্রবস্ত্রের খুঁটে না-গলা অবস্থায় একখণ্ড বরফ নিয়ে গিয়েছিলেন—এই ঘটনার কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিতে তিনি বলেছিলেন যে, "উত্তর কলকাতার এক জায়গা থেকে এই বরফ আনা হয়েছিল এবং এটি পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন: 'এই কাজটি ওর ভক্তির সঙ্গে বেশ মানিয়েছে'।" তিনি আমাকে আরো বলেছিলেন: "সমাধি এবং ঐসংক্রান্ত আর সব কিছুকে আপাততঃ শিকেয় তুলে রেখেছি। এখন [যা কিছু] শুধু তাঁরই কাজ করে যাওয়া।" তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি সে-সময় ফার্সি পড়ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ এ-সংবাদ জানতে পেরে তাঁকে দারুণভাবে নিরুৎসাহ করে দিয়ে বললেন: "তুমি যদি এসব নিয়ে থাক তোমার ভক্তি-টক্তি সব কিছু চলে যাবে।" "যাই হোক কা—এই সব পড়াশোনার আগ্রহ ও উৎসাহ (শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে) পুনর্জাগ্রত করে তুলেছিলেন; নয়ত তাঁরা এসব পড়াশোনা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।" মহারাজ আরো বললেন: "পাণ্ডিত্য ফলাবার জন্য আমাকে আবার কিছু বিষয় নতুন করে শিখতে হয়েছিল!"

হরিপ্রসন্ন নামে এক ব্যক্তি রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গে অঙ্ক নিয়ে পড়াশোনা করতেন, আবার দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেও যেতেন। তাঁকে নিয়ে মহারাজ একটি মজার গল্প বলেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হরিপ্রসন্নকে কালী মন্দিরে ধ্যান করতে বলেন। একদিন তিনি [হরিপ্রসন্ন] যখন মন্দিরে ধ্যান করছিলেন—হঠাৎ তখন অনুভব করলেন তাঁর চোখদুটি জুড়ে গিয়ে যেন কপালের উপর

[ভ্রূ-মধ্যে] একটি চোখে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তিনি খুব ভয় পেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ছুটে গিয়ে সমস্ত ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "তুমি এটুকু পর্যন্ত সহ্য করতে পারলে না, ভয় পেয়ে পালিয়ে এলে!" এই কাহিনীর নায়ক আসলে যে কে—সে কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি।

নিজে ত্যাগের প্রতিমূর্তি হয়েও সংসারী লোকেদের আত্মসংযমের অভাব মহারাজকে সহ্য করতে হত। এমনই কোন এক ব্যক্তির সম্পর্কে তাঁর কাছে নালিশ করা হয়েছিল; সেই বিশেষ ঘটনার কথা প্রায়ই তিনি বর্ণনা করতেন—অবশ্য কোন নাম উল্লেখ করতেন না। আমাদের দেশের বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে প্রায়ই তিনি কৌতুক করতেন, বলতেন, "নিজেরা স্ত্রৈণ বলে তাঁদের দেবতাদেরও প্রত্যেকের তিনটি করে স্ত্রী আছে বলে তাঁরা কল্পনা করে থাকেন।" তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে দৈনন্দিন আচার-আচরণে তিনি ছিলেন সহৃদয়, সুবিবেচক এবং স্নেহময়। সকালের ক্লাস শেষ করে ফিরে আসার সময় ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে বেশী দাবি করায় একবারই মাত্র তাঁকে একজন ঘোড়ার গাড়িওয়ালাকে ভর্ৎসনা করতে দেখেছিলাম। যদিও তিনি তৎক্ষণাৎ তার দাবি করা ভাড়াই গাড়োয়ানটিকে দিয়ে দিতে আদেশ দিলেন এবং মৃদু হেসে বললেন, "ওর সঙ্গে তর্ক করা মানে শুধু সময়ের অপচয়।" নিঃস্ব অনাথ ছেলেদের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ যে ছাত্রাবাসটি তিনি নিজেই স্থাপন করেছিলেন, তার ছাত্ররাই পালা করে মঠের জন্য বাজার করে দিত। তিনি তাদের নির্দেশ দিতেন, এবং নিজে রান্নার তরি-তরকারী শাক সবজি কুটে দিয়ে তাদের সাহায্য করতেন। কিন্তু তাঁর স্বনির্বাচিত প্রিয় কাজ ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা। সবসময় তিনি তাঁর [শ্রীশ্রীঠাকুরের] সশরীরে উপস্থিতি অনুভব করতেন। পূজার খুঁটিনাটি আচার-অনুষ্ঠান যতই কষ্টসাধ্য হোক না কেন তা উপেক্ষা করে, নিজের সমস্ত শারীরিক অসুবিধাবোধকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তাঁর সমগ্র সত্তা [শ্রীশ্রীঠাকুরের] পূজা-কর্মে তন্ময় হয়ে যেত। স্বভাবতঃই তাঁর এই পূজা-অনুষ্ঠান ছিল অতীব হৃদয়স্পর্শী এক দৃশ্য। অবসর মুহূর্তগুলিতে মহারাজ হলঘরের মধ্যে পায়চারি করতেন। আর 'শ্রীগুরু মহারাজ' অথবা অনুরূপ কোন পবিত্র শব্দাবলী গভীর আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করে যেতেন। সাধারণভাবে রাশভারী প্রকৃতির মানুষ হলেও সহজেই তিনি বালকের মত উচ্চ-হাস্যে ফেটে পড়তেন। তিনি সবসময় সাদাসিধে পোষাক পরতেন। কিন্তু তাঁর জীবনচর্যার প্রতিটি প্রকাশই তাঁকে দুর্লভ সমুন্নত প্রকৃতির এক মহান সাধু-রূপে চিহ্নিত করত।

আমার কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনার কথা মনে পড়ছে—যা তাঁর মন ও মননের ক্রিয়াশীলতার গভীরে আলোকপাত করে। এক গুমোট রাতে মহারাজ

প্রায় না ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলেন। পরের দিন সকালে এই বিনিদ্র রাত্রির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন : "নতুন যে ছেলেটি এসেছে তার মা হয়ত কাঁদছিলেন। তাই আমি সারারাত ঘুমতে পারিনি।" একদিন দুটি তরুণ সদ্য-কেনা কিছু বই সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। তিনি তাদের সঙ্গে অমায়িকভাবে কথাবার্তা বললেন। বইগুলির নামের দিকে তাকিয়ে তিনি 'প্রাত্যহিক জীবনে থিওজফি' নামে একখানি বই দেখতে পেলেন। 'প্রাত্যহিক জীবনে ঈশ্বর' নয় কেন ? তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন। একদিন কথা বলতে বলতে, যতদূর মনে পড়ে, পরলোকগত আত্মাদের প্রসঙ্গটি এসে যায়। আমি পরলোকে বিশ্বাস করি কিনা মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বলেছিলাম, "আংশিক ভাবে।" প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন : "না, পরে যখন তুমি এই সব বিশ্বাস করবে, তোমাকে তার সবটাই বিশ্বাস করতে হবে।" গুনচটের বস্তার উপর বসার ব্যাপারে মহারাজ আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ চটের বস্তার উপর বসতে নিষেধ করে গেছেন, কারণ তাতে মুদির মানসিকতা গড়ে ওঠে (যেহেতু ভারতবর্ষে মুদিরা সাধারণতঃ চটের বস্তার উপর বসেই জিনিসপত্র বিক্রয় করে থাকেন)। শ্রীশ্রীঠাকুরের আর একটি নিষেধ-বাণীর কথা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-সহ আমাদের সকলকে 'মহারাজ' [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] জানিয়েছিলেন : মাদুরের হাওয়া [বিছাবার সময় যে হাওয়ার সৃষ্টি হয়] যেন কিছুতেই কোন মানুষের গায়ে না লাগে (সম্ভবতঃ বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন সংসারী লোকেরা মাদুরের উপরে বসে থাকেন বলে এই সতর্কতা)। দু'টি ব্যাপারে মহারাজ আমার ভুল ধারণা সুন্দরভাবে সংশোধন করে দিয়েছিলেন : একবার আমি যখন বাদামী রুটির থেকে সাদা রুটির প্রতি আমার পছন্দ ব্যক্ত করেছিলাম, এবং অন্য আর একবার আমি যখন 'Inspired Talks' [দেববাণী] গ্রন্থের বেশী দামের ফেদার-ওয়েট [পালকের মত হাল্কা] কাগজের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনি। ইন্দ্রিয়সমূহের চেয়ে মনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তিনি কীভাবেই না আমার মনে ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন ! তিনি বলেছিলেন : "ইন্দ্রিয় শুধুমাত্র বস্তুর বহির্ভাগ স্পর্শ করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে এই দেয়ালটির কথাই ধর। যখন তুমি এর দিকে তাকাও শুধু একটি রঙিন উপরিভাগ দেখতে পাও। তোমার চক্ষুদ্বয় এর ভিতরে কী আছে—তা বলে না। একমাত্র মনই তোমাকে এর ঘনত্ব, এ দেওয়াল যে ইটের তৈরী, প্রভৃতি আরো সব নতুন তথ্য দিতে পারে।" এইভাবে অনেক কথা তিনি সেদিন বলেছিলেন।

একদিন তিনি আমাকে বললেন : "যখন তুমি দেখ একটি ছাগ-জননী তার শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে—তখন তোমার প্রণতি জানাও, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরই তার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন।" আর একদিন ত্যাগের প্রয়োজন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বললেন : "একজন মানুষের প্রতি যতই অন্যায়

করা হোক প্রায় সবই সে ভুলে যেতে পারে; কিন্তু যদি তার স্ত্রীর প্রতি কেউ একটিও অন্যায় আচরণ করে, এমন কি একটি কটু বাক্য প্রয়োগের দ্বারাও—তা কিছুতেই সে কখনও ভুলতে পারে না। অতএব ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ যদি কেউ তার অহংকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়, তার পক্ষে বিয়ে করা উচিত নয়।" ঈশ্বরলাভের জন্য একাগ্র ব্যাকুলতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গুরুত্ব দিয়ে বলা তাঁর কথাগুলি আমার আরো মনে পড়ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি এক শিষ্যের গল্প বলেছিলেন। শিষ্য তার গুরুর কাছে ঈশ্বর দর্শনের প্রার্থনা নিবেদন করলে গুরু শিষ্যকে একটি পুকুরে নিয়ে গেলেন এবং অকস্মাৎ শিষ্যকে জলের মধ্যে কিছুক্ষণ জোর করে ডুবিয়ে রাখলেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই গুরু শিষ্যকে ছেড়ে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন জলের মধ্যে থাকাকালীন সে কোন্ জিনিষটা একান্তভাবে চাইছিল। "নিঃশ্বাস নেবার জন্য সামান্য একটু হাওয়া মাত্র"—শিষ্য বললেন। "আর কিছু নয়?" "না।" গুরু বললেন, "ঈশ্বরের একটিবার দর্শনের জন্য যখন ঐ রকম তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করবে এবং অন্য আর কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, তখনই শুধু তুমি তাঁকে লাভ করতে পারবে।" আর একদিন প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি তাঁকে বলেছিলাম যে যাঁরা শত্রুভাবে ঈশ্বরের ভজনা করেন, তাঁরা তাঁকে শীঘ্র লাভ করেন। কারণ তাঁরা নিরন্তর তাঁর চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন। এর প্রত্যুত্তরে মহারাজ বললেনঃ "হ্যাঁ, তিনি তাঁদের চাবুক মেরে মেরে ঠিক পথে নিয়ে আসেন।" শ্রীচৈতন্যের একটি বিখ্যাত বাংলা আবেগমধুর জীবনচরিত আমার খুব ভাল লেগেছিল (অবশ্যই মাঝে মাঝে অন্ধ গোঁড়ামির ত্রুটিগুলি বাদ দিয়ে)। এ সম্পর্কে মহারাজের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হলঃ "মনে হয় লেখক যেন একখানি উপন্যাস লিখেছেন!"

তাঁর সান্নিধ্যে যে আনন্দময় দিনগুলি কাটাচ্ছিলাম তা শেষ হয়ে আসছিল। 'মহারাজ'-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হল। আমার পুরনো স্কুলের একজন প্রবীণ শিক্ষক, তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে আমার সমস্ত যুক্তিতর্ক ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ায় আমি বুঝলাম, আমাকে ফিরে যেতেই হবে। কারণ আমি যদি এখানে থেকে যাই তাহলে আমার মা-বাবা এখানে চলে আসতে পারেন এবং মহারাজকে অসুবিধায় ফেলতে পারেন। তাঁকে এসব থেকে মুক্ত রাখবার জন্য এবং মা-বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে আবার ফিরে আসব ভেবে আমি চলে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারেও, মহারাজ যে অনেক আগে থেকেই সব চিন্তা-ভাবনা করে রাখেন তা বোঝা গেল দুপুরবেলা খাওয়ার সময় যখন তিনি আমাকে একান্তে ডেকে আমার শিক্ষকের ব্যবহৃত থালায় খেতে নিষেধ করে দিলেন। ভারতে এই রীতি [গুরুর পাতে প্রসাদ

গ্রহণ] অতি প্রচলিত ছিল। আমি যে অধ্যাত্ম পথের যাত্রী—এই সত্য বিবেচনাই যে মহারাজের এই নির্দেশের কারণ ছিল সেকথা আমি পরে অনুধাবন করেছিলাম। মহারাজ আমাকে খুব কাছেই অবস্থিত পবিত্র শহর কাঞ্জিভরম দর্শন করে যেতে বললেন। কিন্তু আমি তাঁকে বললাম যে আমি তো খুব শীঘ্রই ফিরে আসছি—[তখন কাঞ্জিভরম দেখে আসব]। (কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমার এই পবিত্র তীর্থ দর্শন ঘটেছিল তেইশ বছর পরে!)…প্রসঙ্গক্রমে এর মধ্যে আর একদিন মহারাজ তাঁর এক গুরুভাই, (যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চ কোটীর অধ্যাত্ম-পুরুষদের একজন বলে মনে করতেন সেই স্বামী প্রেমানন্দ) সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন—তাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "ওখানে বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম) আছেন; তিনি হলেন অনন্ত শক্তির আধার, কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করবেন না।" এ-শক্তি যে কত প্রবল; মহিমময় ও প্রভাবশালী, কয়েক বছর পরেই, তিনি যখন পূর্ববঙ্গে ও অন্যত্র প্রচারের কাজে ব্রতী হলেন তা প্রত্যক্ষ করা গেল। সমস্ত শ্রেণীর সাধারণ নর-নারীদের, এমন কি অহিন্দুদেরও, তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে সমুত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন। তখনই অবশ্য তিনি বাইরের লোকেদের কাছেও প্রতিভাত হয়েছিলেন এক প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি রূপে।

…কলকাতায় আমার শিক্ষক মহাশয় আমার উপর নজর রাখার উৎকণ্ঠায় চলন্ত ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে হাঁটুতে আঘাত পেলেন। আমাদের গন্তব্যস্থলে পেঁছে, একদিকে আমার শিক্ষক মহাশয়ের মনে হল একজন উচ্চাভিলাষীকে ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত করে নিয়ে আসার নিমিত্তভাগী হওয়ার জন্যই তাঁর এই আঘাত-প্রাপ্তি, অন্যদিকে তাঁর এই অসুস্থতার জন্য তাঁর জায়গায় আমার পুরানো স্কুলে আমাকে কিছুদিন অঙ্কের শিক্ষকতা করতে হল! এর কিছুদিন পরেই রামকৃষ্ণানন্দজীর কাছ থেকে একখানি সুন্দর চিঠি পেলাম যাতে অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে আমার এক বন্ধুর কথাও লিখেছেন। সে মাদ্রাজ মঠে রামকৃষ্ণ সংঘে যোগ দিতে গিয়েছিল। কিন্তু তাকেও তার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহারাজ লিখেছেন: "আজকালকার বাপ-মায়েরা বরং ছেলেরা বকে যাক—তা সহ্য করবেন, কিন্তু কিছুতেই তাদের সন্ন্যাসী হতে দেবেন না।"

এরপরে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের কাছাকাছি কোন সময়ে মহারাজকে কলকাতায় বলরাম বাবুর বাড়িতে দর্শন করেছিলাম। তিনি আমাকে দেখে খুব খুশী হয়ে বললেন: "শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে নাও; তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।" আমি তাঁকে বলেছিলাম যে সেই উদ্দেশ্যেই আমি এখানে এসেছি। তারপর তিনি বললেন: "যে বিষয়ে খুব বেশী খাটতে হবে না—এমন কোন একটা বিষয় নিয়ে এম. এ.-টা পড়ে ফেল।" প্রত্যুত্তরে আমি জানালাম যে আমি

ইতিমধ্যেই সে কাজ করেছি। আমি যখন তাঁকে বললাম যে আমার অভিভাবকেরা মাদ্রাজ থেকে আমাকে ফিরিয়ে আনতে হয়ত পুলিশের সাহায্য নিতে পারতেন, তখন তিনি বললেন ঃ "না, না, আমি তোমায় এমন জায়গায় রেখে দিতে পারতাম যেখানে কোন পুলিশ যেতে সাহস পেত না। আমি শুধু চেয়েছিলাম তুমি বাড়ি যাও।" এর কয়েক সপ্তাহ পরে শেষবারের মত আমি তাঁকে বেলুড় মঠে দর্শন করেছিলাম। তিনি তখন একধরনের জ্বরে ভুগছিলেন। তবুও সাদর আহ্বানসূচক হাসিটি ছিল তাঁর মুখে। তাঁর জন্য কিছু ফল আনতে আমাকে কলকাতায় পাঠানো হল। পরে জেনেছিলাম—শীঘ্রই আমার রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদানের অপেক্ষায় তিনি ছিলেন। আমি তাঁর এই প্রত্যাশাকে আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করেছিলাম এবং অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলাম।

পরের বছর কয়েক মাস বেলুড় মঠে থাকার পর আমি হিমালয়ের কোলে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে বদলি হলাম। এর এক বছরের মধ্যেই আমাদের কাছে উদ্বেগজনক সংবাদ এল যে ইতিমধ্যে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্ষয় রোগের চিকিৎসার জন্য মহারাজকে কলকাতার উদ্বোধন কার্যালয়ে আনা হয়েছে। তাঁর অমন শক্ত সমর্থ স্বাস্থ্যদীপ্ত শরীরে কী করে যে এই রোগ এসে প্রবেশ করল—তা আমাদের কাছে রহস্যজনক বলে বোধ হল। কিন্তু কারণ ছিল সহজ ঃ প্রয়োজনীয় বিশ্রাম এবং উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য ছাড়া তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করে গেছেন। তারই ফলে সবার অলক্ষ্যে প্রথমে আসে বহুমূত্র ব্যাধি। অল্প কিছুদিন পরেই আমরা জেনে মর্মাহত হলাম যে তাঁর আর নিরাময়ের কোন আশাই নেই। সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হল, যদি কারো মহারাজকে দেখতে ইচ্ছে থাকে, তিনি যেন অবিলম্বে তাঁকে দর্শন করে যান। আমার পক্ষে এত তাড়াতাড়ি এ জায়গা থেকে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। পরিশেষে সেই অন্তিম সংবাদ এল এবং সমগ্র আশ্রম শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। পরের মাসে তাঁর সম্মানে 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হল।

শেষের দিনে মহারাজ একটি বিশেষ ভাবের সঙ্গীত রচনা করে তাঁকে গেয়ে শোনাতে বলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ, অভিনেতা ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় তা করা হল। গানের শুরু হয়েছিল এই ভাবাশ্রিত কথা দিয়ে—"পোহাল দুঃখরজনী।" বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে তাঁর নশ্বর দেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। কোন রকমের স্মারক দর্শনার্থীদের বোঝার জন্য স্থানটির পবিত্রতাকে চিহ্নিত করে রাখে নি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, তাঁদের হৃদয়-মন্দিরে তাঁর স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বিরাজ করছে। রামকৃষ্ণ সংঘের বিকাশে এবং বিশ্রুতকীর্তি স্বামী বিবেকানন্দ

কর্তৃক প্রবর্তিত এবং সূচিত নব-বেদান্ত আন্দোলনের প্রসারে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। তিনি রেখে গিয়েছেন কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ, সেইসঙ্গে তাঁর বাণী এবং পবিত্রতায় সমুজ্জ্বল জীবনচর্যা, তাঁর প্রিয়তম প্রভু ও আর্ত মানবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অহম্-বিলুপ্ত অক্লান্ত সেবার ইতিহাস,—যা লিপিবদ্ধরূপে আছে, তাই তাঁর অক্ষয় স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে বিরাজ করবে।

স্বামী প্রেমানন্দ—স্বামী অদ্ভুতানন্দ সান্নিধ্যে*

স্বামী বাসুদেবানন্দ

[পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) তাঁর কর্মচঞ্চল জীবনের প্রতিটি পদবিক্ষেপে নবীন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং সমীপাগত যুবকদের সামনে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রদ ও গভীর ভাব-উদ্দীপক প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন। স্বামী মাধবানন্দ যখন নবীন নির্মল মহারাজ, সেইকালে পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে অতিবাহিত তাঁর দুটি প্রেমানন্দময় দিনের স্মৃতি এখানে বর্ণিত। আর এক শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অদ্ভুতানন্দের পুণ্য অনুধ্যানও এই স্মৃতি-সন্দর্ভে সংযোজিত হয়েছে।]

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দজী) এবং মহাপুরুষ মহারাজের (স্বামী শিবানন্দজী) সঙ্গে কাশীধামে যাই। সেই সময়কার স্মৃতি এখানে দেওয়া হল।

একদিন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ নিজেই আমাদের সঙ্গে করে পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সঙ্গে জিতেন মহারাজ (স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী), নির্মল মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দজী), সীতাপতি মহারাজ, এবং খগেন মহারাজ (স্বামী শান্তানন্দজী)-ও ছিলেন। দেখলুম···[লাটু মহারাজ] দড়ির খাটিয়ায় মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। বাবুরাম মহারাজ দেখে বললেন, "আরে পরমাত্মা উঠো উঠো।"

তিনি মুড়ি দিয়েই বলতে লাগলেন, "কাহে দিক্ করতে হো, কাল রাতমে বিলকুল নিদ্ নহী হুয়ী।"

বাবুরাম মহারাজ বললেন, "আরে জী, উঠো উঠো, হম্‌লোগ জানতে হেঁ, তুম ধ্যান করতে হো।"

(রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঘুমুচ্ছিলেন, ঠাকুর তাঁকে বলেন, "এমন রাতটে ঘুমিয়ে কাটালি।" সেই থেকে লাটু মহারাজ আর রাত্রে ঘুমুতেন না, ধ্যান করে কাটাতেন, দিনেও মাত্র ঘুমের ভান করতেন, আসলে কিন্তু করতেন ধ্যান।) যাহোক তারপর তিনি উঠে পড়লেন। পরস্পর কুশল-প্রশ্নাদি হল। পরে ছাদের থেকে ঘরে গিয়ে বসা হল। তাঁরা দুজনে খাটে বসলেন, আমরা মেঝের

---

* 'উদ্বোধন', ফাল্গুন, ১৩৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী বাসুদেবানন্দ রচিত 'পুরাতন স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

সতরঞ্চিতে বসলুম। এ কথা সে কথার পর বাবুরাম মহারাজ লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, ঠাকুর আমাদের কেমন ভালবাসতেন বল দেখি ?"

লাটু মহারাজ বললেন, "আরে উ কহনেকী বাত নেহি। ঈশ্বরের ভালবাসা জীব কি করে বুঝবে ? ভাগবত শুনে আমরা বৃন্দাবনের গোপগোপীদের ভালবাসাই বুঝতে পারি, কিন্তু তিনি তাঁদের কিরূপ ভালবাসতেন, তা কি করে আমরা বুঝব, বই পড়ে শুনে তাঁর ভালবাসার আভাসও পাওয়া যায় না। গোপীরা অজ্ঞান হয়ে তাঁতে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা বুঝতেও পারত না এ টান কিসের। লোহা জানেও না কেমন করে চুম্বক তাকে টানে।"

বাবুরাম মহারাজ বললেন, "দেখ্ একবার তোরা! এমন ব্যাখ্যা কখনও শুনেছিস্। বেশ খতিয়ে নে, ঠাকুর যা বলেছিলেন।" (ঠাকুর লাটু মহারাজকে বর দিয়েছিলেন, তোর বই পড়তে হবে না, আপনাআপনি সমস্ত জ্ঞান ভক্তি গ্রন্থের তাৎপর্য তোর অধিগত হবে। এঁর অক্ষর পরিচয়ও ছিল না)।

অতঃপর প্রশ্ন হল, 'ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ'—শ্লোকটির মানে কি ? জ্ঞানীকে কি করে ভক্তি অভিভূত করে। (শ্লোকটি হচ্ছে—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"—শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।১০

"যাঁরা সর্বগ্রন্থিমুক্ত, আত্মারাম, সেই মুনিরাও কোন কামনা না করে উরুক্রম শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করেন, শ্রীহরির এমনি গুণ।")

লাটু মহারাজ বলতে লাগলেন, "জ্ঞানী না হলে ভগবান যে 'এক-ভক্তির' কথা বলেছেন, তা হবে কি করে ?" (গীতার শ্লোকটি হচ্ছে—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥"—গীতা, ৭।১৭

"আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানীর মধ্যে নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীর আমি অতি প্রিয় কারণ আমি তার আত্মা, আত্মাপেক্ষা আর কি প্রিয় আছে ? এবং সে আমারও প্রিয়।")

লাটু মহারাজ বললেন—একই বস্তু, আর সব অবস্তু, এর উপলব্ধি না হলে, একভক্তি হবে কি করে ? দ্বৈত জ্ঞান থাকতে 'একভক্তি' হয় না। জ্ঞানী তো ভেদবুদ্ধিতে ভগবানকে দেখে না, সে ভগবানকে নিজের আত্মা বলে জানে, কাজে কাজেই আত্মার চাইতে আর কি প্রিয় বস্তু থাকতে পারে ?"

সন্ধ্যা হয়ে এল। বাবুরাম মহারাজ আমাদের নিয়ে কেদার ঘাটে গেলেন। বললেন, "ঠাকুর মণিকর্ণিকার ঘাটে ও এখানে অলৌকিক আবির্ভাব উপলব্ধি করেছিলেন।" সন্ধ্যার গাম্ভীর্য, গঙ্গা, দীপমালা, আরাত্রিকের শঙ্খঘণ্টা, মহাপুরুষের ধ্যান অতি অপূর্ব বলে বোধ হতে লাগল। আমরাও নিস্তব্ধচিত্তে জপ করতে লাগলুম।

কাশী থেকে বেলুড়ে ফেরবার দিন বাবুরাম মহারাজ বললেন, "চল্ পুষ্প দন্তেশ্বর দর্শন করে আসি। এঁর দর্শন করলে বাবা ৺বিশ্বনাথের মন্দিরাদির নির্মাল্য মাড়ানোর পাপ হতে মুক্ত হওয়া যায়। পুষ্পদন্ত বলে এক গন্ধর্বরাজ রোজ গোপনে কাশীরাজের বাগান থেকে গভীর রাত্রে পুষ্প চয়ন করে ৺বিশ্বনাথের পূজা করত। রাজকুমারী রোজ ভোরে পুষ্প চয়ন করতে গিয়ে দেখেন যে, তাঁর আগেই কে বাগানের সব চাইতে সেরা ফুলগুলি তুলে নিয়ে গিয়েছে। তিনি পিতার কাছে এ ব্যাপার নিবেদন করলেন। রাজা পাহারা দিয়ে বাগান সারারাত ঘিরে রাখলেন, রাজকুমারীও গোপনে আড়িপেতে বসে রইলেন, দেখলেন শেষ রাত্রে এক অপরূপ গন্ধর্বরাজ পুষ্প চয়ন করছেন। তিনি শান্ত্রীদের ইঙ্গিত করতেই তারা তাঁকে চার পাশ থেকে ঘিরে ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু গন্ধর্বরাজ শূন্যমার্গে চলে গেলেন। রাজা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রোজই অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট পুষ্পে পূজা হয়। তখন মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ এক কাজ করুন, শিবনির্মাল্য বাগানে ছড়িয়ে রাখুন, পায়ে ঠেকলেই গন্ধর্বের বিভূতি নষ্ট হয়ে যাবে, সে তখন আপনার অধীনস্থ হবে।" রাত্রে গোপনে তাই করা হল। পুষ্পদন্ত গন্ধর্বরাজের, নিয়মিত পুষ্প চয়ন করতে এসে শিবনির্মাল্য বিল্বপত্রে পাদস্পর্শ হল। আকাশমার্গে যেতে গিয়ে দেখেন তাঁর আকাশ-গমনশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেছে ; কি হবে ! এখনি তো রাজার শান্ত্রীরা জাগ্রত হয়ে পড়বে। তিনি তখন একাগ্রমনে ভক্তির সহিত শিবস্তুতি করলেন। এই স্তবই হচ্ছে বিখ্যাত 'শিবমহিম্ন' স্তোত্র—

"কুসুমদশননামা সর্বগন্ধর্বরাজঃ
শিশুশশধর মৌলের্দেবদেবস্য দাসঃ।
স খলু নিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ
স্তবনমিদমকার্ষীদ্ দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ ॥" ৩২

"সর্বগন্ধর্বরাজ কুসুমদশন শিশুশশধরমৌলি দেবদেব মহাদেবের দাস। নির্মাল্য পাদস্পর্শ-হেতু শিব রোষে নিজ মহিমা হতে ভ্রষ্ট হয়ে মহিমান্বিত এই দিব্যাদিব্য স্তব করেন।" তাতে আবার তাঁর দিব্য বিভূতি ফিরে আসে। তিনি আবার শূন্যে অন্তর্হিত হলেন। যারা কোন বন্ধনে পড়ে, তারা এই স্তব পাঠ করলে বন্ধনমুক্ত হয়। এই স্তব খুব পাঠ করবি। ঠাকুরের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের শ্লোকটিও এই স্তবে আছে ;—ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি-মতং বৈষ্ণবমিতি।

উপরে বর্ণিত স্মৃতিকথাটির প্রথম অংশ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রসঙ্গ) স্বামী চেতনানন্দ কর্তৃক সংকলিত ও অনূদিত এবং আমেরিকাস্থ বেদান্ত সোসাইটি অব্ সেণ্ট লুই থেকে প্রকাশিত 'Swami Adbhutananda : Teachings and Reminiscences' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

শ্রীম সকাশে

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

[প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্রাবস্থায় হিন্দু হোষ্টেলের আবাসিক নির্মল (স্বামী মাধবানন্দ) সতীর্থদের সঙ্গে কথামৃতকার মাষ্টার মহাশয়ের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেন। কলেজ ষ্ট্রীটের হিন্দু হোষ্টেল থেকে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মর্টন স্কুলের দূরত্ব ছিল যৎসামান্য। সম্ভবতঃ মাষ্টার মহাশয়ের মাধ্যমেই নির্মল সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-জগতের সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচিত হন। ঘটনাকাল ছিল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ। সেসময় থেকে শ্রীম'য়ের শরীর ত্যাগের দিন ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন অবধি উভয়ের নিবিড় সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ছিল। কর্মব্যস্ততার অবসরে স্বামী মাধবানন্দ যখনই সুযোগ পেতেন মাষ্টার মহাশয়ের স্নেহচ্ছায়ায় উপনীত হয়ে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গাদি করতেন।]

(১)*

[মর্টন স্কুল] অপরাহ্ন ছয়টা। কয়েকজন ভক্ত তিনদিকে বেঞ্চে বসা। শ্রীহট্টের সুরেনবাবু (স্বামী সৎসঙ্গানন্দ)-ও রহিয়াছেন। আজ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২২ খৃঃ, ১৭ই আশ্বিন, ১৩২৯ সাল, বুধবার, শুক্লা চতুর্দশী।

বেলুড় মঠ হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দ, ধীরানন্দ ও মাধবানন্দ আর বিবেকানন্দ সোসাইটির সেক্রেটারী কিরণচন্দ্র দত্ত আসিয়াছেন। ৺বিজয়ার প্রণাম ও আলিঙ্গনাদি হইয়া যাওয়ার পর সকলে মিষ্টিমুখ করিলেন। মঠের সম্বন্ধে নানা কথা হইতেছে। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহারা বলিতেছেন, "আজ আমরা deputation-এ (আবেদন নিয়ে) এসেছি। কথামৃত আর লেখা সম্ভব না হলে, যেমন আছে ডায়েরীতে তেমনি ছাপিয়ে দিলে হয় না?" শ্রীম সহাস্যে উত্তর করিলেন, "সব তাঁর ইচ্ছা। আমাদের ইচ্ছা আছে আর এক পার্ট লেখা। তিনি শক্তি দিলে হতে পারে। ডায়েরী ছাপালে বুঝবে কে? হয়ত উল্টো উৎপত্তি হবে।"···

শ্রীম (সাধুদের প্রতি)···

ঠাকুর বলেছিলেন, বেদে যাকে সচ্চিদানন্দ বলে, সেই সচ্চিদানন্দ এঁর (ঠাকুরের শরীরের) ভিতর থেকে বের হয়ে একদিন বললেন, আমিই যুগে যুগে অবতার হই।

---

* শ্রীম-দর্শন, তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ১১-১৩ থেকে গৃহীত।

আবার বলেছিলেন, বেদে যাকে ব্রহ্ম বলে আমি তাকেই কালী বলি, আদ্যাশক্তি বলি। যখন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন তখন বলি শক্তি। যখন স্বরূপে অবস্থিতি করেন তখন বলি ব্রহ্ম। শক্তি ব্রহ্ম অভেদ। যেমন সাপ, কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, এটি ব্রহ্ম ; আবার হেলে দুলে চলে, এটি শক্তি।

সেই সচ্চিদানন্দ, সেই বেদপুরুষই ঠাকুর। কি অবস্থাই তাঁর ছিল। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের একেবারে ঘনমূর্তি। একবার কতকগুলি টাকা পয়সা তাঁর সামনে রাখা হয়েছিল। হাত ওদিকে নেবার অনেক চেণ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই যাচ্ছে না, ছোঁয়া তো দূরের কথা ! শেষে জোর করে নেওয়ায় হাত বেঁকে গেল, ব্যথা হল। আর স্ত্রীলোক সব মা। 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'।

শ্রীম (স্বামী শুদ্ধানন্দের প্রতি)—বেশ নিয়ম ছিল ঋষিদের। কেউ প্রশ্ন করতে গেলে বলতেন, আগে তপস্যা করে এস অন্ততঃ এক বছর। আবার উপদেশ দিয়েও বলতেন তপস্যা করতে। নইলে বুঝতে পারবে না। আগেও তপস্যা পরেও তপস্যা। ইন্দ্র বুঝি একশ এক বছর তপস্যা করে বুঝতে পারলেন ব্রহ্ম কি !

স্বামী মাধবানন্দ—ঋষিদের Constructive Method (সংগঠনমূলক পদ্ধতি) ছিল। একটা কথা বলে দিলেন। ঐটা নিয়ে চিন্তা করতে থাক ; ভিতর থেকেই বুঝতে পারবে next step কি (অতঃপর কি)।

শ্রীম—ঠাকুর বলতেন, নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বল। তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন। তিনি এই রাস্তায় গিছলেন কিনা। সোজা পথ কলিযুগের পক্ষে।

সাধুরা এবার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

(২)*

কলিকাতা, ২০শে মার্চ, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ, ৬ই চৈত্র, ১৩৩০ সাল। বৃহস্পতিবার।

মর্টনের চারতলার ছাদ। অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়া আছেন। সম্মুখে দুই দিকে বেঞ্চিতে সামনাসামনি ভক্তগণ বসা। এখন বড় অমূল্য, জগবন্ধু, সদানন্দ, লক্ষ্মণ ও শচীনন্দন প্রভৃতি রহিয়াছেন। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী মাধবানন্দ আসিয়াছেন। ইনি হিমালয়স্থিত মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষ। তিনি শ্রীমকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ে হাত দিলেন। শ্রীম বাধা দিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। শ্রীম কাহাকেও পায়ে হাত দিতে প্রায়

* শ্রীম-দর্শন, ষষ্ঠ ভাগ, পৃষ্ঠা ৯৪-১০১ থেকে গৃহীত।

দেন না, সাধুকে দেওয়া দূরের কথা। ভারতের জাগরণ ও স্বাধীনতার কথা হইতেছে।

শ্রীম (স্বামী মাধবানন্দের প্রতি)—ওরা (ইংরেজরা) এখনও পূর্বের ন্যায়ই terrorise (আতঙ্কিত) করতে চায়। কিন্তু তা তো আর চলছে না। এখনও বুঝতে পারে নি। যখন বুঝতে পারবে তখন ফস্ করে হয়ে যাবে (স্বাধীন)। Spiritual force-এর (আধ্যাত্মিক শক্তির) কাছে কি material force (জড় শক্তি) দাঁড়াতে পারে ?

শিখদের (নানকানা সাহেবের) জাটার মামলায় দেখছিলাম জজ বলছে, probably they used some fire arms (সম্ভবতঃ তাহারা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল)।

স্বামী মাধবানন্দ—জজের আসনে বসেছে কিনা, তাই মুরুব্বিয়ানা করছে।

এইবার ঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে।

মাধবানন্দ (শ্রীম'র প্রতি)—ঠাকুর ক'বার তীর্থে যান ? আপনি লিখেছেন দু'বার।

শ্রীম—হাঁ, দু'বারই। একবার মথুরবাবুর সঙ্গে। আর একবার ওঁর ছেলেদের সঙ্গে। তখন কাশী পর্যন্ত রেল ছিল। রেলওয়ে কোম্পানীর সঙ্গে reference (লেখালেখি) করে তারা যে 'ডেট' দেয়, আর যারা সঙ্গে গিছলো তাদের দেওয়া 'ডেট' মিলিয়ে দেখলাম ঠিকই। আরো অনেক circumstantial evidence (পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য, ঘটনা) ছিল। আমরা যেতুম কিনা, জানবাজারে ও ব্যারাকপুরে (রাণী রাসমণির বংশধরদের কাছে) এই সব সংবাদ সংগ্রহ করতে।

মাধবানন্দ—ঠাকুরের কথা শুনে তখনই লিখে ফেলতেন তো ?

শ্রীম—না, on the spot (সেই স্থানেই) লিখি নি। সবই memory (স্মৃতি) থেকে লিখেছি বাড়ি এসে—কখনও সারারাত জেগে। আমরা যা দিয়েছি তা অন্যের নিকট থেকে collection (সংগ্রহ) নয়। যা শুনেছি আমরা তাই লিখেছি। Historian-দের (ঐতিহাসিকদের) মত collect (সংগ্রহ) করি নি। অথবা antiquarian-দের (পুরাতত্ত্ববিদদের) মতও লেখা হয় নি। সব নিজ কানে ঠাকুরের মুখ থেকে শোনা, নিজ চোখে দেখা।

মাধবানন্দ—এর মধ্যেই অত difference (মতভেদ) হতে লাগল (ঠাকুরের জীবনী ও বাণী নিয়ে)।

শ্রীম—তা'তে আর আশ্চর্য কি ! তা হয়। দেখুন না বাইবেল। চারটা গস্পেলের একটার সঙ্গে আর একটার মিল নাই। এতে আর তেমন কি আশ্চর্য আছে। আমরা কখনও একটা sitting (দিনের ঘটনা) সাত দিন ধরে লিখতুম, কার পর কি গান, সমাধি, এসব স্মরণ করে।

স্বামী মাধবানন্দ—আমরা নামটা বদলিয়ে দি। যেমন নরেন্দ্র আছে, convenience-এর (সুবিধার) জন্য স্বামীজী করে দি।

শ্রীম—ছি, তা কি করতে আছে? তাহলে faithfulness (বিশ্বস্ততা) রইল কোথায়?

স্বামী মাধবানন্দ—কালীপূজার দিন শ্যামপুকুরের বাড়িতে ঠাকুর কাকে সব নিবেদন করলেন?

শ্রীম—নিজেকেই নিজে নিবেদন করলেন।

স্বামী মাধবানন্দ—ঠাকুরকে, কি মা-কালীকে?

শ্রীম—না। ঠাকুর নিজেকেই নিজে। সকলে যেই ফুল দিয়ে ঠাকুরকে পূজা করলেন, অমনি তিনি বরাভয়-মুদ্রা ধারণ করলেন। দুই হাতে বর আর অভয়, এই মুদ্রা (দুটি হাতে দেখাইয়া), এমন করে। তখন সকলের বুঝতে বাকী রইল না তিনি কে।

স্বামী মাধবানন্দ—রামকৃষ্ণ নাম সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

শ্রীম—ঠাকুরের মুখে এ সম্বন্ধে কিছু শুনি নি। তবে এটা probable (সম্ভব) যে যখন family-র (পরিবারের) সকলের নামেই একটা 'রাম' আছে, তখন তা থেকেই 'রামকৃষ্ণ' হয়েছে। ওঁরা রামভক্ত কিনা। রঘুবীর গৃহদেবতা। গ্রামের লোক গদাই গদাই বলে ডাকত। গদাধর নাম যে আছে তা'তো আমরা জানতুমই না। পরে জানা গেল। তোতাপুরী দেন নি ঐ নাম, তাঁর আসার পূর্ব থেকেই রামকৃষ্ণ নাম দলিলে রেজিস্ট্রী হয়েছে।*

স্বামী মাধবানন্দ—কে একজন এসেছিলেন পূর্ণজ্ঞানী। তিনি কুকুরের মুখ থেকে কেড়ে খেতেন। তাঁর সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত কে গিছলেন? হৃদয় কি হলধারী?

শ্রীম—হলধারী।

স্বামী মাধবানন্দ—মেয়ের বাড়ি না গিয়ে বেলপাতা নিয়ে ফেরত এলেন বাড়িতে। এখানে আপনি করেছেন হলধারীর বাপ, শরৎ মহারাজ করেছেন ঠাকুরের বাপ।

শ্রীম—আমরা ঐ রকম জানি।

স্বামী মাধবানন্দ—একজন পণ্ডিতের কথায় অক্ষয় মাস্টারমশায় লিখেছেন, "জুতো পায়ে দিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে এক খাটে গিয়ে বসল।" এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

শ্রীম—না, আমরা তখন সেখানে ছিলাম। পণ্ডিত মেঝেতে বসা। ঠাকুর

---

* Vide, Deed of Endowment by Rani' Rashmani 1861, 18th February, এখানে ঠাকুরের নাম লেখা আছে 'রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য'। তোতাপুরী আসেন পরে, 1864-এ।

তাঁর বুকে পা দিতেই, "গুরো, চৈতন্যং দেহি"—এই কথা তাঁর মুখ থেকে বেরুলো। লোকটি খুব ভক্তিমান।

কবিরা অনেক সময় ভাবেন, এর বুঝি কোন রেকর্ডস্ নেই। তাই একটা করে দিলে। কবি যে, ও করবে না তো কি? আমাদের লেখা collection (সংগ্রহ) নয়। ঠাকুরের লীলা যা দেখেছি নিজ চক্ষে, যা শুনেছি নিজ কানে তাঁর মুখ থেকে, তাই লিখেছি।

এতক্ষণে বড় জিতেন, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, ছোট জিতেন, বলাই প্রভৃতি আসিয়াছেন। মনোরঞ্জন, মুকুন্দ, মাখনও ক্ষণকাল মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বামী মাধবানন্দ—আশ্বিনের ঝড়ের অবস্থায় ঠাকুর কয় বছর ছিলেন?

শ্রীম—সাত বছর। ঠাকুর বলতেন, তখন ওরা আমায় ধরে নিয়ে গেল বিয়ে দিবে বলে।

স্বামী মাধবানন্দ—ঠাকুর বঙ্কিমবাবুর কাছে কাকে পাঠিয়েছিলেন?

শ্রীম—গিরিশবাবু আর আমাদের পাঠিয়েছিলেন এই বলে, "যাও, বঙ্কিমের সঙ্গে আলাপ করে এস।" ঠাকুরকে যেতে নেমন্তন্ন করেছিলেন। কিন্তু ঠাকুর যেতে পারেন নি।

স্বামী মাধবানন্দ—কৃষ্ণদাস পাল ঠাকুরের কাছে গিছলেন?

শ্রীম—হাঁ। ঠাকুর কৃষ্ণদাস পালের সম্বন্ধে বলেছিলেন, "কিন্তু খুব হিন্দু, জুতো খুলে ঘরে এল", ঠাকুরের ঘরে। আর বলেছিলেন, "তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি? সে বললে, জগতের উপকার করা! আমি বললাম, তুমি জগৎ দেখছ? বর্ষাকালে গঙ্গায় কেঁকড়ার ডিম দেখেছ? যত ডিম তত জগৎ—অনন্ত। তুমি তার উপকার করবার কে? তুমি তোমার নিজের উপকার কর। সব জীবরূপে তিনি। বহুরূপে তাঁর সেবা করে তুমি নিজে ধন্য হয়ে যাও। যাঁর জগৎ তিনি দেখবেন এসব! তুমি তোমার নিজের পথ দেখ।"

স্বামী মাধবানন্দ—কেশব সেন মশায়ের সঙ্গে দেখা হয় কখন?

শ্রীম—এইটিন্ সেভেনটি ফাইভে (1875 A.D.)।*

স্বামী মাধবানন্দ—নিরঞ্জন মহারাজ কখন আসেন?

শ্রীম—ভক্তের মত আসেন অনেক পরে, আমাদেরও পরে। নিরঞ্জন আগে একবার গিহলো দক্ষিণেশ্বর একটা পার্টির সঙ্গে 'স্পিরিচুয়েলিজম্' দেখতে।

---

* ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব সেনকে প্রথম দেখেন নৈনালের বাগানে। দয়ানন্দ সরস্বতী গিয়েছিলেন ওখানে। বিশেষভাবে পরিচয় হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়ার বাগানে।

ঠাকুর তখনই তাকে single out (চিহ্নিত) করেন। ঠাকুরের কাছে আসবে বলে গিছলো, কিন্তু আসে নি। তাই পরে যখন এল—অনেক পরে, তখন বলেছিলেন, "আচ্ছা, তুই তো আসবি বলেছিলি। এলি না কেন? একটুও মিথ্যে কথা বলবি না।"

স্বামী মাধবানন্দ—ফিফথ্ পার্ট বের করবেন নাকি? ওতে ওটা দিলে বেশ হয়, বঙ্কিমবাবুর সিন্‌টা।

শ্রীম—ইচ্ছা আছে। 'বসুমতী'র ওরা লোক পাঠিয়েছিল। ওরা বের করবে।

(সহাস্যে) অধর সেনের বাড়িতে বঙ্কিমবাবু গেছেন। ঠাকুরও সেদিন সেখানে। ঠাকুর আসবেন বলেই অধরবাবু বঙ্কিমবাবুকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কথা হয়েছিল। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি তো ভারী ছ্যাঁচড়া হে। নিজে যা নিয়ে আছ লোককে তো তাই করতে বলছ। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য কিনা বলছ—নাম যশ, অর্থোপার্জন আর সন্তান উৎপাদন।"

অধরবাবু আর বঙ্কিমবাবু ইংরেজীতে কথা কইছেন। ঠাকুর রসিক পুরুষ। শুনে হেসে বললেন—"শোন, নাপিত বলেছিল, ড্যাম্ (damn) যদি ভাল হয়, তবে আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম্। খারাপ হলে তুমি ড্যাম্, তোমার বাপ ড্যাম্। তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম্। ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাডাম্ ড্যাম্ ড্যাম্।" (সকলের উচ্চহাস্য)।

একটা নাপিত এক বাবুকে কামাচ্ছিল। একটু লেগে যেতেই বলে উঠল বাবু, "ড্যাম্"। ইংরেজী শব্দ, নাপিত তার মানে জানে না। তাই রেগে ঐ কথা বলল (হাস্য)।

বিদায় নেবার সময় বঙ্কিমবাবু ঠাকুরকে নেমন্তন্ন করলেন, "বলুন, কবে পায়ের ধুলো দিবেন। ওখানেও ভক্ত আছে।" শুনে ঠাকুর বললেন, "কেমন ভক্ত গা? যারা 'কেশব কেশব' করছিল সেরূপ ভক্ত তো নয়?" বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কি রকম মশায়?" ঠাকুর বললেন, "একটা স্যাকরার দোকান ছিল। একজন বাবু গেছে অলংকার গড়াবে বলে। সে শুনছে, দোকানের এক ব্যক্তি জপ করছে, 'কেশব কেশব'। হাতে তার মালা। আর একজন বলছে, 'গোপাল গোপাল'। আর একজন বলছে 'হরি হরি'। আর একজন বলছে, 'হর হর'। সকলেরই হাতে মালা, কপালে তিলক।

'কেশব' কেশব' মানে, এই সব লোক কে? 'গোপাল' মানে, গরুর পাল, অর্থাৎ নির্বোধ। 'হরি হরি' মানে, ও হরণ করি তা'হলে? 'হর হর' মানে, হরণ কর।" (সকলের উচ্চহাস্য)।

বড় জিতেন—বঙ্কিমবাবু রসিক পুরুষ ছিলেন।

শ্রীম—হাঁ। রস টিকল না। রস করতে গিছলেন। ঠাকুর রস ভেঙে দিলেন।

বড় জিতেন—ঠাকুরের life (জীবনী গ্রন্থ) লিখছেন বুঝি এঁরা? কিন্তু—

শ্রীম (বাধা দিয়ে উত্তেজিত ভাবে)—এঁরা লিখবেন না তো কে লিখবে ? কত তপস্যা করেছেন এঁরা ! বড় জিনিসের সঙ্গে অনেক কাল ঘর করেছেন। হিমালয়ে থাকেন কিনা !

আমরা দার্জিলিং থেকে এলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "উদ্দীপন হয়েছিল তো ?" আমরা তখন জানতাম না—'স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ'। পর্বতের মধ্যে হিমালয় ভগবানের রূপ। ঠাকুর বলেছিলেন, "লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল।" শিলিগুড়ির ওখানে গাড়ি উপরে উঠছিল। সামনে হিমালয় দেখে আমার চক্ষে জল এল। ঠাকুর জানতে পেরেছিলেন। এঁরা সেই হিমালয়ে বাস করেন।

শ্রীম—মায়াবতীর আশ্রম থেকে বেশ কাজ হচ্ছে। অনেকগুলি বই বেরিয়েছে। এসব নিষ্কাম কর্ম। নিজের benefit-এর (লাভের) জন্য নয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কর্ম না করে মানুষ থাকতে পারে ? সঞ্জয় গেলেন বিরাট রাজার বাড়িতে। পাণ্ডবরা ওখানে রয়েছেন বনবাসের সময়। সঞ্জয় পাণ্ডবদের বললেন, "তোমরা বেশ আছ ! বনে বনে ঘুরবে আর তাঁর নাম করবে।" শ্রীকৃষ্ণ শুনে মুখের উপরই শুনিয়ে দিলেন। বললেন, "বাঃ, তুমি তো বেশ লোক। এখন ধর্ম শিখাতে এসেছ। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় তোমার ধর্মোপদেশ কোথায় ছিল ? তুমি তো তখন ঐ সভাতেই ছিলে না ? তাদের (পাণ্ডবদের) কত কর্ম বাকী রয়েছে। বললেই হল, বনে বনে ঘুরে তাঁর নাম করবে ! দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন—রাজ্যশাসন, কত কি তাদের করতে হবে।" একেবারে উড়িয়ে দিলেন সঞ্জয়কে। কর্ম না করে মানুষ পারে না।

তবে কি কর্ম করবে ? গুরু যা বলেছেন সেই কর্ম করা। যা তা কর্ম নয়। যদি কোন সিদ্ধগুরু থাকেন, যাঁর শরীর আছে, তিনি যে কর্ম করতে বলেন, সেই কর্ম করা। ঠাকুর একটি ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন এই কথা।

গীতায় আছে, কর্মকে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মকে যে অকর্ম জেনেছে, আর অকর্মকে—মনে কর্মের বাসনা আছে, বাইরে করছে না—কর্ম বলে জেনেছে, সেই ব্যক্তি কর্মের রহস্য জানে। সেই ঠিক ঠিক কর্ম করতে পারে।

শ্রীম (স্বামী মাধবানন্দের প্রতি)—সীতাপতির খুব memory (স্মৃতিশক্তি) আছে। কখন কি হয়েছে সব বলতে পারে। জিতেনটিও বেশ। ওরা মিহিজামে গিছলো।

স্বামী মাধবানন্দ মিষ্টিমুখ করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—খুব মহৎ লোক এই সব সাধু।

ডাক্তার—খুব meritorious (গুণবান)।

শ্রীম—এখানে কিন্তু merit-এর (গুণের) কোন question (প্রশ্ন) আসছে না।—সব মায়ের ইচ্ছা। তিনিই ইচ্ছা করেছেন লোকশিক্ষা দেওয়াবেন এই এঁদের দ্বারা। তাই তিনি এই সব সাধু করেছেন।

বিড়াল যখন ইঁদুর ধরে তখন এক রকম করে ধরে। আবার যখন নিজের বাচ্চাকে ধরে তখন আর এক রকম। এতে মেরিট-ফেরিট (গুণগরিমা) খাটে না। তাঁর ইচ্ছা হলে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। ভাঙা পড়ো বাড়িতে মহাযজ্ঞ হয়।

এমন অনেকে মঠে এসেছে তাদের antecedents (পূর্ব-পরিচয়) তেমন বেশী কিছু নেই। হয়ত কেউ 'মাইনর' পর্যন্ত পড়েছে। আবার কেউ হয়ত বাপে-তাড়ান বকাটে ছেলে। মঠে এসে সেই ছেলে highest ideal-এর (সর্বোচ্চ আদর্শের) সঙ্গে contact (সংযোগ) হওয়ায় একেবারে changed man (নূতন মানুষ) হয়ে গেছে—এই দু'তিন বছরের মধ্যে।

(৩)*

২রা এপ্রিল, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ, ১৯শে চৈত্র, ১৩৩০ সাল, বুধবার।

ইদানীং শ্রীম নূতন 'কথামৃত' লিখিতেছেন—পরিশিষ্টরূপে মাসিক বসুমতীতে বাহির হইতেছে। পুস্তকাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বেলুড় মঠের স্বামী মাধবানন্দ শ্রীমকে কয়েকদিন পূর্বে কথাপ্রসঙ্গে অনুরোধ করিয়াছিলেন 'কথামৃত' পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিম সংবাদ দিতে। উহা 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইয়াছিল পঞ্চম বর্ষে। এই বিষয় বিশেষভাবে 'উদ্বোধনে' অনুসন্ধান করিবার জন্য পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে শ্রীম অন্তেবাসীকে [ছাত্রকে] স্বামী মাধবানন্দের নিকট অদ্বৈতাশ্রমে পাঠাইলেন। অদ্বৈতাশ্রমে 'উদ্বোধন' নাই। শ্রীম তাই অন্তেবাসীকে উদ্বোধন অফিসে গিয়া ঐ প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করিয়া আনিতে বলিলেন। অন্তেবাসী রাত্রি ১০টার সময় প্রবন্ধের অর্ধেক লিখিয়া লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীম ভক্তগণকে নূতন 'কথামৃত' পরিবেশনের লোভে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। অন্তেবাসী অনুলিপি পাঠ শেষ করিলেন রাত্রি এগারটায়। পরদিন শুক্রবারও উদ্বোধন অফিস হইতে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইলে ভক্তগণ বসিয়া রহিলেন। আজ অন্তেবাসীর সঙ্গে বিনয় গিয়াছিলেন।

পাঠ শেষ হইলে শ্রীম বলিলেন, এতে লোকের খুব উপকার হবে। বঙ্কিমবাবু একজন বিখ্যাত লোক। তাঁর সঙ্গে অমন সব কথা হয়েছে লোকে ইহা জানলে ঠাকুরের উপর দৃষ্টি পড়বে। (সহাস্যে) ঠাকুর বলেছিলেন, বাবুরা যখন খেয়েছে তখন আমড়ার চাট্‌নী ভাল, (সকলের হাস্য)। হাঁ, বড়লোকেরা গ্রহণ করলে সাধারণ লোক নেয়।

---

* শ্রীম-দর্শন, চতুর্থ ভাগ, পৃষ্ঠা ১৫০ থেকে গৃহীত।

(৪)*

১লা জানুয়ারী, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ, ১৭ই পৌষ, ১৩৩১ সাল, বৃহস্পতিবার। মর্টন স্কুলের চারতলা।

...আজ ১লা জানুয়ারী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই দিনে কল্পতরু সাজিয়া অনেকগুলি ভক্তকে ইষ্টদর্শন করাইয়াছিলেন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। শ্রীম'র মন ঐ ব্রহ্ম-দর্শনের অনুধ্যানে নিমগ্ন।

...শ্রীম মধ্যাহ্নভোজন করিয়া ঠাকুরবাড়িতেই বিশ্রাম করিলেন। পরিবারবর্গ ঐ স্থানে। অপরাহ্ন চারটায় মর্টন স্কুলে ফিরিয়াছেন।

আজ কল্পতরুর দিন আর ১লা জানুয়ারী বলিয়া অফিস বন্ধ। তাই অনেক ভক্তসমাগম হইয়াছে। ভাটপাড়ার ললিত, ভোলানাথ প্রভৃতি আসিয়াছেন। শুকলাল, মনোরঞ্জন, বড় জিতেন, ছোট জিতেন, দুর্গাপদ, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, অমৃত, বড় ও ছোট অমূল্য, ললিত উকীল, জগবন্ধু, বলাই, গদাধর, বুদ্ধিরাম প্রভৃতি বহু ভক্ত সমাগম হইয়াছে।

প্রথমে বাহিরে ছাদে বসিলেন। পরে শীত বলিয়া, আলো আসিতেই চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়াছেন। সকলের সহিত শ্রীম ধ্যান করিতেছেন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পূর্বের শ্রী নাই, কষ্ট হয় দেখিলে, এই সব কথা ধ্যানান্তে হইতেছে। তবুও সেখানকার প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র। ঐ স্থান মহাতীর্থ। ভগবান সশরীরে ত্রিশ বৎসর ছিলেন ওখানে। এই সব কথা হইতেছে।

স্বামী মাধবানন্দ ও অন্য এক সঙ্গী সাধু প্রবেশ করিলেন। শ্রীম অতি স্নেহে তাঁহাকে নিজের পাশে বেঞ্চেতে বসাইলেন। ইনি মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। কুশল প্রশ্নাদির পর নানা কথা হইতেছে।

শ্রীম (স্বামী মাধবানন্দের প্রতি)—আপনারা মস্ত একটা কাজ করেছেন, ঠাকুরের life-টা (জীবনীটা) বের করে। বছর তিনেকের চেষ্টায় হয়েছে। এটার খুব দরকার ছিল। তবে এখন নন-কোঅপারেসানে সকলে ব্যস্ত। পলিটিসিয়ানরা too busy (অত্যন্ত ব্যস্ত)। দেখবার সময় নেই।

স্বামী মাধবানন্দ—তারা এসব বিশ্বাস করে না।

শ্রীম—তা' বটে। অনেকেই পছন্দ করে না। গান্ধী মহারাজ ফোরওয়ার্ডে কত বড় কথা লিখেছেন—"His life enables us to see God face to face...Ramakrishna was a living embodiment of godliness." মানে তাঁর জীবনচরিত শুনলে মনে হয় যেন ঈশ্বর হাতে এসে গেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরীয় ভাবের জীবন্ত বিগ্রহ। কি কথা! গান্ধী মহারাজের মত

* শ্রীম-দর্শন, অষ্টম ভাগ, পৃষ্ঠা ২৬১-২৬৮ থেকে গৃহীত।

কয়জনের এই insight (অন্তর্দৃষ্টি) আছে? অপর লোক এ সব সম্বন্ধে হয়ত patronisingly (মুরুব্বিয়ানা করে) বলে।

আমরা যখন ব্রাহ্ম সমাজে ঈশ্বরের কথা শুনতাম তখন মনে হত তিনি কত দূরে! ও মা, ঠাকুরের কাছে কথা শুনে মনে হত যেন ঈশ্বর পাশে বসে আছেন, হাতের কাছে! গান্ধী মহারাজ তাঁকে দর্শন করেন নি, কিন্তু উচ্চ অনুভূতি আছে। কেমন ধরেছেন তিনি, দেখুন।

তা' হবে না। ঠাকুর তো শুধু ঈশ্বরদর্শন করেন নি। নিজে যে ঈশ্বর—অবতার। তাই তো যারা শুদ্ধচিত্ত তারা ধরতে পারে, বুঝতে পারে। আবার কতজনকে ঈশ্বরদর্শন করিয়েছেন।

স্বামী মাধবানন্দ—গান্ধীজী সব ছেড়ে স্বরাজলাভের চেষ্টা করছেন, খুব Sincere।

শ্রীম—তিনি যে ঠিক ঠিক কর্মযোগী। সব ভোগ ছেড়ে যে কর্ম করতে চেষ্টা করে তাঁকেই বলে কর্মযোগী। কত বড় যোগীপুরুষ। যোগী না হলে ঠিক ঠিক কাজ হয় না। সব করব কিন্তু benefit (ভোগ) নেব না, এইটি যোগীপুরুষের ভাব। গান্ধীজীর কাজ ঠিক কাজ। দেশ কত উঠেছে!

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুরের Self-Government (স্বরাজ) হল আত্মসংযম। এঁরা বলেন Independence (স্বাধীনতা)। ঠাকুরের ভাবও আলাদা, ভাষাও আলাদা।

ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ সাহস করিয়া রাজনীতির কথা তুলিয়াছেন। দেশে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছে। সর্বত্র এই সব আলোচনা, বড় বড় নেতারা জেলে যাইতেছেন। ঘরের কুলবধূও বাহির হইয়া ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। দুই একজন ভক্ত কোমর বাঁধিয়া এই সব কথায় মত্ত। শ্রীম কৌশল করিয়া এই কথার স্রোত ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, এই সব কথা যেন কোঁচড়ের দাদ। একবার চুলকাতে আরম্ভ করলে আর রক্ষে নেই। শেষে নির্লজ্জ হয়ে দু' হাতে বেহুঁশ হয়ে চুলকাতে থাকে।

শ্রীম (স্বামী মাধবানন্দের প্রতি)—কিন্তু ঠাকুরের politics (রাজনীতি) ছিল ঐটুকু—(সহাস্যে) "কূঁয়ার সিং বলে, ইংরেজ রাজা, সেলাম করতে হয়।" স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "I have nothing to do with politics (রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই)।"

একজন ভক্ত—আচ্ছা, পলিটিক্সের (রাজনীতির) মধ্যে কত ত্যাগ দেখা যাচ্ছে। কত দুঃখ বরণ করছেন এঁরা।

শ্রীম—হাঁ, পলিটিক্সের (রাজনীতির) মধ্যে ত্যাগ আছে নিশ্চয়। এই যেমন

আয়ার্ল্যাণ্ডে ম্যাকস্যুইনি। একান্নবই দিন না কত দিন খেলই না। শরীর ত্যাগ করে দিল। এ ত্যাগও সকাম। এ কেমন? যেমন, ছেলেরা ইস্কুলে না খেয়ে চলে এল। কেন? না, একে দিয়েছে দুটো সন্দেশ, আর ওকে চারটে। এই জন্য রেগে না খেয়েই চলে গেল (সকলের হাস্য)।

এ হল ভোগের জন্য ত্যাগ। কম ভোগ হচ্ছে, বেশী ভোগ পাবার জন্য। আর ঈশ্বরের জন্য ত্যাগ সে অন্য কথা! গান্ধীজীর কাজ ঈশ্বরের জন্য। তাই 'রাম রাম' করেন। এর ভিতরও ভাল লোক আছে। সংখ্যায় খুব কম। বেশীর ভাগই ঐ সকাম।

মাদ্রাজের সুবিখ্যাত জজ সুব্রহ্মণ্য আয়ারের কথা হইতেছে। ইনি অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া নাইট উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও নাইট উপাধি ছাড়িয়াছেন। সম্প্রতি একজন একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার কথা মাধবানন্দজী বলিতেছেন। স্বামীজীর কথাও আছে।

শ্রীম—খুব interesting article (মজার প্রবন্ধ) তো! আমরা নতুন কথা একটা জানলুম। মাথার পাগড়ী ফেলে দিলেন। আর বললেন, আমায় arrest (গ্রেপ্তার) কর। স্বামীজী সম্বন্ধে এটি নতুন কথা শুনলাম। নরেন সেনও এইরূপ করেছিলেন ডাফরিনের সঙ্গে।

আজকাল গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যা করছে দেশের লোক, তা শুনতে সকলের একটু ইচ্ছা হয় বৈকি। খুব স্বাভাবিক। শেষ অবধি পেরে উঠবে না গভর্ণমেণ্ট। দেশের লোকেরই জয় হবে।

তিন মাস পূর্বে হৃষীকেশে জলপ্লাবনে প্রায় আড়াইশ সাধু প্রাণত্যাগ করেন। ঝাড়িতে (বনে) থাকতেন কুটীর বেঁধে। কয়েক বছর ধরে বদরীনারায়ণের পথে একটা পাহাড়ের চূড়া ভেঙে গিয়ে নদীর জল আটকে রাখে। গত অক্টোবরে হঠাৎ সেই জল পাহাড় ভাসিয়ে বেগে বার হয়ে যায়। তা'তেই হৃষীকেশের ঐ দুর্ঘটনা হয়। অবশ্য সরকার পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। সাধুরা সে কথা গ্রাহ্য করেন নি। কেউ কেউ শহরে চলে গিছলেন। বেলুড় মঠের একজন সন্ন্যাসী, নাম সর্বেশ্বরানন্দজী, আর একজন ব্রহ্মচারী ভবানীচৈতন্য ওতে দেহত্যাগ করেন। ভবানীচৈতন্য এম. এ. পাশ ছিলেন। আর সন্ন্যাসী বেশ পণ্ডিত ছিলেন। আর একজন ব্রহ্মচারী ধীরেনও ছিলেন। তিনিও সুপণ্ডিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঈশান স্কলার'। তিনি সন্ধ্যায় ঝাড়ি ছেড়ে কৈলাস আশ্রমের দিকে আশ্রয় নেন তাই বেঁচে গেছেন। পরে শোনা যায়, মঠের সাধু দুইজন ঈশ্বর-ইচ্ছার উপর নির্ভর করে কুটীরে আসনে বসেই ভেসে যান স্বেচ্ছায়।

এই সব কথা হইতেছে।

শ্রীম—বড় বড় পাথর সব জলে ভাসিয়ে এনেছে। তাতে ধাক্কা খেয়েই নাকি মরেছে বেশীর ভাগ।

স্বামী মাধবানন্দ—তিনি মারলে রাখে কে ?

শ্রীম—হাঁ। ঠাকুর কোলা ব্যাঙের গল্প বলেছিলেন। রামের তীরের খোঁচায় কোলা ব্যাঙ মুমূর্ষু—চেঁচায় নি। রাম জিজ্ঞাসা করলে বলল, রাম নিজে মারছেন এখন কার দোহাই দেব, তাই চেঁচাই না। সাপে ধরলে, 'রাম রক্ষা কর' বলে চীৎকার করি।

শ্রীম—আমরা যখন স্বর্গাশ্রমে ছিলাম সে সময়ও একবার জল বেড়েছিল। লোকক্ষয়ের কথা শুনি নি। আমরা পূর্বে খবর পেয়ে অনেক দূর চলে যাই। চার পাঁচ ক্রোশ। ফিরে যখন এলুম তখন দেখতে পাচ্ছি যেখানে ডাঙা ছিল সেখানে দু' মানুষ জল। কে আর সাধুদের খবর নেয়। ঈশ্বর-ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তাঁরা পড়ে আছেন।

স্বামী মাধবানন্দ—মিশনের তরফ থেকে কিছু কিছু কুটীর বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। (দুঃখিত হয়ে) আমাদের দেশের লোক এই ভাবেই সব যাবে। কে দেখছে ? রাজার সেদিকে নজর নেই। এই রকম অবহেলার জন্যে ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ মহামারীতেই আমরা সব সাবাড় হব।

শ্রীম—গান্ধী মহারাজের সঙ্গে দেশের লোক যোগদান করেছেও এই ভেবেই। এমনিও মরছে। না হয় লড়েই মরব, এই ভেবে। সহ্যেরও সীমা আছে। স্বামীজী তাই কত দুঃখে বলেছিলেন, সরকারের অবহেলায় দেশের লোক driven to the neighbourhood of brutes (পশুপ্রায় হয়েছে)। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, ঘর বাড়ি নেই। মানুষ বলে ধারণাই যেন তাদের লোপ পেতে বসেছে ! আবার দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী এ সব লেগেই আছে ! কি দুর্দশা।

শ্রীম চুপ করিয়া আছেন। কি ভাবিতেছেন। এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ঠাকুরের কি দৃষ্টি ! কি বুঝব আমরা ? তাঁর ঘরের শিকেতে সন্দেশ পচে যাচ্ছে হাঁড়ির ভেতর। তবুও যাকে তাকে দেবেন না। ভক্তরা গেলে বের করে নিজহাতে দেবেন। অপর লোক হয়ত বলবে, কি কৃপণ ! কেন দেন নি তিনিই জানেন। আমরা যতটা দেখেছি, মনে হয় তাতে দুষ্ট লোককে খাওয়ালে তার দুষ্কর্মের ফল পেতে হয়, এই জন্যে হয়ত। বলেছিলেন, কসাইয়ের গো-হত্যার পাপ যার বাড়িতে সে খেয়েছিল তাকে স্পর্শ করবে। এক শ্রাদ্ধ বাড়িতে অপরের সঙ্গে বসে কসাই খেয়েছিল। তারপর গিয়ে গো-হত্যা করে।

কালীবাড়িতে কিছু বিশেষ পর্ব হলেই প্রসাদী থালা আসত ঠাকুরের ঘরে। রোজই কিছু কিছু আসত। ঐ দিনবিশেষে একবার থালা আনতে দেরী

হওয়ায় চটর চটর করে খাজাঞ্চির ঘরে গিয়ে উপস্থিত। বললেন, ও ঘরের বরাদ্দ থালাটা যায় নি কেন? অত বেলা হল? যোগেন স্বামী তখন ছেলেমানুষ। এই কথা শুনে ভাবলে 'আকরে টানছে।' মানে পুজারী বামুন। চালকলা বাঁধার অভ্যাস। এটা যায় নি। কিন্তু তিনি তো অন্তর্যামী, বুঝতে পেরে বললেন, দেখ্ এখানে ভক্তরা সব আসে। তারা খেলে রাসমণির ধনের সার্থকতা হবে। তাই গিয়ে নিয়ে এলাম।

তাঁর দৈবী দৃষ্টি। আমরা কি বুঝব তার?

এই সব কর্ম, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে না করলে তার জন্য ভুগতে হবে নিশ্চয়। তাঁকে ফল দিয়ে, নিজে benefit (লাভ) না নিয়ে করলে হয়। তা'তেও যদি ভুল ত্রুটি হয়, তিনি এতে দোষ ধরেন না। তাইতো বলেছেন, 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' ভক্ত এক পা এগুলে তিনি দশ পা এগিয়ে এসে তুলে নেন।

সাধুরা মিষ্টিমুখ করিয়া বিদায় লইলেন।

(৫)*

৭ই অক্টোবর, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ, আশ্বিন, ১৩৩৭ সাল, মঙ্গলবার।

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন প্রায় ছয়টা, লক্ষ্মী পূর্ণিমা। শ্রীম ভক্ত পরিবৃত হইয়া চেয়ারে বসিয়াছেন উত্তরাস্য। ⁄বিজয়ার প্রণাম করিতে সাধু ও ভক্তগণ আসিতেছেন যাইতেছেন সারা দিন। ব্রহ্মশক্তির বিচিত্র খেলার কথা হইতেছে। শ্রীম আবৃত্তি করিতেছেন, 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং'—আবৃত্তি শেষ হইবার পূর্বেই সবেগে স্বামী বিরজানন্দ প্রবেশ করিলেন। ইনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক। বাল্যাবধি শ্রীম'র অতি প্রিয় ও স্নেহভাজন। শ্রীম মায়ের মত উঠিয়া আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে আসনে বসাইলেন। স্বামী বিরজানন্দ শ্রীম'র সকল বাধা না মানিয়া জোর করিয়া পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন।...

...স্বামী মাধবানন্দ, অভয়ানন্দ ও সাহেব মোক্ষপ্রাণের প্রবেশ। তাঁহারাও শ্রীমকে ⁄বিজয়ার প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। স্বামী মাধবানন্দ পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীম দিবেন না পায়ে হাত দিতে। তাই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। কিন্তু স্বামী মাধবানন্দও ছাড়িলেন না। তিনি হাঁটু গাড়িয়া জোর করিয়া পায়ে হাত দিলেন। আর সহাস্যে বলিলেন, আজ একদিন হয়ে যাক্ না! এই ফাঁকে স্বামী অভয়ানন্দও পায়ে হাত

---

* শ্রীম-দর্শন, সপ্তম ভাগ, পৃষ্ঠা ২২৫-২৩৫ থেকে গৃহীত।

দিয়া প্রণাম সারিলেন। স্বামী মাধবানন্দ বলিলেন, ইনি ভরত মহারাজ। শ্রীম আনন্দে বলিলেন, হাঁ, আজকাল মঠ manage (দেখাশোনা) করছেন। অনেক কাল ছিলেন মায়াবতী। স্বামী মাধবানন্দ সহাস্যে বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ। এতদিন 'গিরি' ছিলেন এখন 'পুরী' হোন এসে (সকলের হাস্য)।

সাধুরা যুগ্ম বেঞ্চেতে সতরঞ্চির উপর উপবেশন করিলেন।

শ্রীম (স্বামী মাধবানন্দের প্রতি)—রোঁমা রোলার লেখা ঠাকুরের life-টি (জীবনীটি) বেশ হয়েছে। এই একটা মস্ত কাজ হল। এখন অনেক লোক যাচ্ছে মঠে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রফেসাররা গিছলেন। তাঁরা নাকি বলেছেন, আমরা এত কাছে থেকেও জানতে পারি নি এতদিন।

স্বামী মাধবানন্দ—ব্রেজিল থেকেও সাড়া আসছে। স্পেনিয়াডে' ট্রানস্লেশন হয়েছে ঐ বইটা। তাঁরা তা পড়েছেন।

শ্রীম (আহ্লাদে)—সব লাল হো যায়েগা।*

উত্তর কাশীতে সম্প্রতি আমেরিকাবাসী স্বামী যোগেশানন্দের দেহত্যাগ হইয়াছে। ইউরোপের অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত বিওসিয়াতে (Beotia) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকায় স্বামী প্রকাশানন্দের কৃপা লাভ করেন। বেলুড় মঠ হইতে সন্ন্যাস লইয়া তপস্যা করিতে উত্তর কাশী যান। সেই অবস্থায় শরীর যায়। তাঁহার বয়স মাত্র চল্লিশ। উত্তর কাশী যাইবার পূর্বে অন্তেবাসীর সহিত আসিয়া শ্রীমকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া অনুমতি গ্রহণ করেন। তাঁহার দেহত্যাগে শ্রীম বড়ই দুঃখিত। তথাপি হিমালয়ে গঙ্গাতীরে সাধুসঙ্গে তপস্যারত থাকিয়া শরীর ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সৌভাগ্যের কথা বারংবার বলিয়াছেন। আজ স্বামী মাধবানন্দের কাছে বলিতেছেন—It is a sight for the Gods to see (ইহা সত্যিই দেবতাদের দর্শনযোগ্য দৃশ্য)!

শ্রীম (সাধুদের প্রতি)—আচ্ছা, আর কেউ কাছে ছিল নাকি?

স্বামী বিরজানন্দ—আমাদের সাধু পাঁচ ছয় জন ছিল। তবে চিকিৎসা ভাল চলে নি। ডাক্তার প্রথমে বুঝতে পারে নি। প্রথমে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করে। পরে বোঝা গেল টাইফয়েড।

শ্রীম (বিস্ময়ে)—কোথাকার লোক ভারতে এল! সাধু হল, আবার মহাতীর্থ হিমালয়ে তপস্যারত থেকে শরীর ত্যাগ হল। ঠাকুরের ভক্ত

---

* এটি মহারাজা রণজিৎ সিংহের উক্তি। ভারতের ম্যাপে ব্রিটিশ রাজ্য লাল রঙে রঞ্জিত। দেশীয় রাজ্য বা অন্য রাজ্য সব অন্যান্য রঙে রঞ্জিত। রণজিৎ সিংহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন অচিরে সমগ্র ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইবে। শ্রীম'র এই উক্তির অর্থ—অচিরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইবে।

সাধুরাও আবার কাছে ছিলেন। এই সবই সৌভাগ্যের কথা! কোথায় ফুলটি ফুটেছিল, কোথায় এসে দেবপূজায় লাগল! ঠাকুরকে মা দেখিয়েছিলেন, নানা দেশের, নানা রঙের, নানা ভাষার লোক তাঁর কাছে আসবে। আবার ঠাকুর নিশ্চয় করে বলেছিলেন, আন্তরিক ঈশ্বরকে যারা ডাকবে তাদের এখানে আসতে হবে। আর প্রার্থনা করে বলেছিলেন, মা যারা আন্তরিক এখানে আসবে, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। তাই ধন্য যোগেশানন্দ। এ মৃত্যু নয়, অমৃতত্ব লাভ!

স্বামী বিরজানন্দ—সজ্ঞানে শরীর গেছে। শেষ অবধি জ্ঞান ছিল।

স্বামী মাধবানন্দ—অন্য জায়গা হলে চিকিৎসা করানো যেত। সানফ্রানসিস্কোর শান্তি-আশ্রমের জন্য খুব খেটেছিল। অনেক দিন ধরে মেইল ভ্যানে কাজ করে কিছু টাকা জমিয়ে এসেছে এই দেশে। অনেক সময় শান্তি-আশ্রমে একা থাকত।

শ্রীম—কোথায় শান্তি-আশ্রম?

স্বামী মাধবানন্দ—কালিফোর্নিয়া থেকে একশ মাইল দূরে পাহাড়ী স্থান। হরি মহারাজ প্রথম start (আরম্ভ) করেন। অনেক জমি। খুব দুর্গম ছিল আগে।

শ্রীম—এমন শরীর যাওয়া desired by the Gods even (দেবতাদেরও এরূপ মৃত্যু কাম্য)! ভগবানের নাম করতে করতে নির্জন হিমালয়ে শরীর ত্যাগ!

স্বামী মাধবানন্দ—আজ্ঞা হাঁ। তীর্থে সাধুসঙ্গে সজ্ঞানে শরীর ত্যাগ।

সকলেই কিছুকাল নীরব রহিলেন। পুনরায় কথোপকথন।

স্বামী মাধবানন্দ—ম্যাকসমুলারকে জানতেন কেবল পণ্ডিতমহল। রোঁমা রোলাকে জানে সাধারণ লোকও। ওঁর অনেক বই আছে। তারা তা খুব পড়ে।

শ্রীম—এঁর লেখার ভারি সুন্দর মেথড। প্রথম দিলেন একটা চ্যাপ্টার—Builders of Nation (জাতির গঠনকারীগণ)। রামমোহন রায়, কেশব সেন, দয়ানন্দ, আর কে?

স্বামী মাধবানন্দ—দেবেন্দ্র ঠাকুর।

শ্রীম—কেমন সুন্দর ড্রামাটিক atmosphere (নাটকীয় পরিবেশ) সৃষ্টি করে সেই আসরে নামিয়ে আনলেন ঠাকুরকে।

চ্যাপ্টারের হেডিংসগুলি কি সুন্দর! Builders of Unity (ঐক্যের প্রণেতাগণ), Ramakrishna and the great shepherds of India (শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভারতীয় ধর্ম-মহামানবগণ), The Swan Song (রাজহংস সঙ্গীত), Identity with the Absolute (ব্রহ্মৈকাত্মতা), The Return to Man (নরলোকে প্রত্যাবর্তন)।

আবার মহাসমাধিকে কি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন—'The River

re-enters the Sea (নদীর ব্রহ্মসাগরে পুনঃ প্রবেশ)। সাকার নিরাকারের কি মনোরম চিত্র !

কিংবদন্তি আছে, রাজহংস মৃত্যুর সময় গান গাইতে গাইতে চলে যায়—The Swan Song. ঠাকুর মায়ের নাম করতে করতে চলে গেলেন—এই ভাবটার ইঙ্গিত এটি।

শ্রীম—ধনগোপাল আর মিস্ মেকলাউড—এঁরা অনেক help (সহায়তা) করেছেন এই লেখাতে। মিস্ মেকলাউড ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ধনগোপালের লেখার বেশ আকর্ষণ আছে। তবে facts (ঘটনা) সম্বন্ধে উনি বুঝি একটু loose (উদার)।

স্বামী মাধবানন্দ—এ সম্বন্ধে অশোকানন্দকে জিজ্ঞেস করবেন।

শ্রীম—তা হলেও খুব কাজ হয়েছে। ওঁর বই (In the Face of Silence) দেখেই তো ঠাকুরের সন্ধান পান। তারপর এই বই লেখেন। খুব কাজ।

স্বামী মাধবানন্দ—ওঁর (ধনগোপালের) দ্বারা influenced (প্রভাবিত) হয়ে সানফ্রানসিস্কো ইউনিটেরিয়ান চার্চের কর্তৃপক্ষ ঠাকুরের সম্বন্ধে রবিবারে একটা সারমন্ পর্যন্ত দিয়েছিলেন। আমাদের ষ্টুডেণ্টস্‌রা সব গিছলো শুনতে। ফিরে এসে বললে, খুব appreciation (সমাদর) হয়েছিল ঠাকুরের সম্বন্ধে বক্তৃতাটি। আমরা যেতে পারি নি। আমাদের ওখানে সার্ভিস ছিল। এটাই সব চাইতে বড় চার্চ।

আজকাল ও দেশের অনেকেই জেনেছে। ভারতে অনেকে আসছে। সম্প্রতি একটি মেয়ে এসেছেন, নাম মিস্ কেপার। জার্মান রক্ত গায়ে, কিন্তু আমেরিকান citizen (নাগরিক)। নিবেদিতা স্কুলে রয়েছেন। ধাত্রী-কাজ জানেন ভাল। Child welfare-এ (শিশু মঙ্গলে) কাজ করবেন এ দেশে।

শ্রীম—আপনারা যাচ্ছেন যেকালে অনেক লোক আসবে ওদেশ থেকে। আপনি কতদিন ওদেশে ছিলেন ?

স্বামী মাধবানন্দ—দু'বছর।

শ্রীম—ঐ যে এক একটি সেণ্টার হচ্ছে ঐখান থেকে সব ভাব radiated (বিকীর্ণ) হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এঁদের মিষ্টিমুখ করাও।

ভক্তগণ দুইটি প্লেটে চারিটি করিয়া সন্দেশ ও দুইটি রসগোল্লা আনিয়া শ্রীম'র হাতে দিলেন। শ্রীম নিজ হাতে স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী অভয়ানন্দের হাতে দিলেন। স্বামী বিজয়ানন্দ স্বামী মাধবানন্দকে অতগুলি মিষ্টি খাইতে মানা করিলেন অসুখ হইবে বলিয়া। তিনি স্বল্পাহারী ও আহার-সংযমী হইলেও কোনও কথা না শুনিয়া শ্রীম'র নিজ হাতের মিষ্টি মহাপ্রসাদের মত শ্রদ্ধা সহকারে

খাইয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণ পূর্বে স্বামী বিরজানন্দও অনুরূপ আচরণ করেন। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদের দেওয়া খাবার ঠাকুরেরই প্রসাদ। মোক্ষ-প্রাণকেও এর পর আর এক প্লেট মিষ্টি দেওয়া হইল।

স্বামী বিরজানন্দ ও বিজয়ানন্দ বাসে গেলেন। স্বামী মাধবানন্দ, অভয়ানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ ও মোক্ষপ্রাণ উঠিলেন ৭-২০ মিনিটে। তাঁহারা বাগবাজার স্টীমার ঘাটে উঠিলেন। কি সুন্দর রাত্রি! কোজাগর পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে কি অপূর্ব সুষমা বিস্তার করিয়াছে! আর গঙ্গাবক্ষে যেন গলিত রৌপ্যের হিল্লোল। সাধুর মনে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার-লীলামাধুরী। মধুময় পৃথিবী, চন্দ্রমা মধুর, গঙ্গাবারি মধুর—সাধুগণের হৃদয় মধুর, সব মধুর—

ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।

শ্রীম-দর্শন গ্রন্থের বিভিন্ন ভাগ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ সমন্বয়ে গ্রথিত উপরে বর্ণিত স্মৃতিকথাটি চণ্ডীগড়স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম প্রকাশন ট্রাষ্টের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত হল।

স্বামী মাধবানন্দ ঃ স্মৃতি-সঞ্চয়ন

পুরানো দিনের কথা*

(১)

স্বামী নিখিলানন্দ

পূজনীয় নির্মল মহারাজ (মাধবানন্দজী) যে আদর্শ জীবন দেখিয়ে গেলেন তার কিছুমাত্র পালন করতে পারলেই আমরা নিজদিগকে ধন্য মনে করব।[১]

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি প্রথম বেলুড় মঠ দর্শন করি। তখন আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র। তার কিছুদিন পূর্বে শীতকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে স্বামী শংকরানন্দ, স্বামী অম্বিকানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ প্রমুখ মঠের অনেক সাধুও ঢাকা গিয়েছিলেন। 'আগ্নেশ ভিলা' নামক একটি বাটীতে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সে সময় আমরা ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসে স্বামী মাধবানন্দের একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলাম। স্বামী প্রেমানন্দও সে সভাতে কিছু বলতে সম্মত হয়েছিলেন। আমিই তাঁদের সভায় নিয়ে যাবার জন্য 'আগ্নেশ ভিলা'তে গিয়েছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন সাক্ষাৎ সন্তানের দর্শন-লাভের সুযোগ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটল। আমার জীবনে সে এক সন্ধিক্ষণ। আমি তখন বাংলার বিপ্লবী-দলের একজন সদস্য। পূজনীয় মহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] এবং বাবুরাম মহারাজ উভয়েই আমাকে বৈপ্লবিক কার্যাদি ছেড়ে স্বামীজী-নির্দিষ্ট পথে জীবন-গঠন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

…এই ঘটনার কিছুকাল পরে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সংস্পর্শে ধীরে ধীরে আমার যেন মোহভঙ্গ হয়েছিল। আমি তাঁদের আন্তরিকতা সম্পর্কে ক্রমশঃ সন্দিহান হয়ে উঠেছিলাম। আমি দেখেছিলাম যে, তাঁদের অধিকাংশই নাম ও প্রতিপত্তির আশায় ঘুরছেন, দেশের জন্য কোন ত্যাগ-স্বীকার করতে তাঁরা বাস্তবিক রাজী নন। ফলে, আমি মনে মনে এই সংকল্প করেছিলাম যে,

---

* স্বামী নিখিলানন্দ বিভিন্ন সময়ে মাধবানন্দজীর প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তা থেকে সংগ্রহ করে এই স্মৃতিকথা সংকলিত হল।

১। 'বিবেক ভারতী', আশ্বিন, ১৩৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ রচিত 'স্বামী মাধবানন্দের কিঞ্চিৎ স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধের পৃষ্ঠা ২৪৩ থেকে গৃহীত।

কিছুদিনের জন্য রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা করব এবং সেজন্য মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের নির্জন পরিবেশে কিছুদিন বাস করে আসব। স্বামী মাধবানন্দ তখন মায়াবতী আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন; সুতরাং তাঁর অনুমতি চাইলাম। তিনিও অনুগ্রহ করে অনুমতি দিলেন। আর সেইসঙ্গে···রওনা হবার একটা তারিখও ঠিক করে দিলেন।[২]

১৯২১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দের সঙ্গে মায়াবতী গিয়ে আশ্রমের অতিথি হই। পরে স্বামী যতীশ্বরানন্দ আমাদের সঙ্গে মিলিত হন এবং 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র সম্পাদক হন।[৩]

এই সময়েই স্বামী মাধবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি ইংরেজী জীবনচরিত রচনা করতে আমাকে আদেশ দেন। ঐ গ্রন্থ রচনা করতে করতেই আমি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি ১৯২৩ সালের শরৎকালেই শেষ হয়েছিল। এরপর স্বামী মাধবানন্দের অনুরোধে আমি মঠে আসি, স্বামী সারদানন্দ এবং মহাপুরুষ মহারাজের নিকট থেকে গ্রন্থখানির জন্য কিছু অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে।[৪]···

গ্রন্থটির উপাদান, অধিকাংশই স্বামী সারদানন্দ প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ থেকে গৃহীত। লীলাপ্রসঙ্গে কাশীপুর উদ্যানবাটীর কথা [বিশেষ] কিছু ছিল না; বিভিন্ন বাংলা পুস্তক থেকে যতখানি সম্ভব তা সংগ্রহ করে লিখি। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে লেখা সম্পূর্ণ হয় এবং মাধবানন্দজী পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখে দেন।···জীবনীটি প্রকাশিত হবার পর প্রথম বইখানি সারদানন্দজীকে উপহার দিলাম। দেখে তিনি খুব খুশী হয়ে বললেন, "ঠাকুরের একখানি ইংরেজী জীবনী লেখার ইচ্ছা আমার ছিল। তা দেখছি, ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল সেটা অন্য কাউকে দিয়ে লেখানো।"

সদ্য প্রকাশিত 'সমন্বয়' নামক হিন্দী পত্রিকার জন্য গ্রাহক এবং অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এবং বক্তৃতা দেবার জন্য স্বামী মাধবানন্দ আমাকে রাজপুতানা, গুজরাট, কাথিয়াওয়ার ও যুক্তপ্রদেশ সফরে পাঠান। এই সফরে প্রায় এগার মাস

২। স্বামী অপূর্বানন্দ সম্পাদিত 'শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের (২য় সংস্করণ) পৃষ্ঠা ২৪ থেকে গৃহীত।

৩। 'উদ্বোধন', পৌষ, ১৩৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী নিখিলানন্দ রচিত 'স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতিকথা' শীর্ষক প্রবন্ধের পৃষ্ঠা ৬৭০ থেকে গৃহীত।

৪। স্বামী অপূর্বানন্দ সম্পাদিত 'শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের (২য় সংস্করণ) পৃষ্ঠা ২৪ থেকে গৃহীত।

কাটিয়ে, বহু রাজা-মহারাজা ও অপরাপর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অদ্বৈত আশ্রমের কলকাতা শাখায় ফিরে আসি। সেই সময় অদ্বৈত আশ্রম শংকর ঘোষ লেনে ছিল। বিকেল প্রায় চারটে। স্বামী মাধবানন্দ তৎক্ষণাৎ আমাকে উদ্বোধনে গিয়ে স্বামী সারদানন্দকে প্রণাম করে আসতে বললেন। কারণ, পরদিন সন্ধ্যাতেই তিনি কাশী রওনা হবেন। [আমি উদ্বোধনে গেলে] স্বামী সারদানন্দ···বললেন যে পরের দিন তিনি কাশী যাবেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি তাঁর সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক কিনা।—আমি আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, কারণ আমি এতদিন প্রাণ থেকে এইটাই চাইছিলাম। আমি তখন অদ্বৈত আশ্রমের কর্মী। কাজেই বললাম, "মাধবানন্দজীর অনুমতি নিয়ে আসা প্রয়োজন।" সারদানন্দজী বললেন, "ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না" এবং তখনি স্বামী সচ্চিদানন্দকে আমার জন্য টিকিট কাটতে বললেন। স্বামী মাধবানন্দ আমার মুখে সব শুনে সারদানন্দজীর কাছে গিয়ে জানালেন যে তিনি আমাকে তখন রাজকোট পাঠাবার কথা ভাবছিলেন। সারদানন্দজী বললেন, "সে স্বামীজীর তিথি-পূজার পর জানুয়ারী মাসে গেলে চলবে।"

···কাশীতে স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসব সমাপ্তির পরে স্বামী মাধবানন্দ সারদানন্দজীকে লেখেন যে, পূর্বব্যবস্থানুযায়ী আমাকে যেন কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে আমি রাজকোট কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি। সারদানন্দ মহারাজ আমাকে পত্রখানা দেখিয়ে আমার মত জানতে চাইলেন।··· আমি বললাম, "আপনার সঙ্গে আরো কিছুদিন থাকাই আমার ইচ্ছা, অবশ্য আপনি আদেশ করলে কলকাতায় ফিরে যাব।" শুনে তিনি বললেন, "তাহলে মাধবানন্দজীকে লিখে দাও যে তুমি আরো কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকতে চাও।" স্পষ্টই বোঝা যায়, মাধবানন্দজী এতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, পত্রে আমারই মতামত প্রকাশ পেয়েছে, সারদানন্দজীর নয়। সুতরাং পত্রোত্তরে তিনি সারদানন্দজী আমার সম্বন্ধে কি স্থির করেছেন তা তাঁর স্বহস্তলিখিত পত্রের মাধ্যমে জানতে চাইলেন। সারদানন্দজী তখন লিখে পাঠান যে, আমার রাজকোটে যাবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না; বহু বৎসর পূর্বে তিনি ঐ স্থান দর্শন করেছেন। ঐ স্থানের জনসাধারণের জন্য একজন ইংরেজীতে বক্তৃতা দেবার মত সন্ন্যাসীর প্রয়োজন নেই, বরং আমি তাঁর নিকটে থাকি এইটাই তাঁর ইচ্ছা।[৫]

৫। 'উদ্বোধন', পৌষ, ১৩৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী নিখিলানন্দ রচিত 'স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতিকথা' শীর্ষক প্রবন্ধের পৃষ্ঠা ৬৭৭-৬৭৮ থেকে গৃহীত।

পুরানো দিনের কথা*

(২)

[স্বামী মাধবানন্দ মস্তিষ্কের দুষ্ট ব্রণে (Brain Tumor) আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসকগণ আমেরিকায় অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দেন। কিন্তু বিদেশে ব্যয়বহুল এই চিকিৎসা করাতে স্বামী মাধবানন্দ একান্ত অরাজী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, এ দেহ নশ্বর, আজ না হয় কাল তো যাবেই। সুতরাং এর জন্য ভক্ত-সাধারণের দানে সঞ্চিত সংঘের অর্থ ব্যয় করা একান্ত অনুচিত হবে। চিকিৎসকগণের অভিমত, শুভার্থীগণের অনুরোধ এবং প্রাচীন সাধুদের পীড়াপীড়ি কোন কিছুতেই তাঁকে রাজী করানো যায়নি। এমন সময় নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ মাধবানন্দজীর চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে চেয়ে মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিখানা ছিল এইরকম,—"আমার জীবনের সব পাওয়া, এমন কি আমার লেখা, সামান্য কিছু খ্যাতি এবং পুস্তকের কিছু রয়্যাল্‌টির টাকা শুদ্ধ সব কিছুর জন্যই আমি আপনার নিকটে ঋণী। এটা আমার পক্ষে একটা বিশেষ সুযোগ, আমার নিজস্ব যা কিছু আছে সব বিক্রি করে আপনার জন্য কিছু করতে পারব।" নিখিলানন্দজীর সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামী মাধবানন্দ মত পরিবর্তন করেন এবং ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাস থেকে প্রায় এক বৎসর চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় অতিবাহিত করেন। সেইকালে স্বামী মাধবানন্দ এবং স্বামী নিখিলানন্দের কিছু মধুর আলাপন প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিকথা থেকে উদ্ধৃত হল।]

[অস্ত্রোপচারের পরে হাসপাতালে] একদিন স্বামী নিখিলানন্দ মাধবানন্দজীকে বললেন,

"আর এক সপ্তাহ। ডাক্তাররা বলছেন এক সপ্তাহ পরে আপনি বাড়ি যেতে পারবেন। সুতরাং এজন্যে আপনার মনকে তৈরী করে ফেলাই ভাল, কারণ, বুঝছেন তো আপনাকে প্রস্তুত হতে হবে।" মাধবানন্দজী জবাব দিলেন, "বুড়োকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) বল।"[১]

---

* L. Saraswathi Devi কর্তৃক মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত—"BLESSED DAYS OF ASSOCIATION WITH A SAINT 'MEMORABILIA' ET CETERA BY A DEVOTED ADMIRER" গ্রন্থ থেকে গৃহীত। বাংলা অনুবাদ—**নির্ঝরকান্তি ভট্টাচার্য**।

১। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৫

"স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী অম্বিকানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ প্রমুখ মঠের অনেক সাধুও ঢাকা গিয়েছিলেন।"—পৃষ্ঠা ১২৯

১। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ২। স্বামী প্রেমানন্দ, ৩। স্বামী হরিহরানন্দ, ৪। কাশীমপুরের জমিদার শ্রী সারদা রায়চৌধুরী, ৫। স্বামী দুর্গানন্দ, ৬। স্বামী রামেশ্বরানন্দ (?), ৭। স্বামী শঙ্করানন্দ, ৮। স্বামী মাধবানন্দ, ৯। স্বামী অম্বিকানন্দ (?) ও ১০। গোঁসাই মহারাজ—১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী থেকে মাসাধিককাল পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালে গৃহীত চিত্র।
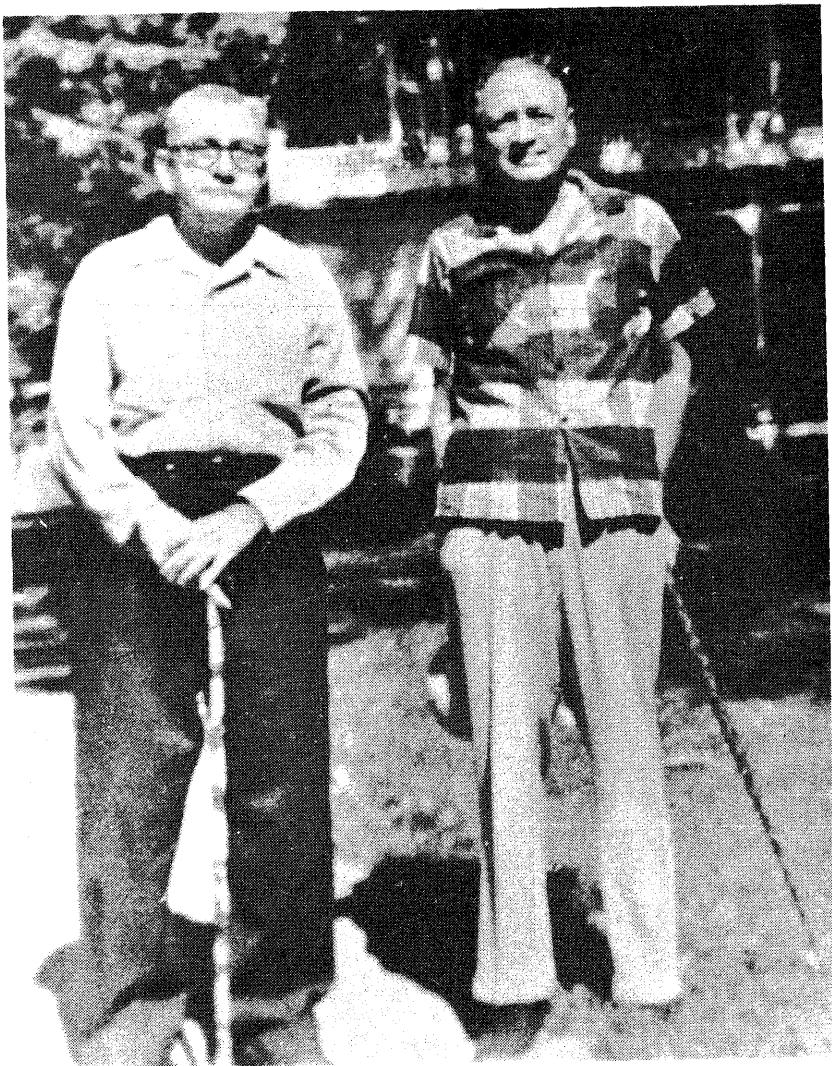
"স্বামী নিখিলানন্দ ঃ আজ আপনি অবশ্যই বাইরে যাবেন এবং রাস্তার ধার দিয়ে পায়চারি করবেন ; একটু বাইরে ঘুরে আসুন, এতে আপনার ভাল হবে।....আপনি কি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে চান্ না, যাতে ভারতে ফিরে যেতে পারেন।
স্বামী মাধবানন্দ ঃ এটা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ঠাকুরকে তোমরা বল।
স্বামী নিখিলানন্দ ঃ (সহাস্যে) ঠাকুর আমার মাধ্যমেও বলছেন, আপনি বেশ জানেন...
স্বামী মাধবানন্দ ঃ কিন্তু ঠাকুর অন্যদের মাধ্যমেও বলছেন, যেমন আমি।"—পৃষ্ঠা ১৩৩
১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সহস্র দ্বীপোদ্যানে গৃহীত চিত্র।

[মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকদের নির্দেশ অনুসারে মাধবানন্দজীকে প্রত্যহ অল্প অল্প করে হাঁটার অভ্যাস করতে হয়েছিল। প্রথম প্রথম সেটা তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়েছিল।]

স্বামী নিখিলানন্দ ঃ আজ আপনি অবশ্যই বাইরে যাবেন এবং রাস্তার ধার দিয়ে পায়চারি করবেন ; একটু বাইরে ঘুরে আসুন, এতে আপনার ভাল হবে।

স্বামী মাধবানন্দ ঃ [আজ] শনিবার—অশুভ দিন।

স্বামী নিখিলানন্দ ঃ আপনি ওসব শুভ ব্যাপার স্যাপার ভুলে যান ! ডাক্তার বলেছেন, আপনি এখন ভালভাবেই হাঁটতে পারবেন এবং তাতে আপনার ভালই হবে।

মাধবানন্দজী মাথা নাড়লেন।

স্বামী নিখিলানন্দ ঃ আপনি কি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে চান্ না, যাতে ভারতে ফিরে যেতে পারেন ?

স্বামী মাধবানন্দ ঃ এটা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ঠাকুরকে তোমরা বল।

স্বামী নিখিলানন্দ ঃ (সহাস্যে) ঠাকুর আমার মাধ্যমেও বলছেন, আপনি বেশ জানেন…

স্বামী মাধবানন্দ ঃ কিন্তু ঠাকুর অন্যদের মাধ্যমেও বলছেন, যেমন আমি।

স্বামী নিখিলানন্দ ঃ আপনি সংখ্যালঘু, তাই আপনার মত খারিজ হয়ে যাচ্ছে।[২]

সেই গ্রীষ্মে স্বামী নিখিলানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনচরিত লেখা সবেমাত্র শেষ করেছেন। স্বামী মাধবানন্দ যে কুটিরে ছিলেন সেখানে কিছু ভক্ত কয়েকদিন ধরে রোজই সকালে এসে সমবেত হতেন এবং নিখিলানন্দজীও সদ্য সমাপ্ত [শ্রীশ্রীমায়ের] জীবনকথার টাইপ করা প্রতিলিপি থেকে একটি করে অধ্যায় পড়ে শোনাতেন। আমরা পেঁছে দেখতাম স্বামী মাধবানন্দ ফায়ার প্লেসের পাশে একটি বড় ইজিচেয়ারে বসে হয় ‘New York Times’ নয়ত ‘Reader’s Digest’ পড়ছেন। স্বামী নিখিলানন্দ ফায়ার প্লেসের অপর পাশে একটি টেবিলে টাইপ করা প্রতিলিপিটি সামনে বিছিয়ে বসতেন। আমরা সকলে বসার পর স্বামী নিখিলানন্দ পাঠ আরম্ভ করার জন্যে প্রস্তুত হতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হত মাধবানন্দজী তখনও তাঁর সংবাদপত্র অথবা সাময়িক পত্রিকায় ডুবে আছেন। স্বামী নিখিলানন্দ মাধবানন্দজীর মনোযোগ

২। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৬

আকর্ষণের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতেন—কখনও গলা পরিষ্কার করার জন্যে কাশতেন, কখনও বা [প্রতিলিপির] পাতা ওলটাবার ছলে শব্দ করতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কিছুতেই যেন কাজ হত না। (কি হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে স্বামী মাধবানন্দ অবশ্যই সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন ; কিন্তু তাঁর কৃত্রিম অমনোযোগ আসলে ছিল দুই মহারাজের মধ্যেকার স্বাভাবিক খুনসুটির অঙ্গ)। শেষ অবধি স্বামী নিখিলানন্দ অধৈর্য হয়ে বলে উঠতেন, "আরে ও মহারাজ, আমরা কি পাঠ শুরু করব ?" তখন স্বামী মাধবানন্দ তাঁর পাঠ্য বিষয়ের থেকে চোখ না তুলেই হাত নেড়ে [শুরু করার জন্যে ইঙ্গিত করে] বলতেন, "হাঁ, আমি তো অপেক্ষা করেই আছি।"[৩]

একদিন সন্ধ্যায় স্বামী পবিত্রানন্দকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তখন তিন প্রাচীন সন্ন্যাসী ইংরেজীতে গল্প করতে করতে বৈঠকী আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে ধর্মতত্ত্বের কিছু সূক্ষ্ম সমস্যার অবতারণা করলেন। স্বামী নিখিলানন্দ মাধবানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, বিশ্বরূপ দর্শন করার পরেও অর্জুনকে আবার কি করে যোগেন মহারাজ (শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী যোগানন্দ) রূপে জন্মগ্রহণ করতে হল আর মথুরবাবু, যিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে এত সেবা করলেন, তাঁকেও কেনই বা পুনর্জন্ম নিতে হবে।

(এই কথা শুনে অন্য মহারাজেরা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন)

স্বামী মাধবানন্দ জবাব দিলেন, "বিশ্বরূপ দর্শন মানে পূর্ণজ্ঞান—এ তোমার নিজের ব্যাখ্যা।"

স্বামী নিখিলানন্দ ঃ "আচ্ছা, শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) একবার আমাকে বলেছিলেন যে, অপরের স্কন্ধে আরোহণ করে স্বর্গে যাওয়ার চেয়ে নিজের চেষ্টায় নরকে যাওয়াও ভাল। কারণ, অপরের সাহায্য হারালে তোমার পতন হবে, কিন্তু তোমার নিজের চেষ্টার ফলে নরকে গেলে সেখান থেকে পুনরায় সেই চেষ্টাতেই তুমি উঠে আসতে পারবে।"

স্বামী মাধবানন্দ ঃ "আমার মনে হয়, প্রথমে নরকে গিয়ে দেখা ভাল যে সে জায়গাটা কি ধরনের। এই মন্তব্যের ফলে আবার হাসির রোল উঠল।[৪]

আর একদিন সন্ধ্যায় নৈশভোজের সময় আতিথ্যদাতা স্বামী নিখিলানন্দ মজা করে বললেন যে মহারাজ [স্বামী মাধবানন্দ] আছেন বলে অনেক ভাল ভাল খাবার জিনিস আশ্রমে আসছে, যা এর আগে আমরা আর কোনদিন

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮

৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩

পাইনি। এইকথা শুনে স্বামী মাধবানন্দ একটি গল্প বললেন, "রোমে একটি ধর্মীয় উৎসবের সময় ব্যাম্বিনো দেবীর মূর্তি গাধার পিঠে বসিয়ে রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে জনতা আনন্দে কোলাহল করছিল এবং ফুল, মিষ্টান্ন ছুঁড়ে দিচ্ছিল। তখন সেই গাধাটি ভাবল যে এ-সব বোধ হয় তারই জন্য। সেইজন্য সে কান খাড়া করে সব কিছু শোনবার চেষ্টা করতে লাগল এবং তারপর ঐসব স্তুতিবাক্য ভাল ভাবে উপভোগ করবে বলে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন জনতা গাধার প্রকৃত স্থানটা কোথায় সেটা বেশ চড়া গলায় জানিয়ে দিয়েছিল।"[৫]

৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৪

হে মহাজীবন*

স্বামী পুণ্যানন্দ

স্বামী মাধবানন্দের জন্ম-পরিগ্রহ ও দেহত্যাগ দুই-ই আজ অতীতের ঘটনা। ইংরাজী সন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে, অবিভক্ত সেদিনের বঙ্গদেশে, নদীয়া জেলার এক পল্লীপ্রান্তে যে আনন্দ-সুন্দর জীবন-কোরকটি প্রথম উদ্গত হয়েছিল, সন ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধে সেই কোরকটি পূর্ণ বিকাশের প্রদীপ্ত মহিমার মধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে। মধ্যে দীর্ঘ সাতাত্তর বৎসরের যে অনন্য জীবন—সেটি নানাভাবে মহিমান্বিত হয়েছে, নানাদিকে সার্থকতা অর্জন করেছে।

প্রাক্-সন্ন্যাসজীবনে স্বামী মাধবানন্দ 'নির্মল' নামে পরিচিত ছিলেন। সন্ন্যাসজীবনেও নির্মল মহারাজই তাঁর সাধারণ্যে সুপরিচিত নাম। নির্মল ও বিমল—পিতামাতার দুই সার্থকনামা পুত্র, এক বৃন্তে দুটি কুসুমের মতো শৈশব-সারল্যে বর্ধিত হয়েছিল। উত্তর জীবনে উভয়েই আবার বৈরাগ্য প্রেরণায় গৃহত্যাগ করে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসী-সংঘে যোগ দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিল।

নির্মলচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোর জীবনের বিস্তৃত কাহিনী আমাদের জানা নেই। এ অপরিসর স্মৃতিসঞ্চয়নে সেকালের আলোচনায় আমরা প্রবেশও করব না। তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর কথা যখনই চিন্তা করি তখনই সর্বাগ্রে যে রূপটি আমার কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে সে এক গৌরাঙ্গ-কিশোর। নাতিদীর্ঘ কৃশ-তনু, নয়নে আননে এক বুদ্ধিদীপ্ত অনাসক্তি, এক অপার্থিব শুচিতা।

শ্রীমা যেমন পরবর্তীকালে নির্মল মহারাজকে দেখেই বলেছিলেন,—'সোনা দিয়ে বাঁধানো হাতীর দাঁতের মতো', ঠিক তেমনি একটি অবয়ব আমার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। কিন্তু মুহূর্তে সে মূর্তি অন্তর্হিত হয়, আর তার স্থলে স্পষ্টতর হয়ে, প্রত্যক্ষতর হয়ে আবির্ভূত হয় আর একটি অবয়ব, আর একটি মূর্তি। সে মূর্তি নির্মলের নয়, কোন শুভ্রবসন পরিহিত গৃহাশ্রমীর নয়। সে মূর্তি সংঘসচিব স্বামী মাধবানন্দের, সংঘনেতা স্বামী মাধবানন্দের।

গৈরিকমণ্ডিত উজ্জ্বল সে তনু,—স্থূলও নয়, কৃশও নয়, দীর্ঘও নয়, খর্বও

---

* রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকা 'আশ্রম' (১৩৭২) থেকে গৃহীত।

"তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর কথা যখনই চিন্তা করি তখনই সর্বাগ্রে যে রূপটি আমার কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে সে এক গৌরাঙ্গ-কিশোর। নাতিদীর্ঘ কৃশ-তনু, নয়নে আননে এক বুদ্ধিদীপ্ত অনাসক্তি, এক অপার্থিব শুচিতা।"—পৃষ্ঠা ১৩৬
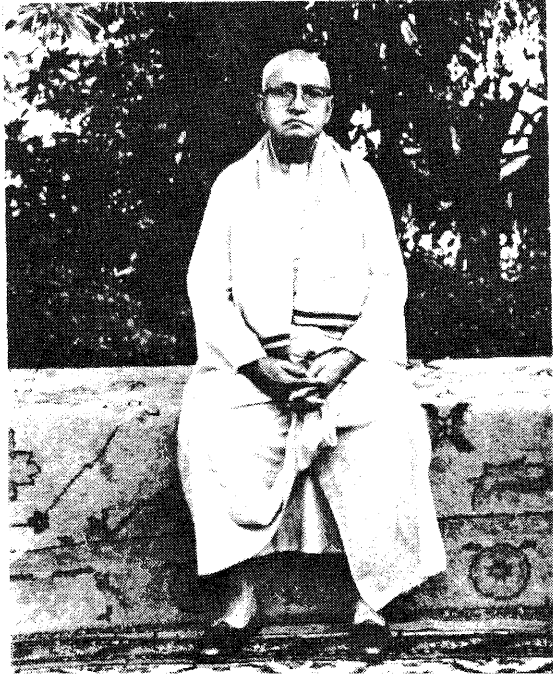
"কিন্তু মুহূর্তে সে মূর্তি অন্তর্হিত হয়, আর তার স্থলে স্পষ্টতর হয়ে, প্রত্যক্ষতর হয়ে আবির্ভূত হয় আর একটি অবয়ব, আর একটি মূর্তি। সে মূর্তি নির্মলের নয়, কোন শুভ্র বসন পরিহিত গৃহাশ্রমীর নয়। সে মূর্তি সংঘসচিব স্বামী মাধবানন্দের, সংঘ-নেতা স্বামী মাধবানন্দের।"
—পৃষ্ঠা ১৩৬
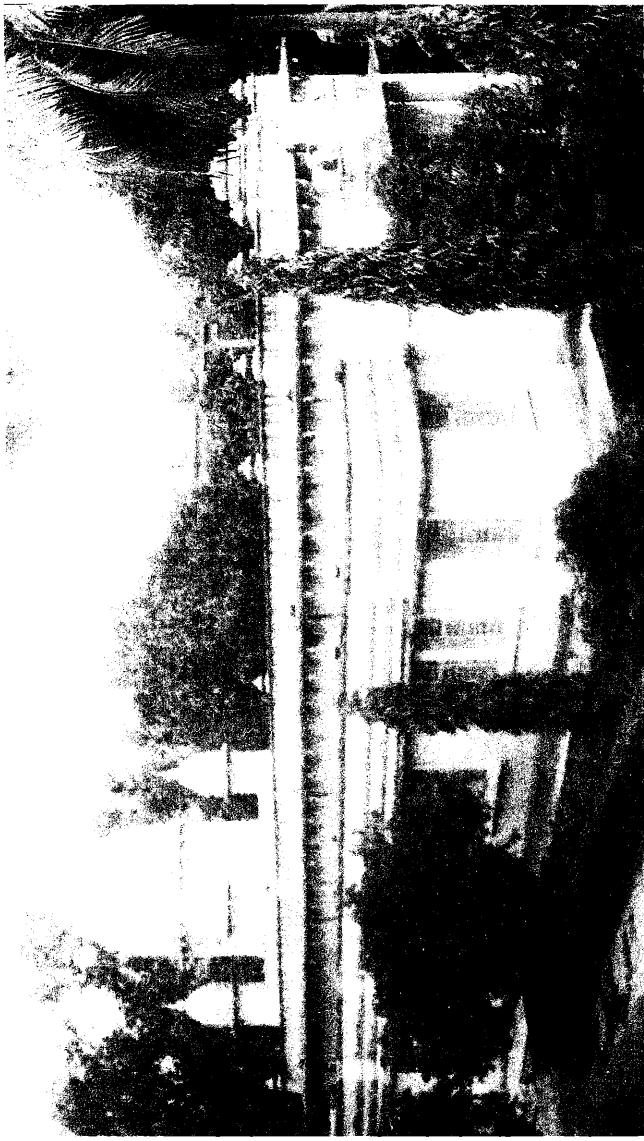
"এ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দুতে যে সুদৃশ্য দেবদেউলটি আজ উর্ধ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সমগ্র বালকাশ্রমের উপর আশিসকিরণ বর্ষণ করছে, তাও তাঁরই হাতে উৎসর্গীকৃত।"—পৃষ্ঠা ১৩৯

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর স্বামী মাধবানন্দ কর্তৃক উদ্বোধিত রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির।

নয়। সে ধীর, স্থির, অন্তর্মুখী এক প্রবীণ সন্ন্যাসীর মূর্তি। সংযত বাক্, শাণিত বুদ্ধি—চক্ষু দুটিতে ধ্যান ও প্রতিভার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ, এক অনন্য অভিব্যক্তি। এ মূর্তিটিকে আমরা দীর্ঘকাল দেখেছি। তাই, তারই স্মৃতি এখনও অম্লান, এখনও উজ্জ্বল।

কিন্তু এরও পশ্চাতে একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। এখন থেকে অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে সে ইতিহাসের সূচনা। কোলাহল-মুখর কলিকাতা মহানগরীর এক প্রান্তে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের সে কাহিনী।

নির্মল মহারাজ তখন এম. এ. ক্লাসে অধ্যয়নরত এক মেধাবী, প্রিয়দর্শন ছাত্র। অধ্যয়নে কৃতিত্বের জন্য, আর বলিষ্ঠ চরিত্রমাধুর্যের জন্য বহুজনের অকৃত্রিম প্রশংসা সে তখন অর্জন করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আর এক প্রবল প্রাক্তন সংস্কার একালেই তাকে সাধারণ সংসার জীবনের গণ্ডী থেকে একেবারে বাইরে নিয়ে যাবার জন্য জাগ্রত হয়ে উঠেছে, উদগ্র হয়ে উঠেছে। সংসার তার ভাল লাগছে না। 'সংসার অশুভ, ঈশ্বরই শুভ'—এ ঋষিবাক্য অন্তরের মণি-মঞ্জুষার রুদ্ধদ্বারে ক্ষণে ক্ষণে তীব্র আঘাত হানছে। তাই, সংসার সে ত্যাগ করতে চায়, গৃহের অচলায়তন থেকে সে বেরিয়ে আসতে চায়। আবার, ঠিক একালেই ঐ উদ্বেল মানসিক অবস্থার মধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দের 'ইন্‌স্পায়ার্ড টকস্' সে হাতে পেয়েছিল এবং দীর্ঘদিনের দ্বিধা সংশয় ঐ গ্রন্থখানির প্রেরণায় যেন মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়েছিল।

'দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং সদ্‌গুরুং ত্বং নমামি।' তাই স্বামীজীকে প্রণাম করে গৃহাশ্রম দূরে রেখে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন নির্মল মহারাজ এবং অচিরে রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসী-সংঘে তিনি যোগদান করেছিলেন।

সে আজ কত কালের কথা, কত যুগের কথা।

তারপরের যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের জীবন, সেটিই তাঁর ধ্যান জীবন, তপস্যা-জীবন, দরিদ্রনারায়ণ-সেবার কর্মজীবন এবং সর্বোপরি তাঁর বহুজনমান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘসচিব ও সংঘনেতার কল্যাণময় মহাজীবন। আমরা যারা তাঁর স্নেহভাজন সহকর্মীরূপে, তাঁর আজ্ঞাধীন সেবকরূপে দীর্ঘকাল তাঁকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে ওঠা বসা করেছি, তাঁর নির্দেশে কাজ করেছি—তাদের প্রত্যেকেরই অন্তরের মণিকোঠায় সেই সংঘসচিব ও সংঘনেতার জীবনের নানা অবিস্মরণীয় স্মৃতি সংরক্ষিত আছে। একসঙ্গে সব কথা মনে আসে না, অনেক কথা হয়ত বিস্মৃতির অতলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথাপি, সহসা এক একটি ঘটনার সংঘাতে এক একটি পূর্বকথা মনে ভেসে আসে, এক একটি মধুস্মৃতি জাগ্রত হয়। তাদের মূল্যও সামান্য নয়।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ একটানা

প্রায় তেইশ বৎসর কাল, মধ্যে দুই বৎসরের একটি অবকাশ ছাড়া, স্বামী মাধবানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ কর্মসচিবের গুরু-দায়িত্ব অতি দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। আবার একালেরই শেষার্ধে ভারতের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতা-সূর্য উদিত হয়েছিল, দেশ স্বাধীন হয়েছিল। আর, সে উত্তর-স্বাধীনতা যুগের একাধিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মপ্রয়াসে যে বিরাট অগ্রগতি সূচিত হয়েছিল, বিশেষভাবে শিক্ষা ও সেবার ক্ষেত্রে—সেও হয়েছিল তাঁরই কর্মসচিবত্বের কালে, তাঁরই সুদক্ষ নির্দেশনায়। আজ সে সব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলির নামই বহুবিশ্রুত। আজ তারা শুধু যে দেশ-বিদেশের বিদগ্ধমণ্ডলীর ভূয়সী প্রশংসাই অর্জন করেছে তাই নয়—পরন্তু, দেশের অতি সাধারণ মানুষ বলে যারা কথিত, যারা মাটির অতি কাছাকাছি বাস করে, তাদেরও অকুণ্ঠ আশীর্বাদ ও শুভ কামনায় পুরস্কৃত হয়েছে।

কিন্তু এ সকল প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে ক্রমিক পর্যায়ে তাদের দ্রুত অগ্রগতির যে ঋজু কুটিল ইতিহাস—সে ইতিহাসের প্রকৃত নিয়ামক কে ছিলেন, কার সজাগ দৃষ্টি ও গভীর উদ্বেগ সে ইতিহাসের পদক্ষেপ অলক্ষ্যে নিয়মিত করেছে—সে প্রশ্নের উত্তরে যদি অনেকের মধ্যে কোন একজন মাত্র ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে দেখতে হয় তবে নিঃসংশয়ে সে ব্যক্তি পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দ। এ শুধু আমার একার অভিমত নয়। আমার বিশ্বাস—একাল মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মসাধনায় যাঁরা কোন-না-কোন ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন—তাঁদের প্রত্যেকেরই এই সুচিন্তিত অভিমত।

অতি দ্রুত কর্মপ্রয়াসের অবশ্য খুব পক্ষপাতী ছিলেন না স্বামী মাধবানন্দ। জনশক্তি ও কর্মসাধ্যতার সীমা অতিক্রম করে গেলে অচিরে কর্মের কোয়ান্টিটির কাছে কোয়ালিটি বলিপ্রদত্ত হবে—সে আশঙ্কা সর্বদা তাঁকে পীড়িত করত। অথচ সামান্যের মধ্যে অসামান্যের সম্ভাবনা যে তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ত না তাও নয়। সে তিনি ঠিকই লক্ষ্য করতেন। আবার পদাধিকার বলে নিজের অভিমত অপরের উপর চাপিয়ে দেবেন—এমন চিন্তাও কখনও তাঁর মনে স্থান পেত না। তিনি ছিলেন যথার্থ ডেমোক্র্যাট। তথাপি, তিনি চাইতেন কর্মের কোয়ালিটি, কর্মের গুণ, লোক দেখানো কোয়ান্টিটি নয়, বাহ্যিক চাকচিক্য নয়। ব্যক্তিগত আলোচনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ এ অভিমত তিনি ব্যক্ত করতেন। কিন্তু যখন অধিকাংশের বিচারে কোন একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হত, তখন, সে সিদ্ধান্ত নিজ ব্যক্তিগত অভিমতের অনুসারী না হলেও তাকে কার্যকরী করতে তিনি মুহূর্তে তৎপর হয়ে উঠতেন, মুহূর্তে সংঘের মুখ্য প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, দরদ ও সংগঠনী প্রতিভা ঐ সিদ্ধান্তের সার্থক রূপায়ণে নিয়োগ করতেন। তীক্ষ্ণ নিয়মানু-

বর্তিতার সে যেন এক অপূর্ব নিদর্শন, এক দুর্লভ আদর্শ স্বরূপ ছিল। এর অন্যতম অভ্রান্ত সাক্ষ্য রহড়া রামকৃষ্ণ বালকাশ্রম। আর শুধু বালকাশ্রমই বা বলি কেন, বিগত তের চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে নরেন্দ্রপুরে, পুরুলিয়ায় যে সব বৃহৎ বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, কলকাতার ইনষ্টিটিউট অব্ কালচার অথবা সেবা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কর্মকেন্দ্র যেভাবে দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করেছে—তাদের সবটাই স্বামী মাধবানন্দের ঐ মনোভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমরা স্বকীয় অভিজ্ঞতায় দেখেছি—রহড়া বালকাশ্রমের জন্মলগ্ন থেকেই স্বামী মাধবানন্দের গভীর স্নেহ ও পৃষ্ঠপোষকতা সে লাভ করেছিল। তার বিগত বাইশ বৎসরের সংকট-সংকুল জীবনপথে স্বামী মাধবানন্দের উপদেশ ও নির্দেশ তাকে সাহস দিয়েছিল, পরিপুষ্টি দিয়েছিল। এখানকার একাধিক বিদ্যালয় অথবা মহাবিদ্যালয়ের গৃহদ্বার তাঁরই কল্যাণ-হস্তে উন্মোচিত হয়েছিল। অনেকগুলির ভিত্তিপ্রস্তরও তাঁর হস্তে বিন্যস্ত। তা ছাড়া, এ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দুতে যে সুদৃশ্য দেবদেউলটি আজ ঊর্ধ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সমগ্র বালকাশ্রমের উপর আশিসকিরণ বর্ষণ করছে, তাও তাঁরই হাতে উৎসর্গীকৃত। এখানকার কোন অনুরোধ, কোন আবদার কখনো তিনি উপেক্ষা করেননি, প্রত্যাখ্যান করেননি। এই বালকাশ্রমের কত উৎসবানুষ্ঠানে তিনি যোগ দিয়েছেন, আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে কতবার আমাদের মধ্যে থেকে বিশ্রাম করে গেছেন। রহড়া বালকাশ্রমের অপরিসর জীবনকথায় সে সব স্মৃতি বহুদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে, আপদে বিপদে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

জীবনের একেবারে শেষ দিনগুলিতে যখন ব্যাধিজর্জর দেহটি নিয়ে রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানে তিনি শয্যাশায়ী, যখন মৃত্যুর পদধ্বনি মুহুর্মুহুঃ তাঁর কর্ণে পেঁছিচ্ছে, যখন শ্বাসে শ্বাসে জপ করছেন ইষ্টনাম, অন্তরের অন্তঃস্থলে স্পন্দিত হচ্ছে অনুভূতি—'নামের তরী বাঁধা ঘাটে' তখনও এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির কথা তিনি বিস্মৃত হননি, এর প্রতি তাঁর স্নেহধারা শুকিয়ে যায়নি। আজ মনে পড়ে বিগত বৎসরের দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পূজার নানা সংবাদ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কে কে এসেছিলেন পূজার সময়, পূজার আনন্দ সবাই কেমন উপভোগ করেছেন, প্রতিমা বিসর্জন কিভাবে হয়েছিল, ব্যাণ্ডবাদক বালকবাহিনী কোন পোষাকে সেজেছিল, কেমন বাজিয়েছিল—সব জানতে চেয়েছিলেন। তার মধ্যে কত স্নেহ, কত মমতা! আর একথা যে শুধু রহড়া বালকাশ্রম সম্বন্ধেই সত্য তাও নয়, সংঘের অন্যান্য শিক্ষা এবং সেবা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও সত্য।

সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁর ছিল—সেকথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দু'একটি স্মৃতিকথাও এখানে বলব।

এখন থেকে অনেক বৎসর পূর্বেকার একটি ঘটনা। স্বামী মাধবানন্দের অপার্থিব স্নেহ ও বিশ্বাসের আমি তখন একজন বিশেষ অংশীদার। নানা সংকটে ও সংঘাতে তাঁর স্নেহ ও পক্ষপুটের আশ্রয় তখন আমার অন্যতম বিশেষ ভরসা। ঠিক সেই কালে মঠ-মিশনের একটি সন্ন্যাসী সম্মেলনে, যাকে আমরা নিজেদের মধ্যে 'সংকল্প কন্‌ফারেন্স' বলি—তেমনি একটি সম্মেলনে তাঁর মতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় আমি নিজ মত প্রকাশ করে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। উৎসাহ এবং ভাবপ্রবণতার আধিক্যে তীক্ষ্ন ভাষা ব্যবহারেও কুণ্ঠিত হইনি। কিন্তু সভার শেষে জনৈক বন্ধুর মন্তব্য শুনে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম—কাজটি হয়ত সঙ্গত হয়নি। সাধারণ কর্মসচিবের পদমর্যাদার কথা বাদ দিলেও স্বামী মাধবানন্দের যে বিশেষ স্নেহ ও বিশ্বাসের আমি অধিকারী—তার জন্যও প্রকাশ্য সভায় তাঁর বিরোধিতা করা আমার পক্ষে হয়ত অসঙ্গতই হয়েছে। মনে একটা বিশেষ অস্বস্তি নিয়েই সেদিন তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। অনুশোচনার কণ্ঠেই জানতে চেয়েছিলাম, আমার ব্যবহারে তিনি দুঃখ পেয়েছেন কিনা, অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা। কিন্তু আমার প্রশ্নে স্বামী মাধবানন্দ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন—"কেন? আমি তোমার ব্যবহারে দুঃখিত হয়েছি একথা তোমার মনে হল কেন? যে বিষয়টি তুমি সত্য বলে বিশ্বাস করেছ—তাই তুমি প্রকাশ করেছ। সে অধিকার অবশ্য তোমার আছে। তাতে আমি দুঃখিত হব কেন?" আমি অভিভূত হয়ে ফিরে এসেছিলাম।

অনুরূপ আরও একটি ঘটনা। নীতিগত মতপার্থক্যের দরুণ সে ঘটনাটি আরও গুরুতর ছিল, আরও জটিল ছিল। একটি বিবৃতি, যাকে ইংরাজীতে ম্যানিফেস্টো বলে, সেই ধরনের কাগজে আমি স্বাক্ষর দিয়েছিলাম এবং তাও দিয়েছিলাম ঠাকুরের পুণ্য জন্মদিনে। সে সময় একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। বলেছিলেন—"এ বিবৃতির বিষয়বস্তু স্বামীজীর ভাবের বিরোধী। অথচ এতে তুমি স্বাক্ষর দিয়েছ ঠাকুরের জন্মদিনে! এর কারণ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, সেজন্য তোমাকে ডেকেছি।" আজ দীর্ঘকালান্তরেও তাঁর সে বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠস্বর যেন আমার কানে ভেসে আসে। আমি মনে মনে সেদিন বিশেষ বিব্রত বোধ করেছিলাম। তথাপি বলেছিলাম:

"মহারাজ, এ কাজটিকে একটি সৎকাজ বলে মনে করেই আমি ঐ বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছি—আমার নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস মতে। তাই ঐ গুরুতর বিষয়ে ঠাকুরের পুণ্য জন্মদিনে স্বাক্ষর দেওয়াই আমি সঙ্গত মনে করেছি।" আমার কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন স্বামী মাধবানন্দ। তারপর বললেন:

"তাহলে আমার আর কিছু বলবার নেই। তোমার বিশ্বাস যদি ঐ হয়ে থাকে, তবে তুমি ঠিকই করেছ।"

প্রশ্ন হতে পারে যে, বৃহৎ লোকপ্রতিষ্ঠান যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁদের অনেকের পক্ষেই অমন মন্তব্য দুর্লভ নয়। হয়ত নয়। আমি সঠিক জানি না। তবে নিজ কর্মজীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এ জাতীয় পরিস্থিতিতে মৌখিক কথাই সবটা নয়। পরন্তু মুখের কথার পিছনে যে স্মৃতির বেদনা থাকে—সেটিই যথাকালে প্রকট হয়ে ওঠে। তখন নানাভাবে সে বেদনা আত্মপ্রকাশ করে, ক্রিয়াশীল হয়।···কিন্তু সুদীর্ঘ কর্মজীবনের ক্ষুদ্র, বৃহৎ, নানা ঘটনার মধ্যে লক্ষ্য করেছি যে স্বামী মাধবানন্দ সেদিক দিয়ে একেবারে নিষ্কলুষ ছিলেন, সর্বাংশে এক স্বতন্ত্র পুরুষ ছিলেন। মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের পরিপূর্ণ সঙ্গীতিতে স্মৃতির কোন কালো দাগ তাঁর অন্তরের মধ্যে কখনো জেগে থাকত না। স্বামী মাধবানন্দের প্রশস্ত মানসক্ষেত্রটি সত্যই বড় নির্মল ছিল, পরিচ্ছন্ন ছিল।

শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতিটি কর্মের মধ্যে একটি নিখুঁত নিপুণতা, যাকে প্রিসিসন্ বলে, তাও ছিল বিশেষ লক্ষ্যণীয়। কোন গ্রন্থ প্রণয়নে বা সম্পাদনে সে নিপুণতা যে কত সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল হত তা বলে বোঝানো শক্ত। কি বাক্যে, কি লেখায় প্রতিটি কথা যেন ওজন করে ব্যবহার করতেন। স্বভাবতঃই তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন—আর তার সঙ্গে তাঁর তীক্ষ্ন বুদ্ধি, ভগবদ্‌বিশ্বাস ও সংবেদনশীল মনটি সংযুক্ত হয়ে—একটি বিচিত্র ত্রিবেণী-সংগমের যেন সৃষ্টি করেছিল।

মানুষ মাত্রেই ভুল করে থাকে, অন্যায়ও হয়ত করে ফেলে—কিন্তু যদি তার মধ্যে কপটতা না থাকে, মতলববাজী না থাকে—তবে সে ভুল বা অন্যায়ের জন্য দণ্ডবিধান সঙ্গত নয়। তাকে সুযোগ দিতে হবে, নির্দেশ ও ভালবাসা দিয়ে ঠিক পথে তুলে নিতে হবে—এই তাঁর কথা ছিল, কর্মপন্থা ছিল।

আমার নিজ কর্মজীবনের সুদীর্ঘকাল তাঁর স্নেহ, বিশ্বাস ও পক্ষছায়ায় অতিবাহিত হয়েছে সেকথা পূর্বেও বলেছি, আবারও বলছি। তাঁর পুণ্যস্মৃতি সঞ্চয়নে সেটিই আমার মূল কথা। আর সেজন্য তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতারও যেমন অবধি নেই, ঋণেরও তেমনি শেষ নেই। আমার দৃষ্টিতে তাঁর মধুর আনন্দ-স্নিগ্ধ পুণ্যজীবনটি নানাভাবে একটি আদর্শ জীবন, একটি অনন্য মহাজীবন।

আমি অবশ্য ঐতিহাসিক নই। ইতিহাসবেত্তার দূরদৃষ্টিও আমার নেই। তথাপি, আমার বিশ্বাস যে স্বামী মাধবানন্দের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের ইতিহাসে একটি বিশেষ যুগ শেষ হয়ে গেল, একটি বিশেষ অধ্যায় পরিসমাপ্তি লাভ করল। আর সেই সঙ্গে বহুলাংশে আর এক নূতন কালেরও

অভ্যুদয় সূচিত হল তাঁর কর্মধারায়। সেই কালান্তরের উদয় লগ্নটিতে পশ্চিমাস্য হয়ে দাঁড়িয়ে আজ এই অকিঞ্চিৎকর স্মৃতি-সঞ্চয়নের মধ্যে দিয়ে স্বামী মাধবানন্দের পাদযুগে আমার ঐকান্তিক প্রণতি নিবেদন করে আমি ধন্য হলাম, কৃতার্থ হলাম। তাঁর স্নেহের ঋণ আমার জীবনে পরিশোধ্য নয়, তাঁর অখণ্ড বিশ্বাসের কোন প্রতিদানও আমি দিতে পারব না। সে চেষ্টাও আমি করব না। আজ জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় তাঁর কাছে আমার শুধু এই নিবেদন ঃ

হে মহাজীবন,
"তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবারে দাও শকতি।"

স্বামী মাধবানন্দের কিঞ্চিৎ স্মৃতি*

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

পূজনীয় নির্মল মহারাজ বা মাধবানন্দজীর নিকট হইতে আমরা এত অহেতুক স্নেহ পাইয়াছি যে তাঁহার বিষয়ে কিছু লিখিতে গিয়া পাছে তাঁহার সেই অপার্থিব স্নেহের অমর্যাদা করিয়া ফেলি, তজ্জন্য তাঁহার বিষয়ে এতদিন কিছু লিখিতে সাহস করি নাই।

তাঁহার সেই অপার্থিব স্নেহ সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, তাঁহার ঘর আমাদের জন্য সর্বদাই খোলা থাকিত। পূর্বে কোন কিছু না জানাইয়া নিঃসঙ্কোচে আমরা তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিতাম। তিনি তখন কোনরূপ কাজে ব্যস্ত থাকিলে আমাদিগকে ঐ ঘরেই একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া কার্যশেষে আমাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া নানা বিষয়ে আলাপ করিতেন—তাহার সবই যে কাজের কথা হইত তাহা নহে।

সেই ঘরে মঠ বা মিশনের কোন কার্য উপলক্ষে আমরা প্রবেশ করিলে, তিনি আমাদিগকে ঘরের অন্য কোন আসনে বসিতে না দিয়া তাঁহার বিছানারই এক পাশে একরূপ জোর করিয়া বসাইতেন। এইরূপ অহেতুক স্নেহ তাঁহার নিকট হইতে কত যে পাইয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অবশ্য আমাদের কাজের বা ব্যবহারের কোন বিশেষ ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিলে তিনি দৃঢ়হস্তে উহা সংশোধন করিয়া দিতে ভুলিতেন না।

তাঁহার প্রসঙ্গে কিছু লিখিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে বন্ধুবর স্বামী নিখিলানন্দের চিঠিটির কথা। ১৯৬৫ সালে মাধবানন্দজীর শরীর গেলে বন্ধুবর স্বামী নিখিলানন্দ নিউইয়র্ক হইতে আমাকে এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "পূজনীয় নির্মল মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দ) যে আদর্শ জীবন দেখাইয়া গেলেন তাহার কিছুমাত্র পালন করিতে পারিলে আমরা নিজদিগকে ধন্য মনে করিব।" ইহাই তাঁহার যথার্থ পরিচয়। তাঁহার ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা, অপরিসীম ত্যাগ-বৈরাগ্য ও স্বতঃস্ফূর্ত ধ্যানপরায়ণতা আমাদিগকে চিরদিন চমৎকৃত করিয়া আসিয়াছে ও ভবিষ্যতেও করিবে।

তিনি সত্যনিষ্ঠার সহিত অন্য কোন কিছুর কোনরূপ আপোষ করিতে পারিতেন না। যাহা তিনি সত্য বলিয়া বুঝিতেন শত বাধাবিঘ্ন বা প্রতিকূল

---

* প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'বিবেক ভারতী', আশ্বিন (১৩৮৫) থেকে গৃহীত।

অবস্থা সত্ত্বেও তাহা তিনি পালন করিয়া যাইতেন ও ঐ বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র শিথিলতা দেখিলে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন এবং ভবিষ্যতে আমরা উহার পুনরাবৃত্তি না করি তদ্বিষয়ে দৃঢ়ভাবে আমাদিগকে যথাযথ নির্দেশ দিতেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯৩৯ সালের একটি ঘটনা। তখন আমি দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের পরিচালক বা কর্মাধ্যক্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ও বাজারে আহার্য দ্রব্যাদির মূল্য হু হু করিয়া দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার হইতে Ration System বা নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্তন করা হইল ও যাহাতে ঐ নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই আহার্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, তজ্জন্য প্রতি দোকানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের একটি তালিকাও টাঙাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ব্যবসায়ীগণ উহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দিন দিন ঐ সকল দ্রব্যাদির মূল্য বাড়াইয়াই চলিল। বিদ্যাপীঠে তখন ছাত্র-শিক্ষক পাচকাদি লইয়া আমরা প্রায় দুইশতজন আবাসিক। যুদ্ধারম্ভের কিছুকাল পরেই আমাদের সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন আমরা বাধ্য হইয়া ব্যবসায়ীদের দ্বারে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু তাহারা আমাদিগকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে, সরকারের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে তাহারা আমাদিগকে কোন খাদ্যদ্রব্য দিতে পারিবে না। বাজারে উহা যে মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে, আমাদিগকেও সেই মূল্যেই উহা ক্রয় করিতে হইবে। তবে সরকারকে দেখাইবার জন্য বা অন্য কোন কারণে যদি উহার রসিদ দিতে হয় তো তাহারা আমাদের রসিদের উপরে নিয়ন্ত্রিত মূল্যই লিখিয়া দিবে এবং যে অতিরিক্ত মূল্য লওয়া হইতেছে তাহা দ্বারা যেন আমরা ঐ দোকান হইতে অপর কোন জিনিষ ক্রয় করিতেছি এইরূপ উহাতে লেখা থাকিবে। ইহাতে সম্মত না হইলে আমরা স্থানীয় কোন দোকান হইতে খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিব না। অগত্যা বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল এবং ঐভাবে বিদ্যাপীঠের জন্য আমরা খাদ্যাদি ক্রয় করিতে লাগিলাম। উহা পূজনীয় মাধবানন্দজীর কর্ণগোচর হইলে তিনি আমাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা সাধু হইয়া এইরূপ অসত্যকে প্রশ্রয় দিতেছ কেন?" আমরা তাঁহাকে যতই পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বুঝাইতে লাগিলাম, তিনি কিছুতেই উহা বুঝিতে চাহিলেন না। বলিলেন, "তোমরা সাধু, অসত্যকে কখনও প্রশ্রয় দিও না। উহাতে যদি বিদ্যাপীঠ বন্ধ করিয়া দিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ।"

এই প্রসঙ্গে অনুরূপ আরও একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়িতেছে। তখন আমি পাটনায়। সরকারী তার বিভাগের কর্মী আমাদের বন্ধুজন তাঁহাদের স্থানীয় সহকর্মীদের দ্বারা জানাইয়া দিলেন যে পূজনীয় মাধবানন্দজী শীঘ্রই আমাদের এদিকে আসিতেছেন এবং আমাদের এদিকে আসিয়া তাঁহার কিরূপ কর্মসূচী হইবে তাহার একটা আনুমানিক তালিকা দিলেন। পরে পূজনীয়

মাধবানন্দজীর পত্রে উহার খবর পাইলাম এবং প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে জানাইলাম যে স্থানীয় তার বিভাগের কর্মী বন্ধুগণের নিকট হইতে আমরা এই খবর পূর্বেই জানিয়াছি। তাঁহারা কলিকাতা হইতে লগ (Log) করিয়া (নিজেদের মধ্যে তারে কথা বলিয়া) উহা আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। পূজনীয় মাধবানন্দজী প্রথমে আমাদের এই Log কথাটির অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। পরে পাটনায় পৌঁছিয়া উহার অর্থ যখন আমাদের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন, তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, ঐ লগের পয়সা কে দিল?—তোমরা, না ঐ কর্মচারীরা?" যখন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমি বলিলাম যে উহা আমরা কেহই দিই নাই, তার বিভাগের কর্মচারীগণ পরস্পর পরস্পরকে তাঁহাদের আবশ্যকীয় খবরাদি ঐরূপে দিয়া থাকেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া আমাদিগকে বলিলেন, "এইভাবে সরকারকে প্রতারণা করা কি তোমাদের ঠিক হইয়াছে? সাধু হইয়া এইরূপ অসত্যকে প্রশ্রয় দাও কেন?"

এইরূপই ছিল সত্যের প্রতি তাঁহার একান্ত দৃঢ়নিষ্ঠা—যাহার কিঞ্চিৎ অবমাননাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার আচরণেও কখনও মন-মুখের পার্থক্য দেখি নাই। মনে তিনি যাহা সত্য বুঝিতেন তাহাই মুখে প্রকাশ করিতেন। উহাতে কাহারও কাহারও নিকটে অপ্রিয় হইতে হইলেও তিনি কখনও তাঁহার সত্যনিষ্ঠা পরিত্যাগ করেন নাই।

ত্যাগেরও তিনি ছিলেন জ্বলন্ত মূর্তি। ছোট বড় সকল কাজেই তাঁহার যে ত্যাগ দেখিয়াছি তাহা আমাদের নিকট কল্পনার বস্তু। গ্রীষ্মের সময় কার্যানুরোধে তাঁহার ঘরে গেলে দেখিতাম যে তিনি তাঁহার ঘরের ইলেকট্রিক পাখাটি বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। ঐ গরমে তাঁহার এইরূপ করিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাদের মুখের দিকে একটু তাকাইয়া বলিতেন, "তোমাদের প্রয়োজন হইলে তোমরা উহা খুলিয়া দাও না কেন? আমার প্রয়োজনের কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

আরও একটি ছোট ঘটনা—উদ্বোধনে আমার থাকিবার কালে তাঁহাকে একদিন সেখানে প্রসাদ পাইতে বলা হইয়াছিল। তিনি উপরের ঘরে বসিয়াই প্রসাদ পাইতেছিলেন। সেখানে তাঁহার গায়ে রৌদ্র লাগিতেছে দেখিয়া আমার ইঙ্গিতে জনৈক সেবক একটু দূরে একটি ছাতা ধরিয়া উহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। পূজনীয় মাধবানন্দজীর ঐ দিকে দৃষ্টি পড়ায় তিনি অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে সেবকটিকে বলিলেন, "আমাকে কি তোমরা ননীর পুতুল পাইয়াছ যে একটু রৌদ্রে উহা গলিয়া যাইবে? ছাতাটি সরাইয়া ফেল।" তাঁহার আদেশে সেবকটি ঐরূপ করিতে বাধ্য হইল।

এইরূপ ছোট বড় ত্যাগের বহু দৃষ্টান্তই তাঁহার জীবনে দেখিয়া আমরা ধন্য

হইয়াছি।

তিনি যখন মঠ ও মিশনের সেক্রেটারী, তখনও বহুদিন পর্যন্ত তাঁহাকে কোথাও যাইতে হইলে, তিনি তাঁহার বিছানাটি স্বহস্তে শতরঞ্চি দিয়া মুড়িয়া একটি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইতেন। নিকটে অপর কেহ থাকিলে হয়ত বা তাঁহাকে একটু সাহায্য করিত। তবুও তিনি আমাদের ন্যায় হোল্ডল (Hold-all) ব্যবহার করেন নাই। অবশ্য বহুদিন পরে সকলের বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে উহা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

ট্রেনে কোথাও যাইতে হইলে তাঁহার সমবয়স্ক ও সমমর্যাদাসম্পন্ন সাধুগণ যে ক্লাসেই ভ্রমণ করুন না কেন, তিনি সচরাচর মধ্যম শ্রেণীতেই ভ্রমণ করিতেন—উহার উপরের কোন শ্রেণীতে নহে। তাঁহার সমবয়স্ক ও সমমর্যাদা-সম্পন্ন—জনৈক সাধু সাধারণতঃ উহার উপরের ক্লাসেই ভ্রমণ করেন, সেবিষয়ে একদিন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আমরা তাহা হইলে এবিষয়ে কাহার অনুসরণ করিব?" তাহার উত্তরে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমাদের যাতায়াত বিষয়ে তোমরা উঁহাকেই অনুসরণ করিও, আমাকে নহে।" উহা যে তিনি ব্যঙ্গ করিয়া বা বিরক্ত হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন তাহা নহে। কার্যতও দেখিয়াছি, উৎসবাদির জন্য আমাদের কোন স্থানে যাইতে হইলে, তিনি যাঁহারা টিকিট কাটিতেন তাঁহাদিগকে আমাদের জন্য উচ্চতর ক্লাসেরই টিকিট করিতে বলিতেন। এইরূপই ছিল তাঁহার মাহাত্ম্য।

এই সময় তিনি প্রায় প্রতিবৎসর কষ্টকর একজিমা (Eczema) রোগে ভুগিতেন। এলোপ্যাথিক ঔষধে উহার বিশেষ কোন প্রতিকার না হওয়ায় কলিকাতার একজন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে মঠকর্তৃপক্ষগণ তাঁহার জন্য ডাকাইয়াছিলেন। উক্ত চিকিৎসক তাঁহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া একটি ঔষধ নির্বাচন করিলেন ও বলিলেন, "যখনই আবার প্রয়োজন হইবে আমাকে ডাকাইলেই পুনরায় আসিয়া যথারীতি ঔষধ লাগাইয়া যাইব।" ইহাতে পূজনীয় মহারাজ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "না না, ইহার জন্য আর আপনাকে আসিতে হইবে না। প্রয়োজন হইলে আমি নিজেই আপনার নিকটে যাইব।" মঠের অন্যান্য সাধুগণের নিষেধ সত্ত্বেও কার্যতঃ তিনি তাহাই করিলেন—কিন্তু গেলেন কোন ট্যাক্সি বা প্রাইভেট গাড়িতে নহে—একেবারে সাধারণ বাসে। তাঁহার এই বয়সে এইরূপে কলিকাতা যাতায়াত করায় আমরা সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিলাম ও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ উহা না করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কাহারও কথা শুনেন নাই। এইরূপই ছিল তাঁহার কঠোর ত্যাগব্রত, যাহা তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই।

তাঁহার এই অপরিসীম ত্যাগব্রতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখিতে পাই তাঁহার

"উদ্বোধনে আমার থাকিবার কালে তাঁহাকে একদিন সেখানে প্রসাদ পাইতে বলা হইয়াছিল।"—পৃষ্ঠা ১৪৫

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে উদ্বোধনে (মায়ের বাড়ি) গৃহীত চিত্র।

"পাটনায় পৌঁছিয়া আমাদিগকে বলিলেন"—পৃষ্ঠা ১৪৭

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশনে গৃহীত চিত্র।

শরীর ত্যাগের পূর্বক্ষণে। তখন তিনি সেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হইয়াছেন ও তাঁহাকে দেখিবার জন্য রহড়া আশ্রমের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দ সহ আমরা কয়েকজন সেখানে গিয়াছিলাম। তাঁহার সেই সময়ের শারীরিক অস্থিরতা দেখিয়া স্বামী পুণ্যানন্দ (যিনি পূর্বে রেঙ্গুন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং চিকিৎসা ও শুশ্রূষা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন) একটু ঠাণ্ডা জলে কয়েক ফোঁটা ওডিকলোন মিশাইয়া তাঁহার মাথায় উহার জলপটি দিতে লাগিলেন। দুই একবার উহা করিবার পর পূজনীয় মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাথায় ও আবার কি দিচ্ছ?" উত্তরে পুণ্যানন্দ মহারাজ বলিলেন, "একটু ওডিকলোন। হয়ত আপনার মাথার যন্ত্রণা কমিবে।" উহা শুনিয়া পূজনীয় মহারাজ বলিলেন, "না না, উহা লাগাইও না। উহা Luxury (বিলাসিতা)। পূর্বে আমি উহা অনেক লাগাইয়াছি। উহা আর লাগাইতে হইবে না।" তাঁহার কথায় বাধ্য হইয়া স্বামী পুণ্যানন্দকে উহার প্রয়োগ বন্ধ করিতে হইল। উহার কয়েক মিনিট পরেই কিন্তু পূজনীয় মহারাজ দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপই ছিল তাঁহার কঠোর ও অপরিসীম ত্যাগব্রত, যাহার কণামাত্র আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, তাঁহার সেবার জন্য কাহারও এতটুকু অসুবিধা হয়, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার কোন এক কার্যোপলক্ষে তিনি বেলুড় মঠ হইতে পাটনা আসিতেছিলেন। আমি তখন পাটনা আশ্রমের পরিচালক। পাটনা আসিবার পূর্বে তিনি আমাদিগকে জানাইলেন যে মঠ হইতে ওখানে আসিবার পথে তিনি বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনে নামিয়া নালন্দা, রাজগীর প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করিয়া পাটনায় আসিবেন। বক্তিয়ারপুর ষ্টেশন পাটনার দুই তিনটি ষ্টেশনের পূর্বে; সেখানে নামিয়া অন্য একটি ছোট ট্রেনে নালন্দা আসিতে হইত; রাজগীর যাইতে হইলে পুনরায় নালন্দা হইতে রিক্সা বা এক্কা করিয়া সেখানে যাইতে হইত। এইরূপ ভ্রমণে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইবে মনে করিয়া আমরা তৎক্ষণাৎ পত্রদ্বারা তাঁহাকে উক্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলাম ও লিখিলাম যে যেন অনুগ্রহ করিয়া সোজা পাটনা চলিয়া আসেন; দুই-একদিন বিশ্রাম করিবার পর আমরাই তাঁহাকে মোটরে করিয়া ঐসব স্থানগুলি দেখাইয়া আনিব। কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না। পাটনায় পেঁাছিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "তোমরা জাননা, যে ভক্তটির গাড়িটি তোমরা উহার জন্য ব্যবহার করিবে, তাঁহার উহাতে কত আর্থিক ও শারীরিক কষ্ট হইবে। আমি উহাতে স্বীকৃত হই কিরূপে?" ভক্তটি যে উহাতে কৃতার্থ হইত তাহা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াও বুঝানো যাইল না।

আরও একবার তিনি ও আমি উভয়ে আমাদের জামসেদপুর আশ্রমে কোন এক উৎসবে গিয়াছিলাম। আমি গিয়াছিলাম দেওঘর বিদ্যাপীঠ হইতে ও তিনি আসিয়াছিলেন বেলুড় মঠ হইতে। উৎসব শেষ হইলে আমাদের ফিরিবার পালা। আমার যে ট্রেনে ফিরিতে হইবে, পূজনীয় মহারাজের ট্রেন তাহা অপেক্ষা দুইঘণ্টা পরে; তদনুযায়ী আমাদিগকে ষ্টেশনে পেঁছাইয়া দিবার জন্য দুইটি পৃথক পৃথক মোটরেরও ব্যবস্থা হইল। কিন্তু যখন আমি আমার নির্দিষ্ট মোটরে উঠিয়া ষ্টেশনে যাইবার উপক্রম করিতেছি, তখন তিনি ভক্তদিগকে বলিলেন, "ঐ গাড়িতেই উহার সহিত আমাকে ষ্টেশনে পেঁছাইয়া দাও।" তিনি দুই ঘণ্টা পূর্বে আমার সহিত ষ্টেশনে গিয়া কি করিবেন ইহা ভাবিয়া আমি ও ভক্তেরা অবাক হইলাম। কিন্তু তিনি পুনঃ পুনঃ ঐরূপ করিতে বলায় অগত্যা তাহাই করিতে হইল। ষ্টেশনে পেঁছাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি কি বুঝিতে পার না, আমাকে ঐরূপ আবার দুইঘণ্টা পরে ষ্টেশনে লইয়া আসিতে ভক্তদের কত অর্থব্যয় ও শারীরিক কষ্ট হইত। তাই তোমার সহিতই আসিলাম। এই দুইঘণ্টা ষ্টেশনে বসিয়া থাকিতে আমার আর কতটুকু কষ্ট হইবে?"

এইরূপই ছিল তাঁহার কঠোর ত্যাগ ও আনুষঙ্গিক অপরের সুবিধা অসুবিধার প্রতি তীব্র দৃষ্টি, যাহা অতি বিরল ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐকান্তিক ধ্যানপরায়ণতা ছিল তাঁহার জীবনের আর একটি উজ্জ্বল চিত্র, যাহা ওতপ্রোতভাবে তাঁহার জীবনের সহিত জড়িত ছিল। তিনি যত কাজের ভিতরেই থাকুন বা যে অবস্থাতে পড়ুন না কেন, নিত্যকার ধ্যানভজনাদি কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে দেখি নাই। ভারতের নানাবিধ দর্শনীয় স্থানে তাঁহার সহিত একত্রে বেড়াইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সেসকল স্থানেও তাঁহাকে কখনও উহা হইতে বিচ্যুত হইতে দেখি নাই। একবার বেশ মনে পড়ে, বোম্বাই হইতে ঔরঙ্গাবাদ বা অনুরূপ কোন স্থানে যাইবার জন্য তাঁহার ও আমার নিমিত্ত দুইটি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট করা হইয়াছিল। আমাদের নির্দিষ্ট কামরা একটি কূপে (coupe) জাতীয় অর্থাৎ উহাতে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট উপরের ও নিচের বেঞ্চ ব্যতীত অপর কোন বেঞ্চ ছিল না। রাত্রে তাঁহার পুণ্য-সঙ্গে কিছুকাল কাটাইব ভাবিতেছি, এমন সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দেখিতেছ কি? উপরে তোমার নির্দিষ্ট বাঙ্কে গিয়া শুইয়া পড়।" তখন রাত্রি প্রায় ১০টা। ভাবিলাম তিনিও আমারই ন্যায় নিচে হয়ত বিশ্রাম করিবেন। কিন্তু আমি উপরে উঠিয়া দেখিলাম, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া নিচে তাঁহার বেঞ্চে তাঁহার স্বভাবোচিত ধ্যানে বসিয়া গিয়াছেন। জানি না এইভাবে তাঁহার সমস্ত রাত্রি কাটিল কি না।

আরও একবার পূজনীয় মহারাজ কোন এক কার্য উপলক্ষে কাশী

আসিয়াছেন। তখন আমিও কাশীতে। তিনি সেখানে আসিয়া মধ্যপ্রদেশের খজুরাহোর শিল্প-কলাদি দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ও উহার জন্য সকল বন্দোবস্ত হইয়া গেলে তিনি আমাদের কয়েকজনকে লইয়া সেখানে যাত্রা করিলেন। আমাদের জন্য ইতঃপূর্বেই একটা বাংলো ঠিক করা হইয়াছিল। তাহাতে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন সকাল হইতে আমরা উহার শিল্প-কলাদি দর্শন করিতে লাগিলাম। উহা শেষ হইলে তাহার পরের দিনই অতি প্রত্যূষে আমাদের কাশী অভিমুখে ফিরিবার পালা। তখন খজুরাহো হইতে কাশী আসিতে হইলে ভোর রাত্রে বাসে করিয়া সাতনা ষ্টেশন আসিতে হইত ও সেখান হইতে কিছুক্ষণ পরে কাশীগামী একটি ট্রেনে করিয়া কাশী পেঁছাইতে হইত। পূর্বদিন বহুক্ষণ ধরিয়া শিল্প-কলাদি দর্শন করিবার পর আমরা সকলেই ক্লান্ত। যখন আমরা বাসে উঠিলাম, তখন আমাদের সকলের চক্ষু নিদ্রায় ঢুলু ঢুলু করিতেছে, কিন্তু পূজনীয় মহারাজকে দেখিলাম তাঁহার চক্ষে ঐরূপ কোন অলসতার চিহ্ন নাই। তিনি তাঁহার স্বভাবোচিতভাবে বাসে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। বাস হইতে নামিয়া কিছুক্ষণ পরে কাশীগামী ট্রেন আসিলে আমরা সকলে উহাতে উঠিয়া পড়িলাম। তখন সবে ভোরের আলো ফুটিতেছে। আমাদের সহিত দু-একটি কথা বলিবার পরই পূজনীয় মহারাজ বলিলেন, "এখন আর আমাদের বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়।" ইহা বলিয়াই তিনি ঐ গাড়িতেই তাঁহার স্বভাবোচিত ধ্যানে বসিয়া গেলেন। আমরাও আমাদের নিদ্রাভারাক্রান্ত চক্ষু লইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে না থাকিলে ঐ সময়টিতে আমাদের দীর্ঘ বিশ্রামে কাটিত তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁহার দুর্লভ সঙ্গে তাহা আর সম্ভব হইল না। এইরূপই ছিল তাঁহার ধ্যানপরায়ণতা, যাহার একটু আঁচ লাগিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি!

তিনি কৌতুকছলে যে সকল উপদেশ দিতেন তাহার দুই একটা এখানে উল্লেখ করিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেহ আশীর্বাদ চাহিলে উপরের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিতেন, "উহা হাইকোর্টের ব্যাপার এখানের নহে" অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরই একমাত্র আশীর্বাদ করিতে পারেন, অন্য কেহ নয়।

তখনও তিনি বোধহয় দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন নাই, অথচ অনেকেই সেজন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে। তাহাদিগকে দেখাইয়া আমাদিগকে বলিতেন— শ্রীশ্রীঠাকুরের সে গল্পটি তো জান: "এক নীচ জাতীয় ব্যক্তিকে কেহ চরণামৃত খাইতে দিত না। একদিন একজন দয়া করিয়া উহা দিলে উহা খাইয়া সে কি বলিল—'ওঃ, এরই নাম চন্নামেত্ত, চন্নামেত্ত ভেবেছিলাম কি অমেত্ত, এখন খেয়ে দেখি দু'ফোঁটা জল।' এদেরও সেই অবস্থা হইবে কি না কে জানে?"

তাঁহার কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার কথা রামকৃষ্ণ সংঘের কাহারও নিকটে

অবিদিত নাই। দীর্ঘদিন ধরিয়া তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কার্য পরিচালনা করিয়াছেন। শেষের কয়েক বৎসর তীব্র যন্ত্রণাদায়ক দুরারোগ্য একজিমা রোগে ভুগিলেও তিনি উহা হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। ঐ সময়ে তাঁহার তীব্র যন্ত্রণা লাঘবের জন্য তাঁহার বিছানায় কলার পাতা বিছাইয়া দেওয়া হইত। উহার উপর শুইয়া শুইয়া তিনি তাঁহারই ঘরে মঠ ও মিশনের সর্বপ্রকার সভাদি পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন ও ঐ অবস্থাতেও প্রতি বিষয়ে তাঁহার যথোচিত মন্তব্য ও নির্দেশ দিতে ভুলেন নাই।

তাঁহার এই কঠোর কর্মনিষ্ঠার সহিত তাঁহার দৃঢ়চিত্ততার কথা কিছু উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা তখন পাটনা আশ্রমে। তাহার পূর্ব হইতে জনৈক প্রতিবেশী আশ্রমের সীমানা ঘেঁসিয়া একটি বাড়ি তুলিয়াছিলেন ও আশ্রমের দিকে তাহার জানালা ফুটাইয়াছিলেন। উহা সেখানের মিউনিসিপ্যালিটির সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ। তৎসহিত ঐ বাড়িটি আবার যুবক ছাত্র ও কর্মচারীদের মেসরূপে ব্যবহৃত। ইহাতে আশ্রমের মহিলা ভক্তদের ঐ স্থান দিয়া যাতায়াত করিতে খুবই অসুবিধা হইত। প্রতিবেশীকে ইহা বারবার বুঝাইয়া বলা সত্ত্বেও তিনি উহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তখন আমাদের মিশনের স্থানীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভ্যগণ তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে তিনি ঐরূপ করিতে থাকিলে আমরাও তাঁহার বাড়ি ঘেঁসিয়া আমাদের সীমানায় পাঁচিল তুলিয়া দিব, ইহাতে তাঁহার ঐ বাড়িটি কিন্তু অন্ধকার হইয়া যাইবে। তখন তাঁহার চৈতন্য হইল ও বহু অনুনয় করিয়া তিনি বলিলেন যে তাহা হইলে তাঁহার বাড়ি হইতে অন্ততঃ দুইহাত ছাড়িয়া দিয়া আমরা যেন আমাদের সীমানায় পাঁচিল তুলি। মিশনের স্থানীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভ্যগণ অগত্যা উহাতেই রাজী হইলেন ও তাঁহার বাড়ির দিকে মিশনের দুই হাত জমি ছাড়িয়া দিয়া উক্ত পাঁচিল তোলা হইল। পূজনীয় মাধবানন্দজী অন্য কোন এক কার্য উপলক্ষে পাটনায় আসিয়া উহা দেখিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "এইরূপে তুমি কাহার জমি ছাড়িয়া দিয়াছ? অর্থাৎ আশ্রমের ঐ জমিটুকু ছাড়িয়া দিবার অধিকার তোমাকে কে দিল?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। পরে স্থানীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভ্যগণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে তিনি উক্ত বিষয়ে তাঁহাদের নিকটও অনুরূপ মন্তব্য করিলেন। উহাতে কমিটির জনৈক সভ্য (যিনি পূর্বে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন) বলিলেন, "আপনারা সাধু, ঐটুকু জমির জন্য কেন এইরূপ বলিতেছেন?" ইহার উত্তরে অতি দৃঢ়স্বরে পূজনীয় মাধবানন্দজী বলিলেন, "আমরা সেইরূপ সাধু নই। জনসাধারণ বিশ্বাস করিয়া যে কাজের জন্য আমাদিগকে ঐ জমিটুকু দিয়াছেন, তাহার একচুলও অন্যথা করিবার অধিকার আমাদের নাই। আমরা উহার ট্রাস্টীমাত্র। যে কার্যের জন্য আমরা যাহা গ্রহণ করি, তাহা

সেই কার্যের জন্যই ব্যবহার না করিলে আমাদিগকে বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।" এইরূপ সকল কাজেই মহারাজজী তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা দেখাইয়া গিয়াছেন। অন্যায়ের সহিত তিনি কখনও আপোষ করেন নাই।

এইরকম দৃঢ়চিত্ত, সত্যনিষ্ঠ, যথার্থ ত্যাগী, ধ্যানপরায়ণ, একান্ত কর্তব্যনিষ্ঠ মহান সাধুর সঙ্গ ও অহেতুক স্নেহ পাইয়া আমরা যে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জয়যুক্ত হউক। তাঁহার কৃপায় আমরা এইরূপ দুর্লভ সঙ্গ পাইয়াছিলাম; সেই দুর্লভ জীবন-আলোকে আমরাও যেন আমাদের গন্তব্য পথে চলিতে পারি।

স্বামী মাধবানন্দজীর স্মরণে

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী দুই বৎসর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিস্কো বেদান্ত সোসাইটির আচার্যরূপে কাজ করিয়া ১৯২৯ সালে ভারতে ফিরিলে কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে অ্যালবার্ট হলে তাঁহার জন্য একটি অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন সভা হইয়াছিল। আমেরিকা যাইবার আগে কলিকাতা মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের শাখাকেন্দ্রে তাঁহাকে দেখিয়াছি। এখন পাশ্চাত্য ফেরত তাঁহাকে ভারি সুন্দর ও সৌম্য দেখাইতেছিল। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি আমেরিকার জীবনে শৃঙ্খলা ও কর্মতৎপরতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছিলেন, মনে পড়ে।

১৯৩০ সালে আমার বেলুড় মঠে যোগ দিবার পর তাঁহাকে মঠ ও মিশনের সহকারী কর্মসচিব-রূপে ভাল করিয়া দেখিবার ও জানিবার সুযোগ হয়। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাকে কত স্নেহ করিতেন দেখিয়াছি। তাঁহার নিয়ম-শৃঙ্খলা, অক্লান্ত শান্ত কর্মব্যাপৃতি, জপধ্যানে নিষ্ঠা এবং মিষ্ট ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করিত। এত কাজের মধ্যে কখন যে তিনি পড়াশোনা করিতেন বুঝা কঠিন ছিল। আমার উপর তখন মঠের লাইব্রেরীর কাজ দেওয়া হয়। তিনি যখন শাঙ্করভাষ্য সহ বৃহদারণ্যক উপনিষদের অনুবাদ করিতেছিলেন তখন লাইব্রেরী হইতে পুরাণ প্রভৃতি নানা বই দেখিবার প্রয়োজন হইত। আমি আনিয়া দিতাম। কোনও reference খুঁজিয়া দিতে চাহিলে তিনি মিষ্ট হাস্যে বলিতেন, "না আমি নিজেই বের করে নেব।" আমার ব্রহ্মচারী জীবনের প্রথম চার বৎসর বেলুড় মঠেই কাটিয়াছিল। তিনি যখন বিকালে বেড়াইতেন কখনও কখনও তাঁহার সঙ্গ নিতাম এবং প্রশ্নাদি করিতাম। তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন না। সব সাধুদের উপর তাঁহার সস্নেহ উদার ব্যবহার হৃদয়কে স্পর্শ করিত।

১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ তেইশ বৎসর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদকের পদে অধিরূঢ় ছিলেন। এই গুরুদায়িত্ব তিনি কি আশ্চর্যভাবে পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। শত শত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী তাঁহার নেতৃত্বে আশ্রম-সমূহের কর্মক্ষেত্রে সাহস, উৎসাহ ও উদ্দীপনা পাইত। তাঁহার ব্যক্তিত্ব সকলকেই স্পর্শ করিত। তিনি সত্যই ছিলেন সংঘের কর্মক্ষেত্রে একটি সমন্বয়-বিধায়ক শক্তি। ১৯৪৯ হইতে ১৯৫১

—এই দুই বৎসর মাধবানন্দজী অবসর লইয়া ধ্যান-ধারণায় কাটাইয়াছিলেন। এই সময়ে প্রায় একমাসের জন্য হিমালয়ের শ্যামলাতাল আশ্রমে ছিলেন। একটি ঘরে থাকিতেন, খুব জপ-ধ্যান করিতেন। মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ বিরজানন্দজী মহারাজ তখন শ্যামলাতালে। দুইজনের একত্রে বসিয়া মঠ ও মিশন সংক্রান্ত নানা আলোচনা হইত। এই সময়ে মাধবানন্দজীর সামান্য ব্যক্তিগত সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া বড় আনন্দ পাইতাম। তিনি বরাবরই স্বাবলম্বী ছিলেন। নিজের জন্য অপরকে কোনও প্রকার কষ্ট দিতে তাঁহার প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠিত। কি মঠে কি অন্যত্র, সর্বস্থলে তাঁহার এই মনোভাব সুস্পষ্ট দেখা যাইত। "দাও দাও ফিরে নাহি চাও"—স্বামীজীর বিখ্যাত কবিতার এই পংক্তিটি তাঁহার চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যখন মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট হইলেন, কত সাধু-ব্রহ্মচারী কত ভক্ত তাঁহার কিছু সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল, শুনিয়াছি তখনও তিনি সহজে সেবা নিতে চাহিতেন না।

১৯৫২ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব মাধবানন্দজী আমার উপর ন্যস্ত করেন। এই সূত্রে তাঁহার নিকট অনেক সময় যাইতে হইত। নানা কার্যকরী নির্দেশ ও উপদেশ পাইতাম। কতদিকে তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইত। উহা ছিল খুবই সজাগ ও প্রখর। কথা বলিতেন কম, কিন্তু কোনও সমস্যা বুঝিতে এবং কোনও করণীয় কাজ করিতে তাঁহার দেরী হইত না। শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকীর সময় উদ্বোধনের বিশেষ সংখ্যার জন্য তাঁহার নিকট শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের প্রার্থনা জানাইলে তিনি শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও উহা পূরণ করিয়াছিলেন। লেখাটি বড় মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। যাঁহারা শ্রীশ্রীমায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন তাঁহাদের তুলনায় মায়ের সম্বন্ধে বলিবার বা লিখিবার তাঁহার নিজের উল্লেখযোগ্য কোনও উপাদান নাই, এইকথা অতি বিনয়ের সহিত তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অভিমানরাহিত্যের একটি উদাহরণ মাত্র। যাঁহারা তাঁহার সহিত কাজের সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা এইরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দিতে পারিবেন।

সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ অমায়িক, কোমল-হৃদয় ও নিরহঙ্কার ছিলেন কিন্তু সংঘের যাহা প্রয়োজন তাহার প্রয়োগে অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। স্ত্রী-মঠ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মঠের সাধুদের ভিতর অনেক বাগবিতণ্ডা হইয়াছিল। পক্ষে ও প্রতিপক্ষে তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। মাধবানন্দ মহারাজ সাধারণ সম্পাদক। তিনি কোনও পক্ষে কোন কথা না বলিয়া নীরবে সব লক্ষ্য করিতেছিলেন। যেদিন পাকাপাকি সিদ্ধান্ত লইবার জন্য বেলুড় মঠে সন্ন্যাসীদের মিটিং হইল সেই সভাতে পূজ্যপাদ নির্মল মহারাজের ধীরস্থির ভাবে তাঁহার অভিমত পড়িবার দৃশ্য

কখনও ভুলিব না। এত সতেজ, এত নিরপেক্ষ এত উদার। সমস্ত প্রতিকূলতা এক নিমেষে যেন মিলাইয়া গেল। স্বামী বিবেকানন্দের যেমন ইচ্ছা ছিল তদনুযায়ী বেলুড় মঠ পৃথক ভাবে একটি নারী মঠ স্থাপন করিবেন সিদ্ধান্ত হইল।

১৯৫৬ সালে স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজী [সূর্য মহারাজ, পরবর্তীকালে মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ] কালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা বেদান্ত কেন্দ্রে মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য কেন্দ্রেও গিয়াছিলেন। স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের ইহা দ্বিতীয়বার আমেরিকায় আসা। এই ভ্রমণের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া আমি উদ্বোধনে প্রকাশ করিয়াছিলাম মনে পড়ে। পর বৎসর (১৯৫৭) সানফ্রানসিস্কো বেদান্ত সোসাইটির কাজে সহায়তা করিতে আমার আমেরিকায় আসা ঠিক হয়। তাঁহার ইচ্ছা ছিল উদ্বোধনের সম্পাদনা আমি আরও কিছুকাল করি। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা সম্ভবপর হইল না। তিনি আমার আমেরিকা যাত্রার তারিখ এবং পথে অন্যান্য জায়গায় ভ্রমণের প্রোগ্রাম অতি-যত্নে স্থির করিয়া দিয়াছিলেন।

আমি আমেরিকায় আসিবার কিছু আগে 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থটি লিখিতেছিলাম। তিনি পাণ্ডুলিপি দেখিয়া বেলুড় মঠ হইতে প্রকাশের অনুমতি দিলেন। 'অতীতের স্মৃতি' নামটি তাঁহারই দেওয়া। ঐ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের চাহিদা হওয়ায় উহার কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের উপদেশ দিয়া সানফ্রানসিস্কোতে আমাকে পত্র দিয়াছিলেন। পরিবর্তিত পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম। প্রথম সংস্করণ ও দ্বিতীয় সংস্করণের লভ্যাংশ তাঁহার নির্দেশে বেলুড় মঠ ব্রহ্মচারী শিক্ষণ কেন্দ্রে দেওয়া হইয়াছিল।

১৯৬১ সালে তাঁহার একটি গুরুতর পীড়া (ব্রেন টিউমার) হয়। নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজী পূজনীয় নির্মল মহারাজকে আমেরিকায় আসিয়া উহার অপারেশানের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া পত্র লিখিলেন। মহারাজজী রাজী হইয়াছিলেন। ২৬শে এপ্রিল ঐ অস্ত্রোপচার হয়। কয়েকমাস তিনি ছিলেন। অক্টোবরের গোড়ায় আমি সানফ্রানসিস্কো হইতে নিউইয়র্কে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন তিনি সারিয়া উঠিয়াছেন। ধীরে ধীরে সবল হইয়া উঠিতেছেন। স্যাক্রামেণ্টো আশ্রমের কর্মী ফিলিপস গ্রেগসকে (এখন সে চিকাগো বিবেকানন্দ সোসাইটির কর্মী—নাম স্বামী যোগেশানন্দ) তাঁহার সেবা করিবার জন্য পাঠানো হইয়াছিল। তাহার সেবায় পূজ্যপাদ মহারাজ খুব প্রীত হইয়াছিলেন। যে কয়দিন নিউইয়র্কে ছিলাম পূজ্যপাদ মহারাজজীর সহিত সকালে বেড়াইতে যাইতাম। ফিলিপসও থাকিত। হাঁটা তাঁহার সারিয়া উঠিবার একটি প্রধান সহায়ক—

"পাশ্চাত্যফেরত তাঁহাকে ভারি সুন্দর ও সৌম্য দেখাইতেছিল।"—পৃষ্ঠা ১৫২

স্বামী মাধবানন্দজী পাশ্চাত্য থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের কিছু পূর্বে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সানফ্রানসিস্কোতে গৃহীত চিত্র।

"তাঁহারা [স্বামী মাধবানন্দ এবং স্বামী নির্বাণানন্দ] আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য কেন্দ্রেও গিয়াছিলেন।"—পৃষ্ঠা ১৫৪

ইহা চিকিৎসকরা নির্দেশ করিয়াছিলেন। আমেরিকায় এই তৃতীয় যাত্রায়— মাধবানন্দজীর এই দেশের অন্য কোনও কেন্দ্রে যাওয়া হয় নাই।

ভারতে ফিরিবার পরে তাঁহাকে মঠ ও মিশনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট হইতে হয় (মার্চ ১৯৬২)। কিন্তু কয়েক মাস পরেই মঠাধীশ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ দেহত্যাগ করিলেন। মাধবানন্দজীকে সংঘাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে হইল (৪ঠা আগষ্ট ১৯৬২)। তিন বৎসর দুইমাস তিনি এই গুরুদায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন।

তাঁহাকে মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট-রূপে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আমি তখন আমেরিকায়। কিন্তু তাঁহার প্রধান সেবক স্বামী প্রমথানন্দজীর (তিনি গত কয়েক বৎসর স্যাক্রামেণ্টো আশ্রমেই রহিয়াছেন*) নিকট স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের শেষ জীবনের অনেক কথা শুনিয়াছি। মঠের সর্বাধ্যক্ষের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি বিশেষ গুরুশক্তি নামিয়া আসে। পূজ্যপাদ নির্মল মহারাজের ক্ষেত্রেও উহা সত্য হইয়াছিল। বহুতর কল্যাণ, আধ্যাত্মিক প্রেরণা এবং নির্মল শান্তি তিনি ত্যাগী ও গৃহীদের বিতরণ করিয়াছেন। বিবেক বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। অনেক যুবক তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া তাঁহার জীবন হইতে প্রেরণা পাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর নামে আত্মোৎসর্গ করিয়া বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হইয়াছে। সারদা মঠের সন্ন্যাসিনীদের মধ্যেও অনেকে প্রাক্-সন্ন্যাস জীবনে তাঁহার নিকট অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন।

দেহের দুঃখ কষ্ট তাঁহাকে কখনও অভিভূত করিতে পারিত না। বিভিন্ন সময়ে কঠিন শারীরিক ব্যাধিতে তাঁহাকে ভুগিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সহনশক্তি দেখিলে আশ্চর্য না হইবার উপায় ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের রোগশয্যায় অবিচলতার কথা অনেকের মনে পড়িয়াছে।

স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের বিবেক-চূড়ামণি এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য সহ ইংরাজী অনুবাদ আমি বারবার পড়ি এবং গভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করি। তাঁহার ধ্যানতন্ময়তা, প্রখর মেধা, পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য প্রতিভা রচনার মধ্যে ধরা পড়ে। তাঁহার চরিত্র এবং কর্মের মধ্যে যেমন কোনও জড়তা ছিল না তেমনি তাঁহার লেখার ভিতরও কোন অস্পষ্টতা ও গোঁজামিল দেখিতে পাওয়া যায় না।

---

* স্মৃতিকথাটি রচনাকালে স্বামী প্রমথানন্দজী আমেরিকাস্থিত বেদান্ত সোসাইটি অব্ স্যাক্রামেণ্টো কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি কানাডার বেদান্ত সোসাইটি অব্ টরেণ্টো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ।

পূজ্যপাদ মাধবানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে একটি বিশিষ্ট স্থান রাখিয়া গিয়াছেন। আমি যখন তাঁহার কথা ভাবি তখন হৃদয় শ্রদ্ধায় ও আনন্দে ভরিয়া উঠে। তিনি মায়াবতীতে হিমালয়ের নিস্তব্ধতার মধ্যে বসিয়া বেদান্তের অদ্বৈতভাব হৃদয়ে পরিপুষ্ট করিয়াছেন, নিচে নামিয়া কলিকাতায়, বেলুড় মঠে, ভারতের নানা স্থানে, আমেরিকায়, সেই অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া অতন্দ্রিত কর্মযোগে ব্যাপৃত হইয়াছেন। আবার অন্তরের অন্তরে বেদমূর্তি প্রেমবিগ্রহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অবাধ ভক্তিস্রোত নিঃশব্দে বহিয়া গিয়াছে। চতুর্যোগের সমন্বয় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর উপদিষ্ট পন্থায় তিনি নিপুণভাবে নিজজীবনে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এই ধন্য সন্ন্যাসীবরের উদ্দেশে অসংখ্য প্রণাম নিবেদন করি।

এক মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণ*

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রাক্তন [নবম] অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর যখন মহাপ্রয়াণ করলেন তখন কোন এক ব্যক্তিকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শোনা গিয়েছিল যে, "একজন প্রকৃত মহাপ্রাণ চলে গেলেন।" মহারাজকে যাঁরা ভালভাবে জানতেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের তৎকালীন মনোভাব এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

স্বামী মাধবানন্দকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন এমন লোক বেশী ছিলেন না, কিন্তু যাঁরা তাঁকে সেভাবে জানতেন তাঁরা সর্বদাই ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করবেন। তার কারণ, তিনি আপনাকে বুঝিয়ে দিতেন, আপনি নিজেকে যেমন মূর্খ অথবা অপদার্থ ভাবেন—আপনি আদৌ তা নন। এটি আপনাকে বোঝাবার জন্য তিনি যে বক্তৃতা দিতেন—তা কিন্তু নয়। কিন্তু তিনি আপনার সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করতেন যে আপনি অনুভব না করে পারতেন না যে, যেমন তাঁর কাছে তেমনই জগতের কাছে--আপনি সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আপনার আত্মমর্যাদাবোধ উন্নত করতেন, আপনার মহৎ গুণাবলী সম্বন্ধে আপনাকে সচেতন করে দিতেন, আর সেইসঙ্গে আপনার মধ্যে এমন ব্যাকুলতার সঞ্চার করতেন যাতে আপনি কঠোর পরিশ্রম করে নিজেকে উন্নত করতে পারেন। তাঁর সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটিয়ে এলে আপনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হতেন যে, আপনি যা পেতে চাইছেন তা যতই কঠিন হোক না কেন—আপনি লাভ করতে সক্ষম। এব্যাপারে আপনার করণীয় শুধু দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করা।

তবু স্বামী মাধবানন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা খুব সহজ ছিল না। আপনি হয়ত একজন নবীন সন্ন্যাসী, তাঁর সাথে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে চাইছেন। আপনাকে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে সমস্ত চিন্তাকে আপনি সুসংবদ্ধ করতে পেরেছেন। তারপর কথা বলার সময় আপনাকে

---

* 'বেদান্ত কেশরী', আগষ্ট, ১৯৬৭ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী লোকেশ্বরানন্দ রচিত 'THE PASSING OF A GENTLEMAN' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। বাংলা অনুবাদ—**রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।**

সঠিক জায়গায় উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করতে হবে। আপনি যদি এমন কিছু বলেন যা যথেষ্ট স্পষ্ট অথবা প্রাসঙ্গিক নয় তাহলে আপনার দুর্দশার অন্ত নেই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তিরস্কার করবেন যে, আপনি তাঁর এবং সেইসঙ্গে নিজের সময় নষ্ট করছেন। তিনি চাইতেন যে আপনার বক্তব্য হবে অল্প কথায় ও সেই সাথে স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং ভণিতাশূন্য—যে ভণিতা আমরা প্রায় সকলেই করে থাকি। তিনি মানসিক অনুশাসনে বিশ্বাসী ছিলেন—যে মানসিক অনুশাসন মানুষকে স্বচ্ছ চিন্তা ও স্পষ্ট অভিব্যক্তির অধিকারী করে। আপনার প্রতিটি কথা তিনি লক্ষ্য করবেন এবং যদি আপনি এমন কোন কথা বলেন যা সুসঙ্গত নয় অথবা তাঁর মতে অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় তাহলে তিনি সেবিষয়ে আপনাকে ধরিয়ে দিতে দ্বিধা করবেন না। অথবা আপনি হয়ত কোন শব্দ ভুল উচ্চারণ করছেন, তিনি আপনাকে থামিয়ে দিয়ে আপনার ত্রুটি সংশোধন করে দিতে ইতস্ততঃ করবেন না। যদিও এটা করতে গিয়ে আপনি যাতে মনে আঘাত না পান সেবিষয়েও অবশ্যই তিনি সতর্ক থাকবেন। একবার এক তরুণ সন্ন্যাসী মহারাজের সঙ্গে আলোচনাকালে বলেছিলেন, "Give a dog a bad name and hang it"।* অতীতে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বয়োজ্যেষ্ঠ সাধুদের কাছ থেকে তিনি যে ব্যবহার পেয়েছিলেন এবং তাঁর মতে উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল বুঝে তাঁকে অন্যায়ভাবে দোষারোপ করা হয়েছিল—তরুণ সন্ন্যাসী সেটাই উল্লেখ করেছিলেন। স্বামী মাধবানন্দ সাধুটির কথার মাঝখানেই শান্ত ভাবে বলে উঠলেন, "[hang it নয়] hang him"। যদিও তিনি তরুণ সাধুটির এই ভুল সম্বন্ধে আর কোন মন্তব্য করলেন না, কিন্তু সাধুটি বোকার মতো এরকম একটা ভুল করায় অপ্রতিভ হয়ে আর প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে চাইলেন না। স্বামী মাধবানন্দ নির্ভুলতার ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। কোন শব্দের সঠিক অর্থ, প্রয়োগ অথবা বানান সম্বন্ধে যদি তাঁর কখনও কোন সন্দেহ হত, তিনি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করতেন যাতে তাঁর প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর পেয়েছেন বলে নিশ্চিত হতে পারেন। একবার একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ইংরেজী 'a' আর্টিকেলের (article-এর) প্রয়োগ নিয়ে তাঁকে খুব চিন্তাগ্রস্ত দেখা গিয়েছিল, তিনি ভেবেছিলেন যে [সেই ক্ষেত্রে] ঐ প্রয়োগ যথাযথ হয়নি। সঠিক উত্তর কি হবে তা তিনি অনেকের কাছেই জানতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা তা জানতেন না। এমনকি একটি কলেজের ছাত্রকেও তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ভেবেছিলেন যে ছেলেটি সদ্য স্কুলের পাঠ

---

* 'Give a dog a bad name and hang him' একটি ইংরেজী প্রবচন, এর অর্থ কারুর ওপর দোষ চাপিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া।

সমাপ্ত করেছে, হয়ত অন্যদের থেকে তার (Grammar) ব্যাকরণ ভাল মনে আছে।

ছাত্র হিসেবে তিনি অত্যন্ত ভাল ছিলেন। পরীক্ষায় সফল সহ-পরীক্ষার্থী ছাত্রদের মধ্যে তাঁর স্থান সবসময় ওপরের দিকে থাকত। তিনি এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন, কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য এফ. এ. পরীক্ষায় উচ্চস্থান পান নি। তাঁর বি. এ. পরীক্ষার ফলও ভাল হয়নি—ইংরেজীতে সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছিলেন। কিন্তু তার কারণ হল যে ইতিমধ্যে তিনি তাঁর [বিদ্যায়] অনুরাগ ধর্মানুরাগে পরিবর্তিত করে ফেলেছেন। শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিগ্রীর জন্য পড়াশোনা করা তখন তাঁর কাছে অসহ্য পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু সেই পড়া আর শেষ করতে পারেননি। শীঘ্রই তিনি রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন। তাঁর এক সহপাঠী, যিনি নিজেও একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন, একবার তাঁর মেধা সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছিলেন, "পরীক্ষার ফল দিয়ে স্বামী মাধবানন্দকে বিচার করা ভুল হবে। তাঁকে যাঁরা ভালভাবে জানতেন তাঁরা নির্দ্বিধায় বলবেন যে তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী। আমাদের পাঠ্য বিষয়ে কখনও কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে আমরা সবসময় তাঁর কাছে যেতাম, কারণ আমরা জানতাম যে আমাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই উত্তরটি জানতেন। অন্যরাও হয়ত জানতেন, কিন্তু তাঁরা কেউই তাঁর মতো অত সম্পূর্ণরূপে জানতেন না ও তাঁর মতো নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। স্বামী মাধবানন্দের অভ্যাস ছিল যে, কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তিনি উত্তর দিতেন না—যা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। প্রশ্নের সঠিক উত্তর সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন সন্দেহ থাকলে নির্ভুল উত্তরটি না পাওয়া অবধি তিনি অশেষ কষ্ট স্বীকার করতেন। অনুরূপভাবে, তিনি এমন কোন উত্তর দিতেন না যা তাঁর মনে হত স্পষ্ট নয় অথবা প্রশ্নকারীর সন্দেহ নিরসনে সহায়ক হবে না। রহস্য করে তিনি বলতেন কিভাবে পণ্ডিতদের দেওয়া ব্যাখ্যা কখনও কখনও মূল সমস্যার চেয়েও কঠিন ও বিভ্রান্তিকর হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যাতে এক সময়ে তিনি দেখেছিলেন 'Father' [পিতা] শব্দের অর্থ করার একটা চেষ্টা করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, সেই বই অনুসারে 'Father' [পিতা] কথার অর্থ 'male parent' [জন্মদাতা পুরুষ] !

দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্বের সংস্কৃত থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা যে কি দুরূহ তা যাঁরা কিছুমাত্র জানেন তাঁরা বলবেন যে বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যের স্বামী মাধবানন্দ কৃত ইংরেজী অনুবাদ তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এই অনুবাদ তাঁর পাণ্ডিত্য এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের নিদর্শনই শুধু নয়, পরন্তু যথাযথ অনুবাদের জন্য তাঁর কঠিন পরিশ্রম ও যত্নশীলতার পরিচায়কও বটে। এই বিশাল উপনিষদ গ্রন্থের যেসব অনুবাদ পূর্বে অথবা পরবর্তীকালে হয়েছে তার মধ্যে তাঁর সমতুল্য খুব বেশী নেই। সেদিক থেকে এই বইয়ের নির্ভুল এবং যথাযথ অনুবাদের মাধ্যমে তিনি বিদগ্ধ সমাজকে কৃতজ্ঞতার চির-ঋণে আবদ্ধ করেছেন।

স্বামী মাধবানন্দ এই ধরনের আরো কয়েকটি বইয়ের অনুবাদ করেছেন এবং সেই বইগুলির প্রতিটিতে যে পাণ্ডিত্য ও বিষয়ানুগতার একই ছাপ দেখা যায়—তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি সবসময় নির্ভুলতার উপর এত জোর দিতেন যে সেজন্য সব কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর সাহিত্যকর্মের তুলনামূলকভাবে যে অপ্রতুলতা—তার কারণও সম্ভবতঃ সেটাই। ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী—তিনটি ভাষাতেই তাঁর অসাধারণ দখল ছিল এবং ইচ্ছে করলে এই তিনটি ভাষার যে কোনটিতেই তিনি অনেক বেশী লিখতে পারতেন। কিন্তু স্বভাবগত লাজুক ছিলেন বলে এবং যা বলতে চাইছেন তা বলার জন্য কি শব্দ ব্যবহার করবেন সে বিষয় অল্পবয়স থেকে অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা করার কষ্টকর অভ্যাস আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন বলে, তিনি কেবল কয়েকটি বইয়ের অনুবাদ করা ও কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধ লেখায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী লেখার কাজে প্রতিবন্ধকতার আর একটি কারণ হল তাঁর রামকৃষ্ণ-সংঘ-জীবনের সারা সময়টাতেই তিনি গুরুদায়িত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে মননশীল কাজ করার মতো খুব অল্পই সময় বাকী থাকত। এতে সকলেই আশ্চর্য হয়ে যান যে তা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে এত কিছু তিনি লিখেছিলেন, এবং তাও এত উঁচু মানের। স্বনামে এবং ছদ্মনামে অনেক প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন, সেগুলির সবকটিই বুদ্ধিদীপ্ত, প্রাঞ্জল এবং পরিমিত আকারের—যা তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। এগুলিতে কোন অবান্তর প্রসঙ্গ নেই, আবার প্রাসঙ্গিক সবকিছুই এগুলিতে আছে। প্রবন্ধগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ, তথ্যবহুল কিন্তু বর্ণনার আধিক্যে ভারাক্রান্ত নয়। কৌতূহলোদ্দীপক এই প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য আবার সেইসঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

নিজস্ব রচনা ছাড়াও তিনি অপরের লেখা বহু বই এবং প্রবন্ধাদির সম্পাদনা করেছেন। বিগত তিরিশ বছরে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে এমন বই কদাচিৎ প্রকাশিত হয়েছে যার পাণ্ডুলিপিতে তিনি চোখ বোলান নি, বিষয়বস্তু ও ভাষা বিচার করে দেখে দেননি এবং সেগুলির মান উন্নত করতে সাহায্য করেননি। এমনকি ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী মাধবানন্দের মহাপ্রয়াণের অল্প কিছুদিন আগে প্রকাশিত খৃষ্টোফার ঈশারউডের শ্রীরামকৃষ্ণের উপর লেখা বইটিও এর

ব্যতিক্রম নয়। বইটির ভূমিকায় ঈশারউড লিখেছেন যে প্রেসে দেওয়ার আগে তিনি বইটির প্রত্যেকটি অধ্যায় স্বামী মাধবানন্দকে দেখিয়ে নিয়েছেন। বিশেষতঃ বিভিন্ন তথ্যের যথার্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই ঈশারউড এটা করেছিলেন। তিনি জানতেন যে তাঁর দেওয়া তথ্যগুলি নির্ভুল কিনা যাচাই করতে স্বামী মাধবানন্দের চেয়ে উপযুক্ত—আর কেউ হতে পারেন না। কারুর কাছে বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে এই ধরনের কাজ করে স্বামী মাধবানন্দ যদি না আনন্দ পেতেন তাহলে ব্যাখ্যা করা কঠিন যে কেন তিনি এই কাজ করতেন, এমনকি কখনও অযাচিত ভাবেও। অথবা এটা বলাই বোধহয় আরো যুক্তিসঙ্গত হবে যে তিনি কোথাও কোনরকম অমনোযোগিতার ছাপ দেখলে বিরক্ত হতেন। তিনি যখন কারও লেখায় দুর্বোধ্যতা বা অযত্নের ছাপ দেখতেন তখন তাড়াতাড়ি তা সংশোধন করে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হতেন। অবশ্য তাঁকে কোন আঘাত না দিয়ে যদি তিনি এই কাজ করতে পারতেন। একটি দৈনিক পত্রিকায় জনৈক যুবক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। লেখক পরে স্বামী মাধবানন্দকে লেখাটি দেখান—সম্ভবতঃ তাঁর মতামত জানার উদ্দেশ্যে। স্বামী মাধবানন্দ সেটি পড়ে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করলেন। কিন্তু তারপর বোধহয় অনেক ত্রুটি চোখে পড়ায় তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লেখাটি সম্পাদনা করতে শুরু করলেন। যখন তিনি কাজ শেষ করলেন তখন প্রবন্ধটির অপরিসীম শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। যুবকটি দেখে দারুণ অবাক হয়ে গেলেন যে কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দ এবং বাক্যের অদল বদলের ফলে লেখাটির এই মানোন্নতি ঘটল। আসলে স্বামী মাধবানন্দ যা করেছিলেন তা হল নির্দিষ্ট কয়েকটি শব্দ এবং বাক্যাংশের পরিবর্তন। তাঁর মতে যা আরো সঠিকভাবে লেখকের ভাবকে প্রকাশ করবে। সেই তরুণ লেখক ঐ শব্দ এবং বাক্যাংশগুলির অর্থ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা না করেই সেগুলি ব্যবহার করেছিলেন। এটা করে স্বামী মাধবানন্দের হয়ত পরে মনে হয়েছিল যে অজান্তেই তিনি ছেলেটির লেখার সমালোচনা করে ফেলেছেন। সেজন্য দোষ ক্ষালন করতে তিনি ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলেছিলেন যে, তিনি শুধু একটি ভাল জিনিষকে ঘষে মেজে ঝকঝকে করে তুলতে চেষ্টা করেছেন মাত্র। এটা অবশ্যই খুব কম করে বলা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে স্বামী মাধবানন্দ এমনই একজন মানুষ ছিলেন যিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন—কর্মই হল উপাসনা, যদি তা সঠিক ভাব নিয়ে করা যায়। ঈশ্বরের সেবার উদ্দেশ্যে করা কোন কাজকেই তিনি তুচ্ছ মনে করতেন না। প্রায়ই দেখা যেত তিনি প্রুফ দেখছেন—যে কাজটা খুব কম লোকই করতে চান। তিনি এমনভাবে এই কাজটি করতেন যে দেখলে মনে হত তিনি কাজটি আগাগোড়া উপভোগ

করছেন। আসলে তিনি জানতেন যে এই ধরনের [প্রুফ দেখা] কাজ অন্যেরা করতে চাইবেন না এবং এই কাজের ভার তাঁদের উপর দিলে তাঁরা হয়ত দায়সারা ভাবে কাজটা করবেন। মিশনের প্রধান কার্যনির্বাহকরূপে অত্যধিক কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও এই কারণেই তিনি অপর কাউকে বলার চেয়ে নিজেই এই ক্লান্তিকর কাজের দায়িত্ব প্রায়ই গ্রহণ করতেন। আর সকলের কাছেই অরুচিকর এই কাজটি কি নিষ্ঠার সঙ্গেই না তিনি করতেন! প্রুফ দেখার কলাকৌশলে তিনি এমন সম্পূর্ণভাবে পারদর্শীতা অর্জন করেছিলেন যে একবার যে প্রুফ তিনি দেখেছেন তারপর তা থেকে সংশোধনযোগ্য একটিও ভুল বের করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। মজার কথা হল যে প্রুফ দেখা বা ঐ ধরনের যত ক্লান্তিকর কাজ তিনি প্রায়ই খাওয়ার ঠিক পরেই করতেন। কেউ যদি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলত যে, খাবার ভালভাবে হজম করার জন্য এসময়ে তাঁর একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার। এই ধরনের নিরস কাজ যা বিশেষভাবে চাপ সৃষ্টি করে তা করা উচিত নয়। তিনি উত্তর দিতেন, "আমি তো বিশ্রাম নিচ্ছি। বিশ্রাম নেওয়া মানে কিছু না করা নয়, কাজের পরিবর্তনই হল বিশ্রাম।"

বাস্তবিক, কাজ ছাড়া তাঁকে এক মুহূর্তেও দেখা যেত না। সব সময়েই তিনি কিছু না কিছু করতেন। মানুষটি ছিলেন ভগ্নস্বাস্থ্য-সম্পন্ন। কিন্তু তিনি তাঁর কর্মক্ষমতা এমনভাবে সঞ্চিত রাখতেন যে এমনকি যদিও তিনি সংঘ-কার্যালয়ের কষ্টসাধ্য দায়িত্বভার নিজ স্কন্ধেই বহন করতেন এবং তাঁর ফলে তাঁকে অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হত, তবু তিনি কখনও ক্লান্ত হতেন না। এর কারণ হল যে, তিনি বিশেষভাবে তাঁর পদাধিকার সম্পর্কিত কাজ অথবা তাঁর নিজের কিংবা অপরের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া অন্য বিষয়ে সময় এবং সামর্থ্যের অপচয় না করার সম্বন্ধে সতর্ক থাকতেন। সেই কারণে, তাঁর কাজ যে সর্বদাই যথাসময়ে সম্পন্ন হয়ে থাকত শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে দর্শনার্থীদের সাথে দেখা করা, চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া এবং প্রচুর পড়াশোনা করার মতো সময়ও তিনি পেতেন। প্রতিদিনই অনেক লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। কিন্তু তার মধ্যে অধিকাংশ মানুষ কাজের প্রয়োজনে এলেও কিছু লোক ছিলেন যাঁরা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য যে আসতেন তা নয়, আসতেন কেবল এই কারণে যে তিনি একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কার্যনির্বাহক ছিলেন। এঁরা এমন ধরনের লোক ছিলেন যাঁরা প্রায়ই অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কাছে থাকতেন। যার আপাতদৃষ্টিতে কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যেত না। এর ফলে স্নান খাওয়া প্রভৃতি ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য যে সামান্য সময়টুকু সাধারণতঃ নির্দিষ্ট ছিল তার সিংহভাগ স্বামী মাধবানন্দকে ত্যাগ স্বীকার

করতে হত। এমনকি এরকম পরিস্থিতিতেও তাঁর প্রতিবাদ ছিল অত্যন্ত মার্জিত। বড়জোর তিনি তাঁদের নম্রভাবে ইঙ্গিতে বলতেন যে মঠের মন্দিরগুলি ঘুরে দর্শন করলে তাঁদের ভাল লাগবে। বেলুড় মঠে উৎসবের দিনগুলিতে প্রচুর জনসমাগম হত। সেসময় প্রায়ই তিনি খাওয়ার সময়ও পেতেন না। সমস্ত দিন ধরে তাঁকে দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা করতে হত। এর ফলে তাঁর প্রচণ্ড পরিশ্রম হত। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করতেন না কিংবা কোন দর্শন-প্রত্যাশীকে ফিরিয়েও দিতেন না। একমাত্র যখন খাওয়ার ঘণ্টা পড়ত তখন তিনি একটু একা হতেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত কাজগুলি সারবার মতো অবকাশ পেতেন। [খাওয়ার ঘণ্টা পড়লে] দর্শনার্থীরা তখন তাড়াহুড়ো করে বিদায় নিতেন এইবলে মার্জনা চেয়ে যে তাঁদের খিদে পেয়েছে এবং প্রসাদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে চাইছেন না।

তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল অপরের জন্য বিবেচনাবোধ যা তাঁকে দুর্লভ মাধুর্যপূর্ণ এক সদাশয় ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করেছিল। অত্যধিক গরম না হলে তিনি নিজেকে কখনও পাখা চালানোর 'বিলাসিতা' করতে দিতেন না। কিন্তু কেউ যদি গরমকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে পাখা চালিয়ে দিতেন। কোন কারণবশতঃ তাঁর খেতে যেতে দেরী হলে তিনি বলে পাঠাতেন যে তাঁর খাবার যেন কোনখানে সরিয়ে রেখে দেওয়া হয় যাতে গিয়ে খাওয়ার মতো অবসর হলে তিনি নিজেই সহজে তা নিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু কেউ তাঁর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকুক—তা তিনি চাইতেন না। কিংবা তাঁর খেতে যেতে দেরী হবে বলে কেউ তাঁর ঘরে খাবার নিয়ে গিয়ে রেখে আসবে—তা'ও তিনি পছন্দ করতেন না। সংক্ষেপে বলতে হলে তাঁর বয়স এবং পদমর্যাদার জন্য যদি তাঁর প্রতি কোনরকম বিশেষ গুরুত্ব প্রদর্শন করা হত এবং কেউ যদি এবিষয়ে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করত তাহলে তিনি বিরক্ত হতেন। একবার তিনি খাবার খেতে অস্বীকার করেন এইজন্য যে কেউ একজন এবিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করে খাবার তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখে এসেছিল। কারণ তিনি [স্বামী মাধবানন্দ] বাইরে গিয়েছেন এবং খাওয়ার সময় পেরিয়ে যাওয়ার বেশ কিছু পরেও ফিরবেন না এবং তাঁর ফেরার অপেক্ষায় তাঁর ঘরে খাবার না এনে রাখলে তাঁর হয়ত খাওয়াই হবে না। আর একবার, তিনি এবং তাঁর ছোট ভাই—যিনি নিজেও রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসী [স্বামী দয়ানন্দ], তাঁদের বৃদ্ধ অসুস্থ পিতামাতার সঙ্গে দেখা করতে [বোলপুর] যান। তাঁরা ভেবেছিলেন সন্ধ্যাতেই পেঁছিবেন, কিন্তু ট্রেন লেট করল। তাঁরা যখন গন্তব্যস্থলে পেঁছিলেন তখন রাত হয়ে গিয়েছে এবং পিতামাতাসহ বাড়ির সকলে শুয়ে পড়েছেন। পাছে তাঁদের ঘুম ভাঙিয়ে

দিয়ে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করেন এই ভেবে তাঁরা সমস্ত রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে বাড়ির বাইরে [রোয়াকে] কাটিয়ে দেবেন বলে মনস্থ করলেন, এবং তাই করলেনও।

স্বামী মাধবানন্দের অন্তিম অসুস্থতাকালে একটি বৈদ্যুতিক পাখার প্রয়োজন হয়েছিল। একজন বন্ধু একথা জেনে একটি পাখা কিনে তাঁকে দেন। বন্ধুটির ইচ্ছা ছিল তাঁকে উপহারস্বরূপ এটি দেওয়া। কিন্তু স্বামী মাধবানন্দ তাঁকে দাম নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তাঁর যুক্তি ছিল, ভদ্রলোক একজন মধ্যবিত্ত এবং ইতিমধ্যেই মিশনের জন্য অনেক দান-ধ্যান করেছেন। কাজেই তাঁর মনে হয়েছিল যদিও সেই ব্যক্তি দেবার জন্য উদগ্রীব তবুও তাঁর কাছ থেকে কোন উপহার নেওয়া অসঙ্গত হবে। স্বামী মাধবানন্দকে পাখার দাম দেওয়া থেকে নিবৃত্ত করার জন্য সেই ভদ্রলোক সকল সম্ভাব্য উপায়ে—যা তাঁর মনে এসেছিল, চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি কিছুদিন তিনি মহারাজকে দেখতে আসা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু এতে কোন লাভ হল না। মহারাজ তাঁর খোঁজে লোক পাঠাতে লাগলেন এবং যতক্ষণ না ভদ্রলোক টাকাটা নিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত মহারাজ ছাড়লেন না।

স্বামী মাধবানন্দ কারও থেকে কোন সেবা নিতেও অনিচ্ছুক ছিলেন। একবার তিনি দাড়ি কামানোর পরে একজন বয়োকনিষ্ঠ সাধু তাঁর সরঞ্জামগুলো ধুয়ে দিতে চাইলে তিনি তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, "এর বদলে তুমি মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করছ না কেন?" আর একবার, মহারাজ একটি হলঘরে প্রবেশ করেছিলেন যেখানে জুতো পরে যাওয়া বারণ ছিল। ঐ সাধুটি তাঁর জুতো জোড়ার ওপর নজর রেখেছিলেন এবং তিনি যখন বাইরে এলেন ঐ সাধুটি জুতো জোড়া তাঁর পায়ের কাছে এগিয়ে দেন। এটাকে সেবা বলাই যায় না। এমনকি এই সামান্য সেবাটুকুও তাঁর জন্য করা হোক তা কিন্তু স্বামী মাধবানন্দ চাননি। সেই সাধুটি তাঁর জুতোর জন্য মাথা ঘামিয়েছিল বলে তিনি তাকে বকুনী দিলেন। এমনকি যখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন এবং চলাফেরায় অসুবিধা বোধ করছেন [তখনও] কাউকে সাহায্য করতে দিতেন না। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় তাঁকে দেখলে কষ্ট হত। কিন্তু তিনি সবসময় জোর করতেন যে কারও সাহায্য ছাড়াই তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করবেন। তিনি যখন খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং নিজের কাজ নিজে করতে পারতেন না, তখন সামান্যতম প্রয়োজনেও তাঁকে স্বভাবতঃই অন্যের ওপর নির্ভর করতে হত। কয়েকজন বয়োকনিষ্ঠ সাধুকে তাঁর সেবার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। যার ফলে তাঁকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত যে তাঁকে দেখাশোনা করতে গিয়ে ঐ সাধুদের দৈনন্দিন কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটছে বলে তিনি যেন নিজেকে অপরাধী মনে করছেন।

এমন ঘটনা অনেকবার হয়েছে যখন যাঁরা তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করতেন তাঁরা হয় না জেনে অথবা অনবধানতা বশতঃ ভুল করে ফেলেছেন। লজ্জিত মুখে তাঁরা যখন কি করে ভুল হল তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন তখন স্বামী মাধবানন্দ প্রশ্রয়ের হাসিতে তাঁদের দোষ ত্রুটি হাল্কা করে দিতেন।

তিনি প্রথমে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, পরে এর সাধারণ সম্পাদক হন—যে পদে তিনি দুই দশকেরও অধিককাল ধরে আসীন ছিলেন। তিনি একজন কঠোর প্রশাসকরূপে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর কঠোরতা ছিল এমন ধরনের যা কদাচিৎ [কাউকে] আঘাত করত। এমন নয় যে কার্যনির্বাহী প্রধানরূপে যাদের কল্যাণের দায়িত্ব প্রধানতঃ তাঁর উপর ছিল তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তিনি অন্ধ হয়ে থাকতেন। তিনি প্রয়োজনে নির্মম হতেন, কঠোর ব্যবস্থা নিতেন। কিন্তু সেইসব ঘটনায় তিনি যেভাবে ব্যবহার করতেন তাতে লোকের মনে হত, যে পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন তা তাঁকে নিতে হয়েছে বলে তিনি ব্যথা পেয়েছেন। এরকম প্রায়ই হয়েছে, যে ব্যক্তিকে তিনি সাজা দিয়েছেন সেই ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার পরে আগের চেয়ে আরো বেশী তাঁর গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছে। সেই ব্যক্তি স্বামী মাধবানন্দের সিদ্ধান্তের যথার্থতা সম্বন্ধে অথবা যে ব্যবস্থা তিনি নিয়েছেন তা নেওয়ার সময়ে তিনি যে উচ্চতম এবং পবিত্রতম উদ্দেশ্যেই চালিত হয়েছেন সে বিষয়ে কখনও প্রশ্নও তোলেননি। স্বামী মাধবানন্দ ছিলেন এমন মানুষ যাঁর কাছে ব্যক্তির চেয়ে নীতির গুরুত্ব বেশী ছিল। নীতির স্বার্থে প্রয়োজন হলে প্রিয় বন্ধুকেও তিরস্কার করতে অথবা তার বিরুদ্ধে পরিস্থিতি অনুসারে অনুরূপ কোন ব্যবস্থা নিতে তিনি কখনও ইতস্ততঃ করতেন না। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে যদি একবার কেউ ভুল করে ফেলে তার মানে এই নয় যে সে চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। বরং ভালবাসা ও উৎসাহ পেলে সে উন্নতি করতে পারে। [তিনি মনে করতেন] নেতা হিসেবে তাঁর দেখা কর্তব্য সংঘের যে সদস্যটি ভুল করেছে সে যেন নিজেকে সংশোধনের প্রতিটি সুযোগ পায়। কোন কোন সময়ে অভিযোগ উঠেছে যেসব লোকেরা একবার নয় বরং বার বার অন্যায় করেছে তাদের প্রতি তিনি অযথা নরম মনোভাব দেখিয়েছেন। কিন্তু বোধহয় তাঁর এই নরম মনোভাবের কারণ ছিল যে সাময়িক দুর্বলতার প্রকাশ ছাড়া ঐসব ব্যক্তির প্রভুত সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতেন। তাদের দুর্বলতা দূর করতে এবং অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটাতে যে সাহায্যের প্রয়োজন তা হল সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার এবং উৎসাহ প্রদান। পরবর্তী অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এইসব ব্যাপারে স্বামী মাধবানন্দের সিদ্ধান্ত কতখানি

সঠিক ছিল। এইসব ব্যক্তি উন্নতি করেছিল। তাদের উপর স্বামী মাধবানন্দের বিশ্বাসের সম্পূর্ণ যৌক্তিকতা প্রমাণ করে, লোকে যতটুকু সম্ভব বলে ভেবেছিল তার থেকে অনেক বেশী উন্নতিই করেছিল।

স্বামী মাধবানন্দ, তাঁর চারপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকে যদিও সর্ব বিষয়েই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন তবু যখন তিনি অন্যদের সদ্‌গুণগুলি সম্বন্ধে সুখ্যাতি করতেন তখন কোন কোন সময়ে নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এমনভাবে অতিশয়োক্তি করতেন যে মনে হত তাঁদের মধ্যে এমনকি নগণ্যতম ব্যক্তিটিরও সহযোগী হওয়ার মতো যোগ্যতা তাঁর নেই। তিনি যে কৃত্রিম বিনয়ে বিশ্বাস করতেন তা কিন্তু নয়। আসলে তিনি এত মহৎ ছিলেন যে নিজেকে কিছুতেই বড় বলে ভাবতে পারতেন না। তিনি দেখতে চাইতেন যে অন্যেরা, বিশেষ করে যারা তাঁর থেকে বয়সে ছোট, তারা সর্ববিষয়ে তাঁর থেকে বেশী উন্নতি করেছে। তাঁর সামনে যদি কেউ কখনও তাঁর সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করতেন, তিনি স্পষ্টতঃ এত বিরক্ত হতেন যেন কেউ বিনা প্ররোচনায় তাঁর উপর অপমানের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। একবার এক যুবক পরিণামের কথা না জেনে তাঁর একটি বক্তৃতার প্রশংসা তাঁর কাছেই করেছিল। তাতে স্বামী মাধবানন্দের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে ছেলেটি খুব অবাক হয়ে গেল। তিনি বললেন, "আমি কি তাহলে বুঝব যে তোমার অপরকে তোষামোদ করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই?" আর একটি ঘটনায় তাঁর মন্তব্য স্বভাবসিদ্ধ হলেও ততটা কঠোর ছিল না। মৃদু হেসে তিনি বলেছিলেন, "দেখ হে, ব্যাপার হল যে আমার বরাতটাই খুব ভাল। লোকে আমায় যেরকম ভাবে ততটা ভাল আমি আসলে নই। কিন্তু যেভাবেই হোক্, মনে হয় আমার একটা ভাল 'বাজার দর' হয়েছে। তাই আমি আসলে যতটা উপযুক্ত, লোকে আমায় তার থেকে অনেক বেশী প্রশংসা করে।"

তাঁর বিনয় সত্ত্বেও তিনি সত্যিই একজন ভাল বক্তা ছিলেন যিনি শ্রোতাদের মনোযোগ সবসময় আকর্ষণ করে রাখতেন। তাঁর বক্তৃতার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি যতদূর সম্ভব অল্প কথায় তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে চেষ্টা করতেন। শব্দগুলি হত একাধারে সহজবোধ্য এবং পরিশীলিত। দীর্ঘ বক্তৃতা করা তিনি বিশেষভাবে অপছন্দ করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "লম্বা বক্তৃতা দেওয়া হল অত্যাচার করা। যদি কোনও সভায় তুমিই একমাত্র বক্তা হও তাহলে খুব বেশী হলে পঁয়তাল্লিশ মিনিট বলবে। কিন্তু যদি সেখানে অন্য বক্তা থাকেন, সেক্ষেত্রে পনের মিনিটের বেশী বক্তৃতা দেবে না এবং যদি সম্ভব হয় এমনকি আরো সংক্ষেপে সারবে।" তিনি নিজে সবসময় এই নীতি মেনে চলতেন। যদিও স্বভাবতঃই এর ফলে তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলী প্রায়ই হতাশ হতেন।

স্বামী মাধবানন্দ ছিলেন সেই প্রজন্মের মানুষ যে কালে সৌজন্যবোধের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হত। সেই সৌজন্যবোধের অংশীদাররূপে যতটা করণীয় তার ঊর্ধ্বে উঠে, কোন কোন সময়ে তিনি অপরের প্রতি এমনভাবে শিষ্টাচার প্রদর্শন করতেন যে, যাঁদের উদ্দেশ্যে করতেন তাঁরা বিব্রত হয়ে পড়তেন বয়োজ্যেষ্ঠদের যেভাবে তিনি প্রণাম করতেন সে দৃশ্য অন্তরকে স্পর্শ করত —যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেত গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে কেউ কেউ মননশীলতায় এবং অন্যান্য দিকে যদিও তাঁর থেকে অনেক অধস্তন ছিলেন। একইভাবে বয়োকনিষ্ঠদের প্রতিও তিনি যথাযথ সৌজন্য ও বিবেচনাবোধ দেখাতেন। যদিও প্রচলিত রীতি অনুসারে এটা করা তাঁর দিক থেকে সবসময় আবশ্যিক ছিল না। একবার তিনি যখন ট্রেনে করে যাচ্ছেন তখন সিগারেট মুখে এক যুবক তাঁর কামরায় এসে ঢুকল। কামরায় ভীড় ছিল। কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে যুবকটিকে দাঁড়িয়েই সন্তুস্ট থাকতে হল। তখন স্বামী মাধবানন্দ তাকে তাঁর পাশে এসে বসতে অনুরোধ করলেন। যুবকটি তাই করল, কিন্তু এমন ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বসল যে দেখে মনে হল যেন পাশে বসতে রাজী হয়ে স্বামী মাধবানন্দকে সে কৃতার্থ করেছে। স্বামী মাধবানন্দের দিকে ফিরে সে রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি রামকৃষ্ণ মিশনের ?" স্বামী মাধবানন্দ বললেন, "হ্যাঁ"। তারপর সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার নাম কি ?" "মাধবানন্দ।" যুবকের চকিত মন্তব্য, "ওঃ মাধবানন্দ !" এই ধরনের কথাবার্তায় কামরার অন্যান্য সহযাত্রীরা হতবাক। স্বামী মাধবানন্দ, সেই যুবকের থেকে চল্লিশ বছরেরও বেশী বড় হলেও কিছুই মনে করলেন না এবং মনে হল যদি যুবকটি এই ধরনের আরও প্রশ্ন করতে চায় তার উত্তর দিতেও তিনি প্রস্তুত। আর একবার স্বামী মাধবানন্দ এক নবীন ব্রহ্মচারীকে তিরস্কার করেন। কারণ তাঁকে বলা হয়েছিল যে ঐ ব্রহ্মচারী কিছু ভুল কাজ করেছে। কিন্তু যেইমাত্র তিনি জানতে পারলেন যে তাঁর শোনা কথা সঠিক নয়, তিনি সেই যুবকের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে খুবই লজ্জায় ফেলে দিলেন।

আর একটি মহৎ গুণের ব্যাপারে তাঁর প্রজন্মের আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর মিল ছিল। কিন্তু যা অভ্যাসের ফলে তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছিল এবং যা তাঁর কথা ও কাজকে বিশেষ স্বতন্ত্রতা দিয়েছে তা হল যে তিনি কথায় ও কাজে কঠোর নৈতিক অনুশাসন মেনে চলতে চেষ্টা করতেন। কোন বিষয় নীতিগতভাবে যথাযথ কিনা সে সম্পর্কে প্রথমে নিশ্চিত না হয়ে কোন পদক্ষেপ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি জানতেন যে সকলের ক্ষেত্রে একই নৈতিক বিধি প্রযোজ্য হতে পারে না। একজনের জীবনের অবস্থান এবং একজন জীবনের লক্ষ্যরূপে কি বেছে নিয়েছে সেই অনুসারে নীতিবোধের

অবশ্যই পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু সন্ন্যাসীগণের ক্ষেত্রে নৈতিক মান যতদূর সম্ভব উচ্চ হওয়া উচিত বলে তিনি জোর দিতেন। তাঁর মতে একজন গৃহীর পক্ষে যেটা ন্যায্য ও ক্ষমার্হ হতে পারে একজন সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে তা মার্জনীয় বলে বিবেচিত হতে পারে না। তিনি স্বীকার করতেন যে কখনও কখনও কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা যে ভুল তা স্থির করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি বলতেন যে, যা করতে চলেছ তা-ই যে ঠিক এবিষয়ে যদি পুরোপুরি নিশ্চিত না হও তবে সে কাজ আদৌ না করাই বরং ভাল। কারণ তিনি নিজে কেবল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নয়, তিনি যার প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন—সেই সংঘের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও সবসময় এই নীতি অনুসরণ করতেন। তিনি সকলের সম্ভ্রম আদায় করে নিতেন, এমনকি তাঁদের কাছ থেকেও যাঁরা তাঁর সঙ্গে সংসময় একমত হতেন না।

দৈনিক কিছু সময় জপ-ধ্যান এবং ধর্মগ্রন্থপাঠে কাটানোর অভ্যাসটি স্বামী মাধবানন্দ জীবনের শেষ দিন অবধি কঠোরভাবে বজায় রেখেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর তিরোধানের আগের এক সপ্তাহের মধ্যে তোলা একটি সুন্দর ছবি আছে যাতে দেখা যায় তিনি বিছানায় শুয়েই মালা জপ করছেন। যেহেতু অসুস্থতার জন্য এমনকি বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার মতো সামান্য শারীরিক পরিশ্রম করতেও তিনি তখন অপারগ। দৈনন্দিন আচার-অভ্যাসে সময়ানুবর্তিতা তিনি শেষ অসুখের সময় পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর জপ-ধ্যান ইত্যাদির অভ্যাসের কথা তাঁর সতীর্থ সন্ন্যাসীরা খুব বলতেন এবং তা সকল সাধুদের অনুসরণযোগ্য আদর্শরূপে উল্লেখ করা হত। অনেকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতেন কিভাবে প্রতিদিন ভোর চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে উঠে জপ-ধ্যান শুরু করতে তাঁর কখনও ব্যতিক্রম হত না। কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে আগের দিন রাতে দেরীতে শুতে বাধ্য হ'লেও এর অন্যথা হত না। আবার সন্ধ্যেবেলায় মন্দিরে [ঠাকুরের] সন্ধ্যারতি শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পুনরায় জপ-ধ্যানে বসতেন। কোন কোন সময়ে সন্ধ্যারতির পর এত তাড়াতাড়ি জপে বসতেন যে যদি কাউকে জরুরী প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হত তাহলে হয় তাকে আরতিতে উপস্থিত থাকা ছাড়তে হত নয়ত তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়ার ঝুঁকি নিতে হত। কিন্তু স্বামী মাধবানন্দ চাইতেন না যে কোন প্রয়োজনের মুহূর্তে শুধুমাত্র তাঁকে না পাওয়ার জন্য মিশনের কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আটকে থাকবে। এমনকি তা যদি তাঁর জপ-ধ্যানে মগ্ন থাকার কারণেও হত। একবার কলিকাতাস্থিত [মিশনের] একটি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত এক নবীন সন্ন্যাসী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রে তাঁর সই নিতে গেছেন। কিন্তু যেইমাত্র তিনি মঠে পৌঁছেছেন, হতাশ হয়ে দেখলেন যে স্বামী মাধবানন্দ ঘরের আলো নিভিয়ে দিচ্ছেন—অর্থাৎ তিনি ধ্যানে বসবেন। এর অর্থ হল যে পরবর্তী দু

"তাঁর তিরোধানের আগের এক সপ্তাহের মধ্যে তোলা একটি সুন্দর ছবি আছে যাতে দেখা যায় তিনি বিছানায় শুয়েই মালা জপ করছেন।"—পৃষ্ঠা ১৬৮

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের ৩৭ নং কেবিনে মহাসমাধির ২।৩ দিন পূর্বে গৃহীত চিত্র।

উপবিষ্ট ঃ স্বামী মাধবানন্দ দণ্ডায়মান (বাম হইতে) ঃ স্বামী নিখিলানন্দ, স্বামী আত্মঘনানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী বুধানন্দ —১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সহস্র দ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) গৃহীত চিত্র।
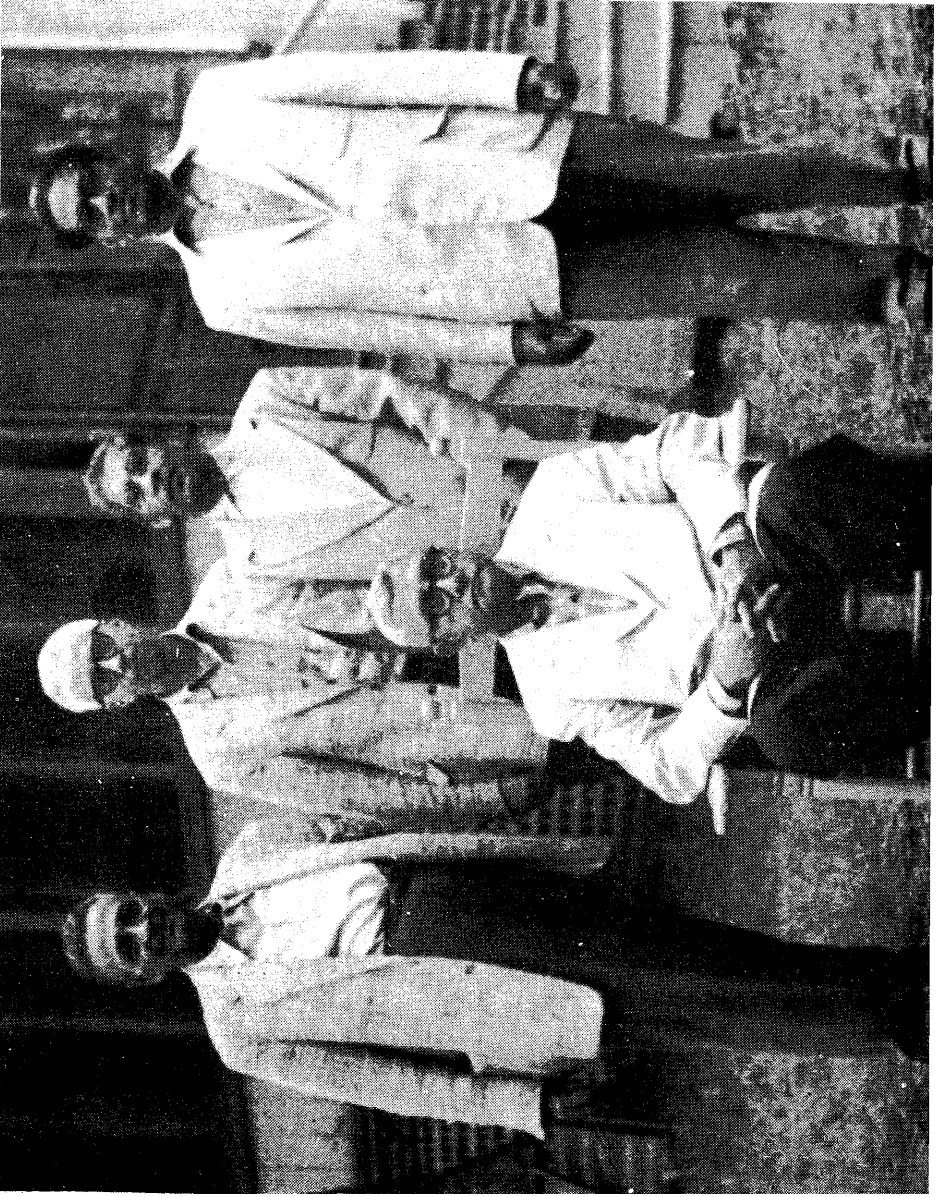
ঘণ্টার মতো সময়ে সাধুটি আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। এই সময়টায় স্বামী মাধবানন্দ সাধারণতঃ জপ-ধ্যান করতেন। অবশেষে সন্ধ্যা উতরে যাওয়ার পরে তিনি যখন স্বামী মাধবানন্দের সঙ্গে দেখা করলেন তখন স্বামী মাধবানন্দ তাঁকে এই বলে তিরস্কার করলেন যে কেন তিনি আরো আগে সই নেবার জন্য তাঁর দরজায় করাঘাত করেননি। অথবা অন্য কোন ভাবে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেননি। কারণ, তিনি বলেছিলেন, বিবেচনাবোধের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর জন্য সাধুটি যা করেছেন তার ফলে তিনি অজান্তে মিশনের কাজে সাময়িক অচলাবস্থার কারণ ঘটিয়েছেন—যা তাঁর অনুচিত মনে হয়েছিল। যেহেতু তাঁর মতে মিশনের কাজের চেয়ে কোন কিছুই অগ্রাধিকার পেতে পারে না। এমন নয় যে স্বামী মাধবানন্দের কাছে তাঁর জপ-ধ্যানের কোন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু যেহেতু আত্মত্যাগী ছিলেন তাই তিনি চাইতেন না যে তাঁর নিজের স্বার্থ মিশনের স্বার্থের পথে প্রতিবন্ধক হোক্।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আধ্যাত্মিক প্রধানরূপে জিজ্ঞাসুদের ধর্মোপদেশ দেওয়ার কাজ তাঁকে করতে হত। কিন্তু কেউ তাঁকে 'গুরু' বলে ভাবুক তা তিনি চাইতেন না। তার বদলে তিনি চাইতেন যে তাঁকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে কিছু বেশী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক ব্যক্তিমাত্র তারা মনে করুক। যাতে বড়জোর তিনি হয়ত কিছু কার্যকরী পথনির্দেশ দিতে পারেন যা তাদের পক্ষে উপকারী হতে পারে। একবার একটি যুবককে কেউ একজন তাঁর 'শিষ্য' বলে উল্লেখ করায় তিনি তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করেন। তিনি বলেছিলেন, "গুরু যদি কেউ হন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ আর আমরা সকলে তাঁর শিষ্য।" অনুরূপভাবে তাঁর কাছে কেউ উপদেশ চাইলে তিনি বলতেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এবং স্বামীজীর বাণী ও রচনা পড়। তোমার আধ্যাত্মিক জীবন সুদৃঢ় করতে যা কিছু জানা দরকার তার সবই তুমি সেখানে পাবে।" অথবা বলতেন, "ধর্ম সম্বন্ধে যা কিছু বলার তা বইতেই বলা হয়েছে। এখন দরকার শুধু তা অনুশীলন করা। ধর্ম সম্পর্কে যেটুকু জেনেছ বা বুঝেছ তাই অভ্যাস করতে চেষ্টা কর। বাকিটুকু আপনি-ই হয়ে যাবে।" কখনও বা আবার আপনার মঙ্গলের জন্য তিনি হয়ত আপনার কাছে এমন উপদেশের পুনরুল্লেখ করতেন যা হয়ত তিনি তাঁর নবীন বয়সের এক সংকটময় মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন সাক্ষাৎ শিষ্যের কাছে পথনির্দেশ চেয়ে পেয়েছিলেন। উপদেশদানে তাঁর অনীহার কারণ হল যে তাঁর উপর, অথবা প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে কারুর উপর কেউ নির্ভরশীল হোক—তা তিনি চাইতেন না। তিনি চাইতেন যে প্রত্যেকেই স্বনির্ভর হোক। তাঁর সুদীর্ঘ সন্ন্যাস জীবনে তিনি নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন, আধ্যাত্মিক বিষয়ে পরনির্ভরতা কিভাবে প্রায়শই গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে

দাঁড়ায়। তিনি চাইতেন বরং এমন আলোচনা হোক যেখানে উভয় পক্ষই খোলা মনে বলতে পারবে। এমন ধরনের মত বিনিময় হোক যেখানে কোন পক্ষের অপরকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টার কোন আভাস না থেকে নিঃসঙ্কোচে ভাবের আদান-প্রদান ঘটবে। তিনি বোধহয় বিশ্বাস করতেন অপরের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে নিজের বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনাবোধের সঞ্চার করতে এই [আলোচনাই] সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। আধ্যাত্মিক জীবনে অবাঞ্ছিত বাধাবিঘ্ন এড়াতে এই অভ্যাস অত্যন্ত অপরিহার্য। স্বভাবগতভাবে তিনি তর্ক করতে ভালবাসতেন এবং যুক্তি প্রয়োগের সময় প্রায়ই এমন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতেন যা তাঁর প্রকৃত উপলব্ধি ও বিশ্বাসের ঠিক বিপরীত হত। বোধহয় তিনি নিজে [আসলে] যা বলতে চাইতেন তা বলতে অপরকে উদ্দীপিত করতে তিনি এটা করতেন। ঐ ব্যক্তির চিন্তা ও অনুভূতিকে কোন কিছু প্রচ্ছন্ন না রেখে প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা দিতেন যাতে আলোচনাটি বাস্তবিক অর্থবহ হয়ে ওঠে। এইসব আলোচনাকালে স্বামী মাধবানন্দ তাঁর অন্তরের বিশাল ব্যাপ্তির কিঞ্চিৎ প্রকাশে, তাঁর পাণ্ডিত্য ও বোধশক্তির গভীরতায় এবং সেইসঙ্গে তাঁর ধী-শক্তির প্রখরতায় অনেক ঊর্ধ্বে উঠে যেতেন। প্রসঙ্গতঃ, তাঁর বুদ্ধিই ছিল তাঁর সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র। এই অস্ত্রাঘাত যে আপনাকে ঠিক আহত করত তা নয়, বরং দেখিয়ে দিত আপনার দুর্বল স্থানটি কোথায়। এতে আপনাকে হতবুদ্ধি করে দিত। আর যতই আপনি অপ্রস্তুত ভাব কাটাবার চেষ্টা করতেন ততই অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠত। তিনি হয়ত প্রতিপক্ষের বিড়ম্বনায় মজা পেতেন কিন্তু কখনও তার সুযোগ নিতেন না। বাস্তবিক যা লক্ষণীয় ছিল তা হল, এই ধরণের আলোচনাকালে তিনি তাঁর বয়স ও পদমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে এমনভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলতেন যেন আপনি আর তিনি সমান। আপনি হয়ত তাঁর সঙ্গে একমত হলেন না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর রূঢ় সমালোচনা করলেন, তাঁর সুচিন্তিত অভিমতগুলিকে কুসংস্কার বলে অগ্রাহ্য করলেন—কিন্তু তিনি তাতে কিছুমাত্র মনে করবেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি আপনাকে আরো বেশী পছন্দ করবেন যদি আপনি বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা করতে পারেন। তিনি সবসময় সরল এবং আন্তরিক অভিমতকে স্বাগত জানাতেন। এমনকি তা যদি প্রচলিত মতের ঘোরতর বিরোধী এবং তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের পরিপন্থীও হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধর্ম যা তাঁর কাছে এত প্রয়োজনীয় ও প্রিয় বস্তু ছিল আপনি হয়ত সেই ধর্মের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন। তিনি কিন্তু ধৈর্যচ্যুত হওয়ার বদলে আপনার সব আপত্তি খণ্ডন করতে চেষ্টা করতেন। আরো জোরালো যুক্তি দিয়ে ধীরে ধীরে আপনাকে এমন অবস্থায় আনতেন যে আপনি দেখতেন ঠিক সেই ধর্মীয় নীতিগুলিই আপনার মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই যেগুলি আগে আপনি

মূল্যহীন বলে খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি এটা করতেন যুক্তি প্রয়োগকালে তাঁর বয়স ও পদমর্যাদাজনিত গুরুত্বের কোন প্রকাশ না ঘটিয়েই। এমনকি ধর্মগ্রন্থ থেকে কোন উদ্ধৃতি ছাড়াই, কারণ ধর্মগ্রন্থের অবিসংবাদিতা আপনি নাও স্বীকার করতে পারেন। পরন্তু শুধুমাত্র ন্যায়নীতি ও সাধারণজ্ঞানের প্রয়োগে—প্রধানতঃ সেই ধরনের ন্যায়নীতি ও সাধারণ জ্ঞান যা আপনার পরিচিত এবং যার সাহায্য আপনি নিজেও নিয়ে থাকেন। নিঃসঙ্কোচে ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাঁর সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার ঝুঁকি যারা নিত সেরকম যেকোন ব্যক্তির কাছে তা ছিল এক মনোরম অভিজ্ঞতা। এই আলোচনা অবশ্যই বুদ্ধিদীপ্ত হতে হত। কারণ বোকাদের তিনি খুব কমই বরদাস্ত করতেন, ঠিক যেমন অহঙ্কারী ও অজ্ঞ লোকেরা তাঁর অসহ্য ছিল।

স্বামী মাধবানন্দের জীবনচর্যা ছিল সাদাসিধে, মিতব্যয়ী—এমনকি কঠোর। যেটা ছাড়াই তাঁর চলবে বলে তিনি মনে করতেন তা তাঁকে দিয়ে গ্রহণ করানো অসম্ভব ব্যাপার ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষরূপে তিনি যখন রেঙ্গুনে যান, আকাশপথে ভ্রমণকালে তিনি যা সঙ্গে নিয়েছিলেন তা হল একটি ছোট্ট এয়ারব্যাগ। কোন এক ব্যক্তি এতে বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, বিনা কারণে কেন তিনি বেশী মাল বইবেন যখন তাঁর যা প্রয়োজন—যথা বদলাবার মতো একপ্রস্থ পোষাক এবং একটা কি দুটো অন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ঐ ব্যাগেই ভরে নেওয়া যায়। রেঙ্গুনে দেখা গেল তিনি একজোড়া পুরনো, ক্ষয়ে যাওয়া চটিজুতো ব্যবহার করছেন। এক ব্যক্তি পুরনোটির বদলে নতুন একজোড়া চটিজুতো দেবার অনুমতি চাইল। স্বামী মাধবানন্দ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। লোকটি ভেবেছিল, সে যদি পুরনো চটিজুতোটি সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় নতুন জোড়াটি রেখে দেয় তাহলে হয়ত তাঁকে নতুন চটি গ্রহণ করাতে পারবে। সে তাই করল, কিন্তু ফলতঃ স্বামী মাধবানন্দকে এরপর খালি পায়ে হাঁটতে দেখা গেল! তাঁর পুরনো চটিজোড়াকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া সেই ভক্তটির তখন আর কোন গত্যন্তর রইল না। একজন সাধু ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য সাধারণ বাসে যাতায়াত পারতপক্ষে প্রায়ই এড়িয়ে চলতেন। একবার তিনি একটা ট্যাক্সি করে বেলুড় মঠে স্বামী মাধবানন্দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। অবিলম্বে কলকাতায় ফিরে যাবেন বলে তিনি ট্যাক্সিচালককে অপেক্ষা করতে বললেন। স্বামী মাধবানন্দ যখন শুনলেন যে সাধুটি ট্যাক্সি করে এসেছেন এবং ট্যাক্সিটিকে দাঁড় করিয়েও রেখেছেন তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। সাধুটিকে ভর্ৎসনা করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "এটা কি অপচয় নয়? আর কার অর্থ তুমি অপব্যয় করছ? তুমি কি জনসাধারণের টাকা নষ্ট করছ না? তোমার কি অধিকার আছে এরকম করবার?" জনসাধারণের অর্থ সম্বন্ধে তিনি এত সচেতন ছিলেন যে

যেখানে তাঁর মনে হত একটা পোষ্টকার্ডেই ভাল মতো কাজ চলে যাবে সেখানে খাম ব্যবহার করাও পছন্দ করতেন না। দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করে প্রত্যাবর্তন কালে তিনি লক্ষ্য করলেন যে তাঁর মোটা মোটা শীতের পোষাকগুলি তাঁর মালপত্র অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। যার ফলে বিপুল পরিমাণ বিমান শুল্ক দিতে হবে—যা দেওয়া মিশনের পক্ষে কষ্টকর। তখন যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু টাকা সাশ্রয়ের জন্য তিনি সেইসব ভারী শীতবস্ত্র গায়ে পরে নিয়েই যাত্রা করলেন। সমস্ত যাত্রাপথে এজন্য তাঁকে অত্যন্ত কষ্ট পেতে হল!

তাঁর অপরের প্রতি বিবেচনা ও সৌজন্যবোধের উল্লেখ এর আগেই করা হয়েছে। ১৯৬৫ * সালের মাঝামাঝি থেকে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং যত দিন যেতে লাগল তাঁর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে গেল। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ এই অসুস্থতা সংকটজনক অবস্থায় পেঁছিল। আরো ভালভাবে সেবাযত্ন ও চিকিৎসার সুবিধার জন্য তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হল। ১লা অক্টোবর যখন দুর্গাপূজা শুরু হল তখন তাঁর অবস্থা এত অবনতির দিকে যে আশঙ্কা হচ্ছিল যে কোনও মুহূর্তে অন্তিম সময় এসে যেতে পারে। আরো উৎকণ্ঠা ছিল পাছে তাঁর তিরোধানে পূজার অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিটি মুহূর্তই ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা। শেষ অবধি ৫ই অক্টোবর যখন পূজা শেষ হল তখন অনেকটা স্বস্তি পাওয়া গেল। মনে হয় অন্যদের চেয়ে স্বামী মাধবানন্দ নিজেই বেশী নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। পূজার কদিন কয়েক ঘণ্টা বাদে বাদেই তিনি খোঁজ নিচ্ছিলেন পূজানুষ্ঠান কতদূর হল। পূজা সাঙ্গ হওয়া অবধি মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য তিনি যে কঠিন সংগ্রাম করে চলেছেন তা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যদিও তাঁর অসুস্থতা এমনই অবস্থায় ছিল, যে কোন মুহূর্তে তিনি গভীর সংজ্ঞাহীনতায় ডুবে যেতে পারতেন। তাঁর চিকিৎসকদের পরম বিস্ময়াবিষ্ট করে তিনি অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সজ্ঞানেই থেকেছিলেন। মহাসমাধির মাত্র পাঁচ মিনিট আগে অবধি তিনি কথা বলেছেন, স্বভাবসিদ্ধ সরস মন্তব্যও করেছেন। দুর্গাপূজা সমাপনের পরের দিন সন্ধ্যায় অন্তিম সময় যখন সমাগত হল তিনি ধীরে ধীরে শান্তভাবে মহাসমাধিতে লীন হলেন। এমন সুখকর মৃত্যু কল্পনারও অতীত। তাঁর প্রয়াণ এমন ভাবে ঘটল যে কেবল পূজানুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল তাই নয় পরন্তু কাউকেই বিন্দুমাত্র অসুবিধায় পড়তে হল না। তিনি যেমন জীবনে তেমনই প্রয়াণে কারুর কোন অসুবিধার কারণ হলেন না।

---

* 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় প্রকাশিত মূল প্রবন্ধে এস্থলে ১৯৬৪ সাল মুদ্রিত হয়েছে।

কাজেই যিনি এই মন্তব্য করেছিলেন তিনি যথার্থই বলেছেন, "একজন মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণ ঘটল।"

উপরে বর্ণিত স্মৃতিকথাটি উপরে প্রকাশিত অনুবাদের থেকে ভিন্ন প্রকারে অনূদিত হয়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে প্রকাশিত 'সমাজশিক্ষা' পত্রিকার ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যায় 'একটি মহাজীবনের মহাপ্রয়াণ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ঐ অনুবাদ ঘোষপাড়া, হুগলী থেকে জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত 'স্মরণ-মনন' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

পুরাগত ছিন্নপত্র*

স্বামী নিরাময়ানন্দ

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ। কলকাতায় একটা ভাবের চাঞ্চল্য জাগছে শ্রীরামকৃষ্ণ-শত-বার্ষিকীর প্রস্তুতির মুহূর্তে। এমনি একটা ভাবের স্রোতে ভাসতে ভাসতে গিয়ে হাজির হই 'উদ্বোধনে'র উপকূলে। কাশীধাম থেকে এসেছেন স্বামী অরূপানন্দ—রাসবিহারী মহারাজ—শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত সেবক। চোখের ডাক্তারের কাছে তাঁকে নিয়ে যেতে হবে সন্ধ্যার পর। তখনও দিনের আলো আছে, পূজনীয় নির্মল মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দজী তদানীন্তন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সম্পাদক) এসেছেন, হাতে কিছু কাগজ-পত্রের ফাইল। তাড়াতাড়ি উপরে মায়ের ঘরে গেলেন প্রণামাদি সেরে সন্ধ্যার মুখেই বেরিয়ে পড়লেন। সেইসঙ্গে রাসবিহারী মহারাজও বেরুলেন, তাঁর সঙ্গে আমি। বাগবাজার ষ্ট্রীটে পড়ে দুইজনের কথাবার্তা শুরু হল :

"হ্যাঁ ভাই নির্মল, কোথায় চলেছ—ফাইলপত্র নিয়ে এই সন্ধ্যাবেলা?"—

"এটর্নির বাড়ি রাসবিহারীদা, মঠের পশ্চিমের জমিটা নেওয়া হচ্ছে—তারই পরামর্শ।"

রাসবিহারী মহারাজ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন, তারপর গম্ভীরভাবে বললেন' "আচ্ছা ভাই, আমরা যখন এসেছি তখন কি দেখেছি?—আর এখন যারা আসছে—তারা কি দেখছে?"

নির্মল মহারাজের সপ্রতিভ উত্তর : "যাদের যেমন ভাগ্য।"

রাসবিহারী মহারাজ বলে চলেছেন—কতকটা নিজের ভাবে : "আমরা এসে দেখলাম—জপ-ধ্যান, সাধন-ভজন—মনে আছে তো সব?"

"মনে থাকবে না কেন?—তার জোরেই তো চলেছি।"

"আর এখন এরা এসে কি দেখছে? টেবিল, চেয়ার, টাইপ-রাইটার হিসাব আর ফাইল। কি নিয়ে চলবে এরা?"

"তাহলে রাসবিহারীদা, আমিও বলি, যিনি এদের এনেছেন, তিনিই এদের চালাবেন। আমরা বলি না, আমাদের দেখে চলতে শেখো। আমরা যাঁদের কাছে এসেছিলাম তাঁদের সেই জীবন দেখে যতটা পেরেছি, শিখতে চেষ্টা

---

* স্বামী নিরাময়ানন্দ বিভিন্ন সময়ে মাধবানন্দজীর প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তা থেকে সংগ্রহ করে এই স্মৃতিকথা সংকলিত হল।

করেছি। শেষে তাঁরাই বলেছেন কাজ কর, ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ, তাঁদের আদেশ-নির্দেশ ভেবেই কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। জানি তাঁরা পেছনে আছেন—তাঁরা দেখছেন—তাঁরা দেখবেন।"

"আর এদের কি হবে? এরা তো তাঁদের ধ্যান-ভজনও দেখেনি; তাঁদের আদেশ-নির্দেশও পায়নি—শুধু কাজ করে করে শেষ পর্যন্ত এদের কি হবে?"

"রাসবিহারীদা, এদের কি আমরা ডেকে আনতে গিয়েছিলুম?—এরা এসেছে ঠাকুর-স্বামীজীর বই পড়ে, তাঁদের কথা শুনে, তাঁদেরই আকর্ষণে, তাঁদের আদর্শ ভালবেসে, তাঁদের কাজে জীবন-যাপন করবে বলে। এরাও কি কম?—এই ভাবই এদের চালিয়ে নিয়ে যাবে, আমাদের দেখে এদের শিখতে হবে না।"

দুজনেই গম্ভীর হয়ে পথ চলছেন। তখনকার দিনের কলকাতার জনবিরল পথে নিজেদেরই পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর নির্মল মহারাজ আবার বলে উঠলেন: "রাসবিহারীদা, গঙ্গোত্রী, হৃষীকেশ, হরিদ্বারে গঙ্গার জল স্বচ্ছ পরিষ্কার, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়ে, সে জল ঘোলা ময়লা, কতকিছু ভাসছে, তা বলে গঙ্গার পাবনীশক্তি তো কমে যায়নি।" বলতে বলতে আমরা শ্যামবাজারের মোড়ে এসে পড়লাম। তখন ২নং বাস ছাড়ত ভবনাথ সেন ষ্ট্রীটের মোড় থেকে; একটা গাড়ি প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। নির্মল মহারাজ টপ করে লাফিয়ে বাসে উঠে একটু হাত নেড়ে বললেন—"আজ তাহলে আসি রাসবিহারীদা।"

আমরা ডাক্তারের বাড়ির পথ ধরলাম। কিছুক্ষণ নীরবতার পর রাসবিহারী মহারাজ বললেন; "শুনলি সব কথা?—দেখলি কি প্রতিভা? বেলুড়ের গঙ্গায় হরিদ্বার হৃষীকেশের স্বচ্ছতা নেই, তা বলে পাবনীশক্তি তো কমে যায়নি।"

দেশ-কালের হিসাবে উৎস থেকে বহুদূরে চলে এলেও অবতারলীলার পাবনীশক্তি কমে না বরং বেড়েই চলে—যথা নদীর গতি সমুদ্রাভিমুখে।[১]

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ বা এপ্রিল মাসে…বিদ্যামন্দিরে এসে সবে যোগ দিয়েছি।…

২য় বর্ষের পুরনো ছেলেরা আমাকে দেখছে নিরীহ নবাগতরূপে—বিদ্যামন্দির জীবনের নানা অলিগলির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় এল নতুন বর্ষার বন্যার জলের মতো ১ম বর্ষের ছাত্রদল তাদের নিয়েই শুরু হল

১। 'উদ্বোধন', কার্তিক, ১৩৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী নিরাময়ানন্দ রচিত 'সমুদ্রের উপকূলে' শীর্ষক প্রবন্ধের পৃষ্ঠা ৪৬৯ ও ৪৭০ থেকে গৃহীত।

আমার বিদ্যামন্দির জীবন। তখন ছাত্রাবাস East and West ভাগাভাগি হয়নি। সমগ্রটা ছিল এক, প্রত্যেক তলায় ছিল প্রায় ১৬টি করে ঘর, শৌচাগার ছিল ১ নম্বর ঘরের কাছে। খাবার ঘর ছিল একটি, প্রার্থনাগৃহ ছিল কলেজ ভবনে গ্রন্থাগারগৃহে। আমাকে তখন দুবেলা 'Z'-এর মতো তিন তলার ছাত্রাবাস পরিভ্রমণ করতে হত। একদিন দুপুরে দেখলাম, তিনতলায় একটি ছেলে ১৬ নম্বর ঘর থেকে বার বার শৌচাগারের দিকে যাচ্ছে প্রায় দু-ফার্লং বারান্দা পেরিয়ে, অসুস্থ খুবই দুর্বল। আমি নিরুপায়। ধীরে ধীরে তাকে ঘরে পেঁছে দিলাম। একটি sick room-এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করলাম। সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে দোতলার দক্ষিণ-পূর্ব ঘরটিতে চারটি সিট করা হল, মীটসেফ, হীটার ইত্যাদিসহ। একজন ডাক্তারও নিয়োগ করা হল। আমরাও অবসর মতো সেই ঘরে গিয়ে বসতে লাগলাম—তার কিছুদিন পর পূজনীয় মাধবানন্দ মহারাজ আরোগ্য-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন, সেদিন আমার ভিত্তি পূজা করার সৌভাগ্য হয়েছিল। যখন পূজনীয় মহারাজের হাতে ভিত্তিস্থাপনের অর্ঘ্য দিচ্ছি তখন তিনি হাসতে হাসতে বলেন "দেখো নিরাময়ানন্দ, এখানে যারা আসবে, তারা যেন সব নিরাময় হয়ে ওঠে এবং আনন্দ লাভ করে।"[২]

শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকীর সময় মায়ের একখানি ছোট জীবনী লেখার প্রস্তাব সাতুদা-ই (স্বামী বীতশোকানন্দ, সহকারী সম্পাদক, শ্রীমা শতবার্ষিকী কমিটি) আমার কাছে করেন। পূজনীয় মাধবানন্দজী তা সমর্থন করেন, এবং নির্দেশ দেন একমাস দেড় মাসের মধ্যে—অর্থাৎ পূজার পূর্বেই পাণ্ডুলিপি দিতে হবে। পাণ্ডুলিপি তিনি নিজে সম্পাদনা করেন এবং বইখানি শতবার্ষিকীর মুখেই প্রকাশিত হয়।

এই আমি প্রথম দেখলাম—সম্পাদনা কাকে বলে। লেখকের লেখা যতদূর সম্ভব রেখে, ভাষা একটু অদল বদল করে ভাবটি ঠিক ঠিক ফুটিয়ে তোলার কায়দা দেখলাম। কালিতে নয়—পেনসিলেই মহারাজ সংশোধন করেছেন এবং বললেন : "তুমি যেসব সংশোধন মনে-প্রাণে মেনে নেবে, সেগুলিই কালি দিয়ে লিখে নেবে, বাকী সব রবার দিয়ে মুছে দেবে।" তাই সেই সম্পাদনার গুণেই 'শ্রীশ্রীমা সারদা' ছোট বড় সকলের কাছে আজও প্রিয়।

২। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির রজত জয়ন্তী বর্ষ (১৩৭৪), স্মারক পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামী নিরাময়ানন্দ রচিত 'কৈশোর স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ থেকে গৃহীত।

চার বছর পরে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব দেবার সময় পূজনীয় মহারাজ বলেছিলেন, "কি হাতে কলম পেলেই সকলের লেখা কাটতে হবে নাকি? Keep if you can, cut where you must. (যতদূর পারবে লেখকের লেখা রাখবে, যখন একান্তই প্রয়োজন তখনই কাটবে)।" মনে হয়, কথাগুলি সম্পাদকীয় রীতিনীতির মূল সূত্র।

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর সময় 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র সম্পাদনার ভার দিয়ে মহারাজ ডেকে পাঠিয়েছেন; যেতেই বললেন, "কি, কিরকম সব করবে কিছু ভেবে এসেছ তো?" 'ভারতে বিবেকানন্দ' নিয়ে গেছলাম, বললাম, "অনুবাদের ভাষা ও বানান সব আধুনিক করতে হবে।"

মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, বানান 'চলন্তিকা' অনুসরণ করবে। আর ভাষা, কিরকম কি পরিবর্তন করবে?" বললাম, "সমভিব্যাহারে, ভগবল্লাভাকাঙ্ক্ষী—এসব চলবে না।" "কি করতে চাও?" "সহজ কথা দিতে হবে, 'সমভিব্যাহারে' একেবারে অচল—'সঙ্গে' বা 'সহিত' করতে হবে। আর ভগবল্লাভাকাঙ্ক্ষীকে করতে হবে—'ভগবান লাভ করতে ইচ্ছুক বা ঈশ্বর-লাভেচ্ছু'।" প্রথম পৃষ্ঠা পড়তে পড়তে মহারাজ বললেন, "আচ্ছা, 'কিংকর্তব্য-বিমূঢ়' কি করবে?" দুজনে হেসে উঠলাম, বললাম, "কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাব।" এইরকম হাসি খুশির ভেতর দিয়েই এই গুরুগম্ভীর কাজের সূত্রপাত হল।[৩]

---

৩ 'উদ্বোধন', ১৩৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী নিরাময়ানন্দ রচিত 'সম্পাদক সমীপেষু' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ থেকে গৃহীত।

উপরে বর্ণিত স্মৃতিকথাটির তিনটি অংশ উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'প্রাণ পুরুষ' গ্রন্থের যথাক্রমে 'সমুদ্রের উপকূলে', 'কৈশোর স্মৃতি' ও 'সম্পাদক সমীপেষু' শীর্ষক প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া প্রথম অংশটি (সমুদ্রের উপকূলে) স্বামী চেতনানন্দ কর্তৃক অনূদিত হয়ে 'Work or Worship' শিরোনামে 'প্রবুদ্ধ ভারত', নভেম্বর, ১৯৭৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে এবং L. Saraswathi Devi কর্তৃক মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত "BLESSED DAYS OF ASSOCIATION WITH A SAINT 'MEMORABILIA' ET CETERA BY A DEVOTED ADMIRER" গ্রন্থেও সন্নিবেশিত হয়েছে।

পুণ্য অনুধ্যান

স্বামী নির্জরানন্দ

বেলুড় মঠ। গঙ্গার ধারে পুরাতন মঠবাড়ির দোতলায় স্বামী মাধবানন্দ একটি ছোট্ট ঘরে তক্তাপোষে উপবিষ্ট। একাগ্রমনে কি যেন লিখছেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলাম ঘরে। কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করে সস্নেহে তিনি আমাকে একটি মূল্যবান উপদেশ দিলেনঃ "সব কাজ করবে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কাজ, অথবা নিজের কাজ মনে করে।" আমি তখন মাত্র এসেছি শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে। মাধবানন্দজী তখন মঠ-মিশনের সহকারী সম্পাদক। ওঁর সম্পর্কে শুনেছিলাম—খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাশভারী সন্ন্যাসী। স্বল্পবাক্। তাঁর সামনে যেতে অনেকেই ভীত, সন্ত্রস্ত হতেন। আমি সেদিন প্রবল আগ্রহে, ভয়ে ভয়েই তাঁর ঘরে ঢুকলাম। মুখোমুখি হতেই ভয় কেটে গেল। এরপর মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে পেলে ডেকে কিছু ফরমাশ করতেন। আমি এজন্য নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করতাম এবং তিনি কড়া হলেও যে নবাগতদের প্রতি স্নেহপরায়ণ ও ভরসাস্থল ছিলেন—এটিও উপলব্ধি করেছি। যখন তিনি হেঁটে যেতেন, আমার মনে হত—একজন বিশিষ্ট সাধু যাচ্ছেন।

বৃথা বাক্যব্যয় পছন্দ করতেন না তিনি। অল্প কথায় সব বুঝে নিতেন এবং অল্প কথায় তাঁর বক্তব্যও বুঝিয়ে দিতেন। তিনি কখনও বৃথা বসে কালক্ষেপ করতেন না। হয় কোন কাজে রত থাকতেন, নয় লেখাপড়া প্রভৃতি নিয়ে থাকতেন। তিনি ছিলেন খুব বিদ্যানুরাগী। তাঁর নিজের জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি যে কোন ব্যক্তি, এমনকি বয়োকনিষ্ঠদের কাছেও শিখতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ। অনেক সাধুরা সেখানে গিয়েছিলেন। মাধবানন্দজী আমাকে ডেকে বললেনঃ "মঠের একটি Dispensary building তৈরী হবে। দেখাশোনা করার জন্য আপাততঃ কেউ নেই। তুমিই ওটি দেখাশোনা করবে। কেউ কেউ বলছিলেন, নতুন ছেলে, ও কি পারবে? আমার খুব বিশ্বাস তুমি পারবে।" আমি তার আগে কখনও ঐধরনের কোন কাজ করিনি এবং সে বিষয়ে কোনও প্রাথমিক জ্ঞানও ছিল না আমার। বাধ্য হয়েই কার্যভার গ্রহণ করতে হল। পরে, এ কাজে খুবই দক্ষ একজন সাধুকে পাওয়া গেলে আমাকে মাধবানন্দজী বললেন, "তোমার

কাজ ভালই হয়েছে শুনলাম।" তারপরে হল আমার কর্ম পরিবর্তন। আমার দৃঢ় ধারণা হল, আমাকে উৎসাহিত ও আমার আত্মবিশ্বাস উদ্বুদ্ধ করার জন্যই তিনি বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করছেন। একেই বলে নেতৃত্ব ও মহত্ত্ব।

যখন আমাকে Office work দেওয়া হল, তখন আমার কত ভুল ভ্রান্তি, ত্রুটি হয়েছে, তা আমি বুঝতে পারতাম। আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। মাধবানন্দজী যে আমার উপর অনেক কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার কারণ, আমার নতুন ব্রহ্মচারীর জীবনে তিনি আমার আত্মবিশ্বাস ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগাতে চেষ্টা করেছেন। কাজের অত্যধিক চাপবশতঃ একবার আমি বিদেশ থেকে প্রেরিত বহু টাকার একটি চেক হারিয়ে ফেলেছিলাম। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাচ্ছিলাম না। আমি তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও লজ্জিত। কিন্তু মাধবানন্দজী এতে আমার প্রতি কোন ক্রোধ প্রকাশ করে কিছুই বলেননি। অবশ্য পরে হারানো চেকটি পাওয়া গেল।

একবার একজন ব্রহ্মচারী রিলিফের উদ্দেশ্যে কাঁথিতে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। তার উপর অফিসের অনেক কাজের ভার। কিন্তু মাধবানন্দজী তাকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন, "কেউ কেউ আমেরিকা যেতে চায়, তুমি তো রিলিফে যেতে চাচ্ছ—এ খুবই ভাল। যাও রিলিফ করগে—স্বামীজীর মহিমা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করতে পারবে। আমি তো শুধু অ্যাপীল [রিলিফের কাজের জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন] লিখে লিখেই রিলিফ-এর কাজ করে গেলাম।" এ-ভাবেই তিনি সৎকাজে উৎসাহ দিতেন।

অনেক পরে—শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের প্রাক্‌কালে—যখন আমি অদ্বৈত আশ্রমে প্রকাশন বিভাগের তত্ত্বাবধানের কাজে ছিলাম—তখন 'Great Woman of India' গ্রন্থটি প্রকাশের কাজ চলেছে। মাধবানন্দজী উক্ত গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে অদ্ভুত পরিশ্রম করেছিলেন। উক্ত বিষয়ে তাঁর নির্দেশের জন্য মাঝে মাঝে বেলুড় মঠে তাঁর কাছে যেতে হত। একদিন যেতে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তাঁর ঘরের কাছে গিয়ে দেখি, ঘরের দরজা বন্ধ। ঘরের ভিতরে তিনি ধ্যানে বসতে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি টের পেলেন, বাইরে কে যেন অপেক্ষা করছে। জিজ্ঞেস করলেন "কে ?" আমি আমার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিলেন এবং আমাকে ঘরে ঢুকতে আদেশ করেই বললেনঃ "তোমার যখনই দরকার, চলে আসবে। আমার কাছে ঠাকুরের কাজ ও ধ্যানজপ সমান।" এ কথা শুনেই আমার মনে স্বামীজীর বাণী ও মহামন্ত্র—"Work is Worship"—উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মাধবানন্দজীর জীবনে এ মহামন্ত্র যেন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সাধুদের

প্রতি তাঁর উপদেশ ও বক্তৃতাদিতে তিনি অনেক বারই জোর দিয়ে বলতেন, "Should we forget the Swamiji's message: Work is Worship?" "Is" শব্দটিতে মাধবানন্দজী খুব জোর দিয়ে বলতেন। তাঁর বিশ্বাস ও অনুভূতি "Is" শব্দটির উচ্চারণে পরিস্ফুট হয়ে উঠত।

মাধবানন্দজী আহারে বিহারে ছিলেন মিতাহারী ও সংযত। তবে আহারের সময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদিত ভোগরাগাদির কিঞ্চিৎ অংশ হলেও চেয়ে প্রসাদরূপে গ্রহণ করতেন। বোধহয় উদ্দেশ্য ছিল, ভোগরন্ধনাদিতে কোনও ত্রুটি আছে কিনা স্বয়ং দেখে নেওয়া। ত্রুটি থাকলে তিনি সংশোধনার্থে পাচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

কোন জিনিষের বৃথা অপচয় একেবারেই পছন্দ করতেন না তিনি। হাত মুখ ধোয়ার সময় জলের কল সম্পূর্ণ খুলতেন না। অল্প অল্প করে খুলতেন এবং বন্ধ করে দিতেন। লেখাপড়ার কাজে তিনি পুরনো কাগজ, একপিঠে লেখা কাগজ এবং খামের পিছনের অংশ ব্যবহার করতেন যতটা সম্ভব। প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন কিছু তিনি গ্রহণ করতেন না। কেউ তাঁকে কিছু নিবেদন করলেও তিনি বিরক্ত হতেন।

বিলাসিতার যেমন তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন, তেমনি বেশভূষাদিতে বেশি কঠোরতাও পছন্দ করতেন না। সিভিক সেন্স ছিল তাঁর প্রবল। তিনি একবার বলেছিলেন, যখন বহু পূর্বে তিনি আমেরিকা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব প্রচার করে ভারতবর্ষে ফিরেছিলেন, একদিন কলকাতার রাস্তায় চলাকালে দেখতে পেলেন রাস্তার জলের কল খোলা থাকায় জল সবই পড়ে যাচ্ছে। তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উক্ত কলটি বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু পথচারীরা তা দেখে হাসতে লাগলেন।

মাধবানন্দজী কোন কাজে কলকাতার বাইরে গেলে এবং বেলুড় মঠে নিজ ঘরেও একটি জিনিষ ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। সেটি হচ্ছে সন্ন্যাসীদের কমণ্ডলু। রেলগাড়িতে ভ্রমণকালে তাঁর বিছানাপত্রাদি নিয়ে যেতেন সামান্য একটি সতরঞ্চিতে দড়ি দিয়ে বেঁধে, কোনও হোল্ড-অল ছিল না তাঁর।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনকল্পে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলেন না। কারণ, পক্ষে ও বিপক্ষে অনেকেই ছিলেন। মাধবানন্দজী স্বয়ং প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের পক্ষে দ্বিধাহীন সমর্থন জানিয়েছিলেন। কয়েকটি আলোচনা সভার পর পরিচালন সমিতি উক্ত প্রতিষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত করেন। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সহাধ্যক্ষ স্বামী অচলানন্দজী আমাদের কাছে বলেনঃ "দেখ, আমরা কিন্তু সিদ্ধান্ত করে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু নির্মল মহারাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে কাজটি শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীরই ইচ্ছা পূর্ণ করবে। অতএব তাঁর গভীর ও অটল

বিশ্বাসেই আমরা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেললাম।" একবার একজন সাধু মাধবানন্দজীকে প্রশ্ন করেন, "যদি রিলিফের কাজ করার কালে ভগবান লাভ না হলেও দেহত্যাগ হয়ে যায়, তাহলে কি গতি হবে?" তদুত্তরে মাধবানন্দজী তৎক্ষণাৎ দৃঢ়স্বরে বললেন: "আমার স্থির বিশ্বাস শ্রীশ্রীঠাকুর সেবককে নিজে হাত ধরে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন।"

অনেকেরই তখন ধারণা ছিল, মাধবানন্দজী শুধু কাজকর্মই পছন্দ করেন। কাজ ছেড়ে শুধু জপধ্যানাদি পছন্দ করেন না। সাময়িকভাবে শুধু জপধ্যানাদির উদ্দেশ্যে কেউ নির্জন স্থানে যাওয়ায় আগ্রহবান হলেও অনুমতি লাভের জন্য মাধবানন্দজীর কাছে যেতে তাই সাহস করতেন না। কিন্তু তাঁরা পরে মাধবানন্দজীর কাছে গিয়ে বুঝেছেন তাঁদের ধারণা ভুল। কেউ সত্যি সত্যি নির্জনে কিছুদিন সাধন-ভজন করতে চাইলে তিনি সানন্দে অনুমতি দিয়েছেন।

একদিন এক ব্রহ্মচারীকে মাধবানন্দজী বলেছিলেন: "তুমি বরং কয়েক মাসের জন্য হলেও হৃষীকেশে গিয়ে জপধ্যানাদি করে কাটিয়ে এস। তবে বেশিদিনের জন্য গেলে intensity কমে যাবে।" মাধবানন্দজী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এরূপ উপদেশ দেওয়ায় উক্ত ব্রহ্মচারী অত্যন্ত অবাক ও মুগ্ধ হয়েছিল। ব্রহ্মচারীর দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল যে, ঠিক ঠিক আন্তরিকতা থাকলে মাধবানন্দজীও শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় তদ্‌বিষয়ে অনুমতি দেন।

মাধবানন্দজী মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালে শেষের দিকে অন্যান্য কাজ সহকর্মীদের উপর ন্যস্ত করে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থ পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি তখনই দেখেছি 'কথামৃত' গ্রন্থ হাতে করে বসে আছেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন: "যা কিছু পড়েছি, জেনেছি—সবই বৃথা। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাই—পরম সত্য।" তখন তিনি ক্রমশঃ যেন অন্তর্মুখী। বাইরের কাজ কমে যাচ্ছে এবং জপধ্যানাদি বেড়ে যাচ্ছে। তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মযোগ সাধনার পরিণতি—শ্রীভগবদ্‌ পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ।

স্বামী মাধবানন্দের জীবনে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন: "ছোট কাজে বড় লোককে চেনা যায়।" মাধবানন্দজীর দৈনন্দিন জীবন ও লোকদৃষ্টিতে সামান্য কাজকর্মেই তাঁর মহান চরিত্র ফুটে উঠত। তাঁর সঙ্গে মতানৈক্য থাকলেও সকল সাধুদের নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র এবং আদর্শ সাধু। শোনা যায় শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন: "ত্যাগী সাধুর পাণ্ডিত্য থাকলে হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধার সমতুল্য হয়।" মাধবানন্দজী সম্পর্কে শ্রীশ্রীমা ঐ কথাটি ব্যবহার করেছিলেন বলে শুনেছি। আদর্শের প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল স্থির, তিনি ছিলেন সদা সচেতন, সদাজাগ্রত সন্ন্যাসী।

স্মৃতির আলোকে

স্বামী আত্মস্থানন্দ

ছাত্র জীবনে পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাই। যদিও তিনি খুবই অল্প কথা বলতেন এবং তাঁর সময় অতি অল্প ছিল আমাদের জন্য, তাও দেখেছি, তাঁর ব্যক্তিত্বে একটা কি শক্তি ছিল যা মানুষকে সহজেই বড় আপন করে নিত। তাঁর ওজস্বী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মধুর স্বভাব একটা মস্ত আকর্ষণ হয়েছিল প্রথম দর্শনের পর থেকেই। এইসব গুণ ছিল—অর্থ এই নয় যে প্রয়োজনে তিনি কঠোর হতেন না। দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ। কিন্তু তিনি ক্ষমাসুন্দরও ছিলেন।

তিনি যথার্থই বিদ্বান ছিলেন। কিন্তু তাঁর ততোধিক গৌরব ছিল বিনয়। তিনি যেমন পণ্ডিত ছিলেন তেমনিই ছিলেন নিরহঙ্কার—ছিলেন ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জ্বলন্ত মূর্তি। শ্রীশ্রীমায়ের কথা: "সন্ন্যাসী যদি বিদ্বান হয়, তাহলে হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানোর মতন।" এই কথার মর্ম, দৃষ্টান্ত পরম পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজীর জীবনে পরিস্ফুট।

তিনি সুদীর্ঘকাল সংঘনায়ক ছিলেন। কিন্তু তাঁর ছিল একান্তই ঈশ্বরার্পিত চিত্ত বুদ্ধি। কোন সন্দেহ নেই, তিনি গম্ভীরাত্মা পুরুষ ছিলেন। কিন্তু একথাও সত্য, কখনো-সখনো তাঁর ভিতরের চাপা বালক-স্বভাব ও শিশুর সরলতার প্রকাশ দেখতে পাওয়া গেছে তাঁর দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাট ঘটনার মধ্যে। সরল ও দীনহীন জীবনই ত্যাগীর জন্য। সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্ণধার স্বামী মাধবানন্দজীর জীবন এবিষয়ে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছোট একটা তোয়ালেও কাছে থাকার উপায় ছিল না। শাস্ত্রে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য, শাস্ত্র সিদ্ধান্তে ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ অধিকার। কিন্তু তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কর্মযোগীও। অপরদিকে তাঁর ভিতরে লুকিয়ে থাকত একটি পরম ভক্তও। তাঁর জীবন-চর্যা পরিষ্কার ইঙ্গিত করে সুন্দর যোগীর জীবন। সকাল-সন্ধ্যায় মন্দিরে তিনি যেভাবে প্রণামাদি করতেন, তা বহু সাধকহৃদয়ে প্রেরণা জোগায়। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণধী, আপাদমস্তকে যেন ছিল বুদ্ধির চমক। কিন্তু সব ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে সমর্পিত। এক কথায়, তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীশ্রীমা—স্বামীজীর একজন চিহ্নিত ব্যক্তি।

আর স্মৃতির মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে আছে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি। বললেন, "বসিয়ে দাও, বসিয়ে দাও।" "বসলেই কষ্ট হবে মহারাজ—বমির

স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী আত্মস্থানন্দ। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনে অবস্থানকালে গৃহীত চিত্র।

"স্বামী মাধবানন্দজী স্বামী নির্বাণানন্দজীকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত আমাদের কয়েকটি শাখাকেন্দ্র পরিদর্শনের পরে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।" —পৃষ্ঠা ২৪৫

স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ এবং পশ্চাতে স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ—১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে সানফ্রানসিস্কো বিমানবন্দরে গৃহীত চিত্র।

ভাব হবে—বেশ তো আছেন। এমনিই বিশ্রাম করুন”—সেবক বললেন। “না, বসিয়ে দাও, বসিয়ে দাও।” সেবক আবার আবেদন করলেন, “না, মহারাজ, আপনার যে বড় কষ্ট হয় বসলে।” উত্তরে গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিলেন, “তোমার মাথায় কিছু নাই, শরীর চলে যাচ্ছে, প্রাণ চলে যাচ্ছে—আর তুমি বসাতে চাচ্ছ না। বসিয়ে দাও।” নিরুপায় সেবক ধীরে সন্তর্পণে তাঁকে বসিয়ে দিলেন। ঐ ঘর নীরব। এক অপূর্ব পরিবেশ। নির্নিমেষ নেত্রে পূজ্যপাদ মহারাজজী শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়ের পটের দিকে দেখছেন। সে কি দেখা, সে কি দৃষ্টি, সে কি চাউনি! ঐ দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল কি ভক্তি, প্রীতি ও শরণাগতি! ঐ মৌন অপলক দৃষ্টিতে কি কথা হচ্ছিল ভক্ত ও ভগবানে কে জানে? বেশ কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী, সেবক তাঁর চারিপাশে। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ, যেন বিবশ। এমনি কয়েক মিনিট চলার পর বললেন, “ব্যস্, হয়ে গেছে। এবার শুইয়ে দাও।” পাশ ফিরে শয়ন করলেন—কষ্ট হল, বমি হল। উচ্চারিত হল—“মা” “মা”। জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হল। মহাভাগ্য তাঁদের যাঁরা মহারাজজীর বিদায় নেয়া দেখেছেন।

স্বামী মাধবানন্দ এবং সারদা মঠ*

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দকে চিরকাল একজন মহাপুরুষের মতোই শ্রদ্ধাভক্তি করেছি। তাই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়া বড়ই কঠিন। এ বিষয়ে সিস্টার নিবেদিতাই একজন আদর্শ লেখিকা। 'The Master as I saw Him' পুস্তকে দু-এক জায়গা ছাড়া তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন রেখে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি অনবদ্য রচনা সৃষ্টি করে গেছেন। কিন্তু আমার মতো সাধারণের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দ সাধারণতঃ নির্মল মহারাজ বলেই পরিচিত ছিলেন। আমি তাঁর কথা শুনেছিলাম এবং ১৯৪১ সাল থেকে কয়েকবার প্রণাম করবার সুযোগও হয়েছে। কিন্তু কাছে যাওয়া বা কথাবার্তা বলার সৌভাগ্য হয়নি। তিনি তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক। শুনতাম খুব কড়া, অসহিষ্ণু এবং রাগী প্রকৃতি। আমরা কিন্তু কখনো তাঁকে সেরকম দেখিনি। সাধারণতঃ তাঁর কাছে সহসা কেউ যেতে সাহস করত না, যদিও তাঁর প্রতি সকলের বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল।

১৯৪৬ সালে মে মাসের একেবারে শেষের দিকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হল। কয়েক বছর আগে আমরা একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলাম যেখানে তরুণী মেয়েরা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একত্রে বসবাস করতেন। একদিন আমি আশ্রমের একজন সদস্যার সঙ্গে মঠে যাই। স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দিরের সামনে গাছের নিচে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় পূজনীয় প্রিয় মহারাজ (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) সেখানে এলেন। আমরা প্রণাম করলাম। পূজনীয় প্রিয় মহারাজের অহেতুক স্নেহ ছিল আমাদের উপর। আমাদের আশ্রমজীবন সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখতেন, চাইতেন আমাদের উন্নতি হোক, দু-একটি কথার পর বললেন, "নির্মল মহারাজকে চিনিস?" আমি উত্তর দিলাম—"দেখেছি কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় নেই।" উনি বললেন, "আমার সঙ্গে চল, আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, এরপর আশ্রম সম্বন্ধে ওঁর কাছেই উপদেশ, পরামর্শাদি নিবি।" আমরা ওঁর সঙ্গে সেই প্রথম দোতলায় নির্মল মহারাজের ঘরে গেলাম। উনি খাটের

---

* শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'নিবোধত', চৈত্র, ১৩৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্বামী মাধবানন্দের স্মৃতিকথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

কাছে পশ্চিম দিকে দেওয়ালের পাশে ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। ঐভাবে ঐঘরে তাঁকে বহুদিন দেখেছি। হয় কোন বই পড়ছিলেন অথবা প্রুফ দেখছিলেন—যেমন সবসময় তাঁকে দেখা যেত। পূজনীয় প্রিয় মহারাজ আমার পিতার নাম করে পরিচয় দিয়ে বললেন—"এ তাঁর বড় মেয়ে।" যেহেতু আমার সঙ্গে আমার পিতার চেহারার খুব সাদৃশ্য ছিল পূজনীয় নির্মল মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সে তো ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।" পূজনীয় প্রিয় মহারাজ বললেন, "ওরা একটা আশ্রম করেছে। আমি বলেছি আপনার কাছে এসে আশ্রম সম্বন্ধে পরামর্শ ও উপদেশ নিতে।" বললেন, "বেশ তো, তবে কি আর পরামর্শ দেব ? নিজেরাই ঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শমতো চলবে। পাবলিকের কাছে টাকাকড়ি নিলে তার পাইপয়সার যথাযথ হিসেব রাখবে।" তখন থেকেই হিসেবের কথাটা মাথায় ঢুকে গেল। আরো দু-চার কথা বলেছিলেন। পূজনীয় প্রিয় মহারাজের কাছে আমার অনন্ত কৃতজ্ঞতা। তিনি এমন একজনের কাছে নিয়ে গেলেন যাঁর কাছ থেকে জীবনে বহু স্নেহ ও প্রেরণা পেয়েছি যা আমার মতো সাধারণের পক্ষে নিতান্তই দুর্লভ।

আমরা বেশ কয়েকজন মেয়ে বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের একটি ভাড়া বাড়িতে আশ্রম গড়ে তোলবার চেষ্টা করছিলাম। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবন যাপনেরও আকাঙ্ক্ষা ছিল। উদ্দেশ্য—স্বামী বিবেকানন্দ পরিকল্পিত মেয়েদের মঠে জীবন অতিবাহিত করা। 'স্বামী-শিষ্য সংবাদে' ঐ বিষয়ে জানবার পর থেকেই একটা তীব্র বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত ছিল। মহারাজের সাক্ষাৎলাভের পর আশ্রমে ফিরে পর্যন্ত নানা চিন্তা মনকে আলোড়িত করতে লাগল। মনে দৃঢ় বিশ্বাস হল, তিনি যখন সমগ্র মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক তখন যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁরই উপর নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, মঠ-মিশনের সাংবিধানিক ব্যাপার সম্পর্কে বিশেষ ধারণা ছিল না। মনে হল সাক্ষাতে কথাবার্তার চেয়ে লিখিতভাবে সব জানানোই ভাল। নানা চিন্তার পরে ৪৬ সালের ৪ঠা জুন তাঁকে একখানা দীর্ঘ পত্র লিখি। পত্রের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য—আমরা চোদ্দ জন মেয়ে স্বামীজীর আদর্শে সংঘবদ্ধ-ভাবে জীবনযাপন করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। নিজেরাই সব করতে আগ্রহী, কেবল আপনাদের সাহায্য ও উপদেশ প্রার্থনা করি যাতে সকলে ভাবী মঠের সদস্যা-রূপে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হতে পারি। কারো সঙ্গে পরামর্শ করে এই চিঠি লেখা নয়, আমার নিজের মনের ধারণা অনুযায়ী লিখেছি ইত্যাদি।

পত্রের শেষে তাঁর কাছে ব্যক্তিগত আবেদন ছিল—যিনি মঠ ও মিশনের কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, শত শত নরনারী যাঁর সহানুভূতি ও আশীর্বাদ লাভ করে এবং যিনি মঠ-মিশনের সকল কেন্দ্রগুলির সর্বপ্রকার উন্নতিসাধনে সচেষ্ট, মেয়েরাও তাঁর স্নেহ, সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে না এবং তিনি নিশ্চয় তাদের

সম্বন্ধে চিন্তা করবেন ও তাদের জন্য মঠস্থাপনে তৎপর হবেন।

বলা বাহুল্য, পত্রখানিতে যথেষ্ট ধৃষ্টতা প্রকাশ পায় এবং পরে সে কথা মনে করে লজ্জাবোধও করি। কিন্তু পত্রটি লিখে ভাবলাম আমার পক্ষ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। শীঘ্রই তাঁর কাছে যাবার ইচ্ছা করছিল এবং কতকটা ঝোঁকের মাথায় ১১ই জুন মঠে গেলাম। ভেবেছিলাম মহারাজ চিঠি পেয়ে নিশ্চয় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই মনে সঙ্কোচ ও ভয় ছিল। মহারাজ কিন্তু কোনপ্রকার বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। তাঁর অসীম ধৈর্য ও উদারতা বিস্ময়কর। আমি নগণ্য একজন মেয়ে, তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক! ধৈর্যের সঙ্গে তিনি এক ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে আমার কথা শুনলেন। আমার তো একই কথা—মেয়েদের মঠ কেন হচ্ছে না? স্বামীজী একজন মহিলাকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন, তবে তাঁরা কেন দেবেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু যুক্তি। মহারাজ উত্তরে দৃঢ়ভাবে সব যুক্তিগুলি খণ্ডন করেন। তাঁর কথার সংক্ষিপ্তসার—ঠাকুরের ইচ্ছা হলেই সব হবে। মেয়েদের উপযুক্ত হতে হবে। ফুল তোলা, মালা গাঁথা মেয়ে হলে চলবে না। তাদের নিজেদের সব করে নিতে হবে। স্বামীজী যে একজন মেয়েকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন তা বিশেষ happy হয়নি, পরে তার কি হয় জানা নেই ইত্যাদি। মন খারাপ নিয়ে ফিরে আসি।

মঠে যাতায়াত করি। মহারাজ বেশ প্রসন্নভাবে কথা বলেন। একদিন গেছি। বি. এ পরীক্ষার ফল বেরোবার সময় হয়ে এসেছে। আমি পূর্বেই খবর পাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি এবং তাঁকে জানাই। উনি হঠাৎ ব্যগ্রভাবে বলেন—"আগে বি. টি. পড়ে নাও পরে এম. এ. পড়লেই হবে।" আমি খুবই অবাক। বি. টি. পড়ার ইচ্ছা একেবারেই ছিল না কারণ শিক্ষয়িত্রী হব না বা স্কুলে পড়াব না—এ বিষয়ে মনোভাব খুব দৃঢ় ছিল। কিন্তু মহারাজের আদেশ পালন করবার জন্যই স্কটিশ চার্চ কলেজে বি. টি. তে ভর্তি হলাম। ২৮শে জুলাই বেলুড় মঠে গেলে মহারাজ খুব উৎসাহ দিলেন। বি. এ.-র ফল আশানুরূপ হয়নি, সেজন্য মন খারাপ করতে বারণ করলেন। তবে বি. টি.-তে খুব খাটতে বললেন। ঐদিন তরুদেবী (আশ্রম আবাসিকাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা ও পরে প্রব্রাজিকা শুভাপ্রাণা) আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁকে বললেন—ন-দশ মাসের জন্য আশ্রমের অন্যান্য কাজ থেকে আমাকে ছেড়ে দিতে। আমি মেয়েদের মঠের কথা তুলতেই উনি হেসে বললেন—"মেয়েদের মঠ যদি কখনো হয়, তবে অন্য সব সদস্যারা তোমাকেই তাদের অধীন করে রাখবে।" আমি বললাম—"তা রাখলেই বা, মেয়েদের মঠ তো হবে!" আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে উনি এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন।

২০শে সেপ্টেম্বর বিশেষ করে পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দজীর (মঠের

তদানীন্তন অধ্যক্ষ) সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি ১৪ই সেপ্টেম্বর মঠে এসে পৌঁছান শ্যামলাতাল থেকে। পূজনীয় মহারাজজীর মেয়েদের মঠ সম্বন্ধে খুবই উৎসাহ। কিন্তু তাঁর অক্ষমতার কথাও জানিয়ে বললেন—"সকল ট্রাস্টির মত ছাড়া কিছু হয় না।" এবার মাধবানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করে বললাম—"পূজনীয় মহারাজের মত আছে। আপনি মত দিলেই হয়।" মহারাজ বললেন—"তা কি হয় ? আমি বললেই কি হয় ?" আমি জোর করে বললাম—"আপনি একবার (মেয়েদের ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস ব্যাপারে) মত দিয়ে দেখুন না ?" উনি হাসতে হাসতে বললেন—"এ কি রাশিয়া পেয়েছ যে, স্ট্যালিন যা বলবে তাই ! এসব ডেমোক্রেসির ব্যাপার। সকলের ভোট চাই। তোমাদের আশ্রমে কি তোমার একার মতে কাজ হয়, না অপরের মতামত নাও ?" ঐদিন কথায় কথায় আশ্রমের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। খরচ চালানো ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠছিল। মঠ থেকে কি কিছু সাহায্য পাওয়া যায় না ? (উদ্দেশ্য কিন্তু এইভাবে মঠের সঙ্গে একটা যোগাযোগ স্থাপন)। মহারাজ বললেন, যদি সম্ভব হত তাহলে নিশ্চয় তিনি করতেন। তারপর বললেন—"খুব struggle কর, নিরাশ হয়ো না। দেখ না কতদূর কি হয়" ইত্যাদি। ঐদিনকার কথাবার্তার পর তিনি আমার পিতার হাত দিয়ে আশ্রমের জন্য পঞ্চাশ টাকা ব্যক্তিগত সাহায্য পাঠান। বলেছিলেন, "আমার তো টাকাকড়ি নেই, তাই খুব একটা সাহায্য করা সম্ভব নয়। সামান্য একটু সাহায্য ওদের জন্যে।" এটা যে তাঁর ব্যক্তিগত দান, বেলুড় মঠের পক্ষ থেকে নয়, বিশেষভাবে একথা জানিয়ে দিতে ভোলেন নি।

বলা বাহুল্য, তাঁর প্রদত্ত পঞ্চাশ টাকা আমার কাছে পাঁচ হাজারের মতোই মনে হয়েছিল। আমার বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ় হয়, তিনি আমাদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন হচ্ছিলেন।

প্রথমাবধিই তদানীন্তন অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন এবং আশ্রমজীবন যাপনে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ১৯৪৬ সালের সন্ন্যাসী-সম্মেলনে সভাপতির বক্তৃতায় অন্যান্য কথার পর তিনি বলেন ঃ

"সংঘপরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির মহিলা কর্মীদের সমস্যার প্রতি এতদিন আমাদের যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয়নি। এ পর্যন্ত সংঘের ভিতরে থেকে প্রকৃত সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপনের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত। শত শত নারী সংসার ত্যাগ করে মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তাদের দাবী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুরূপ মহিলাদের নিয়ে ধীরে ধীরে কোনপ্রকার সংস্থান ব্যতীত অথবা স্বল্প সংগতি নিয়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেসব মহিলাকর্মী সংঘের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তোমাদের

কাছ থেকে তারা যেন সাগ্রহ (careful) সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনা লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল যে, স্বামীজী একটি স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং এর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন পুরুষদের মঠ থেকে। তাঁর একাধিক পত্রে এবং আমাদের মঠের নিয়মাবলীতে এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বারবার ব্যক্ত করেছেন। তারপর অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্তপ্রায়। এখন আমাদের উচিত কাজটিকে আরম্ভ করে দেওয়া। আমি নিশ্চিত, কোন কিছুর অভাব হবে না এবং স্ত্রীমঠের পরিপূর্ণ সার্থকতা কেউ রোধ করতে পারবে না।"

স্বামী বিরজানন্দ প্রকাশ্যে স্ত্রীমঠের সমর্থন করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে আমি বিশেষ উৎসাহ বোধ করি। ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে যায়। এই সময় 'সন্ন্যাসে হিন্দু নারীর অধিকার'—এই নামে একটি প্রবন্ধ বর্তমান লেখিকার নামে 'উদ্বোধন', ভাদ্র ১৩৫৩ (ইং ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে) প্রকাশিত হয়। এই নিয়ে মঠ-মিশনে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। ১৯৪৬ সালে ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। সেই ভয়ানক ঘটনার কথা হয়ত অনেকেরই মনে আছে। তিন দিন ধরে সর্বত্র একটা নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চলে এবং এর ফলে সহজভাবে যাতায়াত করা খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। অবশ্য তারপরেও আমরা মঠে গেছি। কিন্তু একা যাওয়া বহুদিন সম্ভব হয়নি। পূজার পর ৮ই অক্টোবর আমি কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসে (স্টুডেণ্টস হোম) স্বামী নির্বেদানন্দের সঙ্গে দেখা করি। উনি বরাবরই আমাদের উৎসাহ দিতেন, স্নেহ করতেন এবং মাঝে মাঝে আশ্রমে এসে মূল্যবান নির্দেশ দিতেন। সেদিন দেখলাম বেশ গম্ভীর। পরে আমাকে খুবই কঠোরভাবে তিরস্কার করেন। তাঁর কথা শুনে মনে হল ঐ প্রবন্ধে আমরা যেন মঠ-মিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছি। বেশ উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন—"তুমি আর আমাদের কাছ থেকে সহানুভূতি ও সাহায্য আশা করতে পার না।" আমি তাঁর কথাবার্তায় হতভম্ব হয়ে গেলাম, মনেও খুব আঘাত লাগল। এরপরও আমি বললাম—"আমরা তো আপনাদের কাছে সর্বক্ষণ সাহায্যই প্রার্থনা করি। সুতরাং সমালোচনা অথবা অভিযোগ করবার কথা কি করে ভাবতে পারলেন!" আমাকে একটু বিষণ্ণ দেখে তিনি অপেক্ষাকৃত নরম হয়ে আশ্বাস দিলেন—"আমি তোমাদের শুভানুধ্যায়ী, স্নেহ করি। তোমাদের আশ্রমের যাতে ভাল হয় তাই তোমাকে ঐ বিষয়ে বিশ্বাস করে অনেক কথা বলি।" আরো বললেন, যতদিন আমরা আদর্শের প্রতি যথাযথ অনুগত থাকব, ততদিন তিনিও আমাদের সমর্থন করে যাবেন। আমি তখন সাহস করে বলি—"নির্মল মহারাজও কি রাগ করেছেন?" তখন ওঁর রাগটা যে বিলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে তা বুঝতে পেরে বললেন—"সে কথা তাঁকে জিগ্যেস কর, না, তিনি রাগ করেননি, আমিও

রাগ করিনি, তোমাদের উপর কি রাগ করব !”

পরদিনই ৯ই অক্টোবর বেলুড় মঠে যাই। নির্মল মহারাজকে যখন প্রণাম করতে গেলাম, তিনি বললেন—“এক article লিখে তো দেখছি বেশ হাঙ্গামা বাঁধিয়ে বসে আছ ! আচ্ছা যাও, আগে প্রসাদ পেয়ে এস, তারপর ধীরেসুস্থে সেসব কথা হবে।” আমার সঙ্গে আরেকজন ছিলেন। দুপুরবেলায় আমরা আবার ওঁর ঘরে গেলাম। প্রবন্ধটি নিয়ে নানারকম আলোচনা হল। নানা জায়গা পড়ে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং বললেন, ওঁদের পত্রিকায় ওটি ছাপা উচিত হয়নি। ওঁর ধারণা হয়েছিল আমি কারো পরামর্শ ও নির্দেশমতো প্রবন্ধটি লিখেছি। আমি অকপটে স্বীকার করি, একজন কিছু কিছু suggestion বা নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু আমি নানা বই পড়ে সম্পূর্ণ নিজের ভাবে লিখেছি। তারপর জিজ্ঞাসা করি—“আপনি অসন্তুষ্ট হননি তো ?” উনি বললেন—“অসন্তুষ্ট আর কি হব !” আমি বললাম—“পূজনীয় অনাদি মহারাজ খুব বকেছেন।” উনি একটু সহানুভূতির সঙ্গে বললেন—“না বকাবকির কথা নয়, তবে এই সময় আমাদের পত্রিকায় প্রবন্ধটি বার করা ঠিক হয়নি।” পরে জানতে পারি যে, তিনি নাকি অনুমোদনই করেছেন। অনেকের রাগের কারণ পরে বুঝেছিলাম। আমি লেখাটি তিন-চার মাস আগে উদ্বোধনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী আত্মবোধানন্দের কাছে দিয়ে আসি। তারপর সম্ভবতঃ মে অথবা জুন মাসে নিবেদিতা স্কুলে যেসব মহিলাকর্মীআগে থেকেই ছিলেন, তাঁরা সকলেই মিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর ঘটায় স্কুল ত্যাগ করে চলে যান, একমাত্র বিজলীকে (প্রব্রাজিকা বিদ্যাপ্রাণা) রেখে ! তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন মিশন কর্তৃপক্ষ খুব মুশকিলে পড়ে যাবেন বিদ্যালয় খোলার পর। কিন্তু ইতিমধ্যে স্কুলের ভার গ্রহণ করেন রেণুকা বসু (প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা)। স্বামী বোধাত্মানন্দ তখন নিবেদিতা স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি আমাদের আশ্রম থেকে কল্যাণী (প্রব্রাজিকা শুদ্ধাপ্রাণা) ও মায়াকে (প্রব্রাজিকা নিত্যপ্রাণা) একবছরের জন্য ওখানে রাখার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং ‘সারদা মন্দির’ নামক নিবেদিতা স্কুলের আশ্রম বিভাগে কর্মীদের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল এবং প্রধানা শিক্ষয়িত্রীরূপে কাজ করতে লাগলেন যিনি, তিনি কোনরূপ পারিশ্রমিক না নিয়ে আশ্রমবাসিনীরূপে রইলেন। ফলে যা আশঙ্কা করা হয়েছিল—স্কুল বন্ধ করে দিতে হতে পারে, বাস্তবে তা কিছুই হয়নি। সুতরাং অনেকেরই মনে হয় পুরনো দল চলে যাওয়াতে মিশন কর্তৃপক্ষই দায়ী এবং আমিই যেন ঐ প্রবন্ধে তার সমালোচনা করছি।

২৯শে জুলাই বি. টি. পরীক্ষার পর যখন মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাই, পরীক্ষার কথাবার্তার পর আশ্রম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। আশ্রমের প্রয়োজনে বাড়ির কথা উঠল। বললেন—“ঠাকুরের উপর নির্ভর করে প্রাণপণে চেষ্টা করে

যাওয়াই আমাদের উচিত! যদি না হয়, দুঃখ করবার কিছু নেই।" ঐ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, আমি বলি—"ঠাকুরের ইচ্ছা ছাড়া তো কিছু হবে না। অতএব তাঁর ইচ্ছাই মেনে নিতে হবে।" উনি খুব শান্তভাবে বললেন—"তা নয়, ঠাকুরের ইচ্ছা শান্তভাবে, প্রসন্ন মনে ও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। সেটাই হল complete resignation (পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন)।"

১৯৪৭ সালে একবার স্বামী বোধাত্মানন্দ (নিবেদিতা স্কুলের তদানীন্তন সেক্রেটারী) চেষ্টা করেন যাতে আমরা সকলে নিবেদিতা স্কুলে যোগদান করি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, নিবেদিতা স্কুলে আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে প্রকৃত মনোভাব ও মতামত জানিয়ে পরিষ্কার করে তাঁকে একটি চিঠি লিখতে। তাই লিখেছিলাম। তাতে লেখা ছিল—আমরা মিশনে যোগদান করে তাঁদেরই অধীনে স্বামীজীর আদর্শমতো কাজকর্ম করতে চাই। তবে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন তাঁরা যেন স্বামীজীর নির্দেশমতো মেয়েদের সন্ন্যাসাদির ব্যবস্থা করে মেয়েদের মঠ গড়ে তুলতে যত্ন নেন।

পরে শুনেছিলাম, আমার ঐ পত্র ট্রাস্টিদের অনেকের পছন্দ হয়নি। তাঁরা বলেন—"আগে তো ওরা যোগদান করুক, তারপর দেখা যাবে।" স্বামী মাধবানন্দ কিন্তু বলেছিলেন—"না, ওদের ঐভাবে যোগ দিতে বলা ঠিক হবে না।"

স্বামী নির্বেদানন্দের পরামর্শ অনুযায়ী স্বামী বোধাত্মানন্দ আমাকে ঐরূপ চিঠি লিখতে বলেন। স্বামী নির্বেদানন্দ একদিন স্কুলে আমাকে ডেকে দুঃখিতভাবে বললেন—"আমি নিজে এই ব্যাপারে হাত দিলে এরকম হত না, যাই হোক ঠাকুরের ইচ্ছায় ভবিষ্যতে আবার যোগাযোগ হবে।"

ইতিমধ্যে স্বামী মাধবানন্দ আমাকে এম. এ. পড়বার কথা বলেছিলেন। মাষ্টারমশাইয়ের কথার উদাহরণ দিয়ে বললেন—institution (প্রতিষ্ঠান) গড়ে তুলতে গেলে একটা ডিগ্রী থাকলে কাজের সুবিধা হবে, লোকের বেশি দৃষ্টি পড়বে। তাঁর অভিমত ছিল আমি প্রাইভেটে পড়ব। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি, ইউনিভার্সিটিতে পড়বার ব্যবস্থা করতে হয়। এরপর ১৯৪৮ সালে আশ্রমের একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। ক্রমশঃ আশ্রমের কাজের পরিধিও প্রসারিত হয়ে চলল। শ্রীমতী লিজেল রেমণ্ডের (যিনি মঠে মিসেস জিন হারবার্ট নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন) সঙ্গে যোগাযোগ হয় এবং তাঁর মাধ্যমে আমেরিকান ভক্ত মিস্টার গ্লেন ওভার্টুনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তিনি খুব অভিভূত হয়েছিলেন আমাদের আশ্রম দেখে এবং সাহায্য করতেও এগিয়ে আসেন। বাগানসহ একটা বড় বাড়ি ল্যান্সডাউন রোডে ভাড়া নেওয়া হয়। স্থির হয় শ্রীমতী রেমণ্ডও আমাদের সঙ্গে থেকে সিস্টার নিবেদিতার উপর গবেষণা করবেন। মিস্টার ওভার্টুন নিজে প্রতিমাসে একশ ডলার (তখন

তিনশ টাকা) দেন এবং হলিউড কেন্দ্রের স্বামী প্রভবানন্দকে অনুরোধ করেন তিনিও যেন প্রতিমাসে একশ ডলার করে সাহায্য করেন। স্বামী প্রভবানন্দ তৎক্ষণাৎ রাজি হন। পরে জানতে পারি, আমাদের আশ্রমে ঐ সাহায্য দানের পূর্বে তিনি স্বামী মাধবানন্দের অনুমোদন নিয়েছিলেন। মিঃ গ্লেন ওভার্টন এবং আরো কয়েকজন চাইছিলেন আশ্রমটিকে 'রেজিস্টার্ড' করে একটি আবেদন প্রকাশের দ্বারা টাকা তোলবার চেষ্টা করা হোক। এত দ্রুত সব পরিবর্তন ঘটে গেল—সেই সম্পর্কে ১০ই এপ্রিল, ১৯৪৮ সালে স্বামী মাধবানন্দের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা কথাবার্তা হয়। রেজিস্ট্রি সম্বন্ধে বললেন—"ভাল উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করবে যাতে মঠ যদি কখনও আশ্রমটিকে স্বীকৃতি দেয় তাহলে ঐ রেজিস্টার্ড বডি ভেঙে দেওয়া যেতে পারে।"

ঐদিন তিনি মেয়েদের মঠ সম্বন্ধে নানা সমস্যা ও অসুবিধার কথাও বলেন যা যুক্তিসঙ্গত ঃ

সব মেয়েদের নিয়ে একত্র চালাবার মতো অন্তত একজনের আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকা দরকার। শুধু intellectuals দ্বারা হয় না। মা-ঠাকরুণ অথবা তাঁর কোন শিষ্যা ঐ কাজ করে গেলে খুব সহজ হত। শ্রীশ্রীঠাকুরের পর তাঁর সন্তানগণই মঠস্থাপন করে যাওয়ায় তাঁদের প্রবল আধ্যাত্মিকতার জোর আজ পর্যন্ত সবাইকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ভগবানের সঙ্গে একটা যোগাযোগ হলে সহজ হয়।

সাধারণতঃ মেয়েদের outlook (দৃষ্টিভঙ্গি) সঙ্কীর্ণ। ছেলেদের মধ্যেও ঝগড়াঝাঁটি হয়, মেয়েদের মধ্যে বেশি হবে। সুতরাং যে দায়িত্ব নিয়ে থাকবে তাকে খুব শক্ত ও দৃঢ় হতে হবে।

এরপর ক্রমশই আদর্শ নিয়েও মতান্তর দেখা দেবে। টাকা আসতে আরম্ভ করলে সে টাকা কি বাবদ খরচ করা হবে তা নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ হবে।

Love of Power—স্বয়ং প্রধান হবার চেষ্টা। ফলে অন্যেরা বেরিয়ে গিয়ে সেণ্টার খুলতে চাইবে। কোন মেয়ে ঝগড়া করে বেরিয়ে গেলে প্রধানতঃ শত্রুবুদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ তিনি চেষ্টা করবেন আশ্রমে যারা টাকা দিয়ে সাহায্য করে তাদের প্রভাবিত করবার।

সংসার ছেড়ে কোন মেয়ে আশ্রমে থেকে পরে কোন কারণে চলে যেতে বাধ্য হলে তার স্থান কোথায় ? আরেকদিনও ঐ প্রশ্ন উঠেছিল এবং আমি উত্তরে বলি—"আশ্রমবাসিনী সকলকেই একটা বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে যাতে কখনো চলে গেলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে।" ঐ উত্তরে উনি সন্তুষ্ট হন এবং বলেন ওটাই একমাত্র সমাধান।

যেসব মেয়ে আশ্রমে থাকবে তারা পরে অসমর্থ অথবা অসুস্থ হলে বিশেষতঃ কেউ টি. বি. প্রভৃতির মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তাদের চিকিৎসার

জন্য উপযুক্ত 'ফাণ্ড' থাকা দরকার।

সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য নিয়ে বহু সময়েই অহঙ্কার এসে পড়ে। "উপযুক্ত না হলে ঐসব দেবেন কেন"—ঐ কথার উত্তরে বললেন—"সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্যের পূর্বে একরকম মনোভাব, পরে অন্যরূপ, সুতরাং স্থির করা মুশকিল।" কথাচ্ছলে আরো উপদেশ দেন। বলেন—"তোমাদের মধ্যে অন্তত একজন অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন হলে তবে সহজ হয়। সে সবাইকে ভালবেসে এক করে নিয়ে চলবে। তাঁর সঙ্গে একটা direct connection—প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হওয়া চাই। অনেক সময় কেউ কেউ মনে করে 'আমি তাঁর প্রত্যক্ষ আদেশ পেয়েছি।' কিন্তু ওটা seriously মেনে নেওয়া যায় না কারণ বাইরের জীবন ও আচরণ তা প্রমাণ করে না। সুতরাং ঐ বিষয়ে মানসিক কোন খেয়ালকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। একবার এপথে যখন এসেছ তখন সবরকম বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত থাক। আশ্রমের মেয়েদের জন্য কিছু কিছু জমাতে চেষ্টা কর। সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্যের জন্য ব্যস্ত হয়ো না। ঠাকুরের ইচ্ছায় সময়ে হয়ে যাবে।"

"আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, মেয়েদের সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্য হয়ে যাক। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে ভাবি—তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে ফেলা ঠিক নয়। যে আশ্রমে সকলের উপরে থাকে তার দায়িত্ব অনেক বেশি। টাকাকড়ি মনে হয় ক্রমে এসে যাবে। তোমরা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাও সদুদ্দেশ্য নিয়ে। যিনি সব কিছু দেখতে পান তাঁর কাছে খাঁটি থাকলেই হল। অধীর হয়ো না। প্রয়োজন মনে করলে মঠ-মিশনের যখন সুবিধা বা ইচ্ছা হবে তখন স্বীকৃতি দেবে।"

কথাগুলি লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে সুদূর ভবিষ্যতে মেয়েদের মঠের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবই তিনি বলেছিলেন এবং সব কথাবার্তার মধ্যেই সর্বদা ঠাকুরের উপর নির্ভর করতে বলতেন।

আমাদের Appeal বা আবেদন-পত্র বার করা সম্পর্কে বলেন—"মঠ, সন্ন্যাসিনী প্রভৃতি কথাগুলো বাদ দিয়ে সব মেয়েদের মোটামুটি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা (all round education) দিতে যাচ্ছ—এ কথা বলাই ভাল। তার মধ্যেও যদি কেউ খুঁত বার করে, কি করা যাবে!" সবশেষে বললেন—"স্বামীজীর কথা তো পড়েই রয়েছে—Purity, patience and perseverance (পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়)—এ কথা মনে রেখে চল।" এভাবে তিনি সব সময় উৎসাহ দিতেন কিন্তু বাধাবিঘ্নের কথাও উল্লেখ করতেন।

১৯৪৭ সালের ৩রা মে আমাদের আবেদন পত্রে তাঁর নাম দিতে পারি কিনা জানতে চেয়ে তাঁকে চিঠি লিখলাম। স্বামী মাধবানন্দ তখন কালিম্পঙে ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন। চিঠিতে লিখলেন (১০-৫-৪৭):

"…তোমাদের আশ্রমের জন্য গঙ্গার ধারে জমি ও বাড়ির চেষ্টা হইতেছে
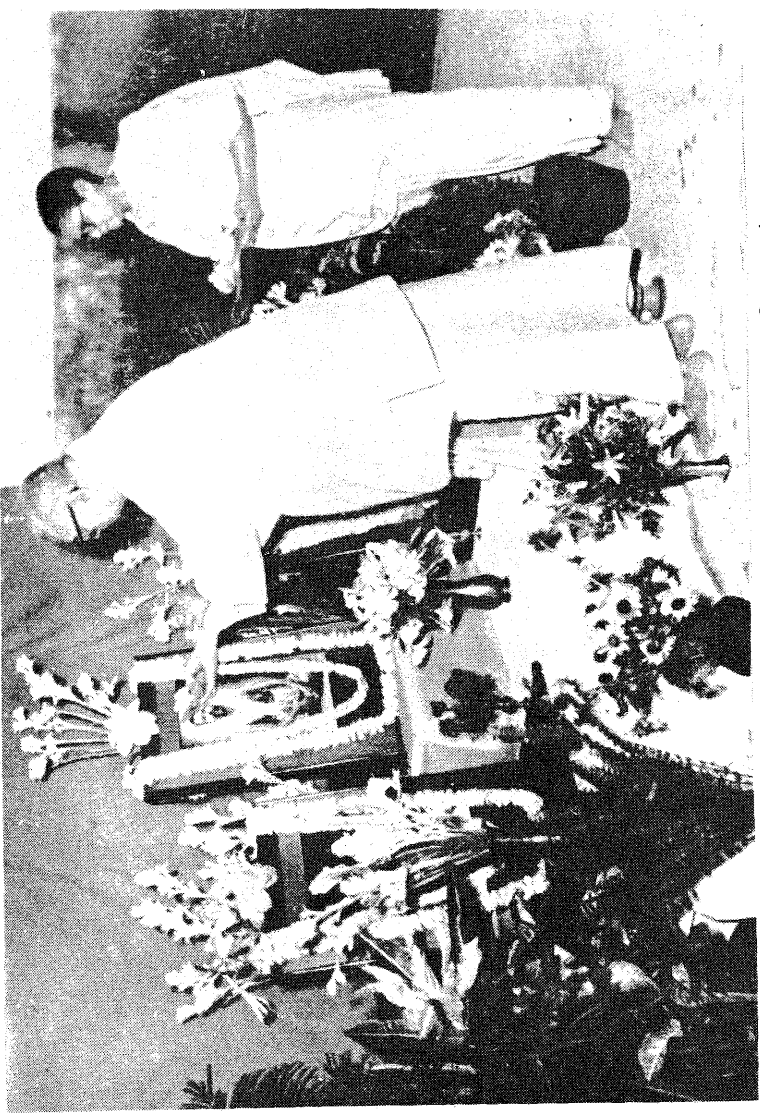
"শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দকে চিরকাল একজন মহাপুরুষের মতোই শ্রদ্ধাভক্তি করেছি।"—পৃষ্ঠা ১৮৪

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন মাতৃভবনের উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে স্বামী মাধবানন্দ। পশ্চাতে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।
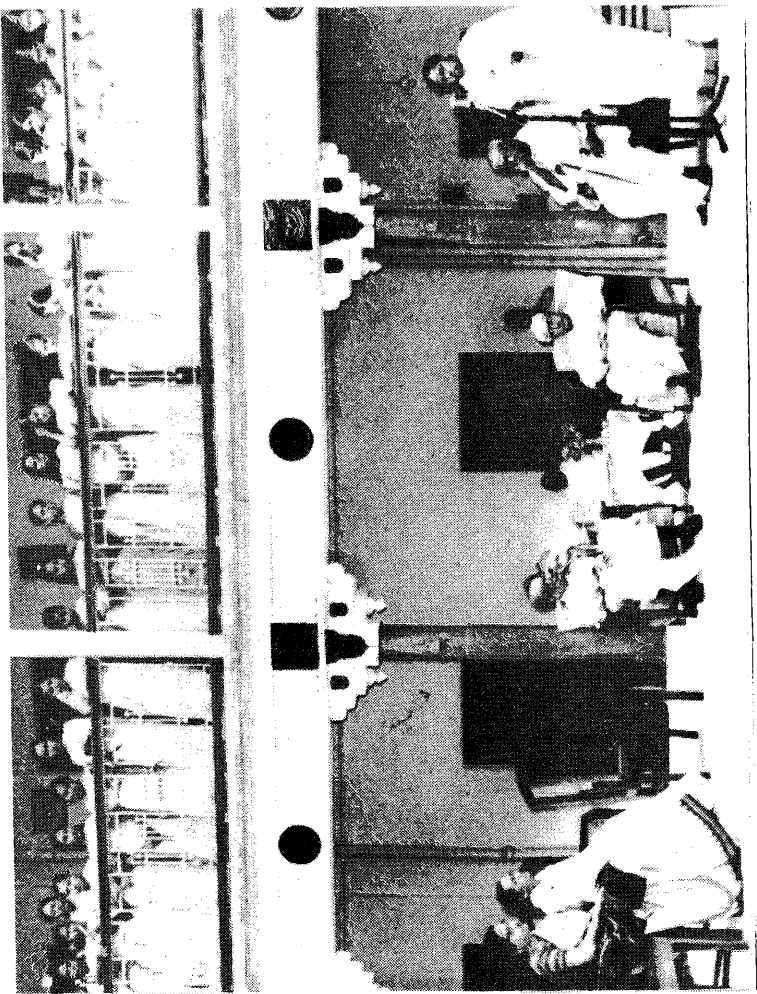
স্বামী মাধবানন্দ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়—১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে নিবেদিতা স্কুলে গৃহীত চিত্র।

জানিলাম। বিশিষ্ট নাগরিকদের স্বাক্ষরসহ 'Appeal' বাহির করিলে টাকা উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়। আজকাল অনেকেই মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী। তবে 'Appeal'-এ আমাদের কাহারও নাম দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। কারণ আমরা একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত এবং উহারই জন্য সাধারণের নিকট ভিক্ষা করিয়া থাকি। আশা করি তজ্জন্য কিছু মনে করিবে না।

মেয়েদের সন্ন্যাসাদির ব্যবস্থা কালে হইবে, তবে উপযুক্ত পরিচালিকার প্রয়োজন। ঠাকুর কাহার দ্বারা সে কাজ করাইবেন, তিনিই জানেন। ভরত মহারাজ, সূর্য মহারাজ, প্রভৃতি আমার সম্বন্ধে স্নেহবশতঃ অতিশয়োক্তি করিয়াছেন। আরও বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিলেই উহা বুঝিতে পারিবে।"

১৯৪৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে স্বামী মাধবানন্দ দুই বৎসরের জন্য কর্ম থেকে অবসর নেন এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দ সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন।

১৯৫০ সাল। মঠে যাতায়াত করি। ১০ই জুলাই স্বামী বীরেশ্বরানন্দ বললেন—"তোমাদের আশ্রমে কত মেয়ে আছে? তাদের নাম, 'কোয়ালিফিকেশন' সহ একটি 'লিস্ট' আমাকে পাঠিও।" এরপর আরেকদিন মঠে গেলে তিনি আমাকে বললেন—"তোমাদের একটা 'চান্স' দেব মিশনে যোগদান করবার। তোমরা নিবেদিতা স্কুলে চলে এস। কিন্তু কোনরকম শর্ত না করে এখুনি বসে আমার সামনে একটা 'ড্রাফট' কর। সেই 'ড্রাফট' অনুযায়ী আমি তোমাকে চিঠি দেব।" আমি তাই করে দিই। আমরা তখন সংখ্যায় আঠারো।

যাই হোক, এ বিষয়ে নানা লেখালেখির পর স্থির হয় যে, তিনি আমাদের মিশনে যোগ দেবার একটা সুযোগ দেবেন। আশ্রমে মিটিং ডেকে একটা 'রেজলিউশন' করা হয়—আপাততঃ 'সারদা আশ্রম' থাকবে এবং অপরে তার পরিচালনা করবে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। আরেকটা 'রেজলিউশন' করা হল—যদি কখনো মঠ-মিশন আশ্রমটিকে স্বীকৃতি দেয় তাহলে তার জন্য একটা প্রস্তাব (clause) রইল। তদানীন্তন মঠাধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ তখন খুব অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা ছিল না। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ জানান, আমাদের মিশনে যোগদানের ব্যাপারে স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী মাধবানন্দ উভয়েই খুব আনন্দিত হয়েছেন। তিনি একথাও বলেন, স্বামী মাধবানন্দের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন প্রস্তাবই নেওয়া হয়নি। সে সময় স্বামী মাধবানন্দের সঙ্গেও দেখা হত না। তিনি সাধু-আবাসে (Monks Quarter) থাকতেন। সাধারণতঃ দেখা করতে চাইতেন না, আমিও বিরক্ত করিনি। মনটা খুব খারাপ হয়েছিল। এতবড় একটা পরিবর্তন হতে চলেছে অথচ তাঁদের কারো সঙ্গে দেখা করে কোন কথা জিজ্ঞাসা

করতে পারছি না।

২২শে জুলাই, ১৯৫০ সাল। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ একটি চিঠিতে আমাদের মিশনে যোগদান করবার অনুমতি দেন। এরপর ৩০শে জুলাই আমাদের সকলের নিবেদিতা স্কুলে যাওয়া স্থির হয়। উদ্দেশ্য, চলে আসার পূর্বে সারদা আশ্রমের সদস্যাগণ এবং নিবেদিতা স্কুলের বর্তমান কর্মিগণ—এই উভয়পক্ষের মিলিত হওয়া। স্কুলের ঠাকুরদালানে আমরা সকলে একত্র হই। বিশেষ অনুরোধে স্বামী নির্বেদানন্দ উপস্থিত ছিলেন। তিনি খুবই আনন্দিত হন। তাঁর এতদিনের প্রচেষ্টা সফল হল। কিছুক্ষণ পরেই স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের আশীর্বাণী এসে পেঁছাল। পূজনীয় নির্বেদানন্দ মহারাজের সামনে বসে সেটি পড়া হয়। আশীর্বাণীটির প্রত্যেক কথা অমূল্য ঃ

"···শ্রীশ্রীঠাকুর, মা এবং স্বামীজীর অশেষ কৃপায় তাঁদের শ্রীচরণাশ্রিত তোমরা যে আজ এক উদ্দেশ্য, এক ব্রত, এক কর্মধারায় একত্রিত হলে—এই অভাবনীয় ঘটনাটির কথা ভেবে আমি প্রাণে অপূর্ব আনন্দ অনুভব করছি, আমার জীবদ্দশায় যে ইহা সম্ভব হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

যদিও আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করতুম, স্বামীজীর যে আন্তরিক ইচ্ছা—মেয়েদের মধ্যেও ত্যাগ এবং আধ্যাত্মিক জাগরণ আনয়ন করা, তা একদিন সফল হবে। আধ্যাত্মিক সাধনা ও অনুভূতির ক্ষেত্রে তিনি মেয়ে এবং পুরুষের গণ্ডি ভেঙে দিয়েছিলেন।···তোমাদের এই মিলনের মধ্যে আমি সুদূরপ্রসারী এক কল্যাণের সূচনা দেখতে পাচ্ছি। জাতিধর্মনির্বিশেষে দেশ-বিদেশের আরো অনেক মেয়ে আসবে—যারা দূরে আছে তারাও এক হয়ে এক বৃহৎ কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলবে···।"

সেসময় স্বামী বীরেশ্বরানন্দ খুব জোর দিয়েছিলেন—ল্যান্সডাউন রোডের সারদা আশ্রম তুলে দিতে হবে। আমি বলেছিলাম—এখন আশ্রমের আর্থিক অবস্থা ভাল, ক্লাস প্রভৃতি ভাল হচ্ছে, অনেক মেয়ে থাকার সুযোগ পাচ্ছে। ওটাকে তো ছাত্রীনিবাস করে রাখা যায়। কিন্তু উনি রাজি হলেন না। পরে অবশ্য স্থির হয় ঐ আশ্রমটি থাকতে পারে। তবে নিবেদিতা স্কুলে চলে যাওয়ার পর আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না।

১৯৫১ সালে স্বামী মাধবানন্দ পুনরায় সাধারণ সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন। একদিন আমাদের কয়েকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি সকলকেই কিছু প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমাদের কে কি প্রশ্ন করেছিল মনে নেই। জয়া (প্রব্রাজিকা ঋতপ্রাণা) তখন মাতৃভবনের সহসম্পাদিকা হিসেবে অফিসে কাজ করত। বাকি সকলের কাজ ছিল হাসপাতালে। জয়া হঠাৎ বলে উঠল যে, যেহেতু সে অফিসে কাজ করে, হিসেবপত্র নিয়েই তার সারাক্ষণ কাটে, লোকজনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

ঠিক ঠিক সেবামূলক কিছুই করতে পারে না। স্বামী মাধবানন্দ খুব দৃঢ়ভাবে বললেন—"তুমি কার কাজ করছ? অফিসের কাজটা কি তোমার নিজের? সেণ্টার তো ঠাকুরের। সুতরাং তুমি তাঁরই হিসেবের কাজ করছ। এর দ্বারা তাঁরই সেবা করা হচ্ছে।"—এই কথা কয়টির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, সেবামূলক কাজের প্রতি তাঁর কি রকম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

এরপর বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ মেয়েদের মঠ নিয়ে স্বামীজীর পরিকল্পনা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। এ কথা এখানে উল্লেখ করা ভাল যে, ত্রিচুরে মেয়েদের একটি ক্ষুদ্র দল স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন এবং সেই সঙ্গে মঠ-জীবন যাপন করতে আগ্রহী ছিলেন।

নিম্নে স্বামী গম্ভীরানন্দ কর্তৃক লিখিত History of the Ramakrishna Math & Mission—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল (১ম সং, পৃঃ ৪০৭; কি কারণে জানি না, বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে এই অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে):

"সম্মেলনে গৃহীত আরেকটি প্রস্তাব যা স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংযুক্ত। ঐ পরিকল্পনাটি প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের। গত কয়েক বৎসর ধরেই সেই সম্বন্ধে কথাবার্তা চলছিল। বস্তুতঃ পূর্ববর্তী দুটি ত্রৈবার্ষিক সাধু সম্মেলনে [যথাক্রমে ১৯৪৬ ও ১৯৪৯ সাল। ১৯৪৬ সালের সম্মেলনে পঠিত তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দের বক্তৃতাটি এই প্রবন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—লেখিকা] বিষয়টি উল্লিখিত হয় যদিও তখন উক্ত বিষয়ে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অবশেষে ১৯৫২ সালে ১৫ই থেকে ১৮ই মে অনুষ্ঠিত ত্রৈবার্ষিক সন্ন্যাসী-সম্মেলনে যে প্রস্তাব করা হয়, তা ১৯৫২ সালের ২৯শে মে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে গ্রহণ করেন। নিম্নে অংশটি উদ্ধৃত হল যাতে বক্তব্য নির্ভুল ও সুস্পষ্ট হয়:

"সম্মেলন মনে করেন স্ত্রীমঠ সম্পর্কিত স্বামীজীর ধ্যান-ধারণাকে রূপ দেওয়ার সময় এসে গেছে। মেয়েদের এমন অধিকার দিতে হবে যাতে তারা পুরুষনিরপেক্ষভাবে আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয়। সম্মেলনে প্রস্তাবগুলি যথাক্রমে—

(ক) যেসব মহিলা উচ্চতম অধ্যাত্মজীবনের আকাঙ্ক্ষায় গৃহত্যাগ করে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনুমোদনক্রমে শাখাকেন্দ্রগুলির স্ত্রী-বিভাগে নিযুক্ত রয়েছেন এবং যাঁরা 'dedicated' কর্মী বলে অভিহিত, তাঁদের ক্রমে ক্রমে সংগঠিত করে যত শীঘ্র সম্ভব একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র সন্ন্যাসিনী সংঘ গড়ে তোলায় সাহায্য করতে হবে।

(খ) এরই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ঐসব 'dedicated' কর্মীদের নিয়ে একটি মূলকেন্দ্র গঠন প্রয়োজন। পরবর্তী ধাপ হল, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনভুক্ত

যেসব মহিলা প্রতিষ্ঠান ও স্ত্রী-বিভাগ আছে, সেগুলিকে একে একে ঐ মূল (স্ত্রী) সংগঠনের অধীনে নিয়ে আসতে হবে।

(গ) দশ বছরের মধ্যে কিংবা তারও পূর্বে বেলুড় মঠ-মিশনের কর্তৃপক্ষ যদি ঐ 'dedicated' মহিলাদের কেন্দ্রীয় সংগঠনকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহলে অধীনস্থ স্ত্রী-বিভাগগুলিকে আইনতঃ রেজিস্ট্রি করে হস্তান্তর করবেন।

(ঘ) শ্রীশ্রীমার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্ত্রী-মঠের উপযুক্ত একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করে ঐ কাজের সূচনা করা হবে এবং এমনভাবে পরিচালিত হবে যার ফলে বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে লিখিত স্বামীজীর অভিপ্রায় অনুযায়ী এই স্বাধীন স্ত্রীমঠটি স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকীর মধ্যেই বেলুড় মঠ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, আইনতঃ একটি স্বতন্ত্র স্ত্রীমঠে পরিণত হতে পারে।

ইতিপূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ মহারাজ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে কিছু মহিলা ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলন এখন প্রস্তাব করছেন—যেসব 'dedicated' মহিলাদের প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টিরা উপযুক্ত বিবেচনা করবেন, তাদেরই বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট অনুরূপভাবে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করবেন। শুধুমাত্র স্বতন্ত্র মঠ না হওয়া পর্যন্ত বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট এই ব্রতে মহিলাদের দীক্ষিত করবেন, পরে কখনই নয়।

স্বামীজী তাঁর রচনাবলী বা বক্তৃতাদিতে বিশেষ করে বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে মেয়েদের সন্ন্যাসের সমর্থন করেছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সম্মেলন প্রস্তাব করছেন, 'dedicated' মহিলা কর্মীদের এই সংগঠন যখন বেলুড় মঠ থেকে পৃথক হয়ে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, তখন তাঁদের মধ্য থেকে যাঁরা ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হয়েছেন তাঁরা সন্ন্যাস প্রার্থনা করতে পারবেন। যদি প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টিরা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহলে প্রেসিডেন্ট তাঁদের সন্ন্যাস দিতে পারবেন। কিন্তু ঐ একবারই সেটা করা হবে। পরে বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট আর কোন ব্রহ্মচারিণীকে সন্ন্যাস দিতে পারবেন না।"

১৯৫২ সালের শেষে নিবেদিতা স্কুলে সাত দিন ধরে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ। মঠ থেকে স্বামী মাধবানন্দ ও অন্যান্য অনেক সাধুরা এসেছিলেন। খুব সুন্দরভাবে উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

১৯৫২ সালে আরেকটি ঘটনা Monks Conference-এ সারদামঠ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ উত্থাপন এবং যথারীতি প্রস্তাবটির অনুমোদন ১৮ই মে তারিখে। ঐ Conference শেষ হবার পর ২৭শে মে আমরা শ্রীমোহন লেনে মাতৃভবনে যাই। স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ তখন মাতৃভবনের সম্পাদক। উনি—

সন্ন্যাসী-সম্মেলনের কথা বললেন—"সব ঠাকুরের ইচ্ছায় হয়ে গেল, দেখো যেন আমাদের মুখ রক্ষা হয়। অনেক বৃদ্ধ সাধু তোমাদের জন্য বলেছেন।" আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বামী মাধবানন্দকে একটি চিঠি লিখেছিলাম। উত্তরের আশা করিনি। উনিও উত্তর দেননি। ফোনে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ জানান যে, উনি আমার চিঠি পেয়েছেন। ২২শে মে আমি পূর্বোক্ত চিঠিটি লিখি।

১৯৫৩ সালে শ্রীশ্রীমার শতবর্ষজয়ন্তী আরম্ভ হয় ডিসেম্বর মাসে এবং শেষ হয় ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে। খুবই সুন্দরভাবে ও সাফল্যের সঙ্গে সর্বত্র উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে আমরা হঠাৎ জানতে পারি শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি ২৭শে ডিসেম্বর আমাদের সাত জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করা হবে। নিবেদিতা স্কুলের পাঁচ জন, মাতৃভবনের একজন ও সুদূর ত্রিচুর আশ্রমের একজন। সেই দিন খুব ভোরে আমরা বেলুড় মঠে যাই। ঠাকুরের পুরনো মন্দিরে অনুষ্ঠানে স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ আচার্যের কাজ করেন এবং অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দেন।

সেদিন মঠ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় স্বামী মাধবানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতায় বলেন—"শ্রীশ্রীমার আবির্ভাবে এক বিরাট অধ্যাত্ম শক্তির জাগরণ ঘটবে, স্বামীজী বলেছিলেন। সারদা মঠের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আজই সকালে সাত জনকে ব্রহ্মচর্য দেওয়া হয় ইত্যাদি।"

পরের বছর ১৯৫৪ সালে নভেম্বর মাসের ২৪ তারিখ থেকে নিবেদিতা স্কুলে সাতদিনব্যাপী শ্রীশ্রীমার জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে আমাদের অনুরোধে স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ সভাপতির পদ গ্রহণ করতে সম্মত হন। ঐ উপলক্ষে একটি বড় ঘরে 'শিক্ষা প্রদর্শনী'র আয়োজন হয়। মহারাজকে প্রথমে ঐ ঘরে নিয়ে গেলে বলেন—"ও সব তেজসানন্দ (বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ) এলে দেখিও।" তারপর স্টেজে গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করছি। স্টেজ থেকে উনি নেমে আসছেন—আমি ওঁর জুতোজোড়া সামনে এনে দিই। উনি খুব ধমক দিয়ে বললেন—"কেন তুমি আমার জুতোয় হাত দিচ্ছ! এতক্ষণ ধরে মাতৃজাতির গুণবর্ণনা হল!" মাতৃজাতির প্রতি তাঁর কতখানি শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল!

১৯৫৪ সালের শেষে ২রা ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বরে শ্রীসারদা মঠের উদ্বোধন করেন তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ। ১৯৫১ সালে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যৎ স্ত্রীমঠের কথা ভেবে বর্তমান মঠের জমি ক্রয় করেন। শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্যা ও সেবিকা সরলাদেবীকে (স্বামী সারদানন্দপ্রদত্ত নাম শ্রীভারতী) প্রথম অধ্যক্ষারূপে নিযুক্ত করা হয়। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকাল বাস, শেষদিন পর্যন্ত তাঁর অকুণ্ঠ সেবা এবং পরে প্রায় দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে কাশীতে ধ্যানধারণার জীবন তাঁকে সর্বতোভাবে যোগ্য করে তোলে স্ত্রীমঠের

অধ্যক্ষাপদে। কিছুদিন পরেই শ্রীভারতীকে প্রেসিডেণ্ট করে ছয়জন ব্রহ্মচারিণীসহ একটি কমিটি গঠিত হয়। উদ্দেশ্য, শ্রীসারদা মঠ পরিচালনা ব্যাপারে বেলুড় মঠ ট্রাস্টিদের সাহায্য করা, পরে ঐ কমিটির উপর রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনস্থ মেয়েদের কেন্দ্রগুলির তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া।

১৯৫৫ সালে নিবেদিতা স্কুলের কার্যভার পরিত্যাগ করে আমি শ্রীসারদা মঠে চলে আসি। ঐসময় মঠে অধিবাসিনীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। প্রথমে আট ও পরে এগার জন। নানা কারণে সেসময় মনে খুব দ্বন্দ্ব চলছিল। স্বামী মাধবানন্দ তখন মায়াবতীতে। সাহস করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে একটি চিঠি লিখি এবং খুব তাড়াতাড়ি উত্তর পাই।

আমার চিঠিতে তিনটি সমস্যার কথা ছিল—সংঘজীবন যাপন করা কঠিন ; কারো সঙ্গে মতের মিল না হলে, মনে যে অপ্রসন্নতা থাকে সে তা জানতে পারে না কিন্তু আমার আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষতি হয় ; কাজের মধ্যে অনেকদিন ধরে থাকার ফলে মনটা কাজের সঙ্গে এমন জড়িয়ে গেছে যে ভাল করে জপধ্যান হচ্ছে না। তিনি মায়াবতী থেকে (২২।৪।৫৫) লেখা চিঠিতে প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই সুন্দরভাবে উত্তর দেন। তাঁর খুব sense of humour ছিল। কথাবার্তা ও পত্রে সর্বত্রই তার পরিচয় পাওয়া যায়। নিচে পত্রটি দেওয়া হল।

কল্যাণীয়াসু,

তোমার নববর্ষের সম্ভাষণ পাইয়া সুখী হইলাম। তুমিও আমার ঐ উপলক্ষে ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে। (এক বিজয়াতেই অস্থির, আবার নববর্ষ! তার উপর ১লা জানুয়ারীও আছেন।)

সংঘজীবন যাপন করা কঠিন লিখিয়াছ। সত্যই। কিন্তু অন্যবিধ জীবন যাপনও কি কঠিন নহে? মোট কথা আমাদের সমগ্র জীবনই struggle for adjustment. ঠাকুরের দিকে নজর রাখিয়া সাধ্যমতো চেষ্টা করিয়া যাও। যতটা পার আন্তরিকভাবে, বাকি তিনি ঠিক করিয়া লইবেন। আসল কথা এই, তিনি আমাদের লইয়া খেলিতেছেন। ঠিক নিজের ইচ্ছামতো কিছুই করা সম্ভব নয়। তিনি যতটুকু করাইবেন ততটুকুই হইবে।

সম্পূর্ণরূপে এক ভাবের লোক না হইলে একসঙ্গে থাকিতে গেলেই মনে বিক্ষোভ হইবে। কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না। প্রাণ ভরিয়া ঠাকুরের কাজ করিয়া যাও ও তাঁহার নিকট আদর্শজীবন যাপনে সাহায্য প্রার্থনা কর। যথাসম্ভব 'অহং'ভাবকে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। ত্যাগ ও ভালবাসার দ্বারাই অপরের চিত্ত জয় করা যায়। শনৈঃ পন্থা। ইতিমধ্যে ঠাকুরের 'শ ষ স' উপদেশ স্মরণ রাখিবে।

কাজের মধ্যে থাকিলে কিছু বিষয়চিন্তা তো হইবেই। কিন্তু উহা হানিকর হইবে না, কারণ ঐ কাজ ঠাকুরেরই কাজ। আন্তরিকভাবে কাজ করাও ভগবানকে

ডাকা। দুটাকে তফাৎ করিতেছ কেন? শুধু নজর রাখিও ছোট আমিটা যেন জোর না করে। তাঁহার চরণে মতি রাখিয়া পড়িয়া থাকিলে তিনি সব ঠিক করিয়া লইবেনই। স্বামীজীর রচিত স্তোত্রেই তো আছে 'কৃত্যং করোতি কলুষং' ইত্যাদি।

'Purity, Patience, Perseverance'—স্বামীজীর এই অমর বাণী যেন আমাদের motto হয়।

সকলকে আমার প্রীতি, শুভেচ্ছাদি জানাইও। আমি ভাল আছি। অপর মঙ্গল।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
মাধবানন্দ

১৯৫৫ সালেই সৌভাগ্যক্রমে আমাদের চারজন ব্রহ্মচারিণীর মায়াবতী গমনের সুযোগ হয়। ঐ সময় স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ ঐ আশ্রমে ছিলেন। আমরা যখন মায়াবতী পেঁাছে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, মহারাজ তখন নিচের বড় ঘরে বসেছিলেন। বললেন—স্বামীজী কিভাবে ফায়ার-প্লেসের ধারে বহুক্ষণ পায়চারি করেছিলেন। অবশেষে বললেন, "এরা যা দেয়, তোমরা ভাল করে খাওয়া-দাওয়া কর, লজ্জা কোরো না।" তাঁর কাছ থেকে এটা অপ্রত্যাশিত। কী স্নেহ-মমতার সঙ্গে কথাগুলি বলেছিলেন! আমরা তাঁর কাছে একদিন অন্তর একটু কথাবার্তা বলার জন্য সময় দিতে অনুরোধ করি। তিনি প্রথমে বেশ কৌতুকের সঙ্গে বলেন—"এর মধ্যেই অরুচি হয়ে গেল!" অর্থাৎ জপধ্যানে। পরে অবশ্য স্বামী গম্ভীরানন্দের মধ্যস্থতায় একদিন অন্তর এক ঘণ্টা করে সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ কথাবার্তাগুলি লিখে রাখা হয়নি। তবে মনে আছে, আধ্যাত্মিক জীবনযাপন সম্পর্কে প্রশ্নগুলি তিনি সাগ্রহে আলোচনা করতেন। বলতেন—"সব সময় এসব সমস্যা ভেতর থেকে solve (সমাধান) করতে হবে। তবে অনেক সময় বাইরে থেকে কেউ একটু সাহায্য করতে পারে।…self-confidence চলে যাক, তার পরিবর্তে তাঁর উপর confidence আসুক।" উনি self-help এবং prayerful attitude-এর উপর জোর দিতেন। বলতেন—"অসুবিধে সব 'তাঁদের' জানাও আর খুব শরণাগত হও।" ঐসময় একদিন রহস্য করে বলেছিলেন—"আমাদের রামময়ের (স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ) insomnia হয়েছে। আগে বালিশে মাথা রাখলেই ঘুমিয়ে পড়ত, এখন ৫ মিঃ দেরি হয়।"

কখনো নিজের প্রসঙ্গও করতেন। তাঁর অনুরাগ ছিল ইংরেজী ভাষার উপর। "এম. এ. পড়বার জন্য ইউনিভার্সিটিতে English-এ admission নিয়েছিলাম কিন্তু স্বামীজীর 'Inspired Talks' পড়বার পর আর continue

করা সম্ভব হল না।”

অনেকদিন পূর্বে আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—মঠ মিশন-এর স্কুলের সঙ্গে বাইরের অন্যান্য স্কুলের কি তফাৎ? কারণ সাধারণতঃ সিলেবাস তো একই। তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—“আমাদের স্কুলগুলিতে যা শিক্ষা দেওয়া হয় তা with god কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তার অভাবটাই চোখে পড়ে।”

১৯৫৮ সালে আমরা চারজন কিছুদিন কাশী সেবাশ্রমে মহিলা বিভাগে ছিলাম। ঐ সময় স্বামী মাধবানন্দ মহারাজও কয়েক দিনের জন্য অম্বিকাধামে অবস্থান করেন। আমরা রোজ একবার করে তাঁর কাছে যেতাম। প্রথম দিনে একটু হেসে বলেছিলেন—“আসতে পার, তবে বিশেষ কিছু হবে না।” একদিন বললেন—“তোমরা একটু hospital-এ কাজ কর না। আমার তো চিরকাল রিলিফ-এর রিপোর্ট লিখেই কাটল। একবার কেবল কুরুক্ষেত্রে রিলিফ-এর সময় ক্যাম্পে এক রাত ছিলাম। তোমরা মেয়েদের বিভাগে কিছু কাজ কর।”

আমরা বিশেষ উৎসাহ বোধ করি। মেয়েদের বিভাগে যিনি দেখাশোনা করতেন, তিনি সব ব্যবস্থা করলেন। দুজন ডিস্পেন্সারীতে কাজ করবে আর একজন ইঞ্জেকশন দেবে। এর মধ্যে মহারাজ কয়েকজন সাধুসহ চিত্রকূট ইত্যাদি দর্শন করে ফিরে এলেন। আমরা দেখা করে খুব উৎসাহের সঙ্গে বললাম—“আমরা কাজ করে খুব আনন্দ পাচ্ছি।” একজনের নাম করে নিরুদি বললেন—“উনি তো বেশ ইঞ্জেকশন দিতে শিখে গেছেন।” তার দিকে তাকিয়ে মহারাজ বললেন—“খালি লোকের গায়ে ছুঁচ ফোঁটাচ্ছ!”

তার খুব মন খারাপ হয়ে যায়, পরদিন থেকে রোগীদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ইত্যাদি করতে আরম্ভ করে। ঐ ক’দিন কাজ করে আমরা যে কি আনন্দ পেয়েছিলাম তা বলতে পারি না। এ কিন্তু তাঁরই কৃপা।

সেবাশ্রমের সব সেবিকারা একদিন তাঁর কাছে সমবেত হলে মহারাজ খুব অনুপ্রেরণা দিয়ে তাঁদের বলেছিলেন—“আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁরা অবশ্যই এগিয়ে যাবেন। কারণ এই সেবাশ্রম দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মা-ঠাকরুণ বলেছিলেন—‘দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন—তাই এসব কাজ হচ্ছে। এসব তাঁরই কাজ’।”

কাশী অবস্থানকালে একটা দুর্ঘটনা হয় এবং তার ফলে আমার হাতে খুবই চোট লাগে। মহারাজ তখন বেলুড় মঠে।

আমি তাঁকে লিখি—“আমার মনটা স্থির হচ্ছে না। শরীরের ওপরেই চলে যাচ্ছে, জপ-ধ্যান ভাল হয় না।” উত্তরে মহারাজ লেখেন—“শরীর থাকিলেই কিছু না কিছু হাঙ্গামা হইবে। নিজেকে যথাসম্ভব অবিচলিত রাখাই বীরের কাজ। মনের স্বভাবই চঞ্চল হওয়া। শ্রীভগবানের আশ্রিত হইয়া ধীরে ধীরে উহাকে বশে আনিতে হইবে। আন্তরিকতা থাকিলে উহা হইবেই। আন্তরিকতাই

বড় জিনিষ। উহা না থাকিলে, উহার জন্য ভগবৎসকাশে প্রার্থনা করা উচিত।

"তুমি দেখিতেছি, বিশ্বনাথের রাজ্যে বাস করিয়া 'আশা হি পরমং দুঃখম্ নৈরাশ্যং পরমং সুখম্'—এই পাঠ পড়িতেছ। আমরা optimist বা pessimist কোনটাই নই। আমরা Vedantist. ঠাকুর ও মাকে ধরিয়া থাক। দু'চারদিন পরে মনের resilience ফিরিয়া আসিবে। আদর্শ খুব উচ্চ হইলে, মাঝে মাঝে হতাশ ভাব আসা বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য পিছনে যে মহাশক্তিধরেরা রহিয়াছেন, তাঁহারাই দায়ী। শুধু আমরা যেন তাঁহাদের ভুলিয়া না যাই। বারবার চেষ্টা করিতে করিতেই সফলতা আসে।"

পূর্বেই লিখেছি যে মঠ কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকীর (১৯৬৩-৬৪) পূর্বে মেয়েদের মঠকে স্বাধীন করে দেওয়া হবে। প্রস্তুতি হিসেবে ১৯৫৩ সাল থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনাধীন মহিলা-বিভাগের কার্যকরী সমিতিতে আমাদের সদস্যারূপে গ্রহণ করা হয় এবং পরে ঐ বছরই মাতৃভবন ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন আশ্রমে মেয়েদের সেক্রেটারী করে তাদের উপর পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয়। অবশ্য ইতিপূর্বে ১৯৫০ সাল থেকে নিবেদিতা স্কুলের পরিচালনা-ভার মেয়েদের উপরে ছিল। তাদের কার্য পরিচালনায় সম্ভবতঃ তাঁরা সন্তুষ্ট হন। কারণ সময়ের পূর্বেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মেয়েদের সন্ন্যাস দেওয়া হবে।

১৯৫৮ সালে শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি পড়ে ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী। ঐদিন শ্রীসরলাদেবীসহ সাতজন ব্রহ্মচারিণীর সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা হয়। ভবিষ্যতে যাঁরা সন্ন্যাসিনী হবেন তাঁদের নামকরণ বিষয়ে স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ বরাবরই গভীর আগ্রহের সঙ্গে নানারকম চিন্তা করেছেন—কি নাম দেওয়া হবে, সন্ন্যাসিনীদের যাতে সাধুদের সঙ্গে একটা পার্থক্য থাকে। মিসেস কুট নামে এক ফরাসী ভদ্রমহিলা বেশ কিছুদিন বেলুড় মঠে ডিস্পেন্সারী বাড়ির উপরের ঘরে ছিলেন, প্রায়ই নির্মল মহারাজের কাছে যেতেন, সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছা ছিল। পরে হরিদ্বারে সন্ন্যাস নিয়ে ওমানন্দ নামে অভিহিত হন। একদিন বললেন—"ওমানন্দকে চিঠি লিখেছি সন্ন্যাস কিভাবে হল, কেমন ড্রেস ইত্যাদি জানবার জন্য।" স্বামী মাধবানন্দ সন্ন্যাসিনীদের নামের আগে 'প্রব্রাজিকা' ও পরে 'প্রাণা' শব্দের সংযোগ করে সন্ন্যাসাশ্রমের ইতিহাসে একটি অভিনব অধ্যায় যুক্ত করলেন। একদিন হঠাৎ বললেন—"তোমাদের মস্তক মুণ্ডন করে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করতে হবে।" আমি তৎক্ষণাৎ বলি—"সে তো করতেই হবে।" তিনি আশ্বস্ত হলেন। ভারতবর্ষে মেয়েরা চিরদিন কেশচর্চা করে এসেছে। ওঁর মনটা এত নরম ছিল—হয়ত আমাদের মনে লাগবে ভেবে বিচলিত হয়ে ছিলেন। শ্রীশ্রীমার জন্মতিথির পূর্বে যথারীতি মস্তক মুণ্ডন

ও শ্রাদ্ধাদি হয় এবং সন্ধ্যা থেকে আমরা মঠের গেস্ট হাউসে অতিবাহিত করি। যথাসময়ে অর্থাৎ শেষ রাত্রে বেলুড় মঠের পুরনো ঠাকুরঘরে বিরজা হোম অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ শ্রীভারতী (সরলাদেবী) ও সাতজন ব্রহ্মচারিণীকে যথাবিহিত সন্ন্যাস প্রদান করেন। ট্রাস্টি ও প্রবীণ সাধুরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ আচার্যের কাজ করে মন্ত্রগুলি পড়ান। অনুষ্ঠান শেষে আমরা সকলে যখন স্বামী মাধবানন্দকে প্রণাম করে তাঁর ঘর থেকে চলে আসি, উপর থেকে তিনি স্বামী বীরেশ্বরানন্দকে ডেকে বলেন—"ওদের জিজ্ঞাসা কর, নাম পছন্দ হয়েছে কিনা!"

তখনো পর্যন্ত আমাদের মঠ বেলুড় মঠের অধীনে। বাইরে কোথাও যেতে গেলে তাঁকে জানাতে হত। সহাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ তখন কামারপুকুরে। তাঁকে একবার প্রণাম করতে যাবার উদ্দেশ্যে অনুমতি চেয়ে স্বামী মাধবানন্দকে একটি চিঠি লেখা হয়। ঐ চিঠির কোণে একটি মন্তব্যসহ তিনি তৎক্ষণাৎ চিঠিটি ফেরত পাঠান—"তোমরা এখন স্বাধীন। এখন থেকে আমাদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। তোমাদের অধ্যক্ষাকে বলে যাবে।" এই উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীমঠের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এর দ্বারা মেয়েদের প্রতি তাঁর উদারতাও প্রকাশ পায়। তিনি যথার্থই ছিলেন স্বামীজীর অনুগামী।

১৯৫৯ সালে আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের মঠকে সাংবিধানিক-ভাবে স্বাধীন করে দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী একটি 'ট্রাস্ট-ডীড'-এর খসড়া তৈরি করে আমাদের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হল। স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ তখন ভুবনেশ্বরে। তিনি পূর্বেই 'ট্রাস্ট-ডীড' সই করে মঠে পাঠিয়ে দেন। ঠিক হয়, ৯ই সেপ্টেম্বর সকালে (সময়ঃ ১০-৫২ মিঃ থেকে ১১-৭ মিঃ-র মধ্যে) স্বামী মাধবানন্দের সামনে সকল ট্রাস্টিদের (সাত জন) স্বাক্ষর দিতে হবে। শুভ মুহূর্ত সম্বন্ধে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। সরকারী-ভাবে বেলা ৩-৩০ মিনিটে অফিস ঘরে 'ট্রাস্ট-ডীড'টি রেজিস্টার্ড করা হয়। ঐদিন বেলুড় মঠ ও শ্রীসারদা মঠে বিশেষ পূজাদি সম্পন্ন হয়েছিল। স্বামী নির্বাণানন্দ মহারাজ আমাদের প্রসাদের বিশেষ ব্যবস্থা করেন। আমরা দুপুর-বেলা গেস্ট হাউসে কাটিয়ে যথাসময় বেলুড় মঠের অফিস ঘরে উপস্থিত হই। সেদিন সকাল থেকেই প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। আমরা যখন সকালে স্বামী মাধবানন্দের ঘরে বসে আছি, তখন উদ্বোধনের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মবোধানন্দের মহাপ্রয়াণের সংবাদ আসে। আমরা সকলেই তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম। সুতরাং বলা বাহুল্য, আমাদের কাছে সেটি ছিল একটি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ—বিশেষ করে সেই মুহূর্তে।

ঐ রাত্রে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ আমাদের ফোন করে বলেন—স্বামী মাধবানন্দ

বলেছেন যে, ওরা যেন মনখারাপ না করে। আজকের মতো শুভ লগ্ন পাওয়া দুষ্কর—খুব শুভদিন ইত্যাদি। তাঁর কি স্নেহপূর্ণ হৃদয়ই না ছিল! তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ঐদিন স্বামী আত্মবোধানন্দের দেহত্যাগে আমাদের সকলেরই মন বিশেষ বিচলিত। তাই সেই রাত্রেই তিনি আমাদের আশ্বাস দিতে ভোলেননি যে, ঐরূপ ঘটনা ঘটলেও বিচলিত হবার কারণ নেই।

শ্রীসারদা মঠের ট্রাস্টিদের প্রথম অধিবেশনের জন্য তিনি ১৪ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০-২ মিঃ থেকে ১০-১৭ মিঃ-র মধ্যে শুভ দিনক্ষণ নির্ণয় করে দেন। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের রেজিস্ট্রি যেদিন হল তারও সময় তিনি নির্দিষ্ট করেন (১৩ই মে ১৯৬০), যদিও তখন তিনি ছিলেন কালিম্পঙে। অতঃপর আমাদের অনুরোধে গভর্ণিং বডির বা পরিচালক সমিতির প্রথম অধিবেশনের দিন ও সময় তিনিই স্থির করে দেন।

নিবেদিতা স্কুল থেকে সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ভগিনী নিবেদিতার একটি প্রামাণিক জীবনী বাংলায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বইটি লেখা শেষ হলে আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে স্বামী মাধবানন্দ তার সম্পাদনা করেন। কিন্তু তখন তিনি রাজি হননি। সুতরাং আমি স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজকে (পরবর্তীকালে মঠের অন্যতম অধ্যক্ষ) অনুরোধ করি বইটি দেখে দেবার জন্য। তিনি তখন মায়াবতীতে। আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে কয়েকটি পরিচ্ছেদের পাণ্ডুলিপি ডাকযোগে পাঠাতে বলেন। তিনিই পরে স্বামী মাধবানন্দকে অনুরোধ করেন যে, যেহেতু সিস্টার নিবেদিতার জীবনী লেখার ব্যাপারে কিছু কিছু বিতর্ক সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে অতএব তিনি সম্পাদনা করলে আর কেউ কোন মন্তব্য করতে পারবে না। অবশেষে স্বামী মাধবানন্দ সম্মত হন। কয়েকটি পরিচ্ছেদ পাঠের পর তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেন। আমি মঠে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে ফাইলটি আমায় দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—আমি তাঁর সংশোধনগুলি গ্রহণ করব কিনা। আমি খুবই বিস্মিত বোধ করি। কিন্তু তিনি মন্তব্য করলেন—"দেখ তুমি লেখিকা, বইটি তোমার। আমার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তোমার মিল না থাকতে পারে।" অপরের লেখার সমাদর কিভাবে করতে হয়, তাঁর কাছে শিখলাম। এরপর তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে বইটি আগাগোড়া সম্পাদনা করে দেন। এই উপলক্ষে বহুদিন তাঁর পদতলে বসে বহু মূল্যবান কথা শোনবার সৌভাগ্য হয়। অনেক কিছু তাঁর কাছে শিখি যা আমার জীবনের পাথেয় হয়ে আছে।

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত মেয়েদের প্রতিষ্ঠানগুলির ভার শ্রীসারদা মঠ বা রামকৃষ্ণ সারদা মিশনকে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত পূর্বেই নেওয়া হয়। সুদূর দক্ষিণ ভারতে ত্রিচুরে মেয়েদের যে কেন্দ্রটি ছিল, ১৯৬০ সালে সেখানে এক

উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কথা চলছিল। ঐ বছর জুলাই মাসে মহারাজ আমাদের ডেকে বলেন—"ভবিষ্যতে তোমরাই ঐ কেন্দ্র পরিচালনার ভার নেবে। সুতরাং কেন্দ্রটি দেখে তোমাদের মতামত দেবার প্রয়োজন আছে।" ঐসঙ্গে তিনি বিশেষ আগ্রহ করে আমার ও শ্রদ্ধাপ্রাণার (বর্তমান সহ-সম্পাদিকা) দক্ষিণভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থগুলি দর্শনের যথোচিত ব্যবস্থা করেন এবং ঐ বিষয়ে দক্ষিণভারতের এক সাধুর উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। এসবই তাঁর সহৃদয়তার পরিচয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য স্বামীজীর সেবাদর্শে তাঁর গভীর আস্থা ছিল। স্বাধীনতালাভের পর জাতীয় সরকার রামকৃষ্ণ মিশনে বহু আর্থিক সাহায্য করে যার ফলে মিশনের অধীনস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটে। স্বামী মাধবানন্দ দৃঢ়ভাবে বলতেন—চাঁদার খাতা হাতে করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াবার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা অনেক ভাল। রাইটার্স বিল্ডিং-এ বারবার ছোটাছুটি করতে সংকোচ বোধ করা উচিত নয়। সরকারী দানের সাহায্যে বিবিধ কাজ আরম্ভ করার জন্য তিনি বরাবর আমাদের উৎসাহ দেন। নিজেদের উপর নির্ভর করে চলবার জন্য সর্বদা প্রেরণাও দিতেন।

মঠস্থাপনের পর থেকেই তাঁর ইচ্ছা ছিল 'নির্জন মঠবাস' থেকে বেরিয়ে এসে আমরা নানাবিধ লোকহিতকর কর্মে নিজেদের নিযুক্ত করি। বলতেন—"দেখ লোকে বলবে, এদের (মেয়েদের) অনেক শক্তি আছে কিন্তু এরা নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে না।" ঐসময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে একটি প্রস্তাব আসে। প্রস্তাবটি হল দিনের বেলায় যাতে ছাত্রীরা এসে পড়াশোনা করতে পারে তারজন্য একটি ছাত্রী-আবাস স্থাপন যেখানে তাদের আহারাদিরও ব্যবস্থা থাকবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব তিনি স্বয়ং করেন। বাংলার বাইরে রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে দুটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ। আমরা ঐ দুটি বিষয়েই অক্ষমতা প্রকাশ করায় তিনি বিশেষ দুঃখিত ও নিরাশ হন, যদিও কখনো তিনি পীড়াপীড়ি করেননি।

যাই হোক, পূর্বে ১৯৫৬ সালে এণ্টালীতে সি. আই. টি. রোডে একটি কেন্দ্র (উইমেন্স ওয়েলফেয়ার সেণ্টার) স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে কলেজের ছাত্রীদের জন্য একটি ছাত্রী-আবাস, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সাধারণ পুস্তকের একটি গ্রন্থাগার, সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক বিবিধ কাজ সরকারী অনুদানে আরম্ভ হল। এই ব্যাপারে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সরকারী অনুদানে পরবর্তীকালে ঐ আশ্রমের বিভিন্ন কার্যসূচী রূপায়ণ ও সম্প্রসারণের জন্য একটি বড় বাড়ি নির্মাণের প্রয়োজন হয়। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে ঐ ভবনের ভিত্তিস্থাপন ও পরে ১৯৬৪ সালে উদ্বোধন কার্যও তিনি সম্পন্ন করেন। সেসময় তিনি মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ, শরীরও বিশেষ ভাল ছিল না।

এন্টালীতে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন আশ্রম-ভবনের ভিত্তি-স্থাপন অনুষ্ঠানে গৃহীত চিত্র।

"১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে ঐ ভবনের ভিত্তিস্থাপন ও পরে ১৯৬৪ সালে উদ্বোধন কার্যও তিনি সম্পন্ন করেন।" —পৃষ্ঠা ২০৪

এন্টালীতে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন আশ্রম-ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বামী মাধবানন্দ, সঙ্গে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী প্রমথানন্দ।

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন মাতৃভবনের ইষ্টার্ন ব্লকের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে গৃহীত চিত্র।

"আমাদের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে যখনই কোন গৃহের ভিত্তিস্থাপন অথবা উদ্বোধন কার্যের জন্য অনুরোধ জানানো হত তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে শুভ সময় নির্দিষ্ট করে দিতেন এবং নিজে উপস্থিত থেকে ঐ কার্য সম্পন্ন করতেন।"—পৃষ্ঠা ২০৫

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে নিবেদিতা স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গৃহীত চিত্র।

তবু আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করেননি। বাস্তবিক, আমাদের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে যখনই কোন গৃহের ভিত্তিস্থাপন অথবা উদ্বোধন কার্যের জন্য অনুরোধ জানানো হত তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে শুভ সময় নির্দিষ্ট করে দিতেন এবং স্বয়ং উপস্থিত থেকে ঐ কার্য সম্পন্ন করতেন।

বারাণসী সেবাশ্রমে মেয়েদের বিভাগটি ভবিষ্যতে যাতে সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা পরিচালিত হয় সেজন্য তাঁরই নির্দেশে চারজন ব্রহ্মচারিণীকে পাঠানো হল হাসপাতালের কাজে সাহায্য করতে। নানা কারণে এটি যথাযথভাবে কার্যকরী হয়নি এবং দুবছর পর আমাদের কর্মীরা ফিরে আসেন।

১৯৬১ সালে স্বামী মাধবানন্দের বিদেশ যাত্রার প্রয়োজন হয়। যাবার পূর্বে আমাদের তিনি দেখা করতে বলেন। আমরা দুজন গিয়েছিলাম। তিনি স্থির করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইগুলি বেলুড় মঠ ব্রহ্মচারী শিক্ষণ কেন্দ্রে দিয়ে যাবেন। তার পূর্বে তিনি ঐ বইগুলির মধ্যে শ্রীসারদা মঠ গ্রন্থাগারের জন্য কতকগুলি ইচ্ছামতো নির্বাচন করে নিতে বলেন।

ঐ সময় রামকৃষ্ণ সারদা মিশনকে মেয়েদের ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের জন্য জমিসহ একটি বাড়ি দান করতে চান এক সদাশয় ভদ্রলোক। এই প্রস্তাব মহারাজকে জানালে তিনি সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদন করে আমাদের অগ্রসর হতে উৎসাহ দিলেন। আমাদের অভিপ্রায়, বিদেশযাত্রার পূর্বে তিনি কলেজটির উদ্বোধন করে যান। উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ১৯৬১ সালে ১০ই মার্চ ঐ উদ্বোধনকার্য তিনি সম্পন্ন করেন।

তাঁর যাত্রার সময় ক্রমশঃ এগিয়ে এল। ৬ই এপ্রিল সকালবেলা বেলুড় মঠে যাই, অন্যান্য সেণ্টার থেকেও দু-একজন আসেন। মহারাজের সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে ভাল দেখাচ্ছিল না। আমাদের মঠের জমির নক্সা (site plan) এবং ভবিষ্যতে যে মন্দির নির্মিত হবে তারও একটি নক্সা তাঁকে দেখাই। ভেবেছিলাম হয়ত তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু তিনি আগ্রহ সহকারে দেখে কয়েকটি মন্তব্য করেন। ৭ই এপ্রিল তাঁর রওনা হবার কথা। মঠে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার খুবই ইচ্ছা হচ্ছিল। এমন সময় প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার ফোন এল যে তার এবং আমার যাবার কথা হয়েছে। সুতরাং সে ও আমি মঠে যাই। ঘর ভর্তি লোক। আমরা ঘরে ঢুকতে ইতস্ততঃ করছিলাম, স্বামী শাশ্বতানন্দ আমাদের প্রবেশ করতে বলেন। মহারাজ বেশ প্রসন্নভাবেই তাকালেন এবং দু-একটি কথা বললেন। ৭-৩০ মিনিটে তিনি যাত্রা করলেন।

১৯৬২ সালের ১৯শে জানুয়ারী তিনি ফিরে আসেন এবং তার পূর্বেই স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের দেহত্যাগ হয়।

অতঃপর ১৯৬২ সালে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ মঠের অধ্যক্ষপদে বৃত হন। কিন্তু ঐ বছরই ১৬ই জুন তাঁরও দেহত্যাগ হয়। স্বামী মাধবানন্দ

মহারাজ ঐ বছরের আগষ্ট মাসে অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন।

৮ই ডিসেম্বর ১৯৬২, দক্ষিণেশ্বর মঠে সন্ন্যাসিনীদের আবাসগৃহ উদ্বোধন করার কথা দিলেও ঘটনাক্রমে ঐ সময় তিনি হাসপাতালে থাকায় তা সম্ভব হয়নি। সুতরাং অন্য একদিন মঠে আসার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—"কিছু বলতে হবে নাকি?" আমি জানাই—কোন অনুষ্ঠান তো নেই! তবে অন্যান্য সেণ্টার থেকে সকলেই আসবেন, যদি আপনি কিছু বলেন তো খুবই ভাল হয়। উত্তরে উনি বলেন—"বলা-টলা আর আসছে না।"

১৯৬৩ সালে ৬ই অক্টোবর, রবিবার মহারাজ স্বামী অভয়ানন্দের সঙ্গে মঠে আগমন করেন। তাঁর শরীর বিশেষ সুস্থ ছিল না, তবু লাইব্রেরী হলে বসে প্রায় আধ ঘণ্টার উপর কথা বলেন। প্রথমেই আমাদের মঠের অধ্যক্ষাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"ওঁর কাছ থেকে সব মায়ের কথা শুনবে। হয়ত তেমন intellectual কিছু হবে না, কিন্তু intellect নিয়ে কি হবে? বাস্তবিক, মা আর ঠাকুর এক। আমি আগে অত বুঝতে পারিনি। শরৎ মহারাজের এক চিঠিতে জানলাম। শরৎ মহারাজ লেখেন—'মা আর ঠাকুরকে অভেদ বলে জানবে আর আমাদের তাঁদের দাস বলে মনে করবে।'

"তোমরা সকলেই ভাগ্যবতী। ঠাকুর ও মা-ই তোমাদের এনেছেন। তাঁদের উপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যাও। উন্নতি হবে। এখন মঠ ছোট রয়েছে বটে কিন্তু পরে খুব বড় হয়ে যাবে। স্বামীজীর ইচ্ছাতেই বেলুড় মঠ হয়েছে—এ মঠও তাই। অনেক বড় বড় কাজ এখান থেকে হবে। তবে তোমাদের খুব চেষ্টা করতে হবে। তা নইলে লোকে বলবে—এদের এত ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু কিছু করছে না। তাঁদের উপর বিশ্বাস রেখে অহঙ্কার-অভিমান ত্যাগ করে কাজ করতে হবে। অহঙ্কার থাকলে কাজ হয় না। কেনোপনিষদে বেশ সুন্দর করে এ-কথা ছোট গল্পের মাধ্যমে বলা হয়েছে।"

অতঃপর তিনি সংক্ষিপ্তভাবে ঐ কাহিনীটি ব্যাখ্যা করলেন এবং বললেন—"তোমরা সকলেই বাড়িঘর ত্যাগ করে এসেছ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যস্ত হয়ো না। বাড়িতে হয়ত তোমাদের অনেকের comforts প্রভৃতি ছিল, সব তো ছেড়েই এসেছ। খুব একটা তপস্যা—এসব এখন হবে না। স্বামীজী সেসব বুঝেই মোটা ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁদের উপর বিশ্বাস রেখে যে কোন কাজই ব্রহ্মবুদ্ধিতে করবে। স্কুলের কাজ হোক কিংবা রোগীর সেবা—সবই 'তাঁকে' করা হচ্ছে—এই দৃষ্টিতে করবে। সব কাজের মধ্য দিয়ে তাঁদেরই সেবা করা হচ্ছে। যারা আগে বা পরে এসেছে সকলেই বেশ humility বা বিনয়ের সঙ্গে কাজ করবে। বাবুরাম মহারাজ বেশ বলতেন—'কিরে শিখতে এসেছিস না শেখাতে এসেছিস?' বেলুড় মঠে যাঁরা আগে এসেছিলেন তাঁদের

অনেকে অত পড়াশোনা করেননি কিন্তু পরে যারা এম. এ. পাশ করে এসেছে তাদের লক্ষ্য করে taunt করে ঐসব বলতেন।"

"উপনিষদের বা গীতার যেটুকু দরকার সেটুকু ভাল করে জেনে নিয়ে সেইমতো কাজ করা।...তাঁদের উপর জ্বলন্ত বিশ্বাস নিয়ে পড়ে থাক। এক জন্মে না হলে কোটি কোটি জন্মে হলেও ক্ষতি নেই। তোমাদের পিছনে ঠাকুর ও মা আছেন। তোমরা যখন কোথাও কিছু বলবে সেইভাবেই বলবে অর্থাৎ তোমরা মায়েরই প্রতিনিধি। বেলুড় মঠের পিছনে ঠাকুর ও মা আছেন, এ মঠের পিছনেও তাঁরাই আছেন। অবশ্য তোমাদের মধ্যে সকলের শক্তি যে এক তা নয়, শক্তির তারতম্য আছে। সকলের মধ্যে একই চৈতন্য ঠিক কিন্তু তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন নানাভাবে। বিভুরূপে তিনি সকলের মধ্যে রয়েছেন, কিন্তু শক্তির 'তর' 'তম' ভেদে তাঁরই প্রকাশ। তাই যার যেরকম দেহ-মন সেইভাবে তাঁকে প্রকাশ করবে।"

—এইভাবে কথা বলে মহারাজ সেদিন উপস্থিত সকলের মধ্যেই একটি বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করেছিলেন।

মঠের অধ্যক্ষ হবার পর আমাদের উপর তাঁর অজস্র স্নেহ নানাভাবে বর্ষিত হয়েছে। আমরা যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, প্রতিবারই তিনি আমাদের সময় দিয়ে সংশয় নিরসনপূর্বক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্যের অভিমুখী করেছেন। প্রভূত আধ্যাত্মিক প্রেরণাও তিনি দিতেন।

তাঁর অসামান্য হৃদয়বত্তার সঙ্গে ছিল গভীর সৌজন্যবোধ। কোন তুচ্ছ অনুরোধও তিনি উপেক্ষা করতেন না, যা তাঁর মতো উচ্চস্তরের একজন ব্যক্তির মধ্যে সচরাচর দুর্লভ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, একদিন আমরা অনেকেই তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে বেলুড় মঠে যাই। তিনি তখন বিশ্রাম করছিলেন তাই সেবককে দিয়ে বলে পাঠান—তাঁর পক্ষে এখন দেখা করা সম্ভব নয়। আমরা ফিরে আসি। তারপরই একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে মহারাজ তাঁকে অনুমতি দেন। ভেবেছিলেন, হয়ত আমরা মনে কষ্ট পেয়েছি। তিনি নিজে বিশেষ দুঃখিত হয়ে সেই রাত্রেই আমাদের কাছে ঐ ঘটনাটি স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের মারফত ফোনে জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। পরেও আমরা দেখা করতে গেলে আবার আমাদের কাছে ঐ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, প্রেসিডেণ্ট হবার পরও তিনি কলকাতায় আমাদের সব কেন্দ্রগুলিতে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন। এমনকি, আমাদের অনুরোধে একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানেও তিনি পদার্পণ করেন। কী অগাধ করুণা ও স্নেহ আমাদের প্রতি তাঁর ছিল।

১৯৬৩-৬৪ সালে স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। ঐ

উপলক্ষে তিনি মঠ-মিশনের বহু কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন এবং ঐ সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা আমাদের সঙ্গে করেছেন। বহু কথা মনে আসছে কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সেগুলি উল্লেখ করলাম না।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের যে 'Women's Conference' হয় সেই সভায় তাঁর সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ সভায় যোগ দিতে না পারায় তিনি বিশেষ দুঃখিত হন।

আরেকটি ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

১৯৬৫ সালের জুন মাসে আমরা কয়েকজন সন্ন্যাসিনী পুরী যাই এবং 'রথযাত্রা'তে যোগদানের সুযোগ হয়। ঐ সময় একটি বিশেষ শুভদিনে তাঁকে একখানি পত্র লিখি কেবল আমার প্রণাম জানাবার উদ্দেশ্যে। আমি লিখেই ছিলাম, পত্রের উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই।

জুলাই মাসে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে আমরা তিনজন যখন দেখা করতে যাই তখনো তিনি বিশেষ অসুস্থ। কোনরকমে বাইরের বারান্দায় একটি চেয়ারে বসে ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করছিলেন। সকলকেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে যেন কথাবার্তা বলা না হয়। আমিও সে বিষয়ে সচেতন ছিলাম। প্রণাম করে ওঠামাত্র জিজ্ঞেস করলেন—"কি কেবল সোজা? না, সোজা-উল্টো দুই-ই?" অর্থাৎ পুরীর রথযাত্রা। আমি উত্তর দিলাম—"শুধু সোজা।" যদি একটু দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতাম, তিনি খুশি হয়ে কিছু কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু তাঁর শরীরের কথা মনে করে আমি সে সুযোগ গ্রহণ করিনি। তাঁর সঙ্গে সেই শেষ সাক্ষাৎ।

নিম্নে বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের (কলেজের) উদ্বোধনী অভিভাষণটি উদ্ধৃত করা হল। অভিভাষণটি দুজন সন্ন্যাসিনী সঙ্গে সঙ্গে লিখে নেন এবং লেখাটি ভাল করে তাঁকে দেখিয়ে তাঁর স্বাক্ষর নেওয়া হয়।

জননীগণ ও বন্ধুগণ,

আজ আমি বাস্তবিক এখানে কোন বক্তৃতা দিতে আসিনি। আজ এখানে যে পুণ্য কার্যের সূত্রপাত হচ্ছে তাতে যোগদান করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি।

আপনারা জানেন, আমাদের স্বামীজী মহারাজ, স্বামী বিবেকানন্দ আকাঙ্ক্ষা করতেন মেয়েরা স্বাধীনভাবে নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করবে। তাঁর ইচ্ছা ছিল বেলুড় মঠের মতো মেয়েদেরও মঠ হবে। আমাদের মঠের উপর তাঁর নির্দেশ ছিল যতদিন মেয়েরা উপযুক্ত না হয় ততদিন পুরুষরা দূরে থেকে সাহায্য করবেন। পুরুষদের অধীনে কাজ করলে মেয়েরা অনেকটা তাদের অধীন হয়ে পড়ে—পুরুষরা তাদের দাবিয়ে রাখতে চায়—তার জন্যেই স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল মেয়েদের মঠ মেয়েরা নিজেরাই পরিচালনা করবে—

পুরুষরা ওতে interfere করবে না।

এটা খুব আনন্দের কথা যে ১৯৫৪ সালে মা ঠাকরুণের শতবার্ষিকীর সময় দক্ষিণেশ্বরে মেয়েদের একটি মঠ আমরা স্থাপন করতে পেরেছি এবং ধীরে ধীরে সব দায়িত্ব তাদের উপর দেওয়া হয়েছে। এই মঠ বেলুড় মঠের counterpart. ছেলেদের জন্য যেমন বেলুড় মঠ—মেয়েদের জন্য তেমনি সারদা মঠ। বেলুড় মঠের সঙ্গে যেমন লোকহিতকর কাজের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন আছে, তেমনি এই সারদা মঠের সঙ্গেও লোককল্যাণকর কাজের জন্য রামকৃষ্ণ সারদা মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ এইসব কাজ আত্মোপলব্ধির অপরিহার্য অঙ্গ। রামকৃষ্ণ মিশনের মতো এই মিশনও সেবাকাজ করবে—তবে পুরুষরা যেসব কাজ করেন এঁদের পক্ষে ঠিক সেসব কাজ করা হয়ত সম্ভব হবে না কিন্তু এঁরা নিজেদের sphere-এ—যেমন মেয়েদের ও শিশুদের মধ্যে—সেবার কাজ চালাবেন।

ঠাকুর ও মা উভয়ের নামে প্রতিষ্ঠিত এই মিশনের উপর যে তাঁদের আশীর্বাদ রয়েছে তা বিশেষভাবে বোঝা যাচ্ছে। কারণ এই মিশন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অযাচিতভাবে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বদান্যতায় ৩৩ বিঘা জমি ও এই বাড়ি পাওয়া গেছে। এখানে মেয়েদের একটি আবাসিক কলেজের জন্য তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে দান করেন। এতেই বোঝা যাচ্ছে ঠাকুর ও মা-ঠাকরুণের আশীর্বাদ এঁদের উপর রয়েছে। একেবারে প্রথমেই একটি Degree কলেজ স্থাপন তাঁদের ইচ্ছাতেই সম্ভব হয়েছে। আমাদের বেলুড় মঠের বিদ্যামন্দির ১৯৪১ সালে—প্রায় বিশ বছর হল হয়েছে—এতদিন পর্যন্ত কেবল Intermediate standard-ই ছিল। মাত্র গত বৎসর Degree course-এর ব্যবস্থা হয়েছে। এঁরা প্রথম থেকেই Degree কলেজ আরম্ভ করতে পারছেন, এটা খুবই আনন্দের কথা। আর আপনারাও আজ সকলে উপস্থিত হয়েছেন—আজ ছুটির দিন নয়, week-day, তা সত্ত্বেও আপনারা উপস্থিত হয়ে এঁদের উৎসাহ ও আনন্দ বর্ধন করেছেন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, হাওয়া কোন দিকে বইছে। এঁদের মধ্য দিয়ে যেন তাঁর ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়, আজ এই প্রার্থনাই করি।

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন যে আলাদা হল তার কারণ স্বামীজী এটা চেয়েছিলেন। কেউ হয়ত বলতে পারেন, "তোমরা ওদের আলাদা করে হাত গুটিয়ে নিচ্ছ।" তা কিন্তু নয়। আর এঁরাও যে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করব বলে আলাদা হতে চেয়েছিলেন তাও নয় বরং একসঙ্গে থেকে খুশিই ছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করুক—দূরে থেকে আমরা সাহায্য করব। তাই আমাদেরই পরামর্শে এঁরা রামকৃষ্ণ সারদা মিশন গঠন করেছেন। এই মিশন legally আলাদা হলেও মূলত এক।

নিজেদের বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁরা সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সব কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করুন, এই প্রার্থনা। আর মিশন হবার সঙ্গে সঙ্গেই এঁরা কলেজের কাজটা take up করেছেন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, দক্ষিণেশ্বরের মঠে বসে থেকে আত্মোন্নতিকেই এঁরা সর্বস্ব মনে করেননি, বরঞ্চ নিজেদের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসেছেন এই সব কাজ করবেন বলে। আপনারা দেখবেন, এঁরা আমাদের থেকে কম ভালভাবে কাজ করবেন না।

যদিও ঠাকুরের ইচ্ছা ও আশীর্বাদেই রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে সাফল্য হচ্ছে তবু আমাদের মনে হয়, রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ যখন আরম্ভ হয় তখন অতি সাধারণ সম্বল নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। তখন যে উপাদান নিয়ে ছেলেরা যোগদান করেছিল—অবশ্য স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইদের কথা আলাদা, তাঁরা ছিলেন আধিকারিক পুরুষ—কিন্তু third generation অর্থাৎ আমরা যখন join করি তখন যে qualifications ছিল এঁরা তার অনেক বেশি যোগ্যতা ও qualification নিয়ে যোগদান করেছেন। এঁদের কর্মশক্তি আছে—আর এঁদের হৃদয় আছে। সুতরাং কায়মনোবাক্যে এঁরা যত ঠাকুরের কাজ করবেন তত ঠাকুর ও, মার আশীর্বাদ এঁদের উপর পড়বে। বাস্তবিক, আমাদের দিয়েই যেসব বড় বড় কাজ ঠাকুর, মা ও স্বামীজী করিয়ে নিয়েছেন—তাতেই আমরা বিস্মিত হয়েছি। হয়ত সে কাজ করবার সঙ্কল্পও আমাদের ছিল না—তা সত্ত্বেও আমাদের উপর সে কাজের ভার পড়েছে এবং তা সম্পন্নও করতে হচ্ছে। আমরা বাড়াতে চাইনি, তা সত্ত্বেও কাজ বেড়ে গেছে।

ঠিক তেমনিভাবে আমি বিশ্বাস করি এঁদের দিয়েও ঠাকুর, মা, স্বামীজী অনেক বড় বড় কাজ করিয়ে নেবেন। এঁদের উপর ঠাকুর, মা, স্বামীজীর আশীর্বাদ তো আছেই, আরও অজস্রধারায় বর্ষিত হোক, এই প্রার্থনাই আমি করি।

এতদিন রামকৃষ্ণ মিশন আপনাদের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করে এসেছে, এঁরাও যেন সেই শ্রদ্ধা ও প্রীতি পায়, এইটেই আমি চাই। এঁরা তো অনেক বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে ঘরসংসার ত্যাগ করে এসেছেন, এই সব কাজ করবেন বলে নিজেদের life dedicate করেছেন। এখন আপনাদের দিক থেকে যেন এঁদের উপর সহানুভূতি থাকে—এঁদের কোন অভাব আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে তা যথাসম্ভব দূর করবেন। আপনারা এঁদের দেখে যাবেন আর নিজের নিজের sphere-এ যথাসম্ভব সাহায্য করবেন।

পুরুষরা পুরুষদের কাজ করুক আর মেয়েরা মেয়েদের কাজ করুক। আমরা দেখতে চাই এঁরা যেন রামকৃষ্ণ মিশনকেও ছাড়িয়ে যান—আর এঁদের কাজ ক্রমশই বেড়ে যাবে। ঠাকুরই এঁদের চালিয়ে নেবেন। আপনারা এঁদের
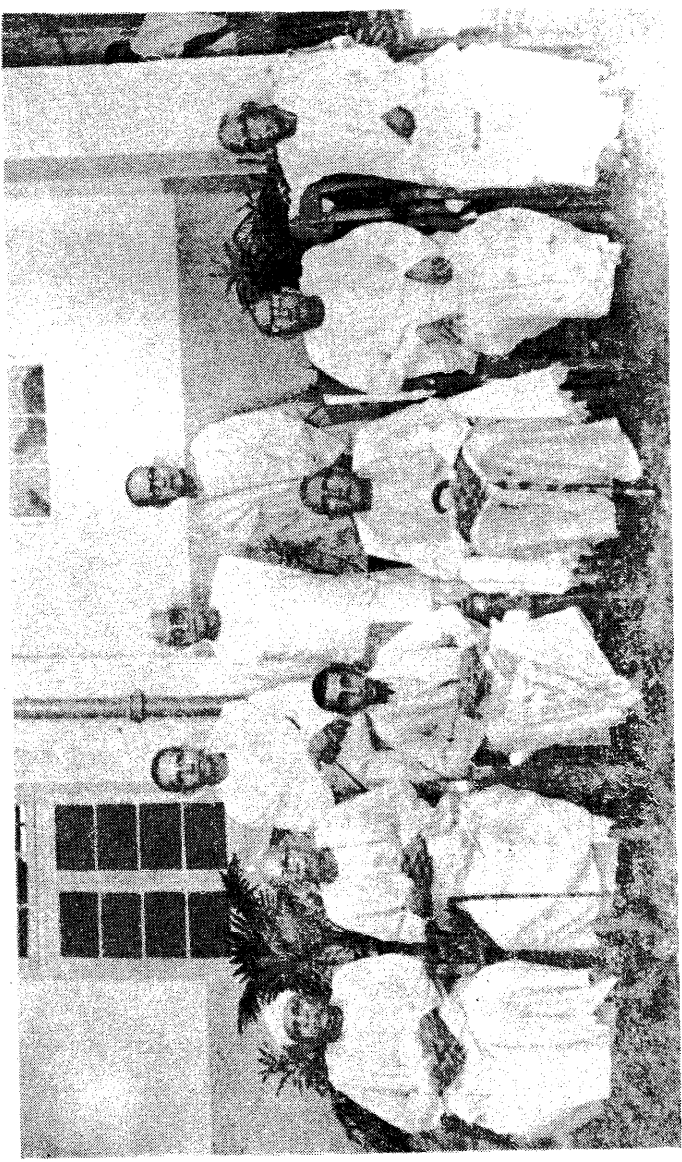
উপবিষ্ট (বাম হইতে দক্ষিণে) ঃ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী অসীমানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ ও স্বামী অভয়ানন্দ।

দণ্ডায়মান (বাম হইতে দক্ষিণে) ঃ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী তেজসানন্দ—রামকৃষ্ণ সারদা মিশন মাতৃভবনে একটি উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে গৃহীত চিত্র।
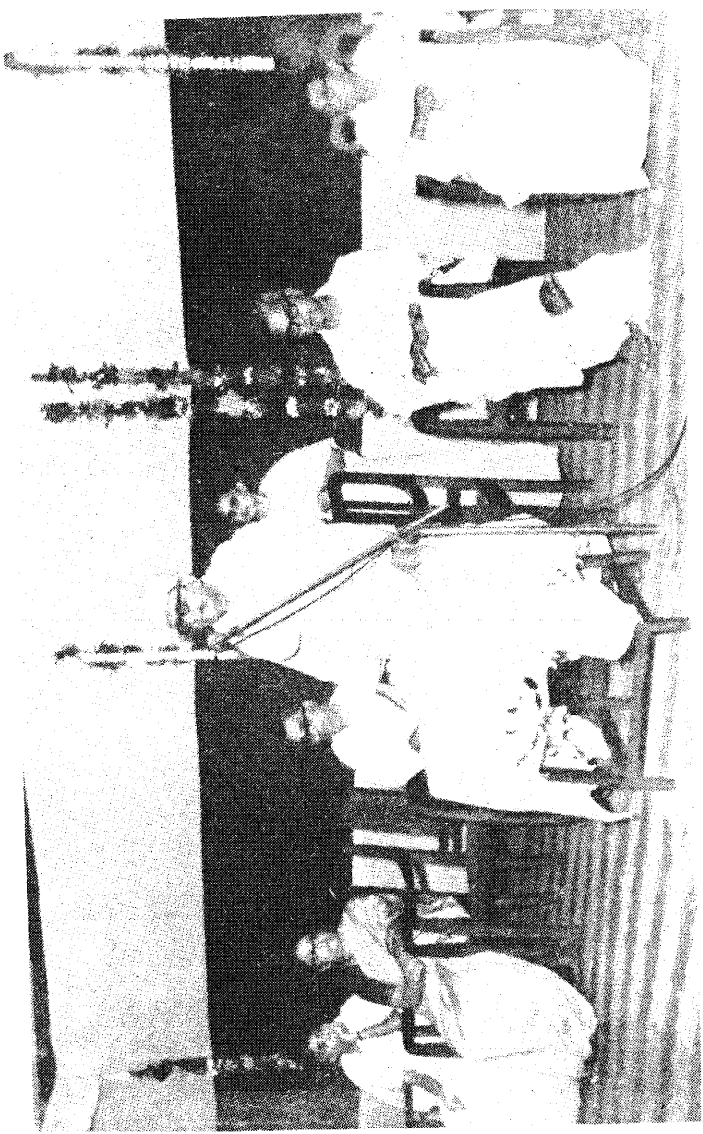
"১৯৬১ সালের ১০ই মার্চ ঐ উদ্বোধনকার্য তিনি সম্পন্ন করেন।"—পৃষ্ঠা ২০৫

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণদানরত স্বামী মাধবানন্দ। মঞ্চে উপস্থিত প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রী অশোক কুমার সরকার, ডঃ রমা চৌধুরী প্রমুখ।

সাহায্য করুন, শক্তিবর্ধন করুন, আপনাদের কাছে আমার এই অনুরোধ। আজকে এই প্রতিষ্ঠান এতটুকু দেখছেন, দশ বছর পরে তা বিরাট হয়ে যাবে। এই বিদ্যাভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে আমরা, স্বামীজী আমাদের উপর যে ভার দিয়ে গিয়েছিলেন, আমাদের সেই কর্তব্য পালন করা হয়েছে মনে করে আনন্দ অনুভব করছি। ঠাকুর, মা, স্বামীজীর আশীর্বাদ এঁদের উপর যেমন বর্ষিত হবে, তেমনি আপনারা যাঁরা এঁদের সাহায্য করবেন তাঁদের উপরও সমভাবে বর্ষিত হবে। আপনারা তো সংসার ত্যাগ করে আসতে পারবেন না—অতএব এতে লোকসানও কিছু নেই।

এভাবে পরস্পরের প্রীতি ও সহযোগিতাতেই এ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। এখন যেমন রামকৃষ্ণ মিশন ফলে-ফুলে বেড়ে উঠেছে, তেমনি আপনাদের এবং এঁদের পরস্পরের সম্প্রীতির ফলেই এই বিদ্যাভবনও সুন্দর হয়ে গড়ে উঠবে। এতে আপনাদেরও জীবন ধন্য হবে, এঁরাও সেবা করে ধন্য হবেন।

আজ এই শুভদিনে এই প্রার্থনাই করছি (মনে মনে তো সব সময় প্রার্থনা আছেই) যে স্বামীজীর নামে এই বিদ্যাভবনের শ্রীবৃদ্ধি হোক।

উপরে বর্ণিত স্মৃতিকথাটি ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কর্তৃক প্রকাশিত ষান্মাষিক পত্রিকা 'সম্বিত', সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ সংখ্যায় 'Reminiscences of Swami Madhavananda' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে।

হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো

স্বামী ইজ্যানন্দ

জহরী যেমন দৃষ্টিপাতেই মণিমুক্তা চিনিতে পারে, জগতের মা, শ্রীশ্রীসারদা-দেবীও এক পলকেই ব্রহ্মচারী নির্মলকে দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন : "বাবা, এ যে হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।" মন্তব্যটি এক প্রাচীন সন্ন্যাসীর নিকট শুনিয়াছিলাম। তখন উপরোক্ত মন্তব্যটির মর্মার্থ অনুভবের বা মূল্যায়নের বয়স ও জ্ঞান হয় নাই।

প্রথম দর্শনেই নির্মল মহারাজকে দেখিয়া মনের উপর একটি ছাপ পড়িয়াছিল। প্রণাম করিয়াই চলিয়া আসিয়াছি। দ্বিতীয় দিন প্রণাম করিতেই বলিয়া উঠিলেন : "প্রথম দিন প্রণাম করেছ, আবার যখন অন্যত্র যাবে সেদিন প্রণাম করলেই চলবে, রোজ রোজ প্রণাম করতে হবে না।"

Relief Office-এর কাজ শেষ করিয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছি মার ঘাটে, দেখি মাধবানন্দজী স্নান করিয়া কাপড় পরিতেছেন। আমি গঙ্গায় নামিয়া তাঁহার গঙ্গাস্নানের কাপড়টি কাচিয়া সিঁড়িতে রাখিয়াছি মাত্র—দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"আমার কাপড় তুমি কেন কাচলে?" এইখানেই এর শেষ নয়! বিকালে ডাক পড়িল এবং প্রচ্ছন্ন রাগতভাবে সেই এক প্রশ্ন। উত্তরে অতি বিনীত-ভাবে বলিলাম : "সময় পেলেই বয়স্ক সাধুদেরও সেবা করে থাকি। আপনি তো বাবার মতো, আপনার সামান্যতম সেবা করে তো কোন অন্যায় করেছি বলে আমার মনে হচ্ছে না।" সাথে সাথে প্রত্যুত্তর আসিল : "সকলের সেবা করতে পার আমার নয়।" নির্মল মহারাজ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কথা বলিতেন এবং একটু তোৎলামি আসিয়া যাইত রাগ হইলে। বুঝিলাম অত্যন্ত স্বাবলম্বী, তিতিক্ষাবান সাধুর ব্রতভঙ্গের জন্যই এই রোষ।

দক্ষ হৃদয়বান প্রশাসক ছিলেন তিনি। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক, এক কথায় কর্ণধার। তাঁর ঘরের আসবাবপত্র ছিল অতি সাধারণ—একটি বহু পুরাতন camp chair পুরাতন গেরুয়া কাপড় দিয়ে ঢাকা, তাহাতে বসিয়াই সাধারণ সম্পাদকের সমস্ত দিনের কাজকর্ম, চিঠিপত্র লেখা, প্রুফ্ রিডিং, বই লেখা, কথামৃত-পাঠ ইত্যাদি সবই হইত। চিঠিপত্র লেখা বা চিঠির খসড়া করার জন্য একটি পুরাতন hard board এবং চার আঙুল লম্বা একটি পেন্সিল। ব্যবহৃত কাগজের বা খামের সাদা অংশটিতেই চিঠিপত্র ইত্যাদি খসড়া করিতেন। যুদ্ধের সময় সমস্ত জিনিষই দুষ্প্রাপ্য ছিল। প্রতিক্ষেত্রেই

তাঁর মিতব্যয়িতা ছিল অনুকরণযোগ্য। আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়। পূজনীয় মাধবানন্দজী ছিলেন এর মূর্ত বিগ্রহ। জটিল সমস্যা নিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত সমাধান পাওয়া যাইত। শাস্ত্র এবং শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কথার মর্মার্থ স্বল্প এবং সহজ কথায় বোঝানোর ক্ষমতা ছিল তাঁহার অপূর্ব। একটি নূতন ব্রহ্মচারী হইতে প্রবীণ সন্ন্যাসী প্রত্যেকের কথা তিনি অতি ধৈর্যের সাথে শুনিতেন এবং সদুত্তর সাথে সাথে দিতেন। সকলেই তাহাতে তৃপ্ত হইতেন। তাঁহার কাছে সকলের ছিল অবারিত দ্বার।

তাঁহার বিছানার চাদর ছিল একটি পুরাতন কাপড়। জলপানের জন্য এক কমণ্ডলু জল বসিবার বাম দিকে থাকিত। সিঙ্গাপুর যাইতেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, আশ্রম-পীড়া করা চলিবে না। নিজের বিছানাটি সঙ্গে যাইতেছে। একটি পুরাতন ছেঁড়া কাপড়, চাদর হিসাবে যাহা ব্যবহার করিতেন, সেটিও যাইবে। আমরা বিছানা বাঁধিবার সময় সেটির পরিবর্তে একটি সাদা চাদর দিয়াছিলাম, সেজন্য মনে আছে, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। সাধারণ সম্পাদক যাইতেছেন সিঙ্গাপুরের মতো বড় কেন্দ্রে, সেখানে তাঁহারা মহারাজের জন্য বিছানার ব্যবস্থা করিবেন না, ইহা কি ভাবা যায়? নিত্য ব্যবহারের জিনিষপত্র, কমণ্ডলু একটি বাঁশের ঝুড়িতে (নানান জায়গায় দড়ি দিয়া বাঁধা) লইয়াছেন দেখিয়া একজন সাধু বেতের ঝুড়িতে জিনিষপত্র গুছাইয়া দিবার প্রয়াস করিবামাত্র ধমক: "বিলাসিতায় তোমাদের ঝোঁক এত বেশী!" উত্তরে আমি বলিলাম: "কুলিরা মাল নিয়ে যাবে, মাঠের মধ্যে ঝুড়ি ভেঙে সমস্ত জিনিষ পড়ে যাবে। আপনি ফিরে এলে আপনার ঝুড়িতেই সব থাকবে। বেতের ঝুড়িটি যাঁর তাঁকে ফেরত দেব।" আমেরিকা যাবার সময় পূজনীয় শুদ্ধানন্দজী মাধবানন্দজীকে একটি পার্কার পেন দিয়াছিলেন। তাহাতে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ইংরাজী তর্জমা ও অন্যান্য বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া কত গ্রন্থের সম্পাদনাও হইয়াছে। কলমটির নিব মোটা হইয়া গিয়াছে। চেকে সই করিয়াছেন—চেকটি ফেরত আসিয়াছে। কারণ তাঁহার 'Madhavananda' স্বাক্ষরের 'dh' বোঝা যাইতেছে না। কপালে ধমক খাওয়া আছে জানিয়াও আমি চেকটি লইয়া যাইলাম এবং খুব নম্র ভাবেই বলিলাম: 'dh' জড়ানো রয়েছে। যতীশ্বরানন্দজীর কলমটি দিয়ে সই করলে বোঝা যাবে।" আর যায় কোথা! "জান এই কলমটি আমি যখন আমেরিকা যাই সুধীর মহারাজ আমাকে দিয়েছিলেন।" একটি মজার ব্যাপার ছিল তাঁহার চরিত্রে—ধমক, বকুনি সহ্য করিয়া যদি কেউ সাথে সাথে যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে পারিত, তিনি কিন্তু সন্তুষ্ট হইতেন।

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ শাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে কিন্তু সাধারণ মানুষের তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ১৯৪৪ কি ৪৫ সাল—সমস্ত শরীরে দারুণ

চর্মরোগ। হাতের ও পায়ের পাতা এবং মুখটি মাত্র বাকী, কচি কলাপাতায় শুইয়া আছেন। শীতকাল। শরীরের উপর কাঠের ঘেরা টোপ, (ছোট ছেলেদের যেমন দেওয়া হয়) তাহার উপর কম্বল। স্বাভাবিক অবস্থায় যে রকম কর্মধারা চলিত—কথামৃত পাঠ, সাধারণ সম্পাদকের কাজকর্ম, বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সাধুরা নানান সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁহার নিকট আসিয়াছেন ইত্যাদি—সব কাজই ঠিক মতো চলিতেছে—কোন ব্যতিক্রমই নাই। মনের উপর কতখানি কর্তৃত্ব থাকিলে এইরূপ অবস্থা হয়!

দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁহার অতি নিকটে থাকার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এক মিনিটের জন্য সময়ের অপব্যবহার করিতে দেখি নাই।

"বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদূনি কুসুমাদপি" কথাটির উপমা মাধবানন্দজীর জীবন। বাহিরের ব্যক্তিত্ব ও কঠোরতা ভেদ করিয়া আসল মানুষটিকে দেখার চেষ্টা যিনি করিয়াছেন, তিনিই পাইয়াছেন কল্যাণকামী বন্ধু ও মাতৃসুলভ স্নেহ ভালবাসা!

তিতিক্ষার মূর্তবিগ্রহ ছিলেন স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। সহজে কাহাকেও তাঁহার আধ্যাত্মিক সম্পদ জানিতে দেন নাই। একাধারে শাস্ত্রের মর্মবেত্তা, তত্ত্বদর্শী, বৈদান্তিক,—অপরদিকে একনিষ্ঠ ভক্তিমান। অপূর্ব মণি-কাঞ্চন সমাবেশ। জগতের মা ঠিকই চিনিয়াছিলেন: হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

নমি বারংবার*

স্বামী অমলানন্দ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌ ।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্‌ ॥

—পরমানন্দ মাধবকে প্রণাম করি। প্রণাম জানাই সপার্ষদ, সপরিকর শ্রীরামকৃষ্ণকে।

স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ছিলেন রামকৃষ্ণ সংঘের নবম অধ্যক্ষ। রামকৃষ্ণ মিশনের উত্তরাধিকার এবং দায়ভার যাঁরা কার্যে পরিণত করেছেন স্বামী মাধবানন্দজী তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

১৯৩৮ থেকে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ অবধি (মধ্যে দু বছর বাদ দিয়ে) তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের সাধারণ সম্পাদকের গুরু দায়িত্বভার বহন করেছেন। কমবেশী এই তেইশ বছর বিশ্বের তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বিশেষ যুগ। এই সময়ে যে যুগান্তকারী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ চলেছে তা অনেকেরই স্মরণে আছে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত স্বাধীনতা পেল। তার আগে কয়েক বছর গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ভারতের পূর্বপ্রান্তে ১৯৪২-এর cyclone—সে এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। Bengal Cyclone Relief, Burma Evacuate Relief, Calcutta Air Raid Precaution, Great Calcutta Relief, দেশ বিভাগ, নোয়াখালিতে দাঙ্গাদুর্গতদের ত্রাণ—এসব আজকের দিনের তরুণদের কাছে অজ্ঞাত হলেও পঞ্চাশোত্তর প্রবীণদের কাছে একটি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা—যাকে বলা যেতে পারে এক একটি ভয়ঙ্কর বিভীষিকা। ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে, দেশের সেই ক্রান্তিকালে স্বামী মাধবানন্দজীর উপযুক্ত নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশন তার মহান দায়িত্ব পালন করেছিল।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে মস্ত বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল—রামকৃষ্ণ মিশন কোন্‌ পথে এগুবে। স্বামী মাধবানন্দজীর প্রেরণায় স্বামী

---

* স্বামী মাধবানন্দ শতবার্ষিকী কমিটি এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ এ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে প্রেসিডেন্সী কলেজ ডিরোজিও হলে ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ তারিখে অনুষ্ঠিত স্বামী মাধবানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ থেকে গৃহীত।

নির্বেদানন্দ, স্বামী বিমুক্তানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীবৃন্দ স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রয়াসে স্বাধীনোত্তর ভারতে কয়েকটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ভারতবর্ষে শিক্ষা হল ধর্মভিত্তিক। যে ধর্ম মানুষের দেবত্বকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত করতে পারে। স্বামীজী বলেছিলেন, "Be and Make"—নিজে মানুষ হও এবং অপরকে মানুষ হতে সাহায্য কর। রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল নীতি হল—man making বা মানুষ তৈরী। স্বামী মাধবানন্দজীর স্বপ্ন ও অনুপ্রেরণা এবিষয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের পরবর্তী পরিচালকবর্গকে প্রভুতভাবে সাহায্য করেছে। সকলেই জানেন, বেলুড় (সারদাপীঠ), নরেন্দ্রপুর, রহড়া, পুরুলিয়া, মাদ্রাজ প্রভৃতি জায়গায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আজকে যেগুলি সকলের কাছে অতি পরিচিত নাম—স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের প্রত্যক্ষ প্রেরণার ফল। স্বামী মাধবানন্দজীর প্রেরণা ও নেতৃত্বে আর্তত্রাণে, চিকিৎসা-সেবায় ও শিক্ষায়—সর্বক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল।

পূজনীয় মহারাজের বহুমুখী প্রতিভার কথা আমরা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করি। 'বেদান্ত পরিভাষা' অতি দুরূহ গ্রন্থ। পূজ্য মহারাজ তার অনুবাদ করেছেন। সেই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখেছেনঃ "I congratulate most heartily Swami Madhavananda on his English translation of the 'Vedanta Paribhasa'.···The Public owe a deep debt of gratitude for this work to Swami Madhavananda. It is also very gratifying to see that the Ramakrishna Mission that has become so famous in the country for social service has also turned its attention towards intellectual service in such a significant work as the present one and many other translations that the learned author has done."

একটি ব্যক্তিগত ঘটনা দিয়ে উপসংহার করছি। স্বামী মাধবানন্দের মতো পণ্ডিত ও অধ্যাত্মজগতের অতি উচ্চস্তরের ব্যক্তিত্ব যখন সংঘের অধ্যক্ষ হলেন তখন কেউ কেউ ভাবছিলেন তিনি হয়ত শুধু উচ্চশিক্ষিত এবং বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই মন্ত্রদীক্ষা দেবেন। এইরকম যখন চিন্তা-ভাবনা চলছিল তখন একটি ঘটনার মাধ্যমে সমাধান বেরিয়ে এল। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেলঘরিয়া আশ্রমের কাছেই থাকেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর মঠে মন্ত্রদীক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সমস্যা হল—দীক্ষার্থীদের কিছু

পড়াশোনা করা দরকার। কিন্তু বৃদ্ধ প্রায় অন্ধ। আগে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পড়েননি। এবং এখন একেবারে পড়তে পারেন না। বৃদ্ধার দৃষ্টিশক্তি ভাল, তবে তিনি পড়াশোনা জানেন না। কাজেই অসম্ভব জেনেও তাঁদের বিশেষ অনুরোধে পূজনীয় মহারাজকে উপরের সব বিষয় জানিয়ে একটি পত্র দিলাম এবং সেই বৃদ্ধকে বললাম আপনি বেলুড় মঠে পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে দেখা করুন। স্বামী প্রমথানন্দ তখন মহারাজের প্রধান সেবক। তাঁর কাছে সব কথা বলে পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে দেখা করলেন—বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। মহারাজের কাছে গিয়ে তাঁরা শুধু কাঁদছেন। পূজনীয় মহারাজ তাঁদের ব্যাকুলতা দেখে কৃপা করতে রাজী হয়ে গেলেন। কোন পঞ্জিকা না দেখে তিনি বললেন, "গঙ্গাতীরে ঠাকুরের স্থানে কোন দিনক্ষণ দেখতে হবে না। তোমরা চলে এস।" দু-চার দিনের মধ্যে তাঁদের দীক্ষা হয়ে গেল। এ খবর যখন পেলাম তখন ভাবলাম এর নাম গুরুশক্তি। শ্রীশ্রীঠাকুরেরই শক্তি এসেছে পূজনীয় মহারাজের ভেতরে।

সংঘগুরু শ্রীশ্রীঠাকুরেরই প্রতিনিধি। বস্তুতঃ আমরা দেখেছি, ঠাকুর-মা-স্বামীজী ছাড়া মাধবানন্দজীর সত্তার মধ্যে অন্য কিছু ছিল না। সেই মহান সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে সতত আমার প্রণাম নিবেদন করি।

উপরে বর্ণিত স্মৃতিকথাটি পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা ষ্টুডেন্টস্ হোম, বেলঘরিয়া, কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকা 'বিদ্যার্থী', ১৩৯৬ সংখ্যায় সম্পূর্ণ আকারে মুদ্রিত হয়েছে এবং সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ থেকে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব স্মরণিকা' ৩৭তম বর্ষ, ১৩৯৭ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

পূত-সঙ্গের অনুষঙ্গে*

স্বামী শান্তানন্দ

পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। তখন তিনি সংঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কিন্তু ঐ সময়ে সে কাজ থেকে দু'বছরের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই তিনি বাঙ্গালোরে এসেছিলেন এবং এখানকার আশ্রমে চার-পাঁচদিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অতি সম্মানিত সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী এবং কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণতার সুখ্যাতি-সম্পন্ন অতি দক্ষ প্রশাসক।

বিভিন্ন সূত্রে তাঁর দৃঢ়তা ও কঠোরতার কথা শুনেছিলাম বলে স্বভাবতঃই আমি তাঁর বিষয়ে কিছুটা ভয়ে ভয়ে ছিলাম। কিন্তু যখন খুব কাছে এসে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলাম আমি তাঁর স্বতন্ত্র এক ছবি দেখতে পেলাম। পৌঁছানোর পর, অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি বারান্দায় বসে কথা বলছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী ত্যাগীশানন্দজী কয়েকজনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন—তাঁরা চিঠি লেখার সময় পান না। তা শুনে, মাধবানন্দজী তৎক্ষণাৎ বললেন, "হ্যাঁ, যাদের অল্পই কাজ, তারা দু-একটা চিঠি লেখার সময় পায় না—আর যাদের প্রচুর কাজ করতে হয়—তারা অনেক চিঠি লেখার সময়ও করে নেয়।" প্রথমে আমি ভেবেছিলাম তিনি রসিকতা করছেন বা ব্যঙ্গ করছেন! কিন্তু পরে বুঝলাম তিনি যা বলেছেন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই বলেছেন। তাঁর কথা আমার কাছে আপাতবিরোধী মনে হয়েছিল। আমি কিছুক্ষণের জন্য ধাঁধায় পড়ে গেলাম। পরবর্তী জীবনে আমি কেবল এর অর্থই বুঝিনি—এর অতি সুস্পষ্ট অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও উপলব্ধি করেছি। সময় থাক বা না থাক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এটা হচ্ছে এক-একজনের মানসিক প্রবণতা। মন যখন সক্রিয় থাকে একই সঙ্গে অনেক কাজ করা যায়; আলস্যপ্রবণ ব্যক্তির কাছে সামান্য কাজও কঠিন বলে মনে হয় এবং সে মনে করে তার বড় সময়াভাব। স্বামী মাধবানন্দজী নিজে তাঁর এই কথার একজন জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন। সংঘের মুখ্য প্রশাসকের গুরুদায়িত্বসমূহ পালনের মধ্যে থেকেই তিনি মূল্যবান

---

* স্বামী শান্তানন্দ রচিত এবং সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক Private circulation রূপে প্রকাশিত 'Glimpses of Holiness' নামক পুস্তক থেকে অনূদিত।

বাংলা অনুবাদ—বাবুরামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কয়েকটি শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করার সময় করে নিয়েছিলেন এবং সেইসঙ্গে তাঁকে নিজের হাতে বহুসংখ্যক চিঠিও লিখতে হত। পরবর্তী জীবনে আমি নিজেই তাঁর এমন কয়েকটি চিঠি পেয়েছিলাম।

তাঁকে খেতে দেবার সময় ছাড়া (আমার এখনও মনে আছে, তিনি খুব সামান্যই খেতেন এবং সে সময়ে কথা কম বলতেন) আমি তাঁর কাছ থেকে সতর্কভাবে দূরে থাকতাম। কিন্তু তাঁর অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে কিছুটা অন্য রকমের ঘটনা ঘটে গেল। দুপুরের প্রথম দিকে রান্নাঘরের ছোট্ট ভাঁড়ারে বসে আমরা কয়েকজন ব্রহ্মচারী পরবর্তী আহারের জন্য তরকারী কুটছিলাম এবং নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলাম। হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজন লক্ষ্য করলেন ঘরের দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে আছেন। সে সময় অধিকাংশ ব্যক্তিই মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বিশ্রাম করছিলেন এবং আমরা সেখানে কেউ আসবে তা ভাবিনি। কে এসেছেন তা দেখবার জন্য তাকালাম। অবাক হয়ে দেখলাম স্বামী মাধবানন্দজী হাতে কিছু কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অচিরেই তিনি একটি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন : "এখানে তোমাদের মধ্যে কেউ সংস্কৃত জান?" অন্যেরা নিরুত্তর রইল। আমিও থাকতে পারতাম, কিন্তু আমার মন অন্য একদিকে আমাকে প্ররোচিত করল। স্বামী ত্যাগীশানন্দজী সংস্কৃতের একজন বড় পণ্ডিত—আর তাঁর 'চ্যালা' হয়ে আমরা সকলেই যদি অজ্ঞতা প্রকাশ করে চুপ করে থাকি তাহলে তাঁর প্রতি খুবই অন্যায় করা হবে—এই কথা ভেবে স্বামী ত্যাগীশানন্দজীর খ্যাতির একজন স্বনিযুক্ত অভিভাবক হয়ে আমি সাহস করে বলে উঠলাম—"হ্যাঁ মহারাজ, সামান্য কিছু জানি।" উত্তরটা সত্য বলেও ধরে নেওয়া যেত এবং একই সঙ্গে স্বীকৃতি-সূচক নয় বলাও চলত। আমার পক্ষে খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছিল বটে! কিন্তু এর ফলে কি ঘটবে আমি তা অনুমান করিনি! তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন "তা'হলে আমার সঙ্গে এস।" মোহাচ্ছন্ন হয়ে আমি তাঁর পেছনে পেছনে তাঁর ঘরে গেলাম। সেখানে তিনি আমাকে একটা চেয়ারে বসালেন এবং নিজে চারদিকে কাগজপত্র ছড়ানো তাঁর চৌকীতে বসলেন। তারপর বললেন, "আমার কাছে এগুলো ছাপতে দেওয়া 'মীমাংসা পরিভাষা' পুস্তকের প্রুফ্। এগুলো সংশোধন করতে হবে। তোমাকে এর একটা কপি দিচ্ছি—তুমি সেটা পড়ে যাও—আর আমি প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে থাকি।" স্বভাবতঃই এই প্রস্তাব আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত একটি বোমার মতো মনে হল। মূল পাঠ বেশ কঠিন এবং পরস্পর-সংযুক্ত দীর্ঘ শব্দসমষ্টিতে পরিপূর্ণ। বেচারা আমাকে তাই পড়ে যেতে হবে! সংস্কৃত জানা বিষয়ে না ভেবে উত্তর দেওয়ার মূল্য আমাকে এইভাবেই দিতে হচ্ছে! সেই মুহূর্তেও আমি অক্ষমতা জানাতে পারতাম এবং ক্ষমা চেয়ে এই 'ফাঁদ' থেকে পালাতে পারতাম। কিন্তু তা

পারলাম না ; অহমিকা, হঠকারিতা অথবা নিজেকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস তার বাধা হয়ে দাঁড়াল। তাই ভদ্রভাবে পশ্চাদপসরণ না করে—পড়তেই আরম্ভ করলাম। ভাগ্য অবশ্য এই সাহসীকে আনুকূল্য দেখাল। অবাক হয়ে গেলাম এই দেখে যে, এখানে সেখানে কিছুটা হোঁচট খেলেও আমি বেশ ভালভাবেই পড়ে গেলাম। তাঁর যেমন খ্যাতি—তাতে আমার সেই সব বিচ্যুতিতে হতাশ হয়ে আমাকে রূঢ়ভাবে বিদায় দিতে পারতেন, তার বদলে তিনি প্রসন্নচিত্তে এবং সস্নেহ রসিকতার সঙ্গে সেই সব স্থানগুলিতে আমার ভুল শুধরে দিতে লাগলেন। যথাসময়ে কাজটি যখন শেষ হল এবং আমি বিরাট এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম—তিনি বরং আমার প্রশংসা করলেন, বললেন: "সাবাস!"

এই অপ্রত্যাশিত দুঃসাহসিক কাজ আমার মনে তাঁর সম্বন্ধে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এল। আমি আরও সাহস পেলাম—এবং আর কারও মতামতের দ্বারা চালিত না হয়ে তাঁকে আরও আপন করে ভাবতে শুরু করলাম। এমন কি তাঁকে কিছু কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার ঝুঁকিও নিয়ে ফেললাম। তিনি অকপটে তৎক্ষণাৎ সেই সব প্রশ্নের সুচিন্তিত উত্তরও দিলেন। সে সময়ে আমার একটা সমস্যার সমাধান করে দিতে অথবা সে বিষয়ে তাঁর পরামর্শ দিতে বলেছিলাম। আমি বললাম, "মহারাজ, আমার একটা অসুবিধার কথা বলি। সবাই জানেন আমাদের ভোরে উঠে ব্রাহ্ম মুহূর্তে ধ্যানে বসতে হয়—যার জন্যে আমাদের অন্ততঃ সাড়ে চারটার সময় ঘুম থেকে ওঠার কথা। আমার সমস্যা হল, যদি আমি সেই ভোরে জেগে উঠি তাহলে কেবল যে ধ্যানে বসার সব সময়টা ঘুম ঘুম বোধ করি তা নয়, দিনের বাকি সময়টাও সারা শরীরে ও পেশীতে যন্ত্রণা বোধ করি এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকি। কিন্তু আমি যদি আধঘণ্টার মতো পরে ঘুম থেকে উঠি, তাহলে সব কিছু আমার আয়ত্তে থাকে। এ ব্যাপারে কি করা যায়?" তাঁর নিজের যেমন কঠোর এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন প্রণালী ছিল বলে জানতাম—তাতে স্বভাবতঃই প্রত্যাশিত ছিল, তিনি আমাকে বকবেন এবং দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আরও জোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে বলবেন এবং হয়ত বা আমাকে বাস্তব কিছু পরামর্শ দিয়ে প্রয়োজনীয় কর্তব্যপথে পরিচালিতও করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি একেবারে অন্যরকম উত্তর দিলেন। শান্তভাবে তিনি বললেন: "হ্যাঁ, শরীরের একধরনের মিতব্যয়িতা আছে—তা লক্ষ্য করা দরকার। যদি আধঘণ্টা বেশী ঘুমিয়ে থাকলে তোমার সুবিধে হয়—তাহলে তাই কোরো।" তাঁর এই চমকপ্রদ উত্তরের বিষয়ে দ্রুত ভেবে নিয়ে আমি বললাম: "কিন্তু যদি আশ্রমাধ্যক্ষ এবিষয়ে কিছু বলেন ··?" আবার তাড়াতাড়ি এর অনুকূলে একথাও বললাম, "এখানে স্বামী ত্যাগীশানন্দজী আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন—তিনি

কিছু করতে আদৌ বাধ্য করেন না। কিন্তু অন্য কোন কেন্দ্রে গেলে কি হবে তাই ভাবছি।” স্বামী মাধবানন্দজী কি উত্তর দিলেন? তিনি যা বললেন তা আমি ভুলতে পারব না। তিনি একটি সন্ন্যাসী-সংঘের প্রশাসনিক প্রধান (যাঁর দায়িত্ব নির্দেশ-বিধি ঠিকমতো অনুসৃত হচ্ছে কিনা দেখা) আমার মতো একজন ব্রহ্মচারীকে বললেন, “যদি কোন আশ্রম-প্রধান আপত্তি জানান—তাঁকে বলবে আমি তোমাকে এইভাবে বলেছি।” অল্পবয়সীদের প্রকৃত প্রয়োজন-রক্ষা বিষয়েও তাঁর কি সুবিবেচনা, বাস্তব সাধারণ বুদ্ধি তাৎক্ষণিক সক্রিয়তা !

এই বিষয়টির পর থেকেই অপরে তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে যে কঠিন ও বিরূপ চিত্র অঙ্কিত করে দিয়েছিল তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন। এ থেকে আমি এক শিক্ষাও লাভ করলাম। “শোনা কথায় পরিচালিত হয়ো না। কোন কিছু সিদ্ধান্ত নেবার আগে নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাও।” আরো অনেক ঘটনা ঘটেছিল—যা আমার অভিজ্ঞতাকে দৃঢ় করেছিল, এবং এভাবেই মনে আমি তাঁর অধিকতর নৈকট্য অনুভব করতে থাকি।

সে-সময় আমার কাছে কম দামের একটি পুরনো বক্স ক্যামেরা ছিল। আমার মাথায় এল, তাঁর কয়েকটি ছবি তোলার চেষ্টা করতে হবে। তিনি কি রাজী হবেন? সাধারণতঃ তাঁর মতো লোকের এই প্রয়াসে অনিচ্ছা প্রকাশ করারই কথা। খুব সতর্ক হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে খুব ইতস্ততঃ করে অনুরোধ জানালাম। আবার আশ্চর্য হলাম! তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুরোধে রাজী হলেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে তিন কি চারবার তাঁর ভঙ্গী পরিবর্তন করতে অনুরোধ করা হল—দেহের এবং মুখের—কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে, একটু অন্যভাবে ইত্যাদি। সব সময়েই সামান্যতম অধৈর্যতা না দেখিয়ে এবং আগ্রহী বালকের মতো সহযোগিতা করে তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করলেন।

এসবে উৎসাহিত হয়ে সকল আশ্রমবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে আর একটি অনুরোধ জানালাম। আমরা সকলে তাঁর সঙ্গে মিলিত হব এবং তাঁকে কিছু প্রশ্ন করব। তিনি কি অনুগ্রহ করে কিছুটা সময় দিতে পারবেন? তিনি সানন্দে রাজী হলেন। একদিন নৈশাহারের পর তিনি আমাদের প্রকৃতপক্ষে পুরো একঘণ্টা সময় দিলেন। কিন্তু সেই একঘণ্টা যখন শেষ হল—তখন রাত দশটা—তিনি সেই আলোচনা আর দীর্ঘায়িত হতে দিলেন না। বললেন, “এখন এই যথেষ্ট, তোমরা সকলে ঘুমোতে যাও।” হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে তিনি কোমল-কঠোর দুই-ই হতে পারতেন।

নিজের বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। স্নানের জন্য তিনি আধ বালতি গরম জল চেয়েছিলেন, কিন্তু ভালবাসার বশে তাঁকে তিন-চতুর্থাংশ ভর্তি গরম জলের বালতি দেওয়া হয়েছিল। তা দেখে, শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে তিনি

অতিরিক্ত সিকি বালতি জল ফেরত নিয়ে যেতে বললেন। প্রকৃত প্রয়োজন থেকে একটুও বেশী নয়!

এরপর তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করলাম বেলুড় মঠে। তখন তিনি সাধারণ সম্পাদক-রূপে কাজে ফিরেছেন। আমাকে তখন প্রথম সাধুজীবনের শপথ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা নিতে হবে। সেই সময় তাঁকে ব্যস্ত প্রশাসকরূপে কর্মরত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলাম এবং জানতে পেরেছিলাম ভুলপথে চলা ব্যক্তিদের প্রতি তিনি কিরূপ কঠোর হতেন। আমি নিজে দেখেছিলাম একজন অল্পবয়সী সাধু তাঁর কাছে কোন এক সুবিধা পাবার জন্য অনুরোধ জানাতে এসেছিলেন। স্বামী মাধবানন্দজী তাঁকে প্রয়োজনীয় উত্তর দিলেন এবং বললেন,—"ঠিক আছে, এখন তুমি যেতে পার।" বলেই তিনি তাঁর নিজের কাজ পুনরায় শুরু করলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি সেখানেই থেকে গেলেন ও আবার অনুরোধ জানাতে চেষ্টা করলেন। এতে তীক্ষ্ন ভর্ৎসনার সুরে তিনি বললেন, "আমি তোমায় চলে যেতে বলেছি—তুমি যাবে কি?"

এই ঘটনা দেখেও আমি নিজে কিন্তু নিবৃত্ত হইনি। সে-সময়ে আমি শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন জায়গা সবেমাত্র পড়তে শুরু করেছি। এই গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটিই একটু মিশ্র অর্থবহ—তাই তার প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রয়োজন ছিল। একদিন রাতে প্রায় ৯টা ৪৫ মিনিটের সময়—বেশীর ভাগ সাধুরাই তাঁদের ঘরে বিশ্রামের জন্য চলে গেছলেন, আর আমি মিশন হেড কোয়ার্টারের অফিসের সামনে পায়চারী করছিলাম। উপরের দিকে তাকিয়ে দোতলায় তাঁর ঘরে আলো জ্বলতে দেখলাম। সেই ঘরের দরজা অল্প খোলা রয়েছে তাও দেখলাম। ঝোঁকের মাথায় আমার মনে এক সংকল্প জাগল—আমি এখনই তাঁর কাছে গিয়ে আমাকে সাহায্য করার অনুরোধ জানাতে পারি। এটা অসময় হলেও তাঁর দরজায় টোকা দেওয়া স্থির করে ফেললাম! "কে ওখানে? ভেতরে এস। কি চাই তোমার?"—[তিনি প্রশ্ন করলেন।] একটি ইজিচেয়ারে বসে তিনি কোন বই পড়ছিলেন। সামান্য ভীত স্বরে তাঁকে আমার প্রার্থনা জানালাম। আমার পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই, তিনি কোনরকম আশ্চর্যের ভাব বা বিরক্তি না দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুরোধে সাড়া দিলেন। শ্লোকটি ব্যাখ্যা করবার পর তিনি রসিকতা করে একটি মন্তব্যও করলেন—যদিও তাতে তাঁর নিজস্ব গাম্ভীর্য বজায় ছিল। ভাগবত গ্রন্থের প্রণেতা এবং শ্লোকের সংশ্লিষ্ট অর্থের উল্লেখ করে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ভদ্রলোকের কঠিন কঠিন শব্দ বা বাক্য ব্যবহারের একটা প্রবণতা ছিল।"

এর কয়েকবছর পরে তিনি আমাকে স্বামী সোমানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম কি ছিল খুঁজে বের করতে লেখেন। স্বামী সোমানন্দজী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের একজন শিষ্য এবং বহুদিন আগেই দেহরক্ষা করেছিলেন। কোন

লেখায় এই তথ্যটি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হয়েছিল। একজন ভক্তের (তিনি ঐ স্বামীজীর পূর্ব বাসস্থান বিষয়ে বিশেষ অবহিত) সহায়তায় ঐ সন্ধান চালানো হল। সে ছিল প্রকৃতই এক অনুসন্ধান! কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সেই স্বামীজীর কয়েকজন আত্মীয় তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল এবং তাঁর [পূর্বাশ্রমের] নামও জানা গেল। স্বামী মাধবানন্দজীকে তা জানানো হল। তিনি এক চিঠিতে খুব তাড়াতাড়ি এক প্রাপ্তিসংবাদও দিয়েছিলেন। যেমন তিনি লিখতেন—তাঁর নিজের হাতে লিখেছেন—"সাবাস! সুন্দরভাবে কাজটি সম্পন্ন করেছ।"

আশ্রম প্রাঙ্গণে নবনির্মিত মন্দির উৎসর্গ উপলক্ষে তিনি পুনরায় বাঙ্গালোরে এসেছিলেন। তাঁর বহু বিষয়ে অনুরাগের মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়েও গভীর ও সক্রিয় আগ্রহ ছিল। তাই এই মন্দির উৎসর্গানুষ্ঠানের শুভ সময় বিষয়ে তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তাঁর উত্তর ছিল—"যাঁরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁদের পক্ষে অমুক অমুক সময় হচ্ছে উপযুক্ত সময়। আর যাঁরা ভক্তির পথে চলেন, তাঁদের পক্ষে যে কোন সময়ই শুভক্ষণ।" এসময়েই তাঁর বাঙ্গালোরে অবস্থানকালে তিনি 'Astrological Magazine' পত্রিকার সুপরিচিত সম্পাদক ডক্টর বি. ভি. রমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন। এঁর সঙ্গে তাঁর জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ে কিছু পত্রালাপ হয়েছিল। নিজের সম্মান বা আনুষ্ঠানিকতার কথা না ভেবে, এবং তাঁর [ডঃ বি. ভি. রমনের] আশ্রমে আসার প্রত্যাশা না করে একটি দিন স্থির করে তাঁকে সম্পাদক মশায়ের কার্যালয়-তথা-বাসভবনে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারে একটি ঘটনা ঘটেছিল—তা অন্যের কাছে তুচ্ছ মনে হলেও আমার পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তাঁদের কথাবার্তার ফাঁকে ডক্টর রমন কফির কথা বলেছিলেন এবং শীঘ্রই তা দেওয়া হয়েছিল। যাঁরা নিয়মিত তৃপ্তি সহকারে কফিপান করতেন আমি তাঁদের মধ্যে একজন ছিলাম। ঠিক সেই সময়েই প্রায় পক্ষকাল ধরে আমি এবিষয়ে কিছুটা কৃচ্ছ্রতা পালন করছিলাম। তাই আমাকে যখন কফি দেওয়া হল, তখন ভদ্রভাবে হলেও বোধহয় কিছুটা গর্বভরে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তা নিলাম না। আমি নিশ্চিত ছিলাম স্বামী মাধবানন্দজী—(যিনি শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবনচর্যার জন্য সুপরিচিত একজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সন্ন্যাসী এবং যিনি আশ্রমেও কফি খেতেন না) হয়ত আরও জোরের সঙ্গে এবিষয়ে [কফিপানে] অনিচ্ছা প্রকাশ করবেন। কিন্তু আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না যখন দেখলাম সেই স্বামী মাধবানন্দজী গৃহকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের হাতে কাপ তুলে নিলেন এবং শান্তভাবে চুমুকও দিলেন। এই ঘটনা তাঁর পরিপূর্ণ

ভদ্রতা, সৌজন্য, আড়ম্বরহীনতা এবং সারল্য বিষয়ে আমার চোখ খুলে দিল। পূত চরিত্রের বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের এটাও ছিল একটি দিক!

এরপর ১৯৬৩ সাল এল। সেটা স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সময়। বাঙ্গালোর আশ্রমে খুব ব্যাপক আকারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং আমরা স্বামী মাধবানন্দজীকে (তখন তিনি সংঘের অধ্যক্ষ পদে আসীন) একটি আশীর্বাণী পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তিনি তখনই আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছিলেন। চিঠিতে জানিয়েছিলেন, প্রভুর কৃপায় সব কিছু সুসম্পন্ন হবে। সমগ্র অনুষ্ঠান খুব ভালভাবে সম্পন্নও হয়েছিল। শতবার্ষিকী কমিটির সচিব রূপে তাঁকে জানাবার সময় লিখেছিলাম—"মহারাজ, আপনার কৃপাপূর্ণ আশীর্বাদে আপনি যেমন বলেছিলেন সেইমতো সবকিছু সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে।" তিনি সম্পূর্ণ এক অপ্রত্যাশিত উত্তর পাঠিয়েছিলেন—"এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। যদি কোনও কৃতিত্ব স্বীকার করতে হয় কঠোর পরিশ্রমের জন্য তা তোমারই প্রাপ্য।"

আবার এক শিক্ষা লাভ করলাম! সে শিক্ষা হল আত্মবলোপের শিক্ষা—সে শিক্ষা তরুণ কর্মীদের গড়ে তোলার জন্য উৎসাহদানের শিক্ষা!

১৯৬৪ সালে মিশন হেড কোয়ার্টার থেকে আমাকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যেতে বলা হল। সে সময়ে পাশ্চাত্যে যেতে হলে আমাদের পশ্চিমী পোষাক পরে যেতে হত। বিমানবন্দরে রওনা হওয়ার ঠিক আগে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করতে গিয়েছিলাম—কারণ তিনি ছিলেন তখন সংঘগুরু। এই 'পাশ্চাত্য-পোষাক পরিহিত'-কে দেখে তিনি খুশি হয়ে মন্তব্য করলেন "তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে।" এর আগে, আমার নতুন কর্মজীবনে অবশ্যই কাজে লাগবে বলে তাঁর কাছে কিছু বিশেষ উপদেশ প্রার্থনা করেছিলাম। সংক্ষেপে হলেও অনুগ্রহ করে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে আমার প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন। শেষে তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন, "নিজস্বতা বজায় রেখো। অন্য কাউকেই তোমাকে অনুকরণ করতে হবে না।" পাশ্চাত্যে কাজ করতে গেলে এই উপদেশ বিশেষভাবেই মূল্যবান।

সেটাই ছিল স্বামী মাধবানন্দজীর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ এবং [আমার কাছে] উক্ত বাণীই ছিল তাঁর শেষ বাণী। সেই উপদেশ হয়েছিল আমার জীবনের অন্যতম প্রধান পথনির্দেশিকা—প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অপরকে পরামর্শ দিতেও যা কাজে লেগেছিল।

অবিস্মরণীয় স্বামী মাধবানন্দ*

স্বামী মহানন্দ

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে আমি কর্মীরূপে যোগদান করি। সেখান থেকে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে মূল কেন্দ্র বেলুড় মঠে আসি। স্বামী মাধবানন্দজী তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক। মঠাধীশ পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ। হিমালয়ের নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে শ্যামলাতাল কেন্দ্রে উচ্চ আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে তিনি বিরাজমান। মঠে দেখলাম রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পৃথিবীব্যাপী কর্মধারার প্রধান নিয়ামকরূপে পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজীকে।

স্বামী মাধবানন্দজীর কাছে একদিন জানতে চেয়েছিলাম, "প্রকৃত সন্ন্যাসী হতে গেলে কিরূপ হতে হবে?" উত্তর পেয়েছিলাম, "ঘটি ছেঁদা হয়ে গেলে লোকে কি করে? পুরনো ঘটি পাল্টে নতুন ঘটি কিনে আনে অথবা ঘটির ছেঁদা জায়গায় রাঙঝাল দিয়ে নেয় ইত্যাদি। কিন্তু সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে হবে— 'ঘটির নীচে দিয়ে আঠা, কোনরকমে জীবন কাটা।' অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে জীবনধারণের ন্যূনতম সংস্থানটুকু ছাড়া সমস্ত রকম বাহুল্য পরিত্যাগ করতে হবে।" এ শুধু সাধারণ ব্রহ্মচারী ও সাধুদের প্রতি তাঁর উপদেশ নয়, এ ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনচর্যার প্রধানতম নীতি। তাঁর নিজের আহার, বিহার, পোষাক, শয্যা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে এই নীতির সদা-সর্বদা প্রয়োগ যাঁরা তাঁর নিকট সান্নিধ্যে গিয়েছেন, সকলেই দেখেছেন। মাত্র একটি উদাহরণের উল্লেখ করছি যার মাধ্যমে এই নীতির প্রয়োগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। সাড়ে তিন বছর কাল পূজনীয় মাধবানন্দজীর নিকট সান্নিধ্যে থেকে বেলুড়ে মিশন অফিসে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন আমাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল বাইরে থেকে আসা চিঠির খাম, একপিঠ সাদা হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদি পরিষ্কার সাইজ করে কেটে clip দিয়ে আটকে রেখে দিতে হবে। চিঠির খসড়া, বাজে হিসাব ইত্যাদি ঐ কাগজে করতে হবে, এজন্য কোনমতেই সাদা ফুলস্কেপ্ কাগজ নষ্ট করা চলবে না।

সত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর। রহস্যছলে অথবা অতি

---

* স্মৃতিকথাটি শ্রুতলিখনের মাধ্যমে প্রাপ্ত।

বড় বাস্তব প্রয়োজনেও সত্যের পথ থেকে তিনি কোনদিন একটুও বিচ্যুত হননি। বেলুড়ে মিশন অফিসে থাকাকালীন এক মর্মান্তিক ঘটনায় আমি মাধবানন্দজীর বিস্ময়কর সত্যানুরাগ প্রত্যক্ষ করি। একজন ব্রহ্মচারী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক চেষ্টাতেও তাঁর সুস্থতার লক্ষণ দেখা না যাওয়াতে অবশেষে তাঁকে মানসিক চিকিৎসালয়ে ভর্তি করার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্রহ্মচারীটি অসুস্থ অবস্থায় প্রায়ই মনুমেণ্ট (বর্তমানে শহীদ মিনার) দেখতে যেতে চাইত। সেই ব্রহ্মচারীটিকে মানসিক চিকিৎসালয়ে ভর্তি করে ফিরে এসে সাধারণ সম্পাদক মাধবানন্দজী মহারাজকে সে খবর জানানো হল। তিনি তখন জানতে চান যে ঐ ব্রহ্মচারীটি চিকিৎসালয়ে যেতে অরাজী ছিল কিনা, অথবা পথে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল কিনা। তখন একজন বলেন যে, মহারাজ, সে প্রায়ই মনুমেণ্ট দেখতে চাইত। প্রথমে তাকে চিকিৎসালয়ে যাওয়ার কথা বলায় সে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তখন তাকে মনুমেণ্ট থেকে বেড়িয়ে আসার প্রস্তাব করা হলে সে রাজী হয়। এইকথা শুনে পূজনীয় মাধবানন্দজী যেন শিউরে উঠলেন এবং বলেন, "সে কি! মিথ্যে কথা বলে ওকে দিয়ে এসেছ?" আমার মনে হল তিনি মানসিকভাবে খুবই আঘাত পেয়েছেন। একটু চুপ করে থেকে তারপর তিনি বললেন, "যাও, মুখে গঙ্গাজল দিয়ে মুখ শুদ্ধ করে এস।"

মাধবানন্দজীকে দেখেছি, যে কোন কাজ শুরু করবার আগে ভাল করে বুঝে নিতে চাইতেন এবং একবার কোন কাজ শুরু করলে শেষ না হওয়া অবধি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে করে যেতেন। আমার অভিজ্ঞতায় তাঁকে কোনদিন রাগ প্রকাশ করতে আমি দেখিনি। কার্যগতিকে অসন্তুষ্ট হয়ত হতেন ঠিকই কিন্তু বহির্প্রকাশ ছিল কম।

সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব ও শতব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর নিত্য নিয়মিত জপধ্যান পূজাপাঠে কোন ছেদ ঘটত না। শোনা যায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একবার কাশীধামে অন্যান্য সাধু ব্রহ্মচারীদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ মাধবানন্দজীর জপধ্যানে নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। কোন কাজে যাওয়ার আগে শুভক্ষণ দেখে বেরুতেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে আসছে। একবার তিনি কুয়ালালামপুর অথবা ঐরকম কোথাও যাচ্ছিলেন। যথারীতি শুভ সময় দেখে তিনি মঠ থেকে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে অভাবিত কোন দুর্বিপাকে সিঙ্গাপুর অথবা ঐরূপ কোন একটি স্থানে তাঁকে অযথা তিনদিন আটকে থাকতে হয়। সেদেশ থেকে তিনি ফেরার পর কোন প্রাচীন সাধু তাঁকে রহস্যছলে জিজ্ঞাসা করেন, "এত পাঁজিপুঁথি দেখে শুভ সময়ে যাত্রা করার পরেও এরূপ দুর্বিপাক কেন হল?" উত্তরে স্বামী মাধবানন্দ

বলেন, "শুভ সময় দেখে যাত্রার ফলেই তিনদিন আটকে থাকার পর গন্তব্যস্থলে পেঁছান গিয়েছে, অন্যথায় যাওয়াই হত না।"

তাঁর রসবোধ ছিল অত্যন্ত গভীর। কৌতুকপ্রিয় সহাস্য মানুষটি বাহ্যিক কাঠিন্যের আবরণে সবসময় আবৃত থাকতেন। একবার তাঁর ঘরে একটা চৌকি আমাকে সরিয়ে দিতে বলেন। আমি চৌকি ধরে টানতেই চারপায়ায় ঘর্ষণজনিত বিকট শব্দ হয়। তখন মাধবানন্দজী বলেন, "ওভাবে নয়, ওকে আগে মানুষ করে তারপর টান।" অর্থাৎ চৌকির একটা দিক তুলে ধরলে তখন চৌকি মানুষের মতো দুপায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। সেই অবস্থায় টানলে কম ঘর্ষণের ফলে আওয়াজও কম হবে। আর একবার খড়গপুরে আই. আই. টি.-তে একটি অনুষ্ঠানে আমার যাওয়ার কথা। যাওয়ার আগে মাধবানন্দজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। জিজ্ঞাসা করলেন, ট্রেন কখন ছাড়বে, কখন পেঁছাব ইত্যাদি। আমি বললাম, "B. N. R. (বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে) লাইনের ট্রেন, কখন পেঁছায় কিছুই বলা যায় না।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "B. N. R. মানে জান কি?" আমি বললাম, "বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে।" মাধবানন্দজী তখন হেসে বললেন, "না, বি নেভার রেগুলার।"

মহিমা তব উদ্ভাসিত

স্বামী মিত্রানন্দ

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজীর সান্নিধ্যে এবং নির্দেশে বেশ কয় বৎসর ঠাকুরের কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে সময় যা প্রত্যক্ষ করেছিলাম তা থেকে দু একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন: "তাঁহার (স্বামী বিবেকানন্দের) নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত—সাধুর কুটির ও মন্দির দ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র।" এই আধ্যাত্মিক সাধনার বাস্তব রূপ পূজ্যপাদ মাধবানন্দজীর জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি।

সময়ের পারম্পর্য না রেখে আমি কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা করে যাচ্ছি মাত্র। একটি ঘটনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে তাই সেটি প্রথমে লিখছি। আমেরিকা থেকে brain tumor operation করিয়ে সদ্য দেশে ফিরেছেন—১৯৬২ সালের জানুয়ারী। প্রেসিডেন্ট হয়ে যে বাড়িতে ছিলেন ঐ বাড়িতেই নীচের তলায় তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা হল। একদিন সকালে জপ সেরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী গঙ্গা প্রণাম করতে গিয়ে হঠাৎ খাট থেকে নীচে পড়ে গেলেন। সেবক নতুন এসেছেন বলে একটু সঙ্কোচ ভাব ছিল। তিনি একটা শব্দ শুনলেন, লক্ষ্য করে দেখলেন মহারাজ খাটে নেই। এমন সময় আমি স্বামীজীর মন্দিরে প্রণাম সেরে বের হতেই আমাকে সেবক মহারাজ ঘটনাটি বললেন। গিয়ে দেখি জানালার ফাঁকের জায়গায় মহারাজ মাটিতে বসে জপ করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম: "কি হল মহারাজ?" চটপট উত্তর দিলেন: "আমি পড়ে গেছি, আর উঠতে পারছি না।" "একটু ডাকলেই তো সেবক এসে যেত।" মহারাজ বললেন: "একটু পরে তো আসবেই, এখন জপে আছি।" সংবাদ পেয়ে কয়েকজন সাধু এলেন। তুলতে গিয়ে দেখা গেল Collar-boneটি ভেঙে গেছে। এই ব্যথা নিয়েও বসে জপ করছিলেন। কতটা অভ্যাস থাকলে এরকম সময়েও শরীর ভুলে ঠাকুরকে স্মরণ করতে পারেন—পাঠকই চিন্তা করুন এবং এই আদর্শ নিজের জীবনে রূপায়িত করবার চেষ্টা করুন!

যখন crape bandage করা হল তখন হাসতে হাসতে মহারাজ বলছেন: "এইবার দীনেশকে (স্বামী নিখিলানন্দ) লিখে দাও; ও আমাকে 'all

perfect' করে পাঠাতে চেয়েছিল।" নিউইয়র্ক কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজী সামনের দুটি দাঁত তুলিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন, cataract mature করার পূর্বেই ঠিক করিয়ে দিয়েছিলেন—তাই ওকথা বললেন।

সমস্ত কাজকেই তিনি spiritualise করে [আধ্যাত্মিক ভাবে] নিয়েছিলেন। কাগজপত্র নিয়ে গেছি, সে কাজ সেরেই কথামৃত পড়তে লাগলেন। এমনও দেখেছি বিশেষ কাজ পড়লে তা না সেরে ব্যক্তিগত সাধন বা কাজে হাত দিতেন না। বরাবর দেখেছি মহাষ্টমীর দিন গঙ্গাস্নান করে মন্দিরে গিয়ে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে এসে প্রসাদ ধারণ করে প্রাতরাশ করতেন। ৮টা / ৮-৩০ মিঃ নাগাদ সব হয়ে যেত। একবার কোন এক শাখাকেন্দ্রের একটা বিশেষ গোলমেলে কাজ ঐদিন সকালে উপস্থিত হল। সমস্যার সমাধান করতে প্রায় সাড়ে-দশটা বাজতে চলল। আমি তখন গঙ্গাস্নান, অঞ্জলি ও প্রাতরাশের কথা বললাম। বললেন: "দাঁড়াও, যেটা সামনে হাজির হয়েছে সেটা তো আগে সারি।" শেষে এগারটায় স্নান করতে গেলেন।

একদিকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, আবার সংঘের স্বার্থে নিজস্ব ব্যক্তিগত নিয়ম পাল্টাতেও বেশী সময় লাগত না। মহারাজজী এক্‌জিমায় ভুগতেন,শেষে এমন একটা অবস্থা এল আর কর্টিজন (**Cortisone***) দেওয়া চলবে না। চিকিৎসকরা বললেন: "মাছ না খেলে আর control করা যাবে না।" অথচ ওঁকে বরাবর নিরামিষ খেতে দেখেছি। ডাক্তারদের অনুরোধে সংঘের জন্য ও অপরাপর প্রবীণ সাধুদের প্রার্থনায় মাছ খেতে রাজী হলেন। এটি ১৯৬০ সালের কথা। প্রথম মাছ দেওয়া হল, মসলা ইত্যাদি ছাড়া যা রান্না, সিঙ্গিমাছের গন্ধ—এ ঔষধই খাওয়া!

জীবনটা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা নিয়ে চলতেন। এত অসুখ বিসুখ যাচ্ছে দেখে পূজনীয় দ্বিজেন মহারাজ (স্বামী গঙ্গেশানন্দ) মহারাজজীকে বললেন: "কি আর হল এত ধর্ম করে?" মহারাজজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন: "কি আর হবে? তোমরা হেদিয়ে হেদিয়ে মরবে, আর আমি হেসে খেলে চলে যাব।" সবাই দেখলেনও কি ভাবে মঠে বিজয়া দশমীর পর একাদশী শেষ হওয়া পর্যন্ত সেবা প্রতিষ্ঠানে "হেসে খেলে চলে যাবার" অপেক্ষা করছিলেন।

মহারাজ ছিলেন খুব স্বল্পভাষী, কিন্তু কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করলে একেবারে to the point উত্তর দিতেন। কোন কিছু ভুল হলে সঙ্গে সঙ্গে তা শোধরাতে একটুও দ্বিধা করতেন না। মহত্ত্ব ও মহিমা তাঁর প্রতি কাজে কর্মে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

---

* একটি ওষুধের নাম।

স্বামী মাধবানন্দজীকে যেমন দেখেছি

স্বামী প্রমথানন্দ

৪ঠা আগষ্ট, ১৯৬২।

আজ স্বামী মাধবানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের নবম অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করলেন—স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর মহাপ্রয়াণের পর।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীর দীক্ষিত সন্তান। ১৯৪৭ সাল থেকে সহাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৭ই মার্চ, ১৯৬২ তিনি অষ্টম অধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত হন। তাঁরই নির্দেশে আমি পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ থেকে এসে তাঁর প্রধান সেবকের কাজে নিযুক্ত হই।

১৩ই জুন কলকাতা পার্ক নার্সিংহোমে তাঁর মূত্রগ্রন্থির অস্ত্রোপচার হয়। এই অস্ত্রোপচারের ফল আশানুরূপ হবে বলেই সকল চিকিৎসকের দৃঢ় ধারণা ছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। অস্ত্রোপচারের পর ১৫ই জুন থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি দেখা দেয় এবং ১৬ই জুন, সকাল ৯টায় একরূপ আকস্মিক ভাবেই মায়ের প্রিয় সন্তান মায়ের কোলেই চিরবিশ্রাম লাভ করেন।

এই অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের ফলে সমগ্র সংঘে ও ভক্তদের মধ্যে এক গভীর শূন্যতা বোধ ও হতাশার ভাব দেখা দেয়। স্বামী মাধবানন্দজীকে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখে সকলের মনে আবার নবীন উৎসাহ, প্রেরণা ও আশার সঞ্চার হয়। তিনিও যে শ্রীমা সারদাদেবীরই এক অতি প্রিয় সন্তান। স্বামী মাধবানন্দজীও আমাকে তাঁর প্রধান সেবকের কাজে রেখে দেন। এ তাঁরই করুণা।

তাঁকে এই সংঘগুরুর পদ গ্রহণ করার জন্য যখন মঠ কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করেন তখন তাঁকে বলতে শোনা গেছে, "আমি কি এই পদের উপযুক্ত? আমি তো এতদিন শুধু লেখাপড়ার কাজ যাকে বলে কেরাণীগিরি করে এসেছি।" সর্বক্ষেত্রেই ঐরূপ নিরভিমানতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। স্বামী প্রশান্তানন্দজী (ঋষি মহরাজ) তাঁর কোষ্ঠী গণনা করে ১৪ই নভেম্বর, ১৯৬২ মাধবানন্দজীকে এক পত্রে জানান, "শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ আবার একজন জীবন্মুক্ত পুরুষের অধ্যক্ষতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে বা হইতে চলিয়াছে।"

১৯৬৩ সালে আমেরিকা হলিউড বেদান্ত সোসাইটির তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী মাধবানন্দ মহারাজকে একটি চিঠিতে লেখেন ঃ
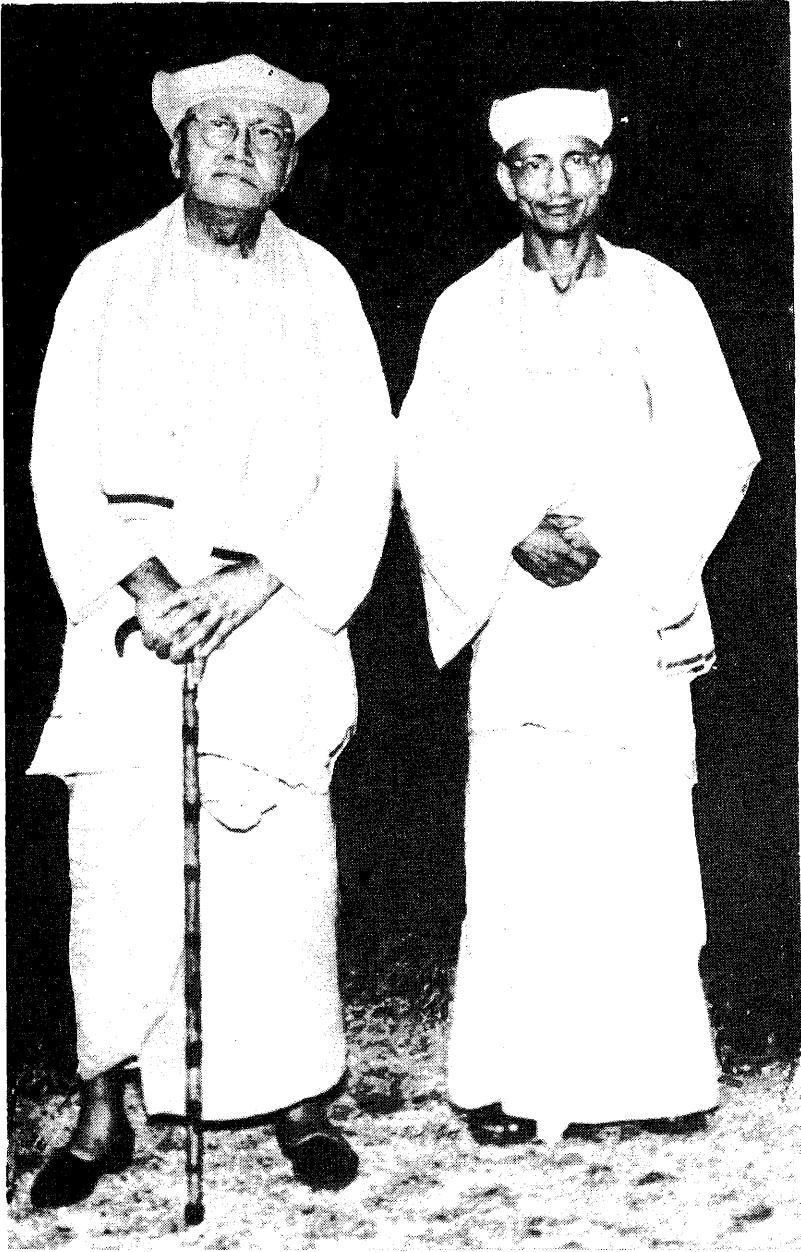
"স্বামী মাধবানন্দজী আমাকে তাঁর প্রধান সেবকের কাজে রেখে দেন। এ তাঁরই করুণা।" —পৃষ্ঠা ২৩০
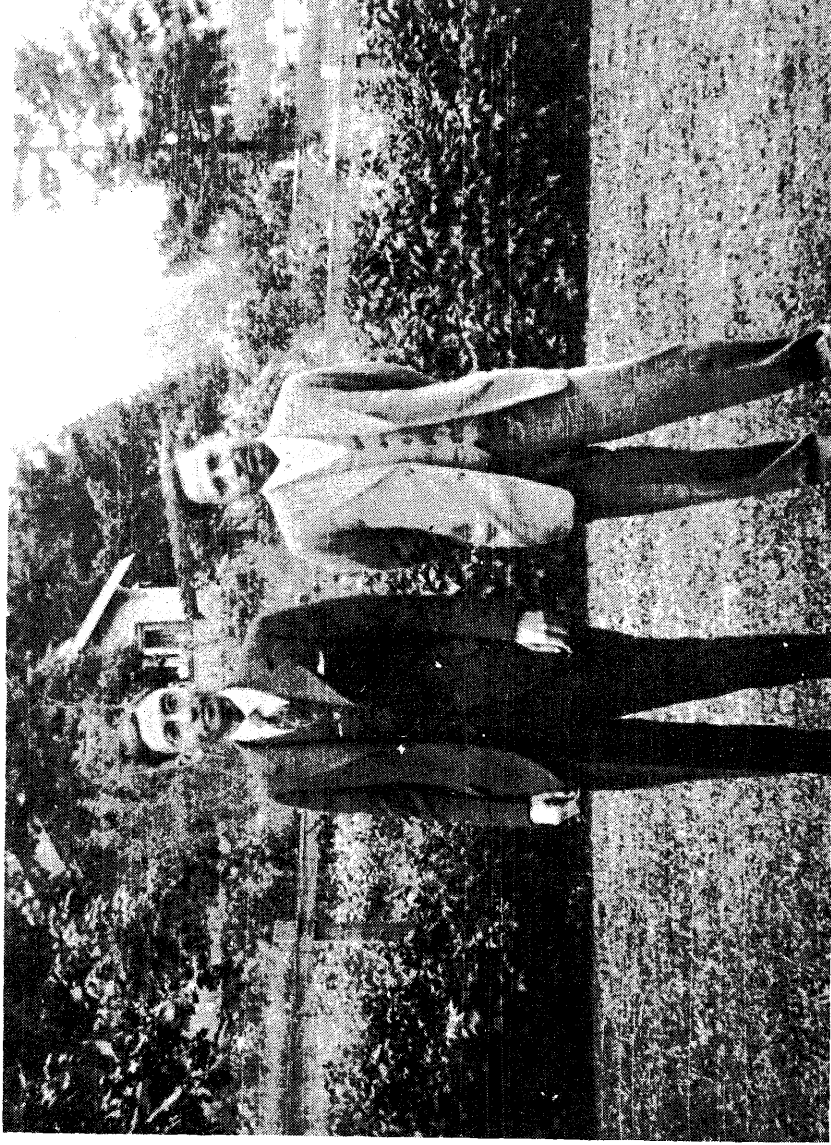
''আমেরিকা হলিউড বেদান্ত সোসাইটির তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী মাধবানন্দ মহারাজকে একটি চিঠিতে লেখেন ঃ'' —পৃষ্ঠা ২৩০

স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী প্রভবানন্দ—১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সানফ্রানসিস্কোতে গৃহীত চিত্র।

"খৃষ্টোফার ইশারউড এদেশের একজন সুলেখক। তিনি ঠাকুরের খুবই ভক্ত, [ইশারউড স্বামী প্রভবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।] পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে ঠাকুরের একটি জীবনীগ্রন্থ তিনি লিখছেন। কিন্তু তথ্যগত ও প্রামাণিকতার দিক থেকে যাতে নির্ভুল হয় সেজন্য তিনি বিশেষ চিন্তিত। আপনি এখন আমাদের সংঘগুরু। কত কাজ। কত গুরুদায়িত্ব। তা সত্ত্বেও এই বইটি সম্পাদনা করার জন্য আপনাকে একান্ত অনুরোধ না করে পারছি না। আপনি অনুগ্রহ করে সম্মতি জানালে যেমন যেমন লেখা হবে কাগজে টাইপ করে আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আপনি সময়মতো দেখে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন—এই প্রার্থনা।"

চিঠি পড়ে মহারাজ আমাকে বললেন, "দেখ দেখি অবনীর (স্বামী প্রভবানন্দজী) কাণ্ড! আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। তা ছাড়া সময়ই বা কোথায়!" তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "আমার মনে হচ্ছে ঠাকুরের সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি ভাল বই বেরোবে। কেমন করে বলি পারব না?" কাজেই লিখে দেওয়া হল টাইপ করা কাগজ পাঠিয়ে দেবার জন্য।

স্বামী প্রভবানন্দজী অত্যন্ত খুশি হয়ে উত্তর দিলেন ও সেই সঙ্গে একতাড়া টাইপ করা কাগজও পাঠালেন। মহারাজ আমাকে বললেন, "কাল সকালে জলখাবারের পর বসব। অন্য কোন কাজ হবে না। আর দেখা সাক্ষাৎ ও বন্ধ থাকবে। তুমি আমার ঘরের আলমারি থেকে যখন যেমন বলব বই নিয়ে আসবে। আর যেমন বলব বই থেকে খুঁজে বের করবে।" এইভাবে কাজ চলতে থাকে। দু-তিন দিনের মধ্যেই দেখে শুনে, প্রয়োজনমতো সংশোধন করে পাঠিয়ে দিলেন। যতটা সম্ভব লেখকের ভাষাটিই রেখেছেন। কোথাও কোথাও জিজ্ঞাসার চিহ্ন (?) দিয়েছেন। বললেন, "এতেই বুঝে নেবে—এই শব্দের বদলে অন্য একটি শব্দ দিলে ভাবটি আরও সুন্দর ভাবে ফুটে উঠবে। তা কি শব্দ দিলে ভাল হয় লেখকই ঠিক করবে।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলছেন, "অনেকে এডিট করেন--লেখকের ভাব ও ভাষা বদলে দিয়ে। এতে লেখকের অমর্যাদা করা হয়। সেটা ঠিক নয়।"

এরপর অনেকদিন আর কোন খবর নেই। হঠাৎ একদিন স্বামী প্রভবানন্দজীর এক চিঠি এসে হাজির। লিখেছেন, "আপনাকে বইটির শেষ অংশটি পাঠিয়েছি—বেশ কয়েকদিন হল। এখনও ফেরত আসেনি। এদিকে প্রেস থেকে তাড়া দিচ্ছে। যদি অনুগ্রহ করে একটু শীঘ্র পাঠিয়ে দেন তাহলে খুব ভাল হয়।" চিঠি পড়ে মহারাজ আমাকে বললেন,

"কী ব্যাপার? অবনী (স্বামী প্রভবানন্দজী) বাণ্ডিলটি পাঠিয়েছে লিখছে। অথচ পেয়েছি বলে তো মনে হচ্ছে না। তুমি তোমার দপ্তরটি ভাল করে খুঁজে দেখ। তারপর মিশন অফিসে (হেড কোয়ার্টার্স অফিস) গিয়ে

খোঁজ করে এস—অবনীর কাছ থেকে কোন রেজিষ্ট্রি এসেছিল কিনা।" সব জায়গায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেল আসেনি।

মহারাজজী সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন: "না, এখানে অনুসন্ধান করে দেখা গেল লেখার শেষ অংশটি আমরা পাইনি। হয়ত কোথাও ডাকের গোলমাল হয়েছে। যাইহোক তুমি সত্বর আর এক কপি পাঠিয়ে দাও।"

কিছুদিনের মধ্যেই শেষ অংশটি এসে হাজির। আমাকে ডেকে বললেন, "কাল সকালে আদা জল খেয়ে বসতে হবে। অনেক দেরী হয়ে গেল।" এমন ভাবে বললেন যেন ওঁরই দোষে দেরী।

নিত্যকারের রুটিন আজ যেন দ্রুত লয়ে চলেছে, যথাসময়ে ভোরে উঠে বাথরুমে গেলেন। বিষ্টু আর একজন সেবক—মহারাজজীর বিছানা ঠিক করে জপের মালা, ঘড়ি ও গঙ্গাজলের শিশি যথাযথভাবে বালিশের উপরে ও পাশে রেখে এল। আর একটি ধোয়া ধুতিও। রাতের ব্যবহৃত ধুতিটি ছেড়ে এই ধোয়া ধুতিটি পরেন।

ঘণ্টাখানেক জপ ধ্যানের পর উঠলেন। আমাকে ডাকলেন। চল ঠাকুর ঘরে যাই। হাতে লাঠি। বিষ্টুও সঙ্গে এল। প্রথমে স্বামীজীর মন্দির। তারপর মায়ের ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দির। সব শেষে ঠাকুরের মন্দির। মহারাজজীর প্রণাম করার ভঙ্গিমা শেখ্‌বার মতো। প্রথম প্রথম হাঁটু গেড়ে প্রণাম করতেন, পরে ডাক্তারের নির্দেশে দাঁড়িয়েই প্রণাম করতেন। দরজার ডানদিকে ডানহাত দরজার পাশে রেখে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। যেন দেখছেন ঠাকুর জীবন্ত জাগ্রত! সাক্ষাৎ বসে আছেন!

হেম মহারাজ—স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী প্রচণ্ড রিলিফ করে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও কর্মঠ সাধু। রিলিফের কাজে বিশেষ পারদর্শী। এখন শরীরের সমস্ত পেশী ও স্নায়ু খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। হাঁটা চলা নিষেধ। প্রেমানন্দ হলের দক্ষিণের নীচের ফোনের ঘরে আছেন। পরে এই ঘরেই স্বামী শান্তানন্দজী এসে ছিলেন।

হেম মহারাজ দু'হাতে দুটি লাঠিতে ভর দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন। শরীর এত দুর্বল, তবু সদা প্রফুল্ল মুখ। মহারাজজী দাঁড়িয়ে দু-একটি কথা বলতেন, "কি হেম কেমন আছ?" কোনদিন বলতেন, "চার পায়ে যে দাঁড়িয়ে?" এতেই হেম মহারাজ পরিতৃপ্ত হয়ে উঠতেন। মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

হেম মহারাজ বৃহস্পতিবার ৬ই জুন, ১৯৬৩ দুপুরে ১-৯ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সন্ধ্যারতির পূর্বেই সৎকার শেষ হয়।

মন্দিরে ঠাকুর দর্শন ও প্রণাম শেষ করে এসে কথামৃত পাঠ হল। প্রায় পনের মিনিট। এবার বিষ্টুর ডাক পড়ল জলখাবার আনবার জন্য। সকালে একটি ক্রিম ক্র্যাকার বা গোল্ডেন পাফ বিস্কুট। ঠাকুরের প্রসাদী একটি সন্দেশ।

আর এক কাপ দুধ। কাপটি পুরো ভরা নয়।

আমাকে আগেই বলে রেখেছেন তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে নিতে। ইতিমধ্যে খবরের কাগজ এলে শুধু হেড লাইনগুলি পড়েন। হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড ওঁর পছন্দ। আজ কিন্তু পড়ার সময় নেই।

আমি কাগজের তাড়াটি এনে হাতে দিলাম। মহারাজজী তাঁর ইজিচেয়ারে বসে আছেন। বোর্ডের উপর কাগজগুলি রেখে সম্পাদনা করতে শুরু করলেন। হাতে পেনসিল ও ইরেজার। তাঁর নির্দেশমতো একের পর এক বই এনে রাখা হচ্ছে। দুপাশে বই-এর পাহাড়। মধ্যে মধ্যে বলছেন, "বের করতো এই অংশ লীলা-প্রসঙ্গ থেকে।" কখনো কথামৃত, কখনো বা অন্যান্য নানা বই থেকে।

আজ বসেছেন সকাল সাতটা নাগাদ। ৯টায় একবার যান বাথরুমে। আর একবার ১১টায়। ঠাকুরের ভোগ নামলে ব্রহ্মচারী বিষ্টু প্রতিদিন টিফিন কেরিয়ারে ওঁর খাবার নিয়ে আসে। নির্দেশ দেওয়া আছে উনি যেটুকু খাবেন শুধু সেইটুকুই নিয়ে আসবে।

মহারাজজী গঙ্গার দিকে মুখ করে বসেছেন। সাড়ে এগারটায় ওঁর স্নানের সময়। তাই ব্রহ্মচারী বিষ্টু পেছন থেকে ঘড়ি দেখাচ্ছে—সাড়ে এগারটা বেজেছে। খাবার আনতে যাচ্ছে মঠের ভাণ্ডার থেকে।

আমি বললাম—"মহারাজ, সাড়ে এগারটা বেজেছে, আপনার স্নানের সময় হয়েছে। বিষ্টু খাবার আনতে গেল।" মহারাজজী শুধু একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। কিছু বললেন না। নিজের কাজে আবার মন দিলেন। মন কাজে একেবারে তন্ময়।

বিষ্টু খাবার নিয়ে এসেছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। তাই ঘড়ি দেখাচ্ছে, বারটা বাজলো। আমি বললাম—"মহারাজ, বারটা বেজেছে। বিষ্টু খাবার এনেছে।" এবার মহারাজজী একটু গম্ভীর ভাবে বললেন, "বাজুক।" এইভাবে আধঘণ্টা পর পর বিষ্টু আমাকে ঘড়ি দেখাচ্ছে। সাড়ে বারটা বাজলো। একটা বাজলো। মহারাজজীর গাম্ভীর্য দেখে আমার আর কিছু বলতে সাহস হচ্ছে না।

যখন দুটো বাজলো তখন বললাম, "মহারাজ, দুটো বাজলো এখনও আপনার স্নান হয়নি। খেতে আপনার অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

মহারাজজী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, "দেরী হোক।"

এইভাবে একান্ত নিবিষ্টভাবে কাজ করে চলেছেন। মন যেন অন্য এক রাজ্যে রয়েছে।

এবার দুটো পঁয়তাল্লিশ বাজলো। সব কাজ শেষ করে বলছেন, "এই নাও

কাগজগুলি। এখনই ভালভাবে প্যাকিং করে আজকের ডাকে যাতে যায় তার ব্যবস্থা কর। পিয়ন তিনটায় আসবে। বলে দেবে রেজিষ্ট্রি করতে হবে।”

এবার উঠে স্নান সেরে খেতে বসলেন। মহারাজের কাজ দেখে মনে পড়ল স্বামীজীর কথা। “Work is Worship”—কাজই পূজা। সকল কাজকেই পূজাতে পরিণত করতে হবে।

বইটি ছাপা হয়ে বেরিয়ে এল—অক্টোবর, ১৯৬৪ সালে।

লেখক খৃষ্টোফার ইশারউড বইটির ভূমিকাতে লেখেন, “I owe great gratitude to Swami Madhavananda, head of the Ramakrishna Order, who read the manuscript chapter by chapter as it was sent to him at the Balur Math in Bengal, and supplied me with most valuable corrections, added information and comments.”

ওঁর অসুস্থ শরীর। কিন্তু কথা দিয়েছেন। কাজেই সেই কথা রক্ষা না করলে সত্যের অপলাপ হবে। তাঁর এই দৃঢ়তার পরিচয় ও কর্মনিষ্ঠা তাঁর দীর্ঘ জীবনে বহুবার বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে। এইরূপ আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

বৃহস্পতিবার, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬২।

আজ সকালে দীক্ষা আছে।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষে বাণী (Message) দেবেন তার খসড়াটি দেখতে বসেছেন ভোরে জপধ্যানের পরই। ঠাকুর দর্শন করতে যাওয়া হয়নি। সকালের খাওয়াও দেরী হয়ে যাচ্ছে। শেষে সাড়ে সাতটা নাগাদ উঠলেন।

সন্ধ্যায় অন্য কথা প্রসঙ্গে বললেন, “তখন মনেই ছিল না যে খাওয়া হয়নি। বরং একবার বাথরুমে যেতে হবে দীক্ষা দানের পূর্বে এইটিই মনে হচ্ছিল।”

ভাবলাম এই কি যথার্থ কর্মযোগের সাধনা ?

মহারাজজীর দীক্ষাদানের পদ্ধতিটিও ছিল উল্লেখযোগ্য।

পূজ্যপাদ মহারাজজী বরাবরই পৃথক পৃথক ভাবে একজন একজন করে দীক্ষা দিতেন। কর গণনাও প্রত্যেককে দেখিয়ে দিতেন।

মঙ্গলবার, ৪ঠা জুন, ১৯৬৩।

বিদ্যামন্দিরের কয়েকজন ছাত্রের দীক্ষা হল, সেইসঙ্গে অপর কয়েকজন পুরুষ ও মহিলারও হল।

পাশে কলিংবেল থাকত। প্রয়োজনমতো আমাকে ডাকতেন। একদিন বলছেন, “ঐ মহিলাটি যাকে মন্ত্র দিলাম—খুবই ভুগিয়েছে। কর গণনা দেখিয়ে দিচ্ছি—কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছে না। শেষে ফাউণ্টেন পেনটি

দিয়ে হাতের আঙুলের উপর এক দুই করে লিখে দিলাম। তা সত্ত্বেও দেখছি বুড়ো আঙুলটি জাম্প (jump) করে করে যাচ্ছে। আবার হাতে ধরে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছি। হাত কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। আমিও ছাড়ব না। শেষে বললাম, 'ভাল করে দেখ নইলে আবার ভুলে যাবে।' তখন বলে, 'না এবার ঠিক হবে'।"

কি করুণা ও ভালবাসা দীক্ষার্থীদের প্রতি !

আর একদিনের ঘটনা।

একটি মহিলা ভেতরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আমার ডাক পড়ল। আমি ভেতরে গেলে বলছেন, "দেখ, একে আমি কিছুতেই পারছি না। প্রথমে কর গণনা দেখিয়ে দিই। আঙুল ঠিক জায়গায় পড়ছে না। শেষে আঙুলের উপরে লিখে দিলাম। বললে, 'গুণতে জানি না।' মন্ত্রটি বললাম,—বললে, 'বাবা কানে শুনি না।' শেষে এক টুকরো কাগজে মন্ত্রটি লিখে দিলাম। তখন বলে, 'বাবা চোখে দেখি না।'

একে নিয়ে কি করব বল। চোখে দেখে না, কানে শোনে না, পড়তে বা গুণতেও জানে না। আমিও ছাড়বার পাত্র নই। কিন্তু এ যে অসম্ভব। এঁকে নিয়ে যাও।"

মহারাজজীর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে। তখন সেই মহিলাকে উঠিয়ে আনতে হল। মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলেন।

সৌভাগ্যক্রমে—ঐদিন ওঁর এক ছেলেরও দীক্ষা হল। এক ফাঁকে আমি গিয়ে জানালাম, ঐ মহিলার এক ছেলের দীক্ষা হয়েছে আজ। মহিলা কাঁদছেন। বলছেন, "আমার কি দুর্ভাগ্য। আমার ছেলের দীক্ষা হয়ে গেল আর আমার হল না !"

এই শুনে মহারাজজী বললেন, "আচ্ছা সব শেষ হয়ে গেলে ওঁর ছেলে ও মাকে পাঠিয়ে দিও।"

উনি ছেলেকে মন্ত্রটি লিখে দিলেন। বললেন, "বাড়িতে গিয়ে তোমার মাকে ঐ মন্ত্রটি কানের কাছে মুখ রেখে শুনিয়ে দিও। তোমাকে অনুমতি দিলাম—তুমিই আমার হয়ে গুরুর কাজটি করে দিও।"

এই শুনে মহিলার মুখ গভীর আনন্দে ভরে উঠল। মহারাজজীর মুখও প্রসন্ন। পরাজয় স্বীকার করতে হল না তাঁকে।

এরপর থেকে দীক্ষার্থীর ফরমে একটি অংশ জুড়ে দেওয়া হল—তুমি কানে কম শোন কি ?

১৯৬৪ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী বুধবার পূজ্যপাদ মহারাজজী সিঙ্গাপুর যাত্রা করেন, সঙ্গে আমিও আছি। সেখান থেকে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরও যান। মঠে ফিরে আসেন শনিবার ৮ই মার্চ।

সিঙ্গাপুরে একটি মজার ঘটনা ঘটে।

একটি মহিলা দীক্ষার ফরমে ইষ্টদেবতার জায়গায় লিখেছেন, "মাদার মেরী।" মহিলাটি খৃষ্টান। মহারাজজী আমাকে বললেন, "সিঙ্গাপুরে যাবার পর ঐ মহিলাটির তুমি ইন্টারভিউ নেবে।" আমি সঙ্কোচের সঙ্গে এই বিষয়ে আমার অক্ষমতা জানাই। উনিও ছাড়বেন না। বললেন, "আমি যে প্রশ্নগুলি তোমাকে বলছি—তুমি শুধু এইগুলি বলবে। আর তিনি যা বলবেন, শুনে এসে আমাকে জানাবে। এতে তোমার কোন প্রত্যবায় হবে না।"

সিঙ্গাপুরে পেঁাছে মহিলাটিকে ডাকা হল। সব প্রশ্নগুলির তিনি যা উত্তর দিলেন তাতে মাদার মেরীই তাঁর ইষ্টদেবী বলে বোঝা গেল।

দীক্ষা একে একে সকলের হয়ে গেল। এই মহিলাটির হল সকলের শেষে। যথারীতি দীক্ষার শেষে আমি দীক্ষার্থীদের দেবার জন্য এক থালা সন্দেশ মহারাজজীর কাছে নিয়ে গিয়েছি প্রসাদ করে দেবার জন্য। তিনি থালা থেকে নিয়ে এক কোণা ভেঙে মুখে দিলেন।

ভিতরে গিয়ে দেখি—মহারাজজীর মুখ আনন্দে ভরে উঠেছে। দীক্ষার্থীদের মধ্যে ভাল আধার দেখলে ওঁর মুখখানি আনন্দে ভরে ওঠে দেখেছি। আজ একটু বিশেষ যেন মনে হচ্ছে।

আমাকে বললেন, "আজ ভারী মজা হয়েছে। ফ্রম এ পণ্ড টু দি ওসান!"

"কি মজা মহারাজ?"—আমি বললাম।

মহারাজ বললেন, "তুমি তো ঐ মহিলার ইণ্টারভিউ নিয়ে ওঁর উত্তরগুলি আমাকে জানালে। তাকে কর গণনা দেখিয়ে দেবার পর যখন মাদার মেরীর মন্ত্র দিই তখন সে বললে, 'না স্বামীজী আমি হোলি মাদার সারদাদেবীর মন্ত্র চাই।' আমি বার বার যত বলি, 'তুমি এই মন্ত্রই নাও, তাতে একই ফল হবে।' ততই কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে, 'না স্বামীজী আমাকে মা সারদা দেবীর মন্ত্র দয়া করে দিন।'

"আমার মনে হল সে হয়ত ভাবছে হিন্দু সন্ন্যাসী আমি কী মনে করব। আমি আবার বললাম, 'তুমি আমার সেক্রেটারীকে আমার প্রশ্নের এই সব উত্তর দিয়েছ। কাজেই এখন মত পরিবর্তন করছ কেন?'

তখন বলে, 'হয়ত আমি আপনার সেক্রেটারীকে ঠিক মতো বোঝাতে পারিনি। আপনি কৃপা করে আমাকে হোলি মাদার সারদাদেবীরই মন্ত্র দিন।'

"শেষে তাই করলাম। তাই বলছিলাম ওর কপাল, 'ফ্রম এ পণ্ড টু দি ওসান' —এ গিয়ে পড়ল।"

"তার মানে কি মহারাজ?"

"ও, তুমি বুঝতে পারলে না? মাদার মেরী একজন অবতার পুরুষের জননী। যেমন ধর ঠাকুরের মা—চন্দ্রাদেবী। আর মা সারদাদেবী হলেন

ঠাকুরের শক্তি। ঠাকুর যাঁকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে পূজা করেছেন।"

দীক্ষাদানের পর পূজ্যপাদ মহারাজজী সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিতেন। নিয়মিত দীক্ষামন্ত্র জপ, ধ্যান, প্রার্থনা এবং কথামৃত, মায়ের কথা, স্বামীজীর বই ও গীতা পাঠ করতে বলতেন।

দীক্ষাদানের পর প্রতিবার সকলের শেষে এই কয়েকটি কথা বলতেন ঃ

"এই জীবনেই তাঁর করুণা কিছুও উপলব্ধি কর—এই প্রার্থনা।"

"তোমাদের যাত্রাপথ শুভ হোক, এই জীবনেই সত্যবস্তু এতটুকুও অনুভব কর—এই প্রার্থনা।"

"ভেতরকার দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ কিছু কিছু থাকবেই, কিন্তু তাঁর স্মরণ মনন করতে ছেড় না। তিনি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

"তোমাদের হয়ে আমি ঠাকুর ও মার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি।"

"যতশীঘ্র হয় তিনি তোমাদের দর্শন দিয়ে কৃত কৃতার্থ করুন—এই প্রার্থনা!"

"তাঁর স্থূল শরীর চলে গেলেও সূক্ষ্ম শরীরে তিনি ভক্ত হৃদয়ে রয়েছেন। ভেতরের যা কিছু দুঃখ দৈন্য ও দুর্বলতা আছে—সবই তাঁর কাছে নিবেদন করবে।"

"তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি—তিনি তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করে এই জীবনেই কিছু প্রত্যক্ষ করে দিন!"

"ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি—তিনি তোমাদের এই জীবনেই তাঁকে লাভ করতে সাহায্য করুন।"

"ঠাকুর সূক্ষ্ম শরীরে এখনও রয়েছেন। তোমাদের কল্যাণের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি।"

"আমি প্রার্থনা করছি তিনি কৃপা করে তোমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করে দিন।"

"এই জীবনে যেন কিছু উপলব্ধি করে তোমরা হাসতে হাসতে চলে যেতে পার—আমি প্রার্থনা করছি।"

"আমি প্রার্থনা করছি—তিনি কৃপা করে তোমাদের ব্যাকুলতা জাগিয়ে দিন, অন্তে যেন চরণে স্থান পাও।"

"আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তিনি তোমাদের দয়া করেছেন। তিনি তোমাদের আরও দয়া করবেন।"

সকল কাজে মহারাজের ছিল গভীর নিষ্ঠা ও সেই সঙ্গে ভক্তদের কল্যাণ-চিন্তা। আবার তেমনি দেখা যেত তাঁর নিরভিমানতা।

একজন দীক্ষিত সন্তান গুরুকে অনেক বাড়িয়ে পত্র লেখেন। তার উত্তরে তিনি জানান—

২৯শে জুলাই, ১৯৬৩

"প্রিয় রঞ্জন,

বেদান্ত বলেন, জগৎ মনঃ কল্পিত। সুতরাং তুমি যাহা লিখিয়াছ—পড়িয়া বিস্মিত হই নাই। তোমাকে শুধু এইটুকু বলিতে চাই—অতিরিক্ত কল্পনা-বিলাসী কোন কাজের নয়। আমাদের ঠাকুর ও মা সর্ব দেবদেবীর সমষ্টি। তাঁহাদের একজনকে চিন্তা ও ভক্তি করিলে সকল দেবদেবীকে চিন্তা ও ভক্তি করা হয়।

তুমি অনুরাগী ভক্তের চক্ষুতে আমাকে দেখিয়া অনেক উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথা লিখিয়াছ। ঠাকুর করুন ঐ সকলের ঈষন্মাত্র অনুভূতিও আমার হয়। আপাততঃ কিছু তো টের পাই না।"

ঐরূপ অপর একজন ভক্তের পত্রের উত্তরে লেখেন—

৩রা আগষ্ট, ১৯৬৩

"প্রিয় অমূল্য,

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তর্যামী এবং করুণাঘন মূর্তি। তাঁহাকে তোমার মনের কথা জানাইতে থাক। গুরুকে লইয়া অত টানাটানি কেন? কথামৃতে তো পড়িয়াছ, ভিখিরিকে এক মুঠা চাল দিতে হইলে বাড়ির ছেলেরা পারে। কিন্তু রেলভাড়া দিতে হইলে বাড়ির কর্তাকে বলিতে হয়।"

আর একটি পত্রের উত্তর—

"প্রীতিভাজনেষু,

...ঠাকুর জগৎগুরু। সুতরাং তাঁহাকে পৃথকভাবে চিন্তা না করিয়া তাঁহাকেই গুরু ও ইষ্ট উভয়ভাবেই চিন্তা করিলে ভালই হইবে। স্বামীজীর কথন, ঠাকুর এখনও সূক্ষ্ম শরীরে আছেন। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার মধ্যে দেখিতেন সকল দেবদেবীরই সমাবেশ, এই হেতু তাঁহারই মন্ত্র দিতেন। মোটকথা, তোমার যখনই ইচ্ছা হইবে তুমি ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে পার। উহা তোমার ইষ্টেরই নিকট প্রার্থনা-তুল্য হইবে।

"দীক্ষার সময় আমি সকলকেই ঠাকুরের চরণে মনে মনে সমর্পণ করিয়া দিই। ইহা মনে রাখিলে তাঁহাকেই গুরু ও ইষ্ট উভয়েরই সমন্বয়রূপে চিন্তা করিতে কোন বাধা হইবে না। কথামৃতেও আছে মা কালীরই সত্তা ঠাকুরের মধ্যে আছে বলিয়াই মা কালীর প্রতি তাঁহার অত টান, ইহা তিনি স্বমুখে বলিয়াছেন।"

যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাধ্যক্ষের উৎসাহে সৈনিকগণ উৎসাহের সঙ্গে লড়াই করে

রামকৃষ্ণ মিশন চেরাপুঞ্জির তৎকালীন অধ্যক্ষ পুনাপ্পন মহারাজ (স্বামী শুদ্ধবোধানন্দ) দিল্লীর কাজ সেরে বেলুড় মঠে এসেছেন। সন্ধ্যায় প্রণাম ও দর্শনের সময় পার হয়ে গেছে। মহারাজজী যথারীতি ধ্যানে বসেছেন।

পুনাপ্পন মহারাজ আমার কাছে এসে বলছেন, "দেখ ভাই, আমি বিশেষ কাজে দিল্লী গিয়েছিলাম। কাল ভোরেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। মহারাজজীকে একটি অত্যন্ত জরুরী খবর দিতে চাই। কাজেই আজ রাত্রি ছাড়া ও'র সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হবে না। সেজন্য বিশেষ অনুরোধ ও'র শোবার পূর্বে কোনরকমে একটু দেখা করার সুযোগ করে দিলে খুবই বাধিত হব।"

আমি জানতাম মহারাজজী চেরাপুঞ্জির অধ্যক্ষকে বিশেষ স্নেহ করেন। ঐ অঞ্চলে উনি খাসিয়াদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে কঠোর পরিশ্রম করেন। তাই ও'কে ঠিক খাবার পূর্বে সওয়া আটটায় আসতে বললাম। যদিও সাধারণতঃ ঐ সময় মহারাজ কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন না।

উনি ঠিক সময়েই এলেন। মহারাজজীর নির্দেশে ভেতরে গেলেন। উনি সংক্ষেপে কথা বলেই উঠে আসতে চান। কিন্তু মহারাজজী আরও বিস্তারিত খবর জানবার জন্য—ও'কে বসতে বললেন। এদিকে খাবার সময় হয়েছে। বিষ্টু জিজ্ঞেস করতে এসেছে—খাবারের ব্যবস্থা করবে কিনা। মহারাজজী খাবার আনতে বলে খাবারের ছোট টেবিলটি সামনে দিতে বললেন। আর পুনাপ্পন মহারাজকে একটু সরে বসতে বললেন।

মহারাজজী খেতে খেতে নানা কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকেন। খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও ও'দের কথাবার্তা চলতে থাকে। পুনাপ্পন মহারাজ কল্পনা করতেও পারেননি যে উনি ঐ সময়ে ও'র সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলবেন।

ফিরে যাবার সময় খুব খুশি হয়ে আমাকে বললেন, "ভাই তোমার কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ—এইভাবে এইসময়ে মহারাজজীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। তাই একটি বিশেষ কথা মনে পড়ছে। না বলে পারছি না।"

"তিন চার বছর পূর্বের কথা। মহারাজজী তখন সাধারণ সম্পাদক। বহুদিন থেকে একজন সহকারীর জন্য আমি ও'কে অনুরোধ করে আসছি। উনি দেবেন দেবেন বলেও দিতে পারছেন না। একদিন খুব দুঃখ করে বলছেন, 'দেখ তোমার কাছে তো যাকে তাকে দিতে পারিনা। ঐ অঞ্চলে কাজ করার জন্য একটু মিশনারী মনোভাব (Missionary Zeal) থাকা চাই। You need a worker like Brahmachari Dhiren of Vidyapith.

He has got a Missionary Spirit. কিন্তু দেওঘর থেকে ওখানকার আশ্রম-সম্পাদক ছাড়তে রাজী নন। তবে তুমি আরও একটু ধৈর্য ধর। কিছু ব্যবস্থা একটা হবেই ঠাকুরের কৃপায়।...'

আজ তাই মনে হচ্ছে উনি ওঁর কাছে একজন উপযুক্ত সেবকই রেখেছেন।"

আমি শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই ভেবে—উনি সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন কোন্ সেণ্টারে নতুন পুরনো কে কেমন কাজের উপযুক্ত তা উনি জানেন! শত কাজের মধ্যেও তিনি এত খবর রাখেন! তা নইলে এই বিরাট সংঘকে এইরকম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা কি সম্ভব?

পরের দিন সকালে যথারীতি আমি চিঠিপত্রের দপ্তর নিয়ে বসেছি মহারাজজীর কাছে। কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে মহারাজজী পুনাপ্পন মহারাজের কথা বলতে শুরু করেন :

"পুনাপ্পন ঐ পাহাড় জঙ্গলে বিশ বছরের উপর পড়ে আছে। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও খাসিয়া জয়ন্তীয়া পাহাড়ে হাজার হাজার ছেলে মেয়েদের বিনা খরচে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়া তাঁতের কাজ, কার্পেণ্ট্রি, মৌমাছি পালন ইত্যাদি নানারকম অর্থকরী বিদ্যাদানেরও ব্যবস্থা করেছে। এজন্য মঠের কাছে লাখ খানেকের উপর দেনা করতে হয়েছে। এই দেনা শোধের জন্য আমি ঠাকুরের কাছে নিত্য প্রার্থনা করি।

"এবারে দিল্লী গিয়েছিল। হোম ডিপার্টমেণ্ট থেকে একটা বড় রকম গ্রাণ্ট পেয়েছে। তাতে ওর সব দেনা শোধ হয়ে যাবে। আমিও শুনে নিশ্চিন্ত। কাল রাত্রে সেইসব কথাই হচ্ছিল।

"এই প্রসঙ্গে তোমাকে একটা গল্প বলছি। কিছুদিন আগে 'রিডার্স ডাইজেণ্ট'-এ (Reader's Digest) পড়েছিলাম।

"একটি অল্প বয়সের ছেলে এক জাহাজে খালাসীর কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। জাহাজ চলেছে মালপত্র নিয়ে। বহু দূর দূরান্তরের বন্দরে মাল ওঠানামা করে। যেতে যেতে হঠাৎ একদিন দেখা গেল সেই খালাসী ছেলেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ক্যাপ্টেনের কাছে খবর গেল। ক্যাপ্টেন প্রথমে সেখানেই জাহাজ থামাবার নির্দেশ দেন। তারপর সব অফিসার ও অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে এক জরুরী বৈঠকে আলোচনা করেন। কতক্ষণ সে নিখোঁজ? খবরে জানা গেল দু'ঘণ্টা। অমনি আদেশ, জাহাজ ফেরাও। দু'ঘণ্টা জাহাজ চালিয়ে আবার আগের জায়গায় থামানো হয়। চারিদিকে লাইফ বোট পাঠানো হল। ক্যাপ্টেন স্থির হয়ে বসে আছেন। সব দিক থেকেই হতাশার বার্তা! শুধু এক দিকের খবর বাকী। শেষে খবর এল ছেলেটিকে পাওয়া গেছে অচৈতন্য অবস্থায়। ছেলেটিকে আনা হল। জাহাজে যত রকমের চিকিৎসা করা সম্ভব তা চালিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে ক্যাপ্টেন নিজে ছেলেটির মাথার কাছে বসে আছেন অপলক

দৃষ্টিতে।

বহু চেষ্টার পর ধীরে ধীরে সে চেতনা ফিরে পেল। এ যেন অসম্ভব সম্ভব হতে চলেছে। আরও বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন ছেলেটি কথা বলার শক্তি পেল তখন ক্যাপ্টেন তাকে জিজ্ঞেস করছেন,

'তুমি অতক্ষণ কেমন করে বেঁচে ছিলে?' ছেলেটির চোখে জল। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলে,

'ক্যাপ্টেন শুধু তোমার জন্য !!'

'কেন?'

ছেলেটি বলে, 'আমি যখন জাহাজে কাজ পাই তখন আমাকে বলা হয়েছিল ঈশ্বর না করুন যদি কখনো জাহাজ থেকে মাঝসমুদ্রে পড়ে যাও, তখন কখনো সাঁতার কেটে তীরে ফিরে যাবার চেষ্টা করবে না। যতক্ষণ পার ভেসে থাকবার চেষ্টা করবে।

আমি তাই করেছি। আমি জানতাম ক্যাপ্টেন, তোমার কাছে এ খবর যাবেই আর তুমি কখনো আমার সন্ধান না করে ফেলে যাবে না! সেজন্য আমি শুধু তোমার কথা চিন্তা করেই শরীর ও মনে বল পেয়েছি। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে পেরেছি'।"

গল্পটি বলেই মহারাজ একেবারে নীরব। দৃষ্টি অন্তর্মুখী। তারপর কিছু পরে বলছেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে জেনারেলের উৎসাহের উপরই সৈনিকগণ সাহসের সঙ্গে লড়াই করতে পারে !!"

সব শুনে আমার মনে হল, খুব খাঁটি কথা। এইজন্যই কি মহারাজজীর সাধারণ-সম্পাদক থাকাকালীন সংঘের নানা দিকে এত উন্নতি ও বিস্তার?

করুণাঘন মূর্তি

বেলুড় মঠ। ৯ই এপ্রিল, ১৯৬৪।

আজ সকালে পূজ্যপাদ মহারাজজী শিলচর অভিমুখে রওনা হন। সঙ্গে দু'জন সেবক। দমদম থেকে প্লেন ছাড়তে কিছু দেরী হল। শিলচর এয়ারপোর্টে অভ্যর্থনা জানালেন সেখানকার আশ্রমের অধ্যক্ষ ও কয়েকজন স্থানীয় বিশিষ্ট ভক্ত।

এয়ারপোর্ট থেকে আশ্রম বেশ দূরে। পথে একটি বড় নদী। বেশ চওড়া। নৌকাতে মোটর সমেত পারাপার করতে হয়। নদীর কিনারাতে এসে দেখা গেল একটি ষ্টীম বোট অচল হয়ে পড়ে আছে। মাত্র একটি বোট যাত্রীদের নিয়ে পারাপার করছে। অনেকগুলি মোটর অপেক্ষা করছে।

ষ্টীম বোটটি ওপারের মুখে। সেখানে যাত্রী ও মোটর নামিয়ে এপারে

আসতে বেশ সময় লাগবে। নদীর জল অনেক নেমে গেছে। সেজন্য গাড়িগুলি তীর থেকে অনেক নীচে নদীর কোলে নামিয়ে আনতে হয়েছে। প্রচণ্ড রোদ। একটুও বাতাস নেই। সকলেই গলদঘর্ম। মহারাজজীর গায়ের জামা কাপড় সব ঘামে ভিজে একাকার। মুখ-চোখ লাল। অথচ আত্মস্থ। ধীর স্থির। কোন চাঞ্চল্য নেই। একজন ভক্ত একটি হাতপাখা যোগাড় করে একটু হাওয়া করতে এসেছেন। কোন কথা না বলে শুধু হাত নেড়ে জানালেন কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভক্তেরা চঞ্চল, ছুটোছুটি করছেন। অথচ করার কিছু নেই।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ষ্টীম বোটটি এপারে উপস্থিত। মহারাজজীর মোটর সমেত ভক্তেরা জয়ধ্বনি দিয়ে নৌকাতে উঠলেন। পার হতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগল।

আশ্রমে পৌঁছবার কথা বেলা ১১টা নাগাদ। কিন্তু মহারাজজী এসে পৌঁছলেন প্রায় একটায়। আশ্রম থেকে আরম্ভ করে রাস্তার দু'পাশে শত শত নরনারী, শিশু জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ঐ প্রচণ্ড রোদ মাথায় করে। সংঘগুরুকে দর্শন করবেন। সেই আনন্দেই ভরপুর। রোদ্দুরের কথা ভাববার সময় কোথায়! তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন সেই সকাল থেকে। কারও হাতে শঙ্খ, কারও হাতে ফুল ও মালা।

মহারাজজীর গাড়ি নজরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনি দিলেন, —"জয় শ্রীগুরু মহারাজজী কি জয়, জয় মহামায়ী কি জয়, জয় স্বামীজী মহারাজজী কি জয়।" শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

গাড়ি ধীরে ধীরে আশ্রমে প্রবেশ করল। মন্দিরের কাছে গিয়ে গাড়ি থামল। মহারাজজী ঠাকুর প্রণাম করে নির্দিষ্ট ঘরে এসে পৌঁছলেন। শান্ত-সৌম্য মূর্তি। ভক্তেরা প্রণাম করবেন।

ঘরটির দেওয়ালে নতুন পেণ্টিং। একটি নতুন বাথরুম সদ্য করা হয়েছে ঘরের সঙ্গে লাগানো। দেওয়ালগুলি এখনও ভাল করে শুকোয়নি।

মহারাজজী জামা খুলে বসলেন। যথাস্থানে জিনিষপত্র রেখে আমি বললাম, "মহারাজ এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। এখন প্রায় দেড়টা বাজে। আপনার স্নান এখনও হয়নি। ওদিকে বহু ভক্ত সমবেত। এখন প্রণাম আরম্ভ করলে অনেক সময় লাগবে। ওঁদের কি বলব—বিকেলে আসতে?"

মহারাজজী একটু বিরক্তির সুরে বললেন, "তুমি বল কি! আমার আরামটা বড় কথা? দেখছ না ঐ রোদ্দুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওঁরা দাঁড়িয়ে আছেন শুধু একটু প্রণাম করার জন্য। না এখনই হবে। যত সময় লাগে লাগুক।"

ভক্তরাও অনেকে ভাবছিলেন এখন আর বিরক্ত না করে বিকেলে এসে প্রণাম করবেন। কিন্তু যখন জানানো হল এখনই প্রণাম হবে তখন তাঁদের অন্তর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

ক্ষমাসুন্দর

বেলুড় মঠ, শনিবার, ৩রা এপ্রিল, ১৯৬৫।

আজ একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। অত্যন্ত মর্মান্তিক। বেদনাদায়ক, কিন্তু গভীর শিক্ষাপ্রদ।

আজ দীক্ষার দিন। রামমুরত মঠের নাপিত। মহারাজজীকে কামাতে এসেছে। পূর্বদিকের বারান্দায় বসে কামানো হয়ে গেলে হাতের কাছে চশমাটি না পেয়ে মহারাজজী আমাকে ডেকে বললেন, "আমার চশমাটা কোথায় ?"

নিউইয়র্কে ১৯৬১-৬২ সালে চোখের ছানি (cataract) অস্ত্রোপচারের পর থেকেই মহারাজজী এই চশমাটি ব্যবহার করছেন। এই চশমা ছাড়া উনি কিছুই দেখতে পান না। সেইজন্য আমরা সকলে খুবই সতর্ক। যখনই খুলে রাখেন সব সময়ে ওঁর হাতের কাছে কাছেই থাকে। রাত্রে শোবার পর বালিশের পাশে থাকে। এইদিন নতুন একজন সেবক ভুল করে ঘরের ভেতরে বিছানার উপরে রেখেছে।

দীক্ষার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যস্ত। দীক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে আসছেন। তাঁদের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। মহারাজজীর ডাক শুনে আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে দ্রুত গতিতে ও'র ঘরে ঢুকছি। এমন সময় একটা শব্দ হল ঝনাৎ করে। চেয়ে দেখি আমার চাদরে লেগে মহারাজজীর চশমাটি খাট থেকে সিমেণ্টের মেঝেতে পড়ে গেল!

কী সর্বনাশ! দেখি একটি গ্লাস ভেঙে গেছে! এদিকে মহারাজজী ডাকছেন বারবার। আমি চশমাটি হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছি অপরাধীর মতো। ভাবছি প্রচণ্ড বকুনি তো আছেই। তা সকলের সামনে কেন! তাই রামমুরত ও অন্যান্য সকলকে সরে যেতে বললাম।

বুক দুপ্ দুপ্ করছে! ঠাকুরকে স্মরণ করে ও'র কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসেছি। চশমাটি হাতে। বললাম, "মহারাজ, একটা ভয়ানক অপরাধ করে ফেলেছি।"

"অপরাধ? কি হল?"

"আপনার চশমাটি আমি ভেঙে ফেলেছি!" আমার তখন শ্বাস রুদ্ধ। বকুনির চেয়েও এই ভয়ঙ্কর খবরটি শুনে মহারাজের কি মানসিক প্রতিক্রিয়া হবে ভেবে সশঙ্কিতে অপেক্ষা করছি। অথচ কী করুণার মূর্তি! অত্যন্ত করুণ সুরে বলছেন, "তাতে কি হয়েছে! স্বামীজী বলেছিলেন না, 'ওসব তো এমনি ভাবেই ভাঙবে। ওদের কি আর কলেরা বসন্ত হবে!' ও কিছু ভেবোনা!"

আমি তখন ভাবছি কোথায় বকুনি, কোথায় তিরস্কার! একি শুনছি! দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। আবার প্রশ্ন।

"কি একেবারে ভেঙে গেছে ?"

"না একটি গ্লাস ! কিন্তু এখনই তো প্রয়োজন হবে—দীক্ষার সময় ।"

"ওতে কিছু অসুবিধা হবে না, তুমি দাও তো ।" তারপর আমারই কাঁধে ভর দিয়ে ঘরের ভেতরে এলেন ! যথারীতি সব কাজ চলতে লাগল, যেন কিছুই হয়নি ।

এঁকে কি বলব ? ইনি কি মানুষ ?

না দেব মানুষ !

স্মৃতিপটে স্বামী মাধবানন্দ*

স্বামী স্মরণানন্দ

স্বামী মাধবানন্দজীর সান্নিধ্যের পুণ্যস্মৃতি আমার খুব বেশী নেই। তাছাড়া প্রায় পঁচিশ বছর পর এখন আর সব কিছু মনে পড়ে না। যেটুকু মনে আসছে তার মধ্যে থেকে দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি, যা তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীরতার আভাস দেয় এবং যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আধ্যাত্মিকতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা দেবী ও স্বামীজীর উপর গভীর বিশ্বাস।

১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মকাল। আমি তখন বোম্বাই আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী। স্বামী মাধবানন্দজী স্বামী নির্বাণানন্দজীকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত আমাদের কয়েকটি শাখাকেন্দ্র পরিদর্শনের পরে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পথে তাঁরা বোম্বাই আশ্রমে এক রাত্রির জন্য যাত্রাবিরতি করেন যাতে পরদিন সকালে কলকাতাগামী বিমান ধরতে পারেন।

স্বামী মাধবানন্দজী তখন মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বলে অনেক সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী তাঁদের ব্যক্তিগত সমস্যাদির ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলেন। সারাটা সন্ধ্যা থেকে রাত ৯টা অবধি সেসব চলল। এর আগে মহারাজজী যখনই বোম্বাই এসেছেন তখন আমি দেখেছিলাম যে তিনি সন্ধ্যাকালীন ধ্যান জপের বিষয়ে অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। সন্ধ্যার পর তিনি দরজা বন্ধ করে দিতেন এবং কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন না। কিন্তু এবার আমি দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম যে তিনি রাত ৯টা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে প্রত্যেকের কথা শুনলেন। সকলে চলে যাওয়ার পরে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "মহারাজ, আপনি তো এখন সন্ধ্যাহ্নিক করবেন। তাহলে আপনার খাবার কি পরে এখানে আনব?" তাঁর উত্তরে আমার এক অপূর্ব উপলব্ধি হল। "কেন, এতক্ষণ ধরে আমি কি ঠাকুরের কাজই করিনি? তাহলে আবার জপধ্যানের প্রয়োজন কেন? আমার খাবার এখানে আনবার কোন দরকার নেই। চল, আমরা

---

* স্বামী স্মরণানন্দ রচিত 'SWAMI MADHAVANANDA: SOME MEMORIES' শীর্ষক মূল ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে অনূদিত।

বাংলা অনুবাদ—**শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।**

খাবার ঘরে যাই।" তিনি এই কথাগুলি এমন দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম, ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে করা সকল কাজই তাঁর কাছে জপ-ধ্যানের সমতুল্য এবং আধ্যাত্মিকভাবে সমান উন্নতিসাধক।

অপর যে ঘটনাটি আমার মনে পড়ছে তা ঘটেছিল ১৯৬৫ সালে তাঁর অন্তিম দিনগুলিতে। তখন তিনি সেবা প্রতিষ্ঠানে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। তাঁর জীবনদীপ ধীরে ধীরে নির্বাপিত হয়ে আসছিল এবং তিনি প্রায় সব কিছু থেকেই মন তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর আরোগ্যলাভের আশা সকলেই তখন ছেড়ে দিয়েছেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যের যে অনবদ্য অনুবাদ তিনি করেছিলেন, এই সময়ে কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে থাকার ফলে মুদ্রণস্থ তার নতুন সংস্করণের প্রুফ দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। প্রুফ দেখার সময় কয়েকটি ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছিল যে অনুবাদ সাবলীল হলেও কোন কোন স্থানে যথাযথ নয়। বইয়ের লেখক স্বামী মাধবানন্দজীর সঙ্গে আলোচনা না করে অনুবাদের কোন পরিবর্তন করার মতো দুঃসাহস আমার ছিল না। কিন্তু কি করে তা করব ভেবে আমি চিন্তিত হয়েছিলাম। তখন তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই খারাপ এবং তাঁর সঙ্গে দর্শনার্থীদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছিল না।

সেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তাঁরা বললেন যে সমস্যাটি মহারাজজীকে জানানোই ভাল হবে। এই বিষয়টি তাঁর প্রিয় এবং এই সুযোগে তাঁর মনকে একটু বহির্মুখ করা সম্ভব হতে পারে। সুতরাং আমাকে স্বাগত জানানো হল। খুশি হয়ে একদিন বিকালে প্রয়োজনীয় বইপত্র নিয়ে আমি মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

তিনি শয্যায় শায়িত ছিলেন। তাঁর কাছে বসে আমার সমস্যাটি আমি তাঁকে বললাম। তাঁর অনুবাদে সংশয় প্রকাশ করাতে আমাকে উদ্ধত মনে না করে বরং তিনি আমাকে মূল সংস্কৃত ভাষ্য থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু, তারপর তার অনুবাদ এবং ঐ অংশের উপর আনন্দ গিরির প্রদত্ত টীকা পড়তে বললেন। অতঃপর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় কোথায় আমার আপত্তি। যখন আমি তা ব্যাখ্যা করলাম তখন তিনি আমাকে ভাষ্য এবং অনুবাদ আর একবার পড়তে বললেন এবং কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। অবশেষে বললেন, অনুবাদ যা করা হয়েছে তা ঠিকই আছে, কোন পরিবর্তনের দরকার নেই।

আমার মতো একজন অল্পবিদ্যার অধিকারী নবীন সাধুর মতানতের প্রতি তাঁর বিবেচনা দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। এরকমই ছিলেন [আমাদের] সংঘের অধ্যক্ষ, একজন সুপণ্ডিত হয়েও সকল প্রকার

অভিমান থেকে মুক্ত। প্রত্যেক ব্যক্তিকে মানুষ হিসেবে প্রাপ্য সম্মান তিনি দিতেন।

তাঁর ধীশক্তি ও হৃদয়বত্তা তাঁকে সংঘের সকল সন্ন্যাসীর কাছে শুধু প্রিয় নয় উপরন্তু পরম শ্রদ্ধাস্পদ করেছিল। এই পবিত্র মানবাত্মার উদ্দেশ্যে আমার বিনম্র প্রণাম জানাই।

স্বামী মাধবানন্দজীর পুণ্যস্মৃতি

স্বামী মুমুক্ষানন্দ

যদিও পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজীকে দর্শন ও প্রণাম করার সৌভাগ্য আমার সম্ভবতঃ ১৯৪৫ সালেই হয়েছিল তবুও তাঁর সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচিত হবার সুযোগ এর অনেক পরেই আসে। মঠের একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী একসময় তাঁর সম্বন্ধে আমাদের কাছে বলেছিলেন যে তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে (সে সময় তিনি মঠ মিশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন) সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের যতটা শ্রদ্ধাভাজন তদপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধাভাজন তাঁর সন্তোচিত চরিত্রের জন্য। অন্য একজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসীর মুখে শুনেছিলাম—"দেখ, শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানদের model-এ (আদর্শে) জীবন গঠন করা তো নিঃসন্দেহে খুব বড় কথা। এমন কি স্বামী মাধবানন্দজীর সাধুচরিত্রের অনুরূপ চরিত্র যদি গঠন করা যায় তবে সেটাও যথেষ্ট মনে করি।" যখন মাধবানন্দজী নিদারুণ পীড়াদায়ক এক্‌জিমায় আক্রান্ত ছিলেন সেসময় তিনি নির্বিকারচিত্তে প্রশান্তমুখে সে যন্ত্রণা ভোগ করে অদ্ভুত সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সে কথাও অনেকের নিকট থেকে অবগত হয়েছিলাম। কর্মে মনকে তন্ময় করা, আবার প্রয়োজন হলে কর্ম থেকে মনকে সহজভাবে গুটিয়ে নেবার তাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে এরূপ জেনেছিলাম যে—তিনি যখন বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন তা খুব কর্মময় জীবনের মধ্যেই নাকি করেছিলেন। হয়ত প্রশাসনিক ও সংঘের পরিচালন সংক্রান্ত সমস্যাবহুল কথাবার্তা বলছেন নানা জনের সঙ্গে—কিন্তু যেই সে পর্ব শেষ হল অমনি অমন দুরূহ মননশীল কর্মে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। নানা বিষয়ে কথাবার্তা ও চিন্তার পর মনকে গুটিয়ে নিতে যেন তাঁর কিছু আয়াস করতেই হল না। আমার বিশেষ পরিচিত সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে তাঁর সাধুবৃত্তি ও মহৎ চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ উচ্চ প্রশংসা শুনে এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আচরণ যথাসম্ভব লক্ষ্য করে তাঁকে খুব শ্রদ্ধা ও সমীহ করে চলতাম। কিন্তু যে কারণেই হোক তাঁকে গম্ভীর প্রকৃতির সন্ত বলে মনে হত তাই এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার বা তাঁর নিকট থেকে নিজের প্রশ্নাদির উত্তর লাভের চেষ্টা প্রথম প্রথম একেবারেই করিনি। পরবর্তীকালে অবশ্য এ অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছিল।

যখন পাথুরিয়াঘাটা আশ্রমে (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পূর্বতন

রূপ) আশ্রমসেবক ব্রহ্মচারীরূপে থাকতাম তখন এক বৎসর (১৯৫৫) তিনি ওখানের প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনে একটা ছোট্ট ভাষণ দিয়েছিলেন যা থেকে মঠ মিশনের মৌল শিক্ষানীতি সম্বন্ধে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়। সে ভাষণের মর্ম এরূপ ছিল ঃ

"স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) শিক্ষার দ্বারা আদর্শ চরিত্রের মানুষ তৈরীর উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে ছাত্রাবাস (Students' Home) প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনি বা তাঁর অনুগামীরা ধীরে ধীরে চালু করেছেন। এই মানুষ তৈরীর কাজ আমরা বই বা লেখাপড়ার দ্বারা ততটা করতে চাই না—যতটা চেষ্টা করি একটা অনুকূল পরিবেশ (environment) সৃষ্টির মাধ্যমে। সে পরিবেশে বিদ্যার্থীরা এমন ব্যক্তিদের সাহচর্যে থাকবে যাঁদের নিঃস্বার্থপরতা ও অন্যান্য চারিত্রিক গুণ তাদের মনে গভীর রেখাপাত করবে। মাটির খোলাতে পোড়াবার আগে, নরম থাকতে থাকতে যা ছাপ দেওয়া যায় তা-ই থেকে যায়। সেরূপ ছাত্রদের জীবনের গঠনকালে (formative period) তাহাদের ঐরূপ পরিবেশে রাখলে সদ্ভাবের ছাপ তাদের জীবনে স্থায়ী হতে পারে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সেই চেষ্টাই করা হয়। এদের মধ্যে আবার ছাত্রাবাসগুলির খুব গুরুত্ব—কেননা এগুলিতে ছাত্ররা ঐ উত্তম পরিবেশে ও মহৎ সান্নিধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে সর্বদা থাকার সুযোগ পায়।

"এই কাজে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সেবকের দৃষ্টিভঙ্গী। আমাদের বিশ্বাস মানুষমাত্রেই ঈশ্বরের এক এক প্রকাশ। তার ভিতর জ্ঞান ও সদ্ভাব পূর্ণই রয়েছে শুধু তার আবরণটুকু সরানো দরকার। আমরা ঈশ্বরের কি উপকার করব? আবরণ-সরানো কাজটির দ্বারা আমরা তাঁর সেবাই করতে পারি। তাই এই কাজের মাধ্যমে ছাত্ররা যেমন উপকৃত হয় তেমনভাবে সেবকরাও উপকৃত, বরং বেশী উপকৃত হয় ঈশ্বরসেবার সুযোগ পেয়ে।

"এই মানুষ-তৈরীর-উপযোগী শিক্ষার জন্য, পূর্ণত্বের আবরণ উন্মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় সব সাজসরঞ্জাম, সব সুযোগ সুবিধা আমাদের নাই, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায়ও নাই। তাই বলে ভবিষ্যতে কখন সব সুযোগ সুবিধা আসবে এই প্রত্যাশায় এখন হাত গুটিয়ে বসে থাকা রামকৃষ্ণ মিশন সমীচীন মনে করেননি। আমাদের শক্তি-সামর্থ্য যা আছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সুযোগ সুবিধা যা পাওয়া যায় তা দিয়েই আমরা সেবাদৃষ্টিতে কাজ শুরু করে দিয়েছি। কেননা আমাদের বিশ্বাস, যদি মানুষ তার নিজের শক্তির ও প্রাপ্ত সুবিধা-সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তবে ঈশ্বর তাকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ও শক্তি জুটিয়ে দেন। এই শুভ অবসরে প্রার্থনা—ঈশ্বর তোমাদের পরিচালিত করুন।"

মাধবানন্দজী তীক্ষ্ণধী সন্ত ছিলেন। একবার এক বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে তাঁর সম্বন্ধে একটু আক্ষেপ শুনেছিলাম যে এমন দুর্লভ মেধা সত্ত্বেও মাধবানন্দজী কোনও মৌলিক গ্রন্থ রচনা করলেন না, শুধু কয়েকটি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করেই ক্ষান্ত রইলেন ইত্যাদি। কিন্তু এই অনুবাদ গ্রন্থগুলির মধ্যেও তাঁর শাস্ত্রমর্মার্থগ্রাহী সূক্ষ্ম বুদ্ধির উজ্জ্বল প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদে তাঁর ঐ পরিচয় সুপরিস্ফুট। এক সন্ন্যাসী শাস্ত্রপাঠকের অভিজ্ঞতা—"যখন শাস্ত্র ব্যাখ্যামূলক ক্লাস বা বাংলা অনুবাদ বা ব্যাখ্যা দ্বারাও শাঙ্কর ভাষ্যের অনেক অংশের মর্মার্থ বা যথার্থ আশয়টা ধরতে পারছিলাম না তখন মাধবানন্দজীর ইংরাজী অনুবাদ পড়েই তা ধরতে ও বুঝতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।"

"শিবজ্ঞানে জীবসেবা" রূপ কর্মযোগের উপর স্বামী মাধবানন্দজী বিশেষ গুরুত্ব দিতেন—একথা অনেকের সুবিদিত। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করে তিনি একস্থলে লিখেছেন, "তাঁর অর্থাৎ শ্রীশ্রীমায়ের) শ্রীমুখ হইতে শুনি যে, ঠাকুরই সব। সাধন ভজন সকলের সহজসাধ্য নয়; উহা মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া করিতে হয় এবং সংঘের কাজ ঠাকুরেরই সেবা।"[১] কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও নিয়মিত জপধ্যানাদিতে তাঁর নিজের যেমন নিষ্ঠা ছিল অপরকেও সেরূপ নিষ্ঠা ও অনুরাগ করতে তিনি উপদেশ দিতেন। একবার কোন আশ্রম থেকে আগত এক ব্রহ্মচারী তার নানা অসুবিধার কথা—সম্ভবতঃ তার প্রতি কারুর কোনও অবিবেচনার কথা বলেছিলেন। মহারাজজী তার কথা শুনে সংক্ষেপে তাকে কয়েকটি কথা বলছিলেন। শুনতে পেলাম মহারাজজী তাকে সব শেষে বললেন, "আর তুমি তোমার জপধ্যানাদি নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত কর—বরং এখন আর একটু বেশী করে করবে যেন তোমার মন বেশ অন্তর্মুখী হয়; বাইরের অসুবিধার জন্য উদ্বিগ্ন বা বিব্রত না হয়।" আমরা জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের বাহ্য অসুবিধা দূর করারই শুধু প্রযত্ন করে থাকি। নিজ নিজ মনকে জপ-ধ্যান-পাঠ-প্রার্থনাদির দ্বারা অন্তর্মুখী করা যে সব সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ বা একটা প্রধান উপায়—এ কথাটি মহারাজজীর কথা শুনে ধারণা হয়েছিল।

সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বিশেষ কর্মময়তার মধ্যেও তাঁর নিজের জপধ্যানাদির নিয়মানুবর্তিতা ও নিষ্ঠার কথা পরিচিত সকলেই জানতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ছোট ঘটনা বেশ স্মরণ হয়। বোধ হয় ১৯৫৭ সালের কথা।

---

১ 'উদ্বোধন', শ্রীমা শতবর্ষ জয়ন্তী সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬১, পৃঃ ৬

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথিপূজার তারিখে শেষ রাত্রে নির্বাচিত প্রার্থীদের 'সন্ন্যাস' ও 'ব্রহ্মচর্য' ব্রত গ্রহণের অনুষ্ঠান আয়োজিত হত। অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে একেবারে ভোর হয়ে যায়। ঠিক তারপরই শুরু হয় নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের প্রণাম নিবেদনের পালা। তারা সারা মঠ ঘুরে ঘুরে প্রবীণদের প্রণাম জানাতে থাকে। সেবারেও তাই হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে অনুষ্ঠান শেষ হবার পর নবীন সাধু-ব্রহ্মচারীরা অন্যান্য মন্দিরে এবং তদানীন্তন পূজ্যপাদ সংঘগুরু ও সহ-সংঘগুরু প্রমুখকে প্রণাম করে মাধবানন্দজীকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখে তাঁর ঘরের দরজা ভেজানো আছে। তিনি বিছানায় বসে মালাটি হাতে জপে মগ্ন। উৎসব-অনুষ্ঠান-প্রণামপর্ব আদি কর্তব্য ব্যাপৃতির মধ্যে তিনি তাঁর নিত্যকার প্রভাতকালীন জপনিষ্ঠার ব্যত্যয় হতে দেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে শেষ রাত্রের অনুষ্ঠানে তিনি যথারীতি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষের সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কালক্ষেপ না করে অথবা এখনই নবীন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা প্রণাম করতে আসবে ভেবে অপেক্ষা না করে ঘরে এসেই নিত্যকার নিষ্ঠা অনুযায়ী জপে বসে গেছেন। ১৫-২০ মিনিটের যেটুকু সময় হাতে পেয়েছেন তারই সদ্ব্যবহার করছেন।

মহারাজজী ছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার একজন সুযোগ্য প্রতিনিধি। এ ভাবধারা নিখুঁত ও সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন প্রকাশিত গ্রন্থমালার মাধ্যমে প্রচারিত হয়—এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। একবার স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সংকলনের একটি বই রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কোন কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক জানেন, স্বামীজীর কোন কোন মৌলিক বাংলা রচনা সাধু গদ্যে, কোন কোন গুলি বা চলতি গদ্যে লিখিত। ভাষার সমতাবিধানের জন্য ঐ শাখা কেন্দ্র স্বামীজীর সমস্ত বাণীগুলিকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত করে ছেপেছিলেন। নবীন সাধু ব্রহ্মচারীদের একজন বিষয়টির দিকে মহারাজজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করেছিল—"মহারাজ, এটা কি ঠিক হয়েছে ?" তিনি বললেন—"মোটেই ঠিক হয়নি। বড্ড ভুল হয়েছে স্বামীজীর ভাষাকে ওভাবে পরিবর্তিত করায়।" তিনি আরও বললেন—এ বিষয়টি পূর্বেই তাঁর নজরে এসেছে এবং তিনি ইতিমধ্যে ঐ কেন্দ্রে বলে পাঠিয়েছেন যেন যথাসম্ভব সত্বর নতুন সংস্করণ বের করা হয়—স্বামীজীর ভাষা হুবহু রেখে! তাঁর সে নির্দেশ যথাসময়ে যথাযথভাবে প্রতিপালিতও হয়েছিল।

আমরা মাধবানন্দজীকে যে সময় থেকে দেখেছি সে সময় থেকে তিনি সর্বদা প্রশাসনিক দৃষ্টিতে উচ্চপদে আরূঢ় থেকেছেন। কিন্তু সেজন্য তাঁর মধ্যে অভিমানবোধ দেখা যেত না। গুরুজনদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম-প্রদর্শন আমাদের নিকট খুব শিক্ষাপ্রদ ছিল।

পূজনীয় মাধবানন্দজীকে সাধারণ সম্পাদকরূপে বেশীরভাগ সময় দেখেছি। আমরা তখন ব্রহ্মচারী। সংঘের একজন প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে তিনি যে আদেশ বা নির্দেশ দিতেন প্রত্যক্ষতঃ অথবা শাখা কেন্দ্রের অধ্যক্ষদের মাধ্যমে, বলা বাহুল্য তা আমাদের সর্বদা শিরোধার্য ছিল। তাঁর ঐ নির্দেশ বা আদেশ আনন্দের সঙ্গে পালন করতে পারার একটা কারণ ছিল। কারণটা এই—দু-একটি বিশেষ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখেছিলাম—তিনি আদেশ দেবার সময় কেবল সংঘের কাজকর্মের সুবিধা-অসুবিধাগুলি বিবেচনা করতেন না। সে আজ্ঞাপালন দ্বারা আজ্ঞাপালনকারীর যথার্থ মঙ্গল হবে কি না, অথবা তার দ্বারা আজ্ঞাপালনকারীর কোনও অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি না—সেটাও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতেন। কাজেই আজ্ঞাপালনকারীর নিশ্চিত ধারণা হত—এ আদেশ-নির্দেশ কেবল সংঘের প্রয়োজনে নয়, তারও যথার্থ হিতের জন্য।

মাধবানন্দজীর সাধু চরিত্রের ও অন্যান্য মহৎ গুণের প্রশংসা অন্য গুরুজনদের মুখে শুনে তাঁর প্রতি যতটা শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়েছিলাম, তাঁর জীবনের নানা ঘটনা ও আচরণ দেখেশুনে সে শ্রদ্ধা যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত ও দৃঢ়মূল হয়েছিল। ধারণা হয়েছিল—সে প্রশংসা অতি যথার্থ।

তাঁর পুণ্যজীবন-স্মরণ ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন আমাদের জীবনে স্থায়ী অনুপ্রেরণার সঞ্চার করুক—এই প্রার্থনা।

সাধু-দর্শন

স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ

একবার একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী আর একজন প্রাচীন সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "আপনি তো ঢাকার শুকুল মহারাজকে (স্বামী আত্মানন্দজীকে) দেখেছেন। ওঁর জীবনের কোন ঘটনা আপনার মনে পড়ে কি ?" যে প্রাচীন সন্ন্যাসীকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি প্রশ্ন শুনেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর শুকুল মহারাজের উদ্দেশ্যে ক'বার প্রণাম করে বললেন ঃ "মশাই, সাধু হতে পারিনি, কিন্তু সাধু দেখেছি।" এই কথা ক'টি মাত্র একবার বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি। অন্ততঃ তিন কি চারবার বলেছিলেন। পূজনীয় শুকুল মহারাজ সম্বন্ধে সেই প্রাচীন সন্ন্যাসী যে কথা বলেছিলেন, পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ সম্বন্ধেও সেই কথাই আজ বলতে ইচ্ছে হচ্ছে।

পূজনীয় মহারাজজীর নিকট সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ আমার হয়নি। মাত্র একবার রেঙ্গুনে কয়েকদিনের জন্য খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেবারে রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটিতে মহারাজজীকে মানপত্র দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল এবং অভিনন্দনের জবাবে তিনি সুখী হওয়ার উপায় ('way to happiness') বিষয়ের উপরে একটি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। আজও মনে আছে তিনি দাঁড়িয়েই প্রথমে বলেছিলেন ঃ "আত্মস্তুতি শোনা সাধুর পক্ষে মৃত্যুতুল্য। এতক্ষণ এখানে বসে আমাকে এ কাজটিই করতে হল।" সোসাইটি কর্তৃপক্ষ তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে স্বাগত ভাষণে যে দু-চারটি কথা বলেছিলেন সে সম্পর্কেই তাঁর ঐ উক্তি। কথাগুলি যে তিনি নিছক বিনয় করে বলেছিলেন, তা নয়। তাঁর জীবনচর্যার সঙ্গে একথা ক'টির অক্ষরে অক্ষরে মিল ছিল। শুধু স্তুতি শোনা কেন, যদি কখনও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে খুব সামান্য কিছুও করা হত তিনি তা গ্রহণ করতে চাইতেন না। একবার বেলুড় বিদ্যামন্দিরে ভ্রাতৃবরণ উৎসবে তাঁকে দেখেছিলাম। উৎসব উপলক্ষে বিদ্যামন্দিরের ঠাকুরঘরে হোম হচ্ছিল। বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বিমুক্তানন্দজী পূজনীয় মহারাজজীকে নিয়ে ঠাকুরঘরে এলেন। পূর্ব থেকেই মহারাজজীর বসার জন্য একটি আসন আর সকলে যে সতরঞ্চির উপরে বসেছে তার উপরে রাখা ছিল। যখন বিমুক্তানন্দজী ঐ আসনটি দেখিয়ে মহারাজজীকে

বসতে অনুরোধ করলেন, তখন তিনি নিজের হাতে আসনটি সরিয়ে দিয়ে আর সকলের সঙ্গে সতরঞ্চির উপরেই বসে পড়লেন।

পূজনীয় মাধবানন্দ মহারাজজীকে দূর থেকে দেখলেও তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর পূজনীয় দয়ানন্দজীকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। এই দুই ভাই-এর জীবনে একটি বিষয়ে খুব মিল ছিল। তাঁদের জন্য অন্য কারো এতটুকু কষ্ট বা অসুবিধা হোক তা তাঁরা হতে দিতেন না; এবং দু ভাই-ই এব্যাপারে ছিলেন অতিশয় সচেতন। পূজনীয় মহারাজ যখন বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্ট, তখন পড়ে গিয়ে তাঁর ফিমার নেক্ ভেঙে গিয়েছিল; এবং এর জন্য তাঁকে বেশ কিছুদিন শয্যাগতও থাকতে হয়েছিল। এর পিছনেও ছিল সেই একই কারণ—সেবককে কষ্ট না দেবার চেষ্টা।

লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের বলছেন: "একঘেয়ে হস্‌নি, একঘেয়ে হওয়া এখানকার ভাব নয়।" শুধু তাই নয়, যদি দেখতেন তাঁর ভক্তদের মধ্যে কেউ ভগবদ্ভাবের বিশেষ কোন একটিতে আনন্দ অনুভব করতে পারছে না, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ তিরস্কার বাক্য ছিল —"তুই তো বড় একঘেয়ে।" পূজনীয় মহারাজজীর জীবন ছিল এরকম একটি জীবন যেখানে একঘেয়েমি বা একদেশদর্শিতার কোন স্থান ছিল না। তাঁর জীবনে পাণ্ডিত্য ও সাধুত্বের ঘটেছিল অপূর্ব সমন্বয়। শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায়—"হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।" তিনি যখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন তখনও তাঁকে নিত্য নিয়মিত সাধন-ভজন করতে দেখেছি। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতো গ্রন্থের অনুবাদ করতেও তাঁর সময়ের অভাব হয়নি। মহারাজজীকে কখনও বৃথা সময় নষ্ট করতে দেখিনি। যখনই তাঁর কাছে গেছি, দেখেছি হয় তিনি সাধন-ভজন করছেন অথবা সংঘের কাজ করছেন কিংবা বই বা পত্র-পত্রিকা পড়ছেন। শত কাজের মধ্যেও প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি কথামৃত পড়তেন। অথচ বাইরে থেকে দেখে বা তাঁর সঙ্গে কথা বলে কারো বোঝার উপায় ছিল না যে এই মানুষটি একদিন বিদেশে বেদান্ত প্রচার করেছেন, অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ হিসাবে বহু বই-এর সম্পাদনা করেছেন অথবা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এক বিরাট সংঘের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন-ভজন করতেন। কিন্তু যদি কখনও সংঘের প্রয়োজনে কেউ তাঁর জপ-ধ্যানে বিঘ্ন ঘটাতেন তাহলে তাতে তিনি কখনও বিরক্ত বোধ করতেন না। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। বেলুড় মঠে রামমূরত রাম নামে একজন নাপিত ছিল। সে খুব অল্প বয়সে মঠে এসেছিল। লেখাপড়া জানত না। কিন্তু মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা তাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। একদিন পূজনীয় মহারাজজীকে রামমূরত বলেছিল:

"মহারাজ, ঠাকুরজী, মাতাজী, ও স্বামীজীর উপর কত বই ছাপা হচ্ছে। আমি তো লেখাপড়া জানি না। তাই ঐ সব বই পড়তেও পারি না। এ আমার খুবই দুর্ভাগ্য।" মহারাজ তখন তাকে বললেনঃ "তুমি যখন ভাত খাও তখন কি শুধু ভাত খেয়েই পেট ভরাও? ভাতের সঙ্গে একটু ডাল, একটু তরকারি, একটু চাটনিও তো খাও। সব একটু একটু খাওয়াতে পেট ভরে যায়। ঠিক তেমনি, তোমার গুরুকৃপা লাভ হয়েছে। মঠে সাধুদের সঙ্গে রয়েছ। তাঁরা তোমায় স্নেহ করেন। সকালে মন্দিরে যাচ্ছ। মঙ্গলারতি দর্শন করছ। জপ-ধ্যান করছ। তারপর সাধুদের সেবা করছ। আবার সন্ধ্যায় আরতিতে যাচ্ছ, জপ-ধ্যান করছ। সব মিলিয়ে তোমার মনটি ভরে যাচ্ছে। বই পড়তে পারছ না তাতে কি হয়েছে! পড়া-ই কি সব? আর বই-এর কথা তো সাধুদের মুখেই শুনতে পাচ্ছ।" এই কথা থেকেই বোঝা যায় মহারাজজীর জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টি কি ছিল।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হত মহারাজ ছিলেন খুবই গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু কাছে গেলে দেখা যেত মজা করার একটি সুযোগও তিনি ছাড়ছেন না। একবার একজন এসে যখন তাঁকে জানালেন—যে দাঁতটির জন্য তাঁর কষ্ট হচ্ছিল, ডাক্তার সেটিকে তুলে দিয়েছে—মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে বলে উঠলেনঃ "আবার বিষ দাঁতটি তুলে দেয়নি তো!" আর একবারের কথা মনে পড়ছে। সেদিন তিনি হলিউড রওনা হচ্ছিলেন সেখানকার বেদান্ত কেন্দ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগ দিতে। তিনি নিজের ঘর থেকে যাত্রা করে স্বামীজীর বাড়িতে পশ্চিম দিকের বারান্দায় একটি বেঞ্চে বসেছিলেন। কয়েকজন সাধু ও ব্রহ্মচারীও তখন সেখানে উপস্থিত। তাঁরা মহারাজজীকে প্রণাম করতে এসেছেন। হঠাৎ মহারাজজীর সঙ্গে যাবেন এরকম একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী এসে বললেনঃ "ব্রাউন (Brown) এই গরম টুপিটি দিয়েছে। বললে, সঙ্গে নিয়ে যান, ওখানে কাজে লাগবে।" শুনেই মহারাজ বলে উঠলেনঃ "এ আবার সেরকম হবে না তো? একজনের জপের মালা হারিয়ে গিয়েছিল। সে ভাবলে, ঠাকুর বুঝি ইঙ্গিত করছেন, তোকে আর জপ করতে হবে না। ব্রাউন যখন গরম টুপি দিয়েছে তার অর্থ তো এ নয় যে ওখানে বরফ পড়বে!" (বৃদ্ধ E. C. Brown ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের শিষ্য। তখন বেলুড় মঠেই থাকতেন।)

একবার আমরা কয়েকজন একসঙ্গে মহারাজজীর কাছে উপদেশ প্রার্থী হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি তখন সংঘের সাধারণ সম্পাদক। আমাদের মুখপাত্র হিসাবে তাঁরই একান্ত সেবক যখন আমাদের প্রার্থনা তাঁকে জানালেন, তখন তিনি নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বললেনঃ "কথামৃত আছে, লীলাপ্রসঙ্গ আছে। শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও ঠাকুরের সন্তানদের উপদেশ রয়েছে। এতেও যদি তোমাদের প্রয়োজন

না মেটে তাহলে আমার উপদেশে কিছু হবে না। কিছু করবে না, শুধু উপদেশ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছ।" তবে কখনও কখনও কথা বলার সময় তাঁর ভেতরের আগুন বেরিয়ে আসত। একবার আমাকে বলেছিলেন: "যেমন একটি শেকলের শক্তি যাচাই হয় তার weakest link দিয়ে। ঠিক তেমনি একটি সংঘের শক্তিও যাচাই হয় তার দুর্বলতম সদস্যটির জীবন দিয়ে।" আর একবার বলেছিলেন: "সব কিছুই নির্ভর করছে দৃষ্টিভঙ্গির উপর। একটি গ্লাসে অর্ধেক জল ভরা আছে। একজন Pessimist বলবে, গ্লাসটা অর্ধেক খালি, আর একজন Optimist বলবে গ্লাসটা অর্ধেক ভর্তি।"

সবশেষে প্রথম কথাটির পুনরুক্তি করে বলব, "সাধু হতে পারিনি কিন্তু সাধু দেখেছি।"

তাঁহার জীবনই তাঁহার বাণী*

স্বামী উমানাথানন্দ

প্রধান কর্মসচিবরূপে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত স্বামী মাধবানন্দজীর মধ্যে সবসময় একটা জিনিষ দৃষ্টিগোচর হত যে সংঘ এবং ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আদর্শ রূপায়ণে তিনি যেন একটা মাধ্যমরূপে নীতিচালিত হয়ে কাজ করে চলেছেন। তীব্র ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দেখা গেলেও সর্বদা মনে হত যেন নীতির নির্দেশে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে মুছে ফেলে নিষ্কাম কর্ম করে চলেছেন কর্তব্যের তাগিদে। সংঘপ্রধান হিসেবে কখনও তাঁর মধ্যে আপাতরূঢ়তা বা কঠোর শাসন প্রকাশ পেলেও শাসক এবং শাসিতের মধ্যে কখনও আদর্শগত প্রীতি বা ব্যক্তিস্নেহের কোমল স্পর্শের অভাব হত না। নিতান্ত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি মেনে নিয়েও মহারাজের মনে কোনদিন মঙ্গলকামীতার অভাব বোধ হত না। কর্তব্যের মধ্যে ব্যক্তিকে এতই অহমিকাশূন্য বা যন্ত্রচালিত মনে করতেন যে কখনও কারও প্রতি ব্যবহার বা উক্তি যথাযথ হয়নি এমন মনে হলেই যে কোন ব্যক্তি এমনকি বয়োকনিষ্ঠকেও ডেকে নিজের ভুল ধারণা স্বীকার করে দুঃখপ্রকাশ করতে দ্বিধা করতেন না। কতটা সাধনপুষ্ট এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নির্ভরশীল হলে ব্যবহার-রাজ্যে প্রীতির সাবলীলতা এভাবে প্রকাশ করা সম্ভব ?

তিনি নিজে সাধ্যমতো প্রতিটি জিনিষ, প্রত্যেক ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ সঠিকভাবে এবং উচ্চতম দৃষ্টিভঙ্গীতে অভ্যাস করার চেষ্টা করতেন। অপরের ভিতরেও খাঁটি সদ্‌গুণ এতটুকু দেখলে তাকে বহুগুণ বড় করে দেখে এত বেশী আস্থাজ্ঞাপন করতেন যার ফলে অপরকেও উন্নততর জীবনে উন্নীত হতে বাধ্য করতেন। নিজে এতই আন্তরিক এবং অতিমাত্রায় পরিশ্রমী ছিলেন যে, অপরকেও তিনি সেই মাত্রাতেই বিচার করতে গিয়ে কখনও কখনও যেন হতাশ হতেন। এসব দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণস্বরূপে তাঁর নিত্যজীবনের ঘটনাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সময়ের সদ্ব্যবহার একটি বিশেষ জিনিষ ছিল তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচীতে। এক-দেড় মিনিট কোনও কাজের অবকাশ থাকলেও একটি প্রয়োজনীয় কাজ সেই ফাঁকে করে নিতেন। অপরেও অযথা কোন সময়ক্ষেপ করবেন—এটি তাঁর রুচি বিরুদ্ধ। সময়ের মতোই কোন জিনিষের অপচয় তাঁর পক্ষে সহ্য করা কঠিন হত। প্রতিটি সাধারণ জিনিষকেও কত বেশীদিন কতভাবে কাজে লাগানো সম্ভব

---

* স্মৃতিকথাটি শ্রুতলিখনের মাধ্যমে প্রাপ্ত।

—এটি ছিল তাঁর স্বভাবগত। শতচ্ছিন্ন গামছার পরিবর্জনও ছিল তাঁর পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। কারণ তেল ময়লা যুক্ত সুতো দিয়েও যেমন মেসিন মোছা যায়, ছেঁড়া গামছাতেও তা সম্ভব। ছেঁড়া ফাটা রবারের চটিজুতোখানি পরিবর্তনের চেষ্টা করতে গেলেও 'সমাজের নেবে কম দেবে বেশী' এই নীতি মনে করিয়ে দিতেন। নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্র নিদেনপক্ষে যা দু-একটা হলেই চলে তার অতিরিক্ত আনা কোনমতেই সম্ভব হত না। তাঁর অতি প্রিয় স্বচ্ছল অবস্থাযুক্ত কেউ যদি একটি ছাতা বা চাদর অনেক সুপারিশ মাধ্যমে গ্রহণ করাতে পারতেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আগেরটি কাউকে দিয়ে দিতেই হবে।

কাজের তাগিদে তাঁর স্নান-খাওয়ার কখনও খুবই দেরী হয়ে যেত। তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ না থাকলেও তাঁর জন্য অপরকে কষ্ট ভোগ করতে হতে পারে, একথা মনে করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি বদল করতেন। সর্বদাই ভাবটি যেন আমি কতটা অপরের জন্য useful, কত কম উদ্বেগকারী—এটি দেখা। প্রয়োজনে কাজের মাত্রা বৃদ্ধি বা আরাম বিশ্রামের উপেক্ষা প্রায়শই ঘটত। অতি অসুস্থ অবস্থায় দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার মধ্যেও শ্রীশ্রীমায়ের শতাব্দী উৎসবের কাছাকাছি সময়ে দিনে ১৮/১৯ ঘণ্টা পর্যন্ত নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখতেন দেখেছি। একজিমায় সর্বাঙ্গ ফুলে গিয়েছে, দিনে চারবার ইনজেকশন, ওষুধ, মলমপ্রলেপ, কম্বল গায়ে দেবার উপায় নেই, প্লাইউড দিয়ে নৌকার ছই-এর মতো তৈরী করে তার উপর কম্বল ব্যবহার করতে হত। কনুইয়ের নীচের অংশ মাত্র ভাল আছে। অনেকগুলি বইয়ের রাতদিন সম্পাদনা, সাংগঠনিক কাজ, দর্শনাথীদের আনাগোনা, তারমধ্যে নিয়মিত জপধ্যান সব ঠিক মতো চলত। চশমা ফিট্ হচ্ছে না বলে হাতে লেন্স ধরেও বই সংশোধন চলছেই। আমার পক্ষে দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ঘটনাবলী ছাড়া তাঁর মহৎ ব্যবহারের নিদর্শন দেখার সৌভাগ্য কমই হত। তবে তাঁর অপরের অসুবিধার জন্য চিন্তিত থাকা, অন্যের খুব সামান্য অসুবিধাও দূর করতে সচেষ্ট থাকা, সর্বোপরি নৈতিক এবং আত্মিক কল্যাণের সূত্র ধরিয়ে দেওয়া—তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারে অপরের কাছে প্রকাশ পেত এবং লিখিত চিঠিতেও তা পরিস্ফুট হত—তা যত বয়োকনিষ্ঠ অথবা নবাগত সাধুই হোন।

স্বামী বিবেকানন্দের এক মহান উত্তরসাধক*

স্বামী তথাগতানন্দ

যখন আমি পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজীর কথা ভাবি, আমার মানসচক্ষে ভেসে ওঠে এক অতি কঠোর মহাতপস্বীর ছবি। প্রত্যেকেই জানতেন, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দ্বৈত আদর্শ ছিল তাঁর সাধু প্রকৃতির ভিত্তিপ্রস্তর। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "একটি আদর্শের জন্য, কেবলমাত্র একটি আদর্শের জন্যই জীবন উৎসর্গ কর। সে আদর্শ যেন এত মহান, এত দৃঢ় হয়, যাতে মনে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব না থাকে, আর কোন কিছু যেন মনে স্থান না পায় এবং আর কোন কিছু যেন ভাববার অবকাশ না থাকে।"[১]

মাধবানন্দজীর ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব ছিল অতুলনীয়। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও প্রশাসনিক ক্ষমতার কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর উপস্থিতি আমাদের মনকে উচ্চস্তরে উন্নীত করত, তাঁর হাসি দিত আমাদের আত্মবিশ্বাস ও ভরসা এবং তাঁর কথা আমাদের সন্দেহ দূরীভূত করত। শুধুমাত্র আদর্শ জীবন-যাপনের দ্বারা তিনি আমাদের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আমি প্রায় নয় বছর বেলুড় বিদ্যামন্দিরে এবং দু'বছর বেলুড় মঠে ছিলাম। সুতরাং আমার প্রচুর সুযোগ হয়েছিল তাঁকে নানাভাবে দেখবার। সেসময়ে মঠের গ্রন্থাগারটি ছিল মিশন অফিসের দোতলায়। মাধবানন্দজীর অফিস তথা শোবার ঘরটি ছিল গ্রন্থাগারের পাশেই।

গ্রন্থাগারটি ছিল বইয়ের তাকে ভর্তি। হাঁটা-চলার জন্য অল্পই জায়গা ছিল। গ্রন্থাগারিক ছিলেন স্বামী ত্যাগানন্দজী। আমার সাধুজীবনের প্রথমদিকে, আমি প্রায়ই মঠের গ্রন্থাগারে যেতাম। গ্রন্থাগারিক ছাড়া আমি কদাচিৎ অন্য কাউকে সেখানে দেখতে পেতাম। একবার আমি মাধবানন্দজীকে বই খুঁজতে দেখেছিলাম। খুব ভয়ে ভয়ে আমি বই দেখছিলাম। আমার

---

* স্বামী তথাগতানন্দ রচিত 'A GREAT FOLLOWER OF SWAMI VIVEKANANDA' শীর্ষক মূল ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে অনূদিত।

বাংলা অনুবাদ—**স্বামী চৈতন্যানন্দ**।

১ The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, PP, 251-252.

উপস্থিতিতে পাছে তাঁর অসুবিধা হয় এই ভয়ে ভীত হয়ে আমি প্রায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। অনধিকার প্রবেশের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করছিলাম এবং আমার সাহস হচ্ছিল না, স্থান ত্যাগ করে যাওয়ার অথবা স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করার। মহারাজ আমার সঙ্কুচিত ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর সহৃদয়তা, কৃপাদৃষ্টি ও সহজ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমার আড়ষ্টতা দূর করেছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক মহত্ব তাঁকে [অপরের প্রতি] বিনয়ী ও উপকারী করে তুলেছিল। তাঁর অপ্রকট কোমলতা এবং সর্বজয়ী করুণার কথা এখনও আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে রয়েছে।

আমার সময়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অনেক স্মরণীয় ঘটনার সাক্ষী আমি, যেগুলি আজও আমার স্মৃতিপটে অমলিন। ভক্তিভরে ও বিনয়ের সঙ্গে সেই ঘটনাগুলির কিছু কিছু আপনাদের সঙ্গে একযোগে স্মরণ করতে ইচ্ছে হয়। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ, তাঁদের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে যেতেন, এবং তাঁরা প্রায়ই তাঁর কাছে সহানুভূতি আশা করলেও কদাচিৎ তা পেতেন। তাঁরা তাঁর কাছে যা লাভ করতেন তা হল সাধারণ বুদ্ধি এবং প্রায়শই জুটত যথেষ্ট তিরস্কার! তা সত্ত্বেও তাঁর বিচক্ষণ উপদেশের জন্য তাঁর প্রতি ছিল তাঁদের প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা।

ঐ সময় ব্রহ্মচারী শিক্ষণ কেন্দ্রটি ছিল টিনের চালাঘর। সেটি পরে ভেঙে ফেলা হয়েছে। একটা ঘটনা মনে পড়ছে। যতদূর মনে হয় সময়টা ছিল ১৯৫৬ সাল। তখন বোধাত্মানন্দজী ছিলেন শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। তিনি একটি ঘরোয়া সভার আয়োজন করেছিলেন শিক্ষণ কেন্দ্রের সামনে। সভাটি হয়েছিল সকালে এবং মাধবানন্দজী ছিলেন সেখানে একমাত্র বক্তা। সেটি ছিল একটি ছোটখাট সমাবেশ। অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে স্বামী অবিনাশানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মাধবানন্দজী বক্তৃতা করলেন কোমল স্বরে—তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। তিনি অধ্যাত্ম সাধনার উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে বললেন যে, এছাড়া অধ্যাত্ম জীবন কখনই গভীরতা লাভ করবে না এবং পরিণামে এই মহান [সন্ন্যাস] জীবনের মাধুর্যও উপভোগ করা যাবে না। এছাড়া তিনি প্রবীণ সন্ন্যাসীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, তাঁরা যেন তাঁদের নিয়মনিষ্ঠ জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে নবীনদের সামনে আদর্শ স্থাপন করেন। এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁদের নতুন দায়িত্বের কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি একটি চমৎকার উপমা দিলেন অধ্যাত্ম সাধনার সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়তাটির প্রতি আলোকপাত করে। তিনি বললেন, সাধুরা চারাগাছের মতো, চারাগাছেরা কুঞ্জবনের গৌরব ও শোভা বৃদ্ধি করে, আকৃতিতে তারা সুন্দর, পত্রসমূহে তারা উজ্জ্বল! কিন্তু গভীর অধ্যাত্ম চেতনা ছাড়া তারা [সাধুরা] টিকে থাকতে পারে না, ঠিক যেমন চারাগাছেরা অকালে মৃত্যুমুখে

পতিত হয় যদি পোকামাকড়ের আক্রমণ ঘটে। বাহ্যত [এইসব চারাগাছ] দেখতে সতেজ ও সমৃদ্ধ হলেও অভ্যন্তরে তাদের ক্ষয় হতে শুরু করে। আমরা দেখি, তাদের ডালপালা ঝুঁকে পড়ে এবং পাতা খসে খসে পড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তারা মাটিতে পড়ে যায়। সেইরকম পার্থিব জগতের রোগবীজাণু অনিবার্যভাবে সাধুদের অধ্যাত্ম জীবনের অগ্রগতিকে রোধ করে দেয়। এটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব কেবলমাত্র কঠোর অধ্যাত্ম সাধনা ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত আনুগত্যের মাধ্যমে।

সেই সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে, প্রত্যেক আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানকে তিনটি অবস্থা অতিক্রম করতে হয়—বিরোধিতা, ঔদাসীন্য এবং স্বীকৃতি। স্বীকৃতি স্বভাবতঃই নিয়ে আসে বিলাসিতা [ভোগ], ঐশ্বর্য, সমাদর এবং নামযশ। এসবই সত্যিকার আধ্যাত্মিক বিকাশের পথে সুস্পষ্ট বাধা। মাধবানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন: "ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের অভাবে প্রতিষ্ঠান বিলাস-ব্যসনের কবলে পড়ে। অতএব ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের আদর্শ সর্বদা সমুজ্জ্বল রাখতে হবে।"[২]

স্বামী মাধবানন্দজী সব সময় তাঁর টেবিলের উপর তিনটি পুস্তক রাখতেন— 'The Readers' Digest', 'Time' Magazine ও 'কথামৃত'। আমাদের কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে তিনি Monica Baldwin-এর লেখা 'I leap over the wall'—প্রবন্ধটি পড়তে বলেছিলেন। এই প্রবন্ধটি 'The Readers' Digest'-এ জুন, ১৯৫০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখিকা একটি খৃষ্টান মিশনের একজন প্রাক্তন সন্ন্যাসিনী ছিলেন। তাঁর মঠ জীবনের দুঃখের কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত, প্রায় পঁচিশ বছর সেখানে থাকার পর তিনি তাঁর সংঘ ত্যাগ করেন। তিনি কখনই সুখী হননি, এমনকি সংঘ ত্যাগ করার পরেও। প্রথম দশ বছর মঠে থাকার পর তিনি দেখলেন যে, সেখানকার জীবনধারা তাঁর পক্ষে উপযুক্ত নয়, তা সত্ত্বেও আরও পনেরো বছর মানিয়ে নেবার চেষ্টায় তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। স্বামী মাধবানন্দজী চেয়েছিলেন অধ্যবসায়ের ঐ উদাহরণ থেকে আমরা যেন অনুপ্রেরণা লাভ করি এবং দ্রুত যেন কোন সিদ্ধান্ত না নিই। আমি এই ঘটনাটি উল্লেখ করলাম এদেশের অনেক অধ্যাত্ম-জীবন যাপনেচ্ছুর পথনির্দেশ হতে পারে—এই আশায়।

আমার অপর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে যেটি খুবই হৃদয়স্পর্শী। একবার আমি সন্ধ্যারতির সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে আমাদের সঙ্গে তাঁকে গান

---

২ The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV, pp. 83-84, 313 and 315.

গাইতে দেখেছিলাম। এটা দেখে আমি আমার চোখকে বিশ্বাসই করতে পারিনি। তখন আমি দেখলাম আমাদের পিছনে অনেক প্রাচীন সাধুরা বসে আছেন। পূজ্যপাদ স্বামী অভয়ানন্দজী ধীরে ধীরে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করছিলেন। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, ঐ সময় (১৯৫৮ বা ১৯৫৯) বেলুড় মঠে সাধু সম্মেলন হচ্ছিল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন বেলুড় মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ। যখন সম্মেলন শেষ হল, পূজ্যপাদ মহারাজের বিশেষ ইচ্ছানুসারে সম্মেলনে যোগদানকারী সকল সাধুরা মন্দিরের সন্ধ্যারতিতে যোগদান করেন। এই ঘটনাটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল—যা আরও অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা করতে পারেনি।

স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের আদর্শ জীবনের দৃষ্টান্ত আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করুক, কারণ সে জীবনের নজির তিনি আমাদের জন্যই রেখে গিয়েছেন একটি অমূল্য উত্তরাধিকাররূপে।

উপরে বর্ণিত স্মৃতিকথাটি স্বামী তথাগতানন্দ রচিত এবং আমেরিকাস্থ বেদান্ত সোসাইটি অব্ নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'Glimpses of Great Lives' নামক পুস্তকে সংকলিত হয়েছে।

দিব্যজীবনের সান্নিধ্যে

স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ

যে পুণ্যসঙ্গলাভের কথা লিখতে যাচ্ছি সে জীবনের গভীরতা এবং ব্যাপকতা আমার অনুমানের চেয়ে অনেক প্রসারিত জানি। লেখার মধ্য দিয়েও আমার ধারণাটি সম্যক প্রকাশ করতে পারব না, তাও জানি। তবুও আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি দু-একটি ঘটনার কথা লিখে নিবেদন করছি।

স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ তখন বেলুড় মঠের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫১ সালে আমি বেলুড় মঠে আসি এবং সেদিনই বেলুড় বিদ্যামন্দির কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য সারদাপীঠে চলে যাই। স্বামী মাধবানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ আমার হয় ১৯৫৫ সালে যখন আমি একটি মানসিক দ্বন্দ্বে পড়ে যাই। তিনি তখনও মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক। আমার পক্ষে এম. এ. পড়া উচিত কিনা এই নিয়ে সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দ মহারাজের সাথে মতবিনিময় চলছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে পাঠালেন পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের কাছে। আসলে ১৯৫১ সাল থেকেই ইচ্ছা ছিল সংঘে যোগদান করি। বি. এ. পাশ করে আর দেরী সইছিল না, সাধু হওয়ার জন্য আর অধিক পড়ার প্রেরণা বা প্রয়োজনীয়তাও বোধ করছিলাম না। যাহোক, পূজনীয় মহারাজ সব শুনে আমাকে আরও পড়ার পরামর্শ দিলেন এবং সেক্ষেত্রে বেদান্ত নিয়েই পড়ব শুনে অনুমোদন করলেন। কিন্তু এও বললেন, "আমরা প্রয়োজনের দিক ভেবেই বলছি। তোমার গুরুর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি সর্বদিক ভেবেই বলতে পারতেন।" বেরিয়ে আসতেই মনে হল, তাইতো, সেখানে অর্থাৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের নিকট গেলেই তো পারি। গেলাম সেখানে, আর সব ওলটপালট হয়ে গেল। পড়া আর হল না, অধিকন্তু পূজনীয় মহারাজের ইচ্ছায় সারদাপীঠ থেকে বেলুড় মঠে চলে আসার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

এরপর দুবছরের অধিককাল ধরেই বেলুড় মঠে থাকি। প্রধানতঃ মন্দিরের ভাঁড়ারেই কাজ করি। কখনো কখনো অন্যান্য কাজও করতে হত। ক্রমে মনে একপ্রকারের অভিমান ও বেদনাবোধ অঙ্কুরিত হয়ে কাজকর্মের মধ্যে ভুল বোঝা-বুঝি বাড়াতে লাগল। শেষে মনের বিষাদভাব তীব্র আকারে দেখা দিল। উঠতে বসতে, শোয়ার সময় প্রায়ই দেখছি মন ঐসব চিন্তায় বিষাদমলিন হতে হতে কয়েকমাসে আমাকে দারুণ অস্থির করে তুলল। ফলে ঐ পরিবেশ

ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। পূজনীয় আত্ম মহারাজের সঙ্গে মানসিক অবস্থা নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনাও হল। তবুও মনে শান্তি না পেয়ে সোজা মাধবানন্দ মহারাজের কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম—কেউ যদি নিজের চিত্তশুদ্ধির জন্য কাজকর্ম করে এবং মঠের কাজকর্ম ঠাকুরের কাজ বলে মনে না করে তাহলে তার পক্ষে এই সংঘে স্থান পাওয়া নিয়মবিরুদ্ধ কিনা। চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে আমার কি ধারণা উনি সেটা শুনলেন। আমার জীবনের লক্ষ্য মুক্তি, অন্য কিছু নয়, সেটি শুনেই বললেন, "মুক্তি কি ছোট জিনিষ নাকি ?" আবার প্রশ্ন—"আমার ভক্তি নাই এবং সেই ভাব নিয়ে তো ঠাকুরের কাজ করছি না তাহলে কি হবে ?" উত্তর এল ঃ "ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো (ভক্তি) হয়ে যাবে, কিন্তু যদি অভিমান করে বসে থাক তবে সেটা কর্মযোগ নয় ।" শেষের কথাটি শুনেই বুঝলাম আমার মতো অকিঞ্চিৎকর এক ব্রহ্মচারীরও সব খবর তিনি রাখেন, আপাতদৃষ্টিতে সেটা বুঝতেই পারিনি। অবাক হয়ে মনে মনে স্বীকার করে নিলাম আমার প্রশ্ন ও আচরণের মধ্যে এখনও সামঞ্জস্য ঠিক হয়নি। সেদিনের সস্নেহ আলাপে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছিলাম। জিজ্ঞাসার সমাধানে, মহত্ত্বে তিনি ছিলেন আমার কাছে অতুলনীয়।

আরও কিছুদিন চলে গেল। দুর্ধর্ষ মন আয়ত্তাধীন থাকল না। মনের করুণ অবস্থা অবশেষে আমার মঠত্যাগ অনিবার্য করে তুলেছিল। পূজনীয় মাধবানন্দ মহারাজের হাতে একখানা পত্র দিয়ে সন্তর্পণে মঠ ছেড়ে চলে যাব ভেবেছিলাম। পত্র দেওয়ার আর সুযোগ হল না। সেদিন ছিল কালীপূজার রাত্রি। ঘরটিতে একে একে অনেক মহারাজ ঢুকে তাঁকে প্রণামাদি করলেন। অপেক্ষা করছিলাম প্রণাম শেষ হলে একা পাব। সবিস্ময়ে দেখলাম ঘরের বাতি নিভে গেল সবাই চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। মহারাজ ধ্যানে বসে গেছেন খবর নিয়ে জানলাম। শুনলাম ধ্যান সেরে একেবারে শেষরাতে বেরুবেন মাকে প্রণাম করতে। অপেক্ষা করতে পারলাম না। পত্রটি যাতে তাঁর হাতে পেঁছায় তার ব্যবস্থা করে কিছু না বলেই মঠ ছাড়লাম। বিস্ময়ের বাকী ছিল। একমাস পর পুরীধামে পেঁছে গেছি। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনে বেড়াতে গিয়ে 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকার ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর সংখ্যাটি দেখলাম। তাতে স্বামী মাধবানন্দজীর একটি প্রবন্ধ ছিল। তাতে আমার পত্রের উত্তর অতি পরিষ্কার করে দেওয়া আছে। প্রবন্ধটির সাথে আমার পত্রের কোন সম্পর্ক আছে সেটি অন্যের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমার পত্রে জিজ্ঞাসা ছিল শ্রদ্ধা হারালে জীবনের আর কি মূল্য থাকতে পারে। ঐ প্রবন্ধে শ্রদ্ধা কাকে বলে তার বিশেষ বিশ্লেষণ আছে। জীবনের মূল্য কি সে সম্বন্ধেও সুন্দর আলোচনা হয়েছে। প্রাণে প্রাণে বুঝে গেলাম আমার বেদনাভরা পত্রখানি তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। তাঁর কাছে কেহই তুচ্ছ নয় এই

পরিচয় পেয়ে এই মধুরস্বভাব সন্ন্যাসীর প্রতি আমার মন সম্ভ্রমে ভরে উঠল। আমার চলার পথে কিছু পাথেয় জুগিয়ে দিল।

পথে প্রান্তরে, হাটে মাঠে পথচারীর জীবনে এইসব সাধকদের পুণ্য স্মৃতি ও শিক্ষাসাধনা পাথেয় হয়ে মনকে শক্তি দিত। বেশ কিছুকাল কেটে গেল, ভ্রমণের শেষপর্বে কনখলের হাসপাতালে স্থান নিতে হয়েছিল। স্নেহমমতার বন্ধন বাধ্য করল আবার পূজনীয় মাধবানন্দ মহারাজকে পত্র লিখতে, এবার আমার ভুলত্রুটির মার্জনা চাইতে। খুব তাড়াতাড়ি উত্তরও এসে গেল। আমার পত্র পেয়ে তিনি আনন্দিত হয়েছেন এবং যাতে আমার শরীর ও মন ভাল থাকে সেজন্য শিলং-এ পূজ্যপাদ সৌম্যানন্দ মহারাজের কাছে থাকার আদেশ দিলেন। এবারও তাঁর হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীর স্পন্দন আমাকে অভিভূত করল।

আরও কয়টি বছর। এবার তিনি বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্ট। আমি এসেছি মঠের ব্রহ্মচারী শিক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষা নিতে। ১৯৬৪ সাল। আমার মনের অতি উচ্চ আসনে তিনি আছেন আমারি অজানা কোন পুণ্যবলে, তাঁর দর্শনলাভের জন্য প্রতিদিন মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। আগে কখনো কারো জন্য মনের ঐভাব বোধ করিনি। যখন তিনি বাইরে কোথাও যেতেন তখন প্রণামের সময় বিকেলবেলাটিতে তাঁর অভাববোধ মনকে পীড়া দিত। সেসময় আমাদের জন্য এল একটি দুর্লভ সুযোগ। নবাগত ব্রহ্মচারীদের তিনি সুযোগ দেবেন একঘণ্টা সময় তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার। ১৯৬৪ সালের স্নানযাত্রার পরদিন আমার সুযোগ এল। ক'দিন ধরেই ঐ মুহূর্তটির জন্য সাগ্রহ অপেক্ষা ছিল। আগের দিন রাতে তাঁর কাছে যাওয়ার চিত্রটি স্বপ্নেও দেখে ফেললাম। সন্ধ্যার পর ৭টা বাজতেই উপস্থিত হয়ে সাষ্টাঙ্গ হলাম। স্বপ্নের চিত্র অনেকাংশে বাস্তব হয়ে আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিল। কথাবার্তার মধ্যেও কিছুটা ইঙ্গিত পেলাম এসব তাঁর অগোচর নয়। মনের ভিতরে গভীর স্পন্দন, কারণ দীর্ঘদিনের লালিত একটি প্রার্থনা তাঁর কাছে নিবেদন করার আশায় মনের শিহরণ চেপে রাখতে পারছিলাম না। অথচ চুপ করেছিলাম এবং তিনি আমাকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন শিক্ষাকেন্দ্রে কোনরূপ বন্ধন বোধ হচ্ছে কিনা, কি কি পড়ছি ইত্যাদি। আগে কোথায় কোথায় ছিলাম, কি কি কাজ করতাম এসবও জেনে নিলেন। আমি যে বেলুড় মঠ থেকে চলে গিয়েছিলাম, ভারতভ্রমণে গিয়েছিলাম এসব কথাও হল। তিনি তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন এক জায়গায় বেশীদিন থাকতাম কিনা, বাংলার বাইরে কন্যাকুমারী ও দ্বারকা এসব স্থানে গিয়েছিলাম কিনা। সবশেষে আমার মনের কি অবস্থা হয়েছিল, তার বর্ণনা দিলাম আবেগভরা কণ্ঠে। ঠাকুরের সংঘ ছেড়ে চলে গেলেও বুঝতে পারতাম ঠাকুর আমাকে ছাড়েননি।

অহেতুক করুণায় আমার দুঃখবিপদে তিনিই শক্তি দিয়েছেন, আমাকে রক্ষা করেছেন। এমন দয়াময় যদি আমাদের ঠাকুর তবে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় সাধু হওয়ার দুর্বোধ্য সংকল্পে কী প্রয়োজন? এই জীবন দিয়ে তাঁর কাজ করে যাই না কেন, যেজন্য তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন; যেজন্য তিনি সংঘ সৃষ্টি করে গেছেন, দেহমনপ্রাণ দিয়ে সেই মহান ব্রতে জীবন উৎসর্গ করাই কি সাধু জীবনের জন্য যথেষ্ট নয়? আবেগে চোখের জল রোধ করতে পারিনি। তিনিও বলে উঠলেন: "একপক্ষে ভালই হয়েছে তোমার এই ভ্রমণযাত্রাটি।" আমরা জানি তিনি কত শৃঙ্খলাপরায়ণ। নিয়মশৃঙ্খলাকে তিনি খুব মর্যাদা দিতেন। তাঁর কাছ থেকে এ কথাটি শুনতে পেয়ে মনে খুব আশ্বাস এল। শেষরাতের চন্দ্রগ্রহণের কথা হয়েছিল তারপর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেশ কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। সেই সময়টি কিভাবে অতিবাহিত করেছিলাম মনে হয় সেটা জানার উদ্দেশ্য ছিল। সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে আসছে, আমি হাতজোড় করে বললাম: "মহারাজ, ঈশ্বরলাভই আমার উদ্দেশ্য, ঠাকুরই আমার ঈশ্বর, আপনি আশীর্বাদ করুন।" পূজনীয় মহারাজ ঠাকুরকেই উদ্দেশ্য করে অঙ্গুলি সংকেতে বললেন: "ঐখানে আশীর্বাদ।" আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম: "না, আপনি করুন।" এইবার দাঁড়িয়ে গিয়ে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর সরতে বলে খাবার জায়গাটির দিকে চলে গেলেন। আমিও ধীরে ধীরে চলে এলাম এই পরিতৃপ্তি নিয়ে যে, আমি তাঁর চরণে আমার মনোগত অভিপ্রায়টি নিবেদন করতে পেরেছি—যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার কৃপালাভে ধন্য।

বিকেল হলেই তাঁর দর্শনে আসতাম সকল ব্রহ্মচারী একসঙ্গে। একদিনও অন্যমনস্ক হইনি। জোড়হাতে দাঁড়িয়ে দর্শন করতাম। দর্শনে ও প্রণামে মনে খুব বল পেতাম। ভেবে আনন্দ পেতাম তিনি আমাকে চিনে রেখেছেন। আমি জানি তাঁর অন্তর শুভেচ্ছায় ভরে ছিল আমার জন্য। রোগশয্যায় সেবাপ্রতিষ্ঠানে যখন ছিলেন তখন শেষদিকে একদিন প্রকাশ করেছিলেন মঠের যুবক সাধুদের মধ্যে তিনি চারজনকে চেনেন। তার মধ্যে আমারও নাম ছিল জেনে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। ক্রমে শেষের দিন এগিয়ে এল। আবার হাসপাতালে যাবেন। আমার আগে কয়েকজন প্রণাম সারলেন। আমিও প্রণামের জন্য নত হয়েছি তিনি এমনভাবে হাত তুললেন মনে হল তিনি আমাকে ভরসা দিচ্ছেন তাঁর আশীর্বাদ আছে আমার প্রতি। তখনও জানিনি এটাই শেষ বিদায়। পরে একদিন তাঁকে হাসপাতালে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখেছিলাম শুধু। একাদশীর রামনামে আছি আমরা, দুর্গাপূজার পরের একাদশী। ঐসময়ে তাঁর দেহত্যাগের সংবাদ এল। আমার কাছে বড় অপ্রত্যাশিত বেদনা। আশা ছিল অনেক, তাই সংকটাপন্ন অবস্থা জেনেও ভেবেছিলাম তিনি আবার

সুস্থ হবেন এবং শেষ দিনটিতে শারীরিক উন্নতিও হয়েছিল একটুখানি। সকলের প্রণাম নিয়েছিলেন, ৺বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রত্যেককে। তাতে দৃঢ়প্রত্যয় হয়েছিল এযাত্রা তিনি সেরে উঠবেন। আমার জীবনপথে তিনি ছিলেন জীবন্ত আদর্শ। স্বামীজীর সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শের এক মূর্তবিগ্রহ ছিলেন তিনি। এইটুকু সান্ত্বনা যে, বেলুড় মঠে অসুস্থ থাকাকালীন রাত্রিতে ব্রহ্মচারীদের প্রত্যেককে তিনঘণ্টা করে তাঁর ঘরে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আমিও কয়েকটি রাত্রি তাঁকে ভালভাবে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলাম। কখনও রুদ্ধশ্বাস নিস্পন্দ দেহ দেখে মনে হত কুম্ভক অবস্থা নিয়ে হয়ত ঈশ্বরের সান্নিধ্যসুখ তিনি তখন অনুভব করছিলেন। কখনও দেখতাম স্থিরহস্ত অতি সন্তর্পণে নমস্কারের জন্য যুক্ত হয়ে ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছিল। গভীর নিশায় দিব্যজীবনের সান্নিধ্য স্বল্পকালের জন্যও পেয়েছিলাম বলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।

স্বামী মাধবানন্দ ঃ একজন আদর্শ সন্ন্যাসী*

স্বামী চেতনানন্দ

নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখাই যাঁর প্রকৃতি ছিল অথবা যিনি [তাঁর জীবনের] বেশীর ভাগ সময়ে নীরব থেকেছেন এমন একজন সম্বন্ধে কিছু লেখা খুব সহজ নয়। যোগীপুরুষের অন্যতম লক্ষণই হল এই। মরমী সাধকেরা জগতে অজ্ঞাত থাকতেই ভালবাসেন যাতে তাঁদের ঈশ্বরীয়-সান্নিধ্য বিঘ্নিত না হয়। তবুও ধর্ম, দর্শন এবং শাস্ত্র বিষয়ক সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির অপেক্ষা তাঁদের জীবন ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের অধিক অবহিত করে। তাঁদের শিক্ষা অল্প কয়েকটি কথায় হতে পারে অথবা এমনকি নীরবতার মাধ্যমেও হতে পারে, কারণ তাঁরা ধর্মীয় বিষয়ের আলোচক নন। তবুও দেখা গেছে একজন মহাপ্রাণের উচ্চারিত কয়েকটি মাত্র কথা কোন মানুষের জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করে দিতে পারে।

১৯৫০ সালে আমি প্রথম রামকৃষ্ণ সংঘের সংস্পর্শে আসি এবং তখন থেকেই নিয়মিতভাবে বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর এবং উদ্বোধনে যাতায়াত করতাম। অবশেষে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান করলাম। সেসময় থেকেই স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজকে দেখার এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার বহু সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। তিনি তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সেইসব কথোপকথনের কিছু কিছু একান্তই ব্যক্তিগত এবং তা প্রকাশ করার মতো নয়। তবু, মহারাজের মহানুভবতার পরিচায়ক কিছু ছোট ছোট ঘটনা আমার স্মৃতি থেকে এবং দিনলিপি থেকে সংগ্রহ করে আপনাদের সঙ্গে একযোগে মনন করতে ইচ্ছা হয়।

১৯৫৯ সালে অদ্বৈত আশ্রম কলকাতার ৪, ওয়েলিংটন লেনে অবস্থিত ছিল। একদিন স্বামী মাধবানন্দ চক্ষু পরীক্ষার জন্য ডাঃ নীহার মুন্সীর কাছে গিয়েছিলেন। অপর একজন প্রাচীন মহারাজ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। বেলুড় মঠে ফিরে যাওয়ার পথে তাঁরা অদ্বৈত আশ্রমে এসেছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল।

---

* স্বামী চেতনানন্দ রচিত 'Swami Madhavananda: An Ideal Monk' শীর্ষক মূল ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে অনূদিত।

বাংলা অনুবাদ—অঞ্জন বসু।

আমরা তাড়াতাড়ি তাঁদের জলযোগের জন্য একজোড়া ডাব এবং কিছু মিষ্টি নিয়ে এলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ ডাবগুলির শাঁস ছিল খুব পুরু, যার অর্থ জল অত্যন্ত বিস্বাদ। স্বামী মাধবানন্দজী কোনকিছু না বলেই ডাবের জল খেয়ে নিলেন। কিন্তু অপর মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে তা ফিরিয়ে দিলেন। আমরা অপ্রস্তুত হয়ে তখনই তাঁদের অন্য ভাল ডাব এনে দিতে চাইলাম। কিন্তু স্বামী মাধবানন্দজী আমাদের এইবলে নিষেধ করলেন যে, "খুঁতখুঁতে স্বভাব সন্ন্যাস জীবনের পক্ষে ভাল নয়।" গীতার বাণী তিনি জীবনে অনুশীলন করেছিলেন,—"বিনা প্রয়াসে যা তোমার নিকটে আসে তাতেই সন্তুষ্ট থেকো।"

স্বামী মাধবানন্দজী ১৯৬১ সালে সাধারণ সম্পাদক পদের দায়িত্বভার ত্যাগ করার পূর্বে ছুটি কাটানোর জন্য কালিম্পঙ গিয়েছিলেন। বেলুড় মঠ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব আমাকে বললেন ওষুধের কয়েকটা ক্যাপসুল সাধারণ ডাকে মহারাজের কাছে কালিম্পঙে পাঠিয়ে দিতে। মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত মিতব্যয়ী এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অতিরিক্ত অর্থব্যয় হোক তা চাইতেন না। কোন বিশেষ খাদ্য অথবা ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। সেইজন্য আমি প্রথমে খামের উপরে ঠিকানা লিখলাম, তারপর ক্যাপসুলগুলো পাতলা প্লাস্টিকের একটা মোড়কে ভরে খামের তলার দিকে এমনভাবে রাখলাম যাতে সেগুলো এদিকওদিক নড়াচড়া না করতে পারে এবং ডাক বিভাগের লোক ডাকটিকিটে ছাপ দেওয়ার সময় সেগুলোতে কোন চাপ দিতে না পারে। আমি সেইসঙ্গে একটা চিঠি লিখে সেটা ওষুধের সঙ্গে দিয়ে দিলাম। ছুটি শেষ হবার পরে মহারাজের সঙ্গে বেলুড় মঠে দেখা করলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি খুব বুদ্ধিমান। আমি তোমার খামটা খুলে চিঠি বের করে খামটাকে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। তোমার চিঠি পড়ার পরে বুঝতে পারলাম খামের ভেতর আমার ওষুধ আছে। খামটিকে পুনরুদ্ধার করে দেখি ক্যাপসুলগুলো ঠিক মতোই আছে। সব চেয়ে কম খরচে ওষুধগুলি পাঠানোর জন্য তোমায় ধন্যবাদ।"

স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ যখন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন আমি সেখানে যোগদান করি। আমাদের প্রকাশন বিভাগ রবিবারে বন্ধ থাকত। সেইজন্য আমরা সাধারণতঃ বেলুড় মঠে গিয়ে সারাটা দিন সেখানে কাটাতাম। স্বামী মাধবানন্দজী মাঝে মধ্যে ব্যক্তিগত অথবা অফিসের কাজকর্ম সংক্রান্ত কোন চিঠিপত্র আমাদের মাধ্যমে স্বামী গম্ভীরানন্দজীকে পাঠাতেন। তিনি তাঁর চিঠি একটি ব্যবহৃত খামে ভরে, খামের মুখ বন্ধ করে আমাদের বলতেন স্বামী গম্ভীরানন্দজীকে সেটি দিতে। তিনি মনে করতেন রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতিটি পয়সা যেন স্বামী বিবেকানন্দের রক্ত অর্থাৎ কঠিন পরিশ্রম দিয়ে অর্জিত। তিনি নিজে কৃচ্ছ্রসাধক ছিলেন এবং সন্ন্যাসীদের অপব্যয়

অথবা অমিতব্যয়ের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন।

১৯৬১ সালে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের জন্য আমেরিকা যাত্রার পূর্বে তিনি কলকাতার ৫, ডিহি এণ্টালী রোডে অদ্বৈত আশ্রমের নতুন গৃহের উদ্বোধন করেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে প্রবেশপথে ফিতে কাটার পর তিনি কর-জোড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়েছিলেন। পরে প্রাতরাশের টেবিলে কোন একজন সাধু কৌতুকপূর্বক তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, "মহারাজ, আপনি অদ্বৈত আশ্রমের নিয়ম ভেঙেছেন। এখানে স্বামীজীর নির্দেশ অনুসারে কেউ ধর্মীয় আচার পালন করতে অথবা কোনও বিশেষ দেবতাকে প্রণতি জানাতে পারে না।" স্বামী মাধবানন্দজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, "এটা অভ্যাসের ফল, আমি কি করব ?" তাঁর জীবনে জ্ঞান ও ভক্তির পূর্ণ সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর বাহ্যিক ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ যুক্তিনিষ্ঠ এবং কঠোর, কিন্তু আমরা দেখেছি তাঁর অন্তর ছিল প্রেম ও ভক্তিরসে সিক্ত।

অদ্বৈত আশ্রমের উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানের সময়ে প্রায় দুইশত সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তাঁদের প্রাতরাশ প্রস্তুত করার জন্য আমরা একজন খাদ্যদ্রব্য সরবরাহকারীকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। আমার উপর ভার পড়েছিল স্বামী মাধবানন্দজী এবং অন্য প্রবীণ মহারাজদের খাবার পরিবেশন করার। বেলুড় মঠে মহারাজের সেবককে আমি পূর্বেই ফোন করেছিলাম এবং তিনি আমাকে মহারাজের প্রাতরাশের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা বলে দিয়েছিলেন। সেইমতো আমরা ব্রিটানিয়া ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট, সন্দেশ এবং অন্যান্য জিনিষ কিনেছিলাম। যখন প্রাতরাশ পরিবেশন করা হল স্বামী মাধবানন্দজী মন্তব্য করেছিলেন : "হায় ভগবান! আমি যেখানেই যাই আমাকে একই খাবার খেতে হয়। ব্যাপারটা কি ? এইসব ছেলেরা আমাকে একটু মুখ বদলাতে পর্যন্ত দেবে না।" জীবন্মুক্ত পুরুষের পক্ষে নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকা কষ্টকর। কিন্তু আমরা তাঁর স্বাস্থ্যের দিকটাই ভেবেছিলাম। যাই হোক, আমরা যা দিয়েছিলাম তিনি তা আনন্দ করে খেলেন।

অদ্বৈত আশ্রমে যখন প্রথম যোগদান করি তখন আমি প্রুফ দেখার কাজ করতাম। যখনই আমার মনে কোন প্রশ্ন জাগত আমি স্বামী গম্ভীরানন্দজীকে জিজ্ঞেস করতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন : "আমি মায়াবতী যাচ্ছি। স্বামীজীর 'Complete Works'-এর কোথাও যদি তোমার কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন জাগে তাহলে স্বামী মাধবানন্দজীকে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে।" রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবসাহিত্য সম্বন্ধে স্বামী মাধবানন্দজী ছিলেন বিশেষজ্ঞ। স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকীর সময়ে আমরা স্বামীজীর একটি অপ্রকাশিত চিঠি পেয়েছিলাম। চিঠিটি তিনি মন্মথনাথ ভট্টাচার্যকে বাংলায় লিখেছিলেন। স্বামীজীর 'Complete Works'-এ প্রকাশের জন্য স্বামী গম্ভীরানন্দজী

সেটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন এবং স্বামী মাধবানন্দজীর অনুমোদনের জন্য সেটি তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। স্বামী মাধবানন্দজী অনুবাদটি ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখে প্রকাশের জন্য আবার অদ্বৈত আশ্রমে ফেরত পাঠান। অনেকে ধারণাই করতে পারবেন না কিভাবে রামকৃষ্ণ সংঘের এইসব বিশিষ্ট সন্ন্যাসীরা নীরবে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে স্বামীজীর কাজ করে গিয়েছেন।

১৯৬৩ সালে বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী শিক্ষণ কেন্দ্রে আমার যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্বামী গম্ভীরানন্দজী আমাকে বললেন যে স্বামীজীর শতাব্দী জয়ন্তীর জন্য আমার যাওয়া সম্ভবপর হবে না। স্বামীজীর রচনাবলীর শতবার্ষিকী সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তুতি, স্বামীজীর ৭৫টি আলোকচিত্রের মুদ্রণ কাজ এবং পার্কসার্কাসে একটি বইমেলার আয়োজন বিষয়ে আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। যাই হোক্, আমি বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামী মাধবানন্দজীকে বলেছিলাম, "পূজনীয় স্বামী গম্ভীরানন্দজী আমাকে বলেছেন এ বছর [ব্রহ্মচারী] শিক্ষণ কেন্দ্রে আসা স্থগিত রেখে স্বামীজীর কাজ করে যেতে।" স্বামী মাধবানন্দজী তৎক্ষণাৎ বললেন: "গম্ভীরানন্দ ঠিক কথাই বলেছে। স্বামীজীর কাজ কর। যদি তুমি এক বছর দেরীতে ব্রহ্মচর্য ব্রত পাও তাহলে ভেবনা যে তুমি একজন অধস্তন সাধু হয়ে যাবে। সন্ন্যাস এবং ব্রহ্মচর্য ব্রত হল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। আসল হল ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। তুমি কি জান মর্যাদায় বড় কে? যে প্রভুর কাছের লোক সেই হল বড়। সংঘে যে বেশী দিন আছে, সেই বড়—তা নয়।"

স্বামী মাধবানন্দজী রামকৃষ্ণ সংঘের সংঘগুরু পদে আসীন হবার পর বেলুড় মঠে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। মহারাজের রেঙ্গুনে তোলা একটা পুরনো আলোকচিত্র আমরা যোগাড় করেছিলাম এবং সেটাই তাঁর শিষ্যদের কাছে বিক্রী করা হত। তাঁর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ অসঙ্কোচে কথা বলতাম। সেই কারণে একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে একটা নতুন ছবি তোলার জন্যে আমি যদি কলকাতা থেকে একজন চিত্রগ্রাহককে নিয়ে আসি। প্রথমে তিনি ফটো তুলতে দিতে রাজী হননি, কিন্তু তাঁর প্রধান সেবক যখন অনুরোধ করলেন তিনি অনিচ্ছুকভাবে সম্মতি দিলেন। তিনি প্রচার এবং আড়ম্বর বিমুখ ছিলেন। একদিন বিকেলে চিত্রগ্রাহককে সঙ্গে করে আমি বেলুড় মঠে গেলাম। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে কি নিস্পৃহভাবে তাঁর হাফ হাতা ফতুয়া পাল্টে গেরুয়া পাঞ্জাবী এবং চাদর গায়ে দিয়ে তাঁর ঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটা আসনে তিনি উপবেশন করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর ছবি তোলার ব্যাপারে অদৃষ্ট আমাদের সহায় হয়নি, কারণ তাঁর চশমার কাচ ছিল পুরু, যার ফলে তাঁর চোখের উপর আলো ঠিকরে পড়ছিল।

পরে আর একজন চিত্রগ্রাহককে সঙ্গে নিয়ে আমি বেলুড় মঠে গেলাম।

এইবার আমরা লেন্স ছাড়া চশমার ফ্রেম নিয়ে এসেছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন আড়াআড়ি পা মুড়ে বসতেন মহারাজ সেইভাবে একটি আসনে বসলেন। তাঁর পায়ের পাতা দুটি দেখা যাচ্ছিল না কারণ ডান পায়ের পাতাটি তাঁর বাম হাঁটুর নীচে ছিল। যাতে তাঁর দুটি পায়ের পাতাই দৃষ্টিগোচর হয় সেরকমভাবে বসার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ জানালে তিনি আমাকে মৃদু তিরস্কার করলেন এবং তারপর আমার কথামতো বসলেন। আমি সতর্কভাবে তাঁর চাদরটা ঠিক করে দিলাম যাতে তাঁর দীক্ষিত ব্যক্তিরা ছবিতে তাঁদের গুরুদেবের চরণযুগল স্পর্শ করতে পারেন। আমি যখন তাঁকে কাচ বিহীন চশমার ফ্রেমটি পরতে বললাম, তিনি অসম্মত হয়ে মন্তব্য করলেন, "এটা একটা কিম্ভুত ব্যাপার হবে।" তখন আমি তাঁকে চশমা খুলে ফেলতে অনুরোধ করলাম কারণ তাঁর চক্ষুদ্বয় আদৌ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। আমি চেয়েছিলাম তাঁর শিষ্যেরা যাতে ছবিতে তাঁর চোখ দুটি দেখতে পান। আমি যেরকম বললাম তিনি অনিচ্ছুকভাবে তা করলেন। চিত্রগ্রাহক পরে ছবিতে তাঁর চোখের উপরে চশমার ফ্রেমটি এঁকে দেন। মনে হয় সেসব ফটোর নেগেটিভ এবং প্রিন্ট্ এখনও অদ্বৈত আশ্রমে আছে।

সংঘে যোগদানের পর আমি অন্যান্য সাধুদের কাছে স্বামী মাধবানন্দজী সম্পর্কে অনেক সুন্দর সুন্দর ঘটনা শুনেছি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তিনি খুব চাপা ছিলেন এবং সর্বোপরি অযাচিতভাবে উপদেশ দেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। একটা কথা আছে, "বাক্-স্বল্পতা হল বুদ্ধিবৃত্তির আধার।" কেউ কোন প্রশ্ন করলে তিনি একটি কি দুটি কথায় তার জবাব দিতেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে কিছু শোনবার জন্য সবসময় উদগ্রীব হয়ে থাকতাম।

১৯৬২ সালে নতুন দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারীদের সামনে স্বামী মাধবানন্দজী সংক্ষেপে বাংলায় কিছু কথা বলেন। আমার এক সতীর্থ সন্ন্যাসী সেগুলি তাঁর দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করে রাখেন এবং আমি তার নকল আমার দিনলিপিতে লিখে রাখি। কথাগুলি এখানে উল্লেখ করছি ঃ

১। যে যতটা পারে ততটা যেন সংঘের সেবা করে। সব সময় নিজের Contribution দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

২। যেখানে নিজের interest ও সংঘের interest-এর মধ্যে সংঘাত আসবে তখন নিজের স্বার্থ ত্যাগ করা উচিত। ফলে নিজের ও সংঘের উভয়ের মঙ্গল হবে। নিজের অহঙ্কার সম্পূর্ণ বিনাশ সম্ভব না হলেও এভাবে বহুল বিনাশ সম্ভব।

৩। পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সম্বন্ধ চাই। এ ভাব স্বামীজী দিয়ে গেছেন এবং অবশ্য পালনীয় ও অনুকরণীয়। নিজেদের দোষ ত্রুটি

উপেক্ষা করে ভাল গুণই দেখতে হবে। Negative না দেখে Positive side নেওয়া উচিত। তাই কল্যাণকর। Cups—half full vs half empty-এর মধ্যে half full ভাবই গ্রহণীয়।

৪। প্রত্যেক কাজই দায়িত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। কাজের মধ্যে ছোট বড় ভেদ নেই। ঘড়ির ক্ষুদ্র অংশ ও বৃহৎ অংশ উভয়ই ঘড়ির পক্ষে সমান প্রয়োজনীয়। উভয়ের উপরেই ঘড়ির সময়দান নির্ভর করে। সে রকম এ সংঘের প্রত্যেক অংশ সমভাবে essential.

৫। Comforts মানুষকে বড় করে না। মানুষের জীবনই মানুষকে বড় করে। সেজন্য Comforts-এর উপর বেশী মনোনিবেশ না করাই উচিত। Comforts যদি সহজলভ্য হয় তবে গ্রহণীয় নচেৎ দুঃখের কোনই কারণ নেই। মঠের প্রথমাবস্থায় আজকের তুলনায় আরাম উপকরণ অল্পই ছিল। আমাদের আদর্শ—Plain living and high thinking.

৬। স্বামীজী বলেছেন Work is worship. এ কথাটা এখন খুব বেশী শোনা যায় না। কর্মকালে মনে করতে হবে ঠাকুরের সেবা হচ্ছে। ভাল করে কাজ করলে জপ-ধ্যানও ভাল হবে।

৭। জপ-ধ্যান, কর্ম, পাঠ ও শরীররক্ষা—এগুলি এককালে সাধন করার চেষ্টা করা উচিত। সমন্বয়ের দ্বারা সুন্দর ও উত্তম ফল লাভ হয়, চরিত্রের বিকাশ হয়।

৮। আমাদের জীবনে কোন ulterior motive বা ক্ষুদ্র ভোগবাসনা, ক্ষমতালাভ, মানযশ অর্জন প্রভৃতি নেই। God realisation-ই প্রধান আদর্শ ও অভিপ্রায়। সুতরাং তাঁকে খুব অন্তরের সঙ্গে যত্নের সঙ্গে ভজনা করা চাই। যতকাল তাঁর ভজনা করব ততকালই তা হবে sincere earnest—এ ভাব থাকা চাই। তাঁর দর্শন লাভ তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করে। তিনি শেষ-কালে কৃপা নিশ্চয়ই করবেন—এ সত্য!

৯। আশ্চর্যকর কিছু করা উদ্দেশ্য নয়, wonderfully shine করার প্রয়োজন নেই। নিজের শক্তি অনুযায়ী দায়িত্বশীল হয়ে সংঘের সেবা করলেই তা হবে substantial. তার মধ্যেই আমাদের গৃহত্যাগের ও সন্ন্যাসজীবনের সার্থকতা থাকবে এবং সমাজেরও কল্যাণ হবে।

১০। অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে থাকে দু'চার জন মহাপুরুষ কিন্তু আমাদের সংঘের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর—ঠাকুর। এজন্যই আমরা ধন্য। তিনিই কৃপা করে তাঁর নিকট এনেছেন—(নতুবা)

সন্ন্যাসজীবন সহজ নয় বরং দুর্লভ।

১১। আদর্শলাভ দু'চার দিনে হয় না। দীর্ঘকাল steadily, sincerely or earnestly তা করতে হয় তবেই fulfilment আসে।

যখনই স্বামী মাধবানন্দজীর কোনও রচনা অথবা তাঁর সম্পর্কে কোনও লেখা দেখি আমি খুব মন দিয়ে তা পড়ি। ১৯৫৬ সালে সান্তা বারবারা বেদান্ত মন্দিরের উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে স্বামী মাধবানন্দজী আমেরিকায় এসেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে তিনি একটি ভাষণ দেন। ১৯৫৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হলিউড মন্দিরে প্রদত্ত সেই বক্তৃতাটি 'Vedanta and the West' পত্রিকায় ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে (সংখ্যা ১৩৫) 'Vivekananda and His Message' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। আমি সেই প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করি এবং ১৩৬৮ সনের মাঘ মাসের 'উদ্বোধনে' তা প্রকাশিত হয়।

১৯৭৫ সালে আমি যখন হলিউডে ছিলাম সেসময়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৭৬ বর্ষ, দশম সংখ্যায় স্বামী মাধবানন্দজী সম্পর্কে স্বামী নিরাময়ানন্দ লিখিত একটি হৃদয়গ্রাহী নিবন্ধ আমার চোখে পড়ে। লেখাটি কর্মযোগের গূঢ় রহস্য বুঝতে আমায় সাহায্য করে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পাঠাই এবং তিনি ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে ['প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায়] সেটি প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'Work or Worship.'*

১৯৬৪ সালে আমি যখন বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী শিক্ষণ কেন্দ্রে ছিলাম তখন আমি স্বামী মাধবানন্দজীর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেসময় তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের কিছু গোপন রহস্য আমার কাছে ব্যক্ত করেন। যেমন, কিভাবে মনের চঞ্চলতা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং কেমন করে মনকে অন্তর্মুখী করা যায়।

একদিন বিছানায় মশারীর মধ্যে বসে ধ্যান করার সময় তাঁর একটি দুর্ঘটনা ঘটে। ধ্যানের পরে যেই নীচু হতে গেছেন অমনি তিনি বিছানা থেকে মাটিতে পড়ে যান। কারণ তাঁর চতুর্দিক সম্পর্কে তিনি তখন সজাগ ছিলেন না। তাঁর হাড় ভেঙে যায়। তিনি যখন হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কেমন আছেন মহারাজ?" "ভালই আছি"—তিনি উত্তর দিয়েছিলেন। ফের আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনার কি এখনও ব্যথা আছে?" তাঁর শারীরিক যন্ত্রণার কথা মনে করিয়ে দেওয়াটা তিনি

* এই গ্রন্থের ১৭৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্বামী নিরাময়ানন্দ রচিত স্মৃতিকথার প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য।

"শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন আড়াআড়ি পা মুড়ে বসতেন মহারাজ সেইভাবে একটি আসনে বসলেন।"—পৃষ্ঠা ২৭২
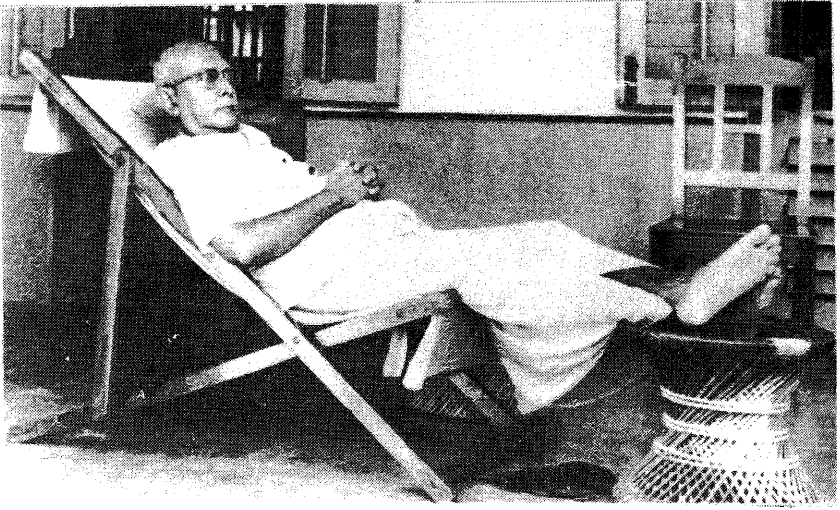
"বিকেল বেলায় স্বামী মাধবানন্দজী তাঁর ঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় তাঁর ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে এসে বসতেন, তাঁর পা-দুটি একটা বেতের মোড়ার উপর রাখা থাকত।"—পৃষ্ঠা ২৭৫

"স্বামী গঙ্গেশানন্দজী আমায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন।"—পৃষ্ঠা ২৭৫

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ও দ্বিতীয় সংঘাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের সচিব স্বামী গঙ্গেশানন্দ

পছন্দ করেননি। তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "তুমি ভাল আছ তো ?" "আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ"—আমি উত্তর দিয়েছিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "না, তোমার সব কিছু ঠিক নেই। যদি কোন চিকিৎসক তোমার দেহ পরীক্ষা করেন তিনি তোমার শারীরিক অবস্থার মধ্যে কিছু না কিছু অনিয়ম দেখতে পাবেন। সম্পূর্ণ নীরোগ শরীর হল একটা পরস্পরবিরোধী কথা।" আমি এক যথার্থ শিক্ষা পেলাম।

স্বামী মাধবানন্দজী নবীন ব্রহ্মচারীদেরও যেভাবে সম্মান দিতেন তা বিস্ময়কর। মানবিক মর্যাদাকে তিনি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। এমনকি তাঁর সেবকদেরও কলিং বেল টিপে ডাকতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। [তাঁর অসুখের সময়] তাঁর সেবকদের উপর দায়িত্ব ছিল ২৪ ঘণ্টাই তাঁকে দেখাশোনা করা, আবার তাদের নিজেদেরও কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন হত। সেইজন্য তাঁর নৈশকালীন (রাত্রি ১১টা থেকে ভোর পাঁচটা অবধি) দেখাশোনার জন্য শিক্ষণ কেন্দ্রের ব্রহ্মচারীদের তাঁর ঘরে নিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রথম রাত্রিতে রাত ১১টা থেকে ২টা অবধি আমি তাঁর সেবা করেছিলাম, তারপর অন্য আর একজন ব্রহ্মচারীর পালা পড়ে। এহেন একজন দুর্লভ সন্তের সেবা করা ছিল অসীম সৌভাগ্যের কথা। তাঁর ঘরের এক কোণে বসে একটি ছোট টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে আমি শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়তাম এবং লক্ষ্য রাখতাম যদি কলঘরে যাওয়ার সময়ে মহারাজের কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

বিকেল বেলায় স্বামী মাধবানন্দজী তাঁর ঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় তাঁর ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে এসে বসতেন, তাঁর পা-দুটি একটা বেতের মোড়ার উপর রাখা থাকত। একদিন তিনি যখন স্বামী গঙ্গেশানন্দজীর সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন আমি সেখানে যাই। স্বামী গঙ্গেশানন্দজী আমায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন, সেজন্য তিনি স্বামী মাধবানন্দজীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন এই ভেবে যে হয়ত মহারাজ আমাকে ভাল চেনেন না। স্বামী মাধবানন্দজী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "আমি ওকে বিলক্ষণ চিনি। ওর মুখে সবসময় হাসি লেগে আছে।" আমি তাঁর এই মন্তব্যকে আমার প্রতি তাঁর আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করেছিলাম।

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, স্বামী মাধবানন্দজী সম্পর্কে কিছু লেখা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তিনি ধর্ম-প্রসঙ্গের আলোচক ছিলেন না। তিনি ধর্মকে অনুশীলন করে তার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর জীবন-ই ছিল তাঁর বাণী। স্বামী মাধবানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল "নির্মল", যার অর্থ কলুষতাহীন। তিনি এই নামকে প্রকৃতই সার্থক করেছিলেন। তিনি ছিলেন যথার্থই একজন মহাপ্রাণ।

পরমপূজ্য শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ সম্বন্ধে দু'একটি কথা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

আমি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শেষের দিক থেকে বেলুড় মঠে যাতায়াত করি। তখন আমি সিটি কলেজের ছাত্র। আই. এ. পড়ি। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বেলুড় মঠে গেলে প্রশান্তস্বভাব পূজ্যপাদ মাধবানন্দজীকে দর্শন করে আকৃষ্ট হই ও প্রণাম করি। তিনি আমায় প্রশ্ন করেন আমি কি করি ও কোথায় থাকি। আমি বিনীতভাবে তাঁকে জানাই যে, আমি কলকাতায় সিটি কলেজে পড়ি, থাকি বউবাজারে একটি মেসে। তিনি শুনে বললেন: "বেশ বেশ, মঠে আসবে। কম বয়স। এখন থেকে মঠে-আশ্রমে এলে তোমার জীবনের অনেক উপকার হবে।" আমি পুনরায় পরমশ্রদ্ধেয় মাধবানন্দজী মহারাজকে প্রণাম করি।

এই আমার তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও কথাবার্তা! তিনি গম্ভীর-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলে পরে বেলুড় মঠে দেখা হলেও কাছে যেতে ভরসা হত না। দেখা করতে ভয় পেতাম। তবে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত সুপ্রসন্ন মুখ তাঁর প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আমি সেণ্ট্রাল এভিনিউয়ে অবস্থিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটিতে পরমপূজ্য স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করি। কিন্তু তা হলেও বেলুড় মঠের আকর্ষণকে আমি কোনদিনই ভুলতে পারিনি। বেলুড় মঠে যখনই বা যেদিনই যেতাম তখন কোন কোন দিন পরম শ্রদ্ধেয় মাধবানন্দজী মহারাজের সঙ্গে দেখা হত এবং আমি তৎক্ষণাৎই তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করতে ভুলতাম না এবং তিনিও হাস্যমুখে বলতেন: "এই যে, মঠে মাঝে মাঝে আসছ দেখছি! বেশ, ভাল ভাল।"

আজ বহুদিন অতীত হল, কিন্তু বেলুড় মঠের সেই পুরনো স্মৃতি এখনও ভুলতে পারিনি এবং ভুলতে পারিনি সদা-হাস্যমুখ স্বামী মাধবানন্দজীর ধীরস্থির আনন্দে ভরা কথাগুলি ও তাঁর পূত সান্নিধ্যের আনন্দময় স্মৃতি।

স্বামী মাধবানন্দ প্রসঙ্গ*

স্বামী ভবহরানন্দ

নির্মল এবং বিমল দুই ভাই প্রবাদের রাজহংস ও তার ছায়ার মতো শান্ত জীবনহ্রদের উপর ভেসে চলেছিল। দুজনেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্দেশ্যের প্রতি একান্ত সমর্পিত প্রাণ। এঁদের একজনের সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে গেলে অপরজনকে বাদ দিয়ে বোধহয় তা সম্ভব নয়। সংসার ত্যাগের ক্ষেত্রেও একজন অপরজনকে প্রায় একই সময়ে অনুসরণ করেন। বয়োজ্যেষ্ঠ নির্মল, যিনি পরে স্বামী মাধবানন্দ নামে সুপরিচিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়তে পড়তে গৃহত্যাগ করে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ছোট ভাই বিমল উত্তরকালে যিনি স্বামী দয়ানন্দ, তখন এম. এস. সি. পড়ছেন। তিনি দাদা নির্মলকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বেলুড় মঠে এসেছিলেন। দাদাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বিফল হয়ে বিমল পরবর্তী শুভ কাজটি সম্পন্ন করলেন নিজেই বেলুড় মঠে যোগ দিয়ে দাদারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে। একসঙ্গে সংসার ত্যাগের ক্ষেত্রে দুই ভাই-এর মধ্যে এই অপূর্ব সহযোগের নজির রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাসেও বিরল।

স্কুলে দুই ভাই-ই পড়াশোনায় খুবই ভাল ছিলেন, তবু নির্মল ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। শ্রী কে. সি. সেন যিনি উত্তরজীবনে তদানীন্তন মহীশূর রাজ্যের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন তিনি একই স্কুলে নির্মলের সহপাঠী ছিলেন। পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করা নিয়ে শ্রী সেন এবং নির্মলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত। একবার স্কুলের প্রধান শিক্ষক নির্মলের ইংরেজী ভাষায় দখল ও সাবলীলতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানেন যে সারা স্কুলের মধ্যে একমাত্র নির্মলই Idiom ও Phrase-এর সঠিক ব্যবহার সহ এত নির্ভুল ইংরেজী লিখতে পারে। ইংরেজী ভাষার উপর এই অসাধারণ দখল সম্বন্ধে স্বামী মাধবানন্দজীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হত যে তিনি এই বিদেশী ভাষায় এরকম দক্ষতা কিভাবে অর্জন

---

*স্বামী ভবহরানন্দ রচিত 'ABOUT SWAMI MADHAVANANDAJI : SOME SMATTERING OF THE MATTER' শীর্ষক মূল ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে অনূদিত।

বাংলা অনুবাদ—স্বামী শিবময়ানন্দ।

করলেন তাও আবার কলকাতা থেকে অনেক দূরে মফস্বল শহরের স্কুলে যেখানে ইংরেজী সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার কোনভাবেই সুযোগ ছিল না? উত্তরে মহারাজ বলেছিলেন, তিনি তাঁর আইনজীবী বাবার কাছ থেকে কখনো কখনো সাহায্য পেতেন এছাড়া 'EPIPHANY' (একটি খৃষ্ট ধর্মীয় প্রকাশন) জাতীয় সাময়িক পত্রিকা এবং ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের মতো সংবাদপত্রের তিনি নিয়মিত পাঠক ছিলেন। এইসব সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাসই সম্ভবতঃ পরিণত ও শুদ্ধ ইংরেজী লিখতে তাঁকে সাহায্য করেছিল এমনকি তখন থেকেই যখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুর স্কুলের ছাত্র।

তিনি যে শুধু ইংরেজী ভাষাতেই দক্ষ ছিলেন তা নয়। হাসপাতালে শয্যাগত অবস্থায় একবার তাঁকে এক অতি সূক্ষ্ম জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করতে দেখেছিলাম। তাঁর শল্য চিকিৎসক ডাঃ মুরলী চ্যাটার্জী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন যিনি নিজেও স্কুলজীবনে গণিতের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনিও মাধবানন্দজীকে এইরকম একটি জটিল জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করতে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। এই সমস্যাটি স্কুলজীবনে তাঁর নিজের কাছেই একটি ধাঁধা বলে মনে হত। উত্তরজীবনে স্বামী মাধবানন্দ তাঁর অনবদ্যতা ও রচনাশৈলীর জন্যও পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচনারীতি অবশ্যই গভীর ভাবের হত।

দু'একবার তাঁর কাছে আমাদের রামকৃষ্ণ সংঘের ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত' সম্পর্কে মন্তব্য শুনেছি। খুবই ঘরোয়াভাবে বলেছিলেন তিনি উদ্ধৃতিবহুল সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় পছন্দ করেন না। তাঁর মতে সম্পাদকীয়গুলি সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, বিশ্লেষণাত্মক হওয়া উচিত যার মধ্যে থাকবে স্বকীয় মতামত। এই প্রসঙ্গে আলোচনার সুযোগে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি নিজে কেন সম্পাদকীয় লেখেন নি? উত্তরে তিনি বলেন, "একটা সময়ে আমি স্থির করেছিলাম যে আমি নিজের মতো করে সম্পাদকীয়গুলি লিখব। ঠিক এই সময় পূজনীয় হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) আমাকে আলমোড়া থেকে এই পরামর্শ দিয়ে একটি চিঠি লেখেন যে, সব কিছুই নিজে নিজে না করে অন্য যাঁদের কার্যক্ষমতা আছে আমি যেন তাঁদের সদ্ব্যবহার করি। অন্ততঃ এখানে অর্থাৎ স্বামীজীর এই সংঘে ক্ষমতা ও কর্ম অযথা একজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত নয়। তিনি স্বামী রাঘবানন্দকে (সীতাপতি মহারাজ) সম্পাদক করার জন্যও পরামর্শ দেন। তাঁর মতে এখানে সবাই এসেছে সেবা করতে এবং যে সুযোগগুলি দেওয়া হচ্ছে তার সাহায্যে নিজেদের বিকশিত করতে। মাধবানন্দজী বলেছিলেন, "যখন আমি পূজনীয় হরি মহারাজের কাছ থেকে এই নির্দেশগুলি পাই তার পরে আর কখনও ঐ বিষয়ে গভীরভাবে ভাবিনি, এবং তার পরে এত বছর ধরে সম্পাদকের কাজ করার কোনও অবকাশও আর উপস্থিত হয়নি।" এইভাবে যদিও তিনি নিজে

কখনও পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেননি তা সত্ত্বেও যখনই প্রয়োজন হয়েছে তিনি সম্পাদকদের গড়ে তোলার জন্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে এসেছেন। রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসীদের লেখা অনেক বই তিনি নিজে সম্পাদনা করে একটা নির্দিষ্ট মান এবং উৎকর্ষতা অনুসারে প্রকাশিত হতে সাহায্য করেছেন। তাঁর সুনিপুণ সম্পাদনা ও সুদক্ষ পরামর্শে পুস্তকগুলির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেয়েছে। ইংরেজীতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবসাহিত্যে অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী স্বামী নিখিলানন্দজী সাধুজীবনের প্রথম অবস্থায় মায়াবতীতে থাকাকালে গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে মাধবানন্দজীর মূল্যবান পরামর্শ লাভ করেন। নিখিলানন্দজীর সংঘে যোগদানের কাহিনী শুনিয়ে মহারাজ বলেছিলেন তিনি মায়াবতীতে 'দি লাইফ অব্ শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনায় কি কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন। স্বামী মাধবানন্দজীর জীবনের শেষ দিনগুলিতে স্বামী নিখিলানন্দজী তাঁকে একটি চিঠি লিখে তাঁর অধীনে নিজের শিক্ষানবিশীর দিনগুলির কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, তিনি লিখেছিলেন, "আমার জীবনের সব পাওয়া, এমন কি আমার লেখা, সামান্য কিছু খ্যাতি এবং পুস্তকের কিছু রয়্যাল্‌টির টাকা শুদ্ধ সব কিছুর জন্যই আমি আপনার নিকটে ঋণী। এটা আমার পক্ষে একটা বিশেষ সুযোগ, আমার নিজস্ব যা কিছু আছে সব বিক্রি করে আপনার জন্য কিছু করতে পারব।"

স্বামী মাধবানন্দজীর রচনার ধরন এবং বিষয়বস্তুর গভীরতা ডন কুইক-জোটের লঘু হাস্যরসের বিপরীত হত। কিন্তু এই রচনারীতির সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে সাধারণ কথোপকথনে স্বামী মাধবানন্দজী তাঁর সদাজাগ্রত কৌতুকবোধ, পরিহাসপ্রিয়তা এবং তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর দেবার ক্ষমতার জন্যও সুপরিচিত ছিলেন। যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁরা সকলেই তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। আবার আমি এও দেখেছি যে স্বামী মাধবানন্দজী তাঁর শেষজীবনে ডন কুইকজোটের কাহিনী কি ভাবে উপভোগ করতেন! বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষ দু-এক বছর। তাঁর মতো একজন প্রবীণ ব্যক্তি, যিনি সারাজীবন একটা গভীর ভাব নিয়ে থেকেছেন, ডন কুইক-জোটের কাহিনী এমন উপভোগ করতে পারেন তা আমার কাছেও সত্যিই খুব বিস্ময়কর মনে হত। আমি অনেক পরে জেনেছি স্পেনে একসময়ে স্কুলে ও কলেজে নীতিশিক্ষা ও দর্শনশিক্ষার বই হিসেবে ডন কুইকজোটের বই আবশ্যিক পাঠ্য করা হত। এর ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য গ্রন্থটিকে আমাদের গীতার মতো মূল্য দেওয়া হত।

স্বামী দয়ানন্দজীর সম্পর্কে স্বামী মাধবানন্দজীর মনোভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আমাকে বলেছিলেন, স্বামী দয়ানন্দ প্রথম জীবন থেকেই সব ব্যাপারে খুব 'প্র্যাকটিকাল' (বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন)। আমি যখন তাঁর

এই ধারণার কারণ জানতে চাই, তখন তিনি আমাকে দু-তিনটি উদাহরণ দিয়েছিলেন। একটি হল তাঁদের দুজনের আমেরিকায় থাকাকালীন ঘটনা। একদিন তাঁরা দুজনেই একটি ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে কার্যোপলক্ষে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আরও অনেক লোক দাঁড়িয়েছিলেন। অন্য একটি জরুরী কাজে যেতে দেরী হয়ে যাচ্ছে বুঝে স্বামী দয়ানন্দজী কাউণ্টারের ভিতরে উঁকি মেরে দেখেন মহিলা করণিক লেখার কাজে ব্যস্ত। তৎক্ষণাৎ তিনি মহিলাটিকে তাঁর সুন্দর ও দ্রুত লেখার জন্য তারিফ করলেন। প্রশংসায় খুশি হয়ে ভদ্রমহিলা প্রত্যুত্তরে জানতে চাইলেন, তিনি কোন ভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন কি না? অতঃপর এইভাবে কাজটি মিটিয়ে দয়ানন্দজী বেশ কিছুটা সময় বাঁচালেন।

স্বামী মাধবানন্দজী অপর একটি ঘটনা বলেছিলেন যা থেকে বোঝা যায় কি দক্ষ মেকানিক ছিলেন স্বামী দয়ানন্দজী। দুই ভাই মোটর গাড়িতে যাচ্ছিলেন, চালকের আসনে ছিলেন স্বামী মাধবানন্দজী। তাঁরা যখন একটি ঢালের মুখে পেঁাছে গেছেন এবং সেটি পার হওয়ার জন্য এগুচ্ছিলেন তখন হঠাৎ গাড়িটিতে কিছু গুরুতর যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল। যে কোন লোকের কাছেই পরিস্থিতিটা সঙ্গীন বলে মনে হত। কিন্তু স্বামী দয়ানন্দজী তৎক্ষণাৎ গাড়ির কোন্ অংশে গোলমাল তা খুঁজে বের করে সঙ্গে সঙ্গে তা সারিয়েও ফেললেন। এই ঘটনাটিও আমেরিকাতে ঘটেছিল। প্রায়ই লক্ষ্য করে দেখেছি স্বামী মাধবানন্দজী স্বামী দয়ানন্দজীর বাস্তব বুদ্ধি ও জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গির সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন—সে জ্ঞান গৃহনির্মাণের কাজেই হোক অথবা জলকল জাতীয় বা অন্য কোন মেরামতি সংক্রান্ত কারিগরী কাজেই হোক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য স্বামী দয়ানন্দজী কলকাতায় 'শিশুমঙ্গল' প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুতঃ তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে শিশু ও মাতৃকল্যাণ এই ধারার পথিকৃৎ। এই সংগঠনটি এদিক দিয়ে অনন্য যে এটি ভারতবর্ষের একটি সন্ন্যাসী সংঘের দ্বারা পরিচালিত। এটি ক্রমে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ দেশের মহান ব্যক্তিরা পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বিশেষ ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন।

স্বামী মাধবানন্দজীর প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁর বৃহদারণ্যক উপনিষদ, বিবেকচূড়ামণি ও অন্যান্য কয়েকটি অপ্রধান উপনিষদের উৎকৃষ্ট অনুবাদের। এই অপূর্ব রচনাগুলি তাঁর ইংরেজী ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য বহন করে।

তাঁর অনূদিত ভগিনী নিবেদিতার 'দি মাষ্টার এ্যাজ আই স হিম' বইটির অনুবাদের কথা একবার তিনি উত্থাপন করেন। অর্বাচীনের মতো ধৃষ্টতা দেখিয়ে আমি সরাসরি তাঁর কাছেই অভিযোগ করেছিলাম যে তাঁর এই

অনুবাদটিকে আদৌ খুব সুখপাঠ্য অথবা প্রাঞ্জল অনুবাদ বলা যায় না, অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়। আমার এই স্পষ্ট সমালোচনায় যেন শিশুসুলভ কৈফিয়তের সুরে তিনি বলেন, "দেখ, নিবেদিতার ইংরেজী একটু কঠিন আর তা সরল চলতি বাংলায় অনুবাদ করা সাধারণ কাজ নয়। তবু একটা চেষ্টা তো করা গেছে। এর পরে অন্য কেউ এটা পরিমার্জিত করে আরও উন্নত করতে পারে এবং তখন সেরকম একটা সংস্করণ বের করা যেতে পারে—তাই নয় কি ?" এখন ভাবলে শিউরে উঠি কতখানি ঔদ্ধত্য দেখিয়ে এমন অপ্রিয় মন্তব্য করে তাঁকে বিব্রত করেছি। সম্ভবতঃ আমি ভুলেই গেছলাম যে মহারাজ বি এ. তে বাংলা পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে গৌরবজনক বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। আমি এখন উপলব্ধি করতে পারি কত নম্র ও ভদ্রভাবে তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে বুঝতে পারি প্রকৃত বিনয় কাকে বলে ? অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এহেন নিরভিমানতা চরিত্রে অসাধারণ মাধুর্য দান করে—যা মহারাজের মধ্যে দেখা যেত।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর সামগ্রিক আচার ব্যবহারে নিরভিমানতা সদা সর্বদা প্রকাশ পেত। কোন শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে তিনি প্রায় সর্বদাই নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে এই বলে আরম্ভ করতেন, "আমি কথামৃতের ছাত্র মাত্র। ধর্ম সম্বন্ধে যা সামান্য অ, আ, ক, খ শিখেছি তা কথামৃত থেকেই শিখেছি।" এভাবেই তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে সফল হতেন। কোন কোন অসতর্ক মুহূর্তে অবশ্য তিনি স্বীকার করে ফেলতেন যে তিনি ছাত্রাবস্থাতেই স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগ' পড়ে আনন্দ পেয়েছিলেন। মনে হয় একসময় তিনি তাঁর প্রিয় বই 'জ্ঞানযোগ' পড়ে কতখানি আনন্দ পেয়েছেন তা পূজনীয় স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে (হরি মহারাজ) লিখেছিলেন এবং স্বামী তুরীয়ানন্দজী তাঁর 'জ্ঞানযোগ' অধ্যয়নের অভ্যাসকে উৎসাহিত করে তাঁকে প্রচুর আশীর্বাদ করেন। কোন কোন সময়ে আমি লক্ষ্য করতাম যে তাঁর উত্তরগুলি এত গভীর ও বিস্তারিত হত যে প্রশ্নকারী তাঁর জ্ঞানের প্রকৃত গভীরতা উপলব্ধি করতে এবং বিষয়বোধ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যর্থ হত। অবশ্য এ সবই ব্যক্তিটির মানসিকতার উপর নির্ভর করত। কখনও কখনও এমনকি মধ্যরাত্রেও স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে অথবা বেদান্ত দর্শনের উপরে —বিশেষ করে তারাসার পণ্ডিতমশাই যেসব বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন তারই কোন কোন অংশ নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন। এটা ঠিকই যে তাঁর ঘুম খুবই কম ছিল এবং প্রায়ই তিনি তাঁর নিদ্রাহীনতার বিষয়ে অনুযোগ করতেন। আমি তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করতাম যে তাঁর তো কিছুটা ঘুম হয়েছে অতএব এবিষয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

আমার মনে পড়ে এরকম অনেক রাত্রে তিনি তাঁর প্রথম শৈশব এবং

বাল্যকালের কোন কোন ঘটনা বা সেরকম কিছু আমার কাছে স্মৃতিচারণ করতেন। প্রায় দিনই তাঁর কথায় মায়ের চেয়ে বাবার প্রসঙ্গই বেশী করে উল্লেখ থাকত। সুতরাং আমার মনে হয় তিনি বাবার অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবংজীবনের অন্ততঃ একটা সময়ে বাবাকেই তিনি আদর্শস্বরূপ মনে করতেন। তিনি আমায় বলেছিলেন, তাঁর মধ্য বয়সের কয়েকটা বছর বাদ দিলে জীবনের সব সময়েই তিনি কোন না কোন অসুখে ভুগেছেন। যখন তিনি অষ্টম কি নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন অসুস্থ হয়ে প্রায় মরণাপন্ন হন এবং তাঁর বাঁচবার আশা খুব কমই ছিল। অবশেষে সব চিকিৎসাই যখন বিফল হল তখন তাঁর বাবা এক সাধুর কাছে যান, এবং মনে হয় এই সাধুই তাঁর জীবন সম্পর্কে একটু আশা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সাধু এও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ছেলেটি কখনই স্বাভাবিক সংসারজীবনে ফিরে আসবে না এবং পিতা হিসেবে তিনি যেন সেজন্য প্রস্তুত থাকেন।

কখনও কখনও নিথর নিঃস্তব্ধ নিশীথে তিনি তাঁর স্কুলে যাওয়ার স্মৃতি বর্ণনা করতেন, তাঁর খেলার জায়গার কথা বলতেন এবং এমনকি সেই পুকুরটির পর্যন্ত বিবরণ দিতেন যেখানে প্রায় প্রতিদিন তিনি স্নান করতে যেতেন। একটি ছোট গ্রাম্য রাস্তা পেরিয়ে তাঁকে পুকুরে যেতে হত। একদিন তিনি স্নান সেরে এক টুকরো সাবান হাতে করে পুকুর থেকে ফিরছিলেন। ঐ পথ দিয়ে তখন কয়েকটা মোষ যাচ্ছিল। দুজন বাউড়ি রাখাল বালক মোষগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। একজন হেঁটে আর একজন মোষের পিঠে চেপে যাচ্ছিল। বয়সে ছোট রাখালটি বড়জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইঙ্গিত করল এবং চেঁচিয়ে বলল, "আমরা এত কালো, অথচ বাবুদের ছেলেরা এমন ফর্সা আর সুন্দর হয় কি করে রে?" তামাক খেতে খেতে বড়জন উত্তর দিয়েছিল, "তুই এই সহজ কথাটা জানিস না—তামাকের রঙ হল কালো, আর আমরা সেই তামাক খাই বলে আমাদের রঙও কালো।" ছোট ছেলেটি এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে মহারাজের হাতের সাবানটি দেখিয়ে বলল, "বাবুরা সাবান মেখে স্নান করে বলে তারা এত ফর্সা ও সুন্দর!" কখনও কখনও স্বামী মাধবানন্দজী অতীতের এইসব ছোট ছোট ঘটনার স্মৃতি মনে করে নিজেও খুব হাসতেন। এইভাবে তাঁর সঙ্গে আমি তাঁর জীবনের অনেক কাহিনী উপভোগ করতাম। আপাতদৃষ্টিতে সবগুলিই ছিল শিশুসুলভ সরল কাহিনী কিন্তু তার মধ্যেই অনেক সময় সাধারণ প্রতীতির পশ্চাতে নৈতিক শিক্ষা ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে গভীর অর্থবহ একটা অন্তর্নিহিত ভাব থাকত।

গভীর রাতে এইসব স্মৃতিচারণের কারণ হয়ত এই ছিল যে দিনের বেলায় কেউ না কেউ, কখনও কখনও বা তাঁর ডাক্তারও তাঁকে দেখতে আসতেন। একমাত্র রাত্রে তিনি ঘরে একা থাকতেন আর প্রায়ই তাঁর ঘুম হত না। এসময়

কোন প্রশ্ন করলে তিনি তার উত্তরগুলিও সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে যাঁদের তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন, কখনও কখনও আমি তাঁদের প্রসঙ্গ অবতারণা করবার চেষ্টা করতাম। স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজ সম্বন্ধে তাঁর ছিল এক অতুলনীয় শ্রদ্ধা। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী সম্বন্ধে তিনি বলতেন যে, কলেজে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর জীবনের অন্যান্য দিক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী এমনকি স্বামী সারদানন্দজীর সঙ্গেও সঙ্গত ভাবেই তুলনা করা যেতে পারে। তাঁর মতে বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জীবনচর্যা ছিল প্রকৃতই একজন পরমহংসের মতো। স্বামী সারদানন্দজীর সম্বন্ধেও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। অনেক সময় তিনি বলতেন যে, স্বামী সারদানন্দজীর কাছ থেকে তিনি অনেক জিনিষ শিখেছিলেন। সিদ্ধিদাতা গণেশের মতো প্রশান্ত স্বভাবে তিনি [রামকৃষ্ণ সংঘে] তাঁর সমকালীন ব্যক্তিত্বদের মধ্যেও অতুলনীয় ছিলেন। তিনি হরি মহারাজের সাধুসুলভ গুণ ও শরৎ মহারাজের অমায়িক ও সৌজন্যমূলক ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করতেন। তিনি বলতেন, তাঁদের এই গুণাবলী আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে পারে এবং শুধুমাত্র অনুকরণ না করে তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা অনুযায়ী আমরা চলতে পারি।

শ্রীশ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দজী সম্বন্ধে তিনি কেন জানি না সহজে কিছু বলতে চাইতেন না। অন্ততঃপক্ষে আমার তো তাই মনে হত। শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে অনুরোধ জানালে তিনি বলতেন, “সবই তো বই-এ আছে। তোমরা বরং খগেন মহারাজ (স্বামী শান্তানন্দজী) ও জিতেন মহারাজের (স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী) কাছে জিজ্ঞেস কর, তাঁরা শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে সব কিছু সঠিক ভাবে বলতে পারবেন।”

স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি খুব মজার স্মৃতি ছিল। একবার তিনি আমায় বলেছিলেন, “একটি ব্যক্তিত্বের কল্পনা করতে চেষ্টা কর যাঁর মধ্যে একটি শিশুর, একটি বালকের, একটি যুবার ও একজন বৃদ্ধের ভাব গুলির একই সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং তাহলেই তুমি মোটামুটি তাঁর সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবে।” একবার স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাঁর অতীতের পরিব্রাজক জীবনের মধুর দিনগুলির কথা হিন্দীতে বর্ণনা করছিলেন। ঐসময় স্বামী মাধবানন্দজী পূর্বাপর না ভেবে ঝোঁকের মাথায়, সরল মনে অখণ্ডানন্দজীর হিন্দী কথার একটি ভুল সংশোধন করে দেন। এতে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর প্রতিক্রিয়া এত তীব্র হল যে তিনি বেশ কয়েকদিন মাধবানন্দজীর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। একদিন স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে প্রফুল্ল মেজাজে থাকতে দেখে মাধবানন্দজী আবার বিষয়টির অবতারণা করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছেন। অখণ্ডানন্দজী তৎক্ষণাৎ

উত্তর দিলেন, "তুমি বোকার মতো ওইভাবে সকলের সামনে, অর্থাৎ সমস্ত ট্রাস্টীদের সামনে আমার হিন্দীর ভুল সংশোধন করতে গেলে কেন? হতে পারে তোমার হিন্দী-জ্ঞান আমার থেকে একটু ভাল কিন্তু ঐভাবে সকলের সামনে আমার সম্মান ক্ষুন্ন করার কি দরকার ছিল?" স্বামী মাধবানন্দজী তখনই বিশেষভাবে দুঃখপ্রকাশ করে অখণ্ডানন্দজী মহারাজের কাছে ক্ষমা চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ডানন্দজীর মনের মেঘ কেটে গেল। এরকমই সহজ সরল ছিলেন তিনি এবং এতই পরিবর্তনশীল ছিল তাঁর মন।

এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্বামী মাধবানন্দজী হিন্দীকে আমাদের রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর অল্পসংখ্যক প্রবক্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি নিজে হিন্দী খুব ভাল জানতেন এবং হিন্দী ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাঁর লেখা একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সমসাময়িক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও ভারত সরকারের ভাষা কমিশনের চেয়ারম্যানরূপে হিন্দীকে দেশের সাধারণ ভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়ার সমর্থনে মতপ্রকাশ করেছিলেন। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি স্বামী মাধবানন্দজীও ছিলেন হিন্দী ভাষার প্রসারের এক বড় সমর্থক। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে তাঁর সময়ে মিশনের পক্ষ থেকে তিনি 'সমন্বয়' নামে একটি হিন্দী পত্রিকার প্রকাশনা করতেন। এই কাজে তাঁর সাহায্যকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত হিন্দী কবি শ্রীসূর্যকান্ত ত্রিপাঠী যিনি পরে 'নিরালা' ছদ্মনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নিরালাজী স্বামী সারদানন্দের শক্তি পূজা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে ঐ বিষয়ের উপরে একটি বই লেখেন। প্রকাশনা কাজের প্রয়োজনে স্বামী মাধবানন্দজী বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছেও যেতেন। পরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। তিনি সেসময়ে পাটনায় থাকতেন। কলকাতার হিন্দু হোস্টেলে মাধবানন্দজীর সমসাময়িক আবাসিকদের মধ্যে শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদও ছিলেন।

একবার স্বামী মাধবানন্দজীকে 'সমন্বয়' পত্রিকার কাজে শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য পাটনায় যেতে হয়েছিল। পাটনা রেল স্টেশনে নেমে তিনি দেখলেন স্টেশন চত্বরে প্রচণ্ড ভিড় কারণ তখন সেখানে কোন স্থানীয় উৎসব চলছিল। রেল যাত্রার ফলে শ্রান্ত ও ধূলিধূসরিত থাকায় তিনি স্টেশনের ওয়েটিং রুমে চট্ করে স্নান সেরে নিয়ে তারপর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাড়িতে যাবেন বলে মনস্থ করলেন। অতঃপর মালপত্র ওয়েটিং রুমে রেখে তিনি বাথরুমে ঢুকলেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখে চমকে উঠলেন—তাঁর জরুরী কাগজপত্র ভরতি পোর্টফোলিও ব্যাগটি খোয়া গেছে। তৎক্ষণাৎ ভিড় জমে গেল। লোকেরা তাঁকে রেল পুলিশের কাছে চুরির অভিযোগ জানাতে বললেন যাতে খোয়া যাওয়া জিনিষ পুনরুদ্ধারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সহযাত্রীরা বার বার বলতে থাকায় তিনি

পুলিশ ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন একজন পুলিশ একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছে। লোকটির হাতে তাঁর পোর্টফোলিও ব্যাগটি ও একটি পেতলের ঘটি। খোঁজ নিয়ে জানলেন এই লোকটিই তাঁর পোর্টফোলিওটি চুরি করে অন্য জায়গায় আবার ঘটি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। স্বামী মাধবানন্দজীকে প্রমাণ দিতে হল যে পোর্টফোলিওটি তাঁরই। পোর্টফোলিওটিতে জরুরী কাগজপত্র থাকায় স্বামী মাধবানন্দজী সেটি তখনই তাঁকে ফেরত দিতে অনুরোধ জানালেন এবং সৌভাগ্যক্রমে পুলিশ তাঁর অনুরোধ রাখল। যাই হোক, পুলিশ চোরটির বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করল এবং কয়েকমাস পরে এই সামান্য ব্যাপারের জন্য মহারাজকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে হাজির হতে হল। আদালত কক্ষে তিনি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে অপরাধী স্বীকার করছে যে সে হাত সাফাইয়ের কাজে পোক্ত লোক এবং বিগত কয়েক বছর ধরেই এই কাজ করে আসছে। এইভাবে উচ্চস্বরে অপরাধ স্বীকার করে সে মাধবানন্দজীর সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ল ও আক্ষেপ করতে লাগল যে দুর্ভাগ্যক্রমে সে বুঝতেই পারেনি ঐ ব্যাগটি ছিল তাঁর মতো একজন মহাত্মার, জানলে সে কখনই তা স্পর্শ করত না। তার বিশ্বাস তার ধরা পড়ার একমাত্র কারণ হল যে সে একজন মহাত্মার জিনিষ নিয়েছে। স্বামী মাধবানন্দজী এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেন, "এই হল ভারতবর্ষ, যেখানে একজন চোরেরও অনুভূতি ও বিশ্বাস এইরকমের।"

কোন কোন দিন কথোপকথনকালে স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের প্রসঙ্গ উঠত। মহাপুরুষ মহারাজের প্রতি স্বামী মাধবানন্দজীর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আলাপ আলোচনার সময় স্বতঃই ব্যক্ত হত।

পূজনীয় হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন মিঃ ব্রাউন নামে মিশনের এক ঘনিষ্ঠ ভক্ত তাঁর খুব সেবা করেছিলেন। স্বামী দয়ানন্দজীর কাছেও আমি এই ভক্তটির সেবার মনোভাব, ত্যাগ ও দায়িত্বশীলতার কথা শুনেছি। স্বামী মাধবানন্দজী সংঘাধ্যক্ষ থাকাকালে এই ভক্তটি সুদূর আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। মিঃ ব্রাউনের এদেশে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সন্ন্যাসগ্রহণ। তিনি তখন খুবই বৃদ্ধ, বোধহয় নব্বুইয়ের কাছাকাছি বা কিছু কম বয়স। সেই বছরে একজন বিশেষ প্রার্থীরূপে স্বয়ং মাধবানন্দজীর কাছ থেকেই সন্ন্যাস নেবেন—এই কেবলমাত্র তাঁর আশা। স্বামী দয়ানন্দজী প্রমুখ কয়েকজন প্রাচীন সাধু মিঃ ব্রাউনের হয়ে সুপারিশ করেন। কিন্তু স্বামী মাধবানন্দজী ছিলেন এই ব্যাপারে অত্যন্ত অনমনীয়। সংঘাধ্যক্ষরূপে এ ব্যাপারে তাঁর নিজের স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। সকলে অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাবার পরে আমি মহারাজের কাছে আমার কৌতূহল প্রকাশ

করলাম যে এমন একজন একনিষ্ঠ ভক্তের প্রার্থনা তিনি একটি ব্যতিক্রম হিসেবে মঞ্জুর করতে চাইছেন না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, "তুমি ওদের বক্তব্য জান না। ওরা সকলে চায় এবিষয়ে আমি আমার স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করি। ওরা যদি ট্রাস্টী মিটিং-এ এই ব্যাপারে সকলে মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে তাহলে অবশ্যই আমিও সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেব। আমার সমস্যা হল, অতীতে আমি অনেকবার সংঘাধ্যক্ষের বিশেষ পদাধিকার ও স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছি। শুধুমাত্র নীতি ও সংঘের স্বার্থে কয়েকবার এই বিশেষ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছি। খেয়ালের বশবর্তী হয়ে এখন আমি আমার নীতি থেকে বিচ্যুত হতে পারি না। আমি স্ববিরোধিতা করব কি করে?"

স্বামী অভেদানন্দজীর প্রসঙ্গে মাধবানন্দজী বলতেন যে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকালে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ছাড়া স্বামী অভেদানন্দজীর বক্তৃতাবলী ও বইগুলি থেকেও তিনি পথনির্দেশ পেয়েছিলেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে সম্ভবতঃ মাধবানন্দজী দেখেন নি। কিন্তু আমি তাঁর কাছে শুনেছিলাম যে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী ছিলেন খুবই ভাবপ্রবণ এবং তাঁর সম্বন্ধে ধারণা করা খুবই দুষ্কর ছিল। তারপর তিনি বলতেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর অনন্য ব্যক্তিত্বের কথা। আমেরিকায় তাঁর নিজের স্থাপিত আশ্রমের নানা জায়গায় বড় ও ছোট নানা রকমের ঘড়ি টাঙিয়ে রাখার বিশেষ সখ ছিল তাঁর। সেই সঙ্গে থাকত নানা রকমের নীতিবাক্য—যেমন "জীবন সংক্ষিপ্ত, ইহার সদ্ব্যবহার কর" অথবা "ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর" ইত্যাদি।

কখনও বা তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যদের স্মৃতিচারণ করতেন। তাঁদের মধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দজী ও স্বামী বিরজানন্দজীর প্রসঙ্গ সর্বোপরি স্থান পেত। সুধীর মহারাজের মেধার প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। আর স্বামী বিরজানন্দজী পরিব্যাপ্ত হয়েছিলেন তাঁর ব্যবহারে, অভ্যাসে ও দৈনন্দিন জীবনের অন্য আচার আচরণে। তিনি বলতেন যে তাঁর পোষাকের ধরন ও ধুতি পরার কায়দা তিনি মায়াবতীতে বিরজানন্দজীর কাছ থেকে শেখেন। মায়াবতীতে বিরজানন্দজী প্রচণ্ড শীতেও তাঁকে ঘরের জানলা বন্ধ করতে নিষেধ করতেন। শীত গ্রীষ্ম নির্বিশেষে তিনি চাইতেন ঘরের সব দরজা জানলাগুলি খুলে রাখতে। যদিও মাধবানন্দজী ভাল্লুক ও অন্য জন্তুর জন্য ভয় পেতেন যারা খাবার জিনিষের সন্ধানে বাড়ির পিছনের বারান্দায় আসত। সেখানে ভাঁড়ারের জিনিষপত্র শুকোতে দেওয়া হত। তা সত্ত্বেও বিরজানন্দজী মহারাজের আদেশ ছিল অন্তত পক্ষে বাড়ির দোতলায় কিছু দরজা বা জানলা যেন খোলা থাকে। মাধবানন্দজী নির্ভীক হয়ে গড়ে উঠুন—স্বামী বিরজানন্দজী এই চাইতেন।

স্বামীজীর আর এক শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁকে মঠের কাজে কলকাতার আশেপাশে দুতিনবার যেতে হয়েছিল। একবার এক জায়গায় তাঁদের চা খেতে দেওয়া হয়েছিল। যদিও মাধবানন্দজী চা পছন্দ করতেন না তবু তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও চা খেতে আরম্ভ করলেন। চা খুব গরম থাকায় মাধবানন্দজী প্লেটে ঢেলে ঠাণ্ডা করে তা খেতে থাকেন। তা দেখে নিবেদিতা ফিস্‌ফিস্‌ করে তাঁকে বলেন চা খাওয়ার ওরকম রীতি নয়। পরে তিনি তাঁকে তিরস্কার করে বলেন যে ওরকম বদ অভ্যাস কোন ইংরেজ সমাজই সহ্য করবে না। স্বামী মাধবানন্দজী বলেছিলেন আমেরিকায় কিন্তু এরকম অনেক শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কাজ সমাজের উঁচু মহলে বিচারক ও অন্য উচ্চ পদাধিকারীদের মধ্যেও তিনি দেখেছিলেন। তাঁর মতে এইসব রীতিনীতি ও অভ্যাস এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে ও দেশ থেকে দেশান্তরে পরিবর্তিত হয়।

ভগিনী নিবেদিতার চরিত্রের কঠিন উপাদানের তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী তিনি ছিলেন স্বাধীনতার প্রকৃত প্রেমিক। তাঁর কাছে স্বাধীনতাই ছিল প্রথম এবং স্বাধীনতাই ছিল শেষ কথা। মাধবানন্দজীর মতে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও আদর্শ সম্বন্ধে নিবেদিতার সুন্দর ধারণা ছিল। উত্তর কলকাতার বস্তিতে প্লেগ রোগাক্রান্তদের ত্রাণ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সেবার কাজ তিনিই প্রথম শুরু করেন। নারীমুক্তি ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের মহান আদর্শের অনুসারী। এই আদর্শ ও ধারাই পরে রামকৃষ্ণ মিশন গ্রহণ করে। স্বামী মাধবানন্দজী বলতেন নিবেদিতা ছিলেন ত্রাণ ও শিক্ষাবিস্তারের কাজের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। স্বামী মাধবানন্দজী আরও মনে করতেন যে এই প্রয়াস সঠিক ও সেসময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পরেই আমরা (রামকৃষ্ণ মিশন) সরকারী অনুরোধে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষামূলক কাজ আরম্ভ করেছি। মিশনের পক্ষে সরকারের আহ্বানে যতদূর সাড়া দেওয়া সম্ভব মিশন তা দিয়েছে। ভগিনী নিবেদিতা কবে কি হবে সেজন্য অপেক্ষা করে বসে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁর স্বকীয় সৃজনী পরিকল্পনা এবং পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করে দিতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের খুব বেশী জড়িয়ে পড়া সম্পর্কে আমাদের অনেকের যেমন আপত্তি আছে, স্বামী মাধবানন্দজীর কিন্তু মোটেই সেরকম ছিল না। স্বামীজীর পরিকল্পনা অনুসারে যেমন স্ত্রী মঠ সম্পর্কে তেমনই বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কেও তিনি ছিলেন পরম উৎসাহী। সরকারী আনুকূল্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। তাঁর দৃষ্টিতে মিশনের পক্ষে দূরবর্তী লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রস্তুতি ও অভিজ্ঞতার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। সেক্ষেত্রে খুঁটিনাটি ব্যাপারে যে সমস্ত অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি

থাকতে পারে পরবর্তীকালে সেগুলি ত্রুটিশূন্য ও সম্পূর্ণ করে নেওয়া সম্ভব, যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে সংগঠনের শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ অধিকতর হয়; ফলে রামকৃষ্ণ মিশন পরিস্থিতি ও সময় অনুযায়ী সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হবে।

এবিষয়েও তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে স্বামীজীর ভাবানুযায়ী কর্মযোগের মাধ্যমেই সমাজের ও দেশের কল্যাণ করা যাবে। স্বামী বিবেকানন্দের আধুনিক ও যুক্তিনিষ্ঠ ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর মনে কোনরকম সংশয় ছিল না। কর্মের মাধ্যমে সাধনা সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ও দৃঢ় ধারণা ছিল এবং তিনি এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে হলে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর কাছে অপরিহার্য। বর্তমান যুগের এই হল একমাত্র পথ—এ বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁর মতে দিনে ছয় ঘণ্টা ঈশ্বর-সমর্পিত কাজ সাধন পথের পক্ষে ভাল ও শরীরের পক্ষেও স্বাস্থ্যকর। প্রচুর কাজ করা কখনও সাধনার অন্তরায় হতে পারে না। তিনি খুব বাস্তববাদী ছিলেন, তাই এও স্বীকার করতেন যে এ বিষয়ে ব্যতিক্রম অবশ্যই থাকতে পারে।

তাঁর মতে রামকৃষ্ণ আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলি হল ধর্মের ব্যাপারে একটি যুক্তিসঙ্গত যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং অতীতের সমস্ত দুর্বলতা দূর করে আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাণশক্তি ও সমন্বয়ের একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে একটি মহান ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও মানব জীবনের একটি নতুন অর্থ সংযুক্ত হয়েছে। পরম মিলনাত্মক, সার্বজনীন, শাশ্বত দর্শনের এ হল এক নতুন পথ, নবতর পরীক্ষা নিরীক্ষা। রামকৃষ্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থরা উভয়েই অভীষ্ট পূরণ করতে পারবেন। দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এই ঐক্য ও বাস্তবধর্মিতা এবং সহযোগ হল এই আন্দোলনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি আরও বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের সকলেরই ছিল প্রয়োজনীয় গুণাবলী, অভিজ্ঞতা ও বৈরাগ্য। তাঁরা প্রায় সকলেই কয়েকবার করে তীর্থভ্রমণ ও সনাতন রীতি অনুযায়ী তপস্যা ইত্যাদি করেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা সকলে এখানে একসঙ্গে থেকে এই সংঘ গড়ে তোলেন বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধ্যাত্মজীবন-যাপনেচ্ছুদের কল্যাণের জন্য। এই পথ হল বাস্তবিকই মধ্যপন্থা, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ভাবাবেগের উগ্রতা বর্জিত।

আমি যতটুকু দেখেছি—হয়ত আমি তাঁকে সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু আমি নিঃসঙ্কোচে বলব, তিনি আমায় বুঝতে সাহায্য করেছিলেন যে ধর্মজীবন এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী ছন্দোবদ্ধ জীবনচর্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। চিরন্তনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার এক অন্তহীন যাত্রা, সীমায়িত থেকে অনন্তে, ক্রমে অনন্ত থেকে অনন্তের অভিমুখে।

তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয়ে বলবার জন্য জোর করায় তিনি আমায় বলেছিলেন যে, স্বপ্নের মতো ভাসা ভাসা দর্শন প্রভৃতিকে তিনি খুব বেশী গুরুত্ব দেন না, যদিও নিশ্চিতভাবেই তাঁর সেরকম কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। তিনি বলতেন, তিনি জীবনের এক শাশ্বত প্রক্রিয়ার রূপান্তরে বিশ্বাসী। "হ্যাঁ"—একথাই তিনি বলতেন "রূপান্তর" (transformation) কথাটির উপর সমগ্র জোরটুকু দিয়ে। আর একটা জিনিষ আমাকে খুব বেশী অভিভূত করেছিল—সেটি হল তাঁর পরিচ্ছন্ন নিখুঁত জীবনচর্যা যা তাঁর 'নির্মল' নামকে সার্থক করে তুলেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন রেজিস্টার ও তাঁর বন্ধুপ্রতিম অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ তাঁকে একবার বন্ধুভাবে প্রশ্ন করেছিলেন – তিনি জীবনে কি উপলব্ধি করেছেন? আমি কিন্তু তাঁর বন্ধু ছিলাম না বরং বলতে গেলে নিতান্ত নির্বোধই ছিলাম তাই সেই একই প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "ঠাকুরের কৃপায় একটা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন তো অন্তত পক্ষে কাটিয়ে দেওয়া গেল।" এই উত্তরে আমি সম্পূর্ণ পরাস্ত হলাম এবং এক মূক বিস্ময়ে এমনই অভিভূত হলাম যে এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আর কোন কথা বলার মতো আমার আর সাহস ছিল না।

একনাগাড়ে দশ-এগারো মাস ধরে দিনের মধ্যে ১৯ থেকে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমি থেকেছি। সেই সুযোগে এরকম একটি শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন জীবন দেখতে পেয়ে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি, আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি।

দৈনন্দিন জীবনে তিনি ছিলেন মিতব্যয়ী ও কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত। এমনকি কলের জল পর্যন্ত তিনি খুব হিসেব করে খরচ করতেন। চিঠির খামও কাটতেন তেমনি সাবধানে, আর সেগুলি চিঠির খসড়া করার কাজে লাগাতেন। এই গুণ তিনি স্বামী বিরজানন্দজীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। স্বামী মাধবানন্দজী অত্যন্ত স্বল্পাহারীও ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, কোন লোক, বিশেষতঃ কোন সাধু প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেলে তাঁর বিরক্তি হয়। তিনি নিজে চা বা কফিতে চিনি দেওয়া হয়েছে কি হয়নি তা ভুলেও জিজ্ঞেস করতেন না বা বলতেন না। দুই ভাই-ই তেতো অপছন্দ করতেন। আবার স্বাদ বা গন্ধের তীব্রতাও দুজনের কাছেই ছিল অসহ্য। এমনকি তীব্র সুগন্ধি ধূপকাঠিও তাঁরা এড়িয়ে চলতেন।

দুজনেই বিশেষ করে স্বামী মাধবানন্দজী অত্যধিক কথা বলা একদম পছন্দ করতেন না। অপরেও কথাবার্তায় প্রাসঙ্গিক ও সংক্ষিপ্ত হোক এটা তিনি চাইতেন। ঘটনার অনাবশ্যক বিস্তারিত বিবরণ বা বাজে গল্প গুজব তাঁর বিরক্তি ঘটাত। তাঁর সিদ্ধান্ত তিনি অকপটে সোজাসুজি জানিয়ে

দিতেন। তিনি সর্বদা যুক্তিনির্ভর এবং সেইসঙ্গে কার্যকরী হয়ে চলতে চেষ্টা করতেন। অবাস্তব আদর্শবাদের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। নিষ্ক্রিয় থেকে শুধু তাত্ত্বিক বিচারের উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয়—এই ছিল তাঁর অভিমত। সক্রিয় অবস্থায় থেকে যে সিদ্ধান্ত সবচেয়ে বাস্তবসম্মত সেটিকেই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত বলে মনে করা যেতে পারে। অনেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে এই কার্যকরী ও পরিস্থিতিগত দিকটা উপেক্ষা করেন—এই ছিল তাঁর অভিযোগ। নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি অবশ্যই এই পরিস্থিতিগত ও কার্যকরী ধরনের সিদ্ধান্তগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে। একবার তিনি আমায় বলেছিলেন যে তিনি কখনই আদেশ (dictate) করতে চান না শুধু নিজের মত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ (asserts) করতে চান। কার্য সম্পাদনের জন্য দৃঢ়ভাবে মতপ্রকাশ করতে হয়। নেতৃত্বদান ও দায়িত্ব পালন দুটির জন্যই এর দরকার। সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে, তিনি স্বীকার করতেন যে ভুল তো হবেই। কিন্তু প্রত্যেকটি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করেই কেবল ত্রুটি বিচ্যুতির হিসাব করা যুক্তিসঙ্গত। তাঁর বক্তব্য ছিল, "কোন কোন সময় ব্যক্তির প্রতি সুবিচার করতে গেলে কাজের ব্যাপারে অনেক সমস্যা এসে উপস্থিত হয়, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাড়তি বিপত্তি দেখা দেয়। কাজেই ব্যক্তির পক্ষে অল্প স্বল্প ত্যাগ স্বীকার বাঞ্ছনীয় ও ন্যায়সঙ্গত। এমনকি একজন সাধুর জীবনে অবহেলা বা উপেক্ষার ঘটনা মানিয়ে নেওয়া উচিত। এরকম না হলে কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকতে পারে না। তাঁর মতে কেউই রাজা বিক্রমাদিত্যের নির্ভুল বিচারকের সিংহাসন অধিকার করেছে বলে দাবী করতে পারে না। অন্যদিকে প্রশাসনিক ক্ষমতার আসন বিলক্ষণ ছলনাপূর্ণ। সব দিকের তথ্যগুলি মিলে পরিস্থিতি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর হতে পারে এবং কখনও কখনও ভুল পথেও পরিচালিত করতে পারে। সব দিকের চাপ ও টানের মধ্যে তুমি কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেই পারবে না। অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতি সরল করে তোমায় সব দিক রক্ষা করতে হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন পর্যায়ে কেউ হয়ত মর্মান্তিক দুঃখ পেতে পারে। কিন্তু কি করা যাবে ? ব্যক্তি সর্বদাই তার আঘাত থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু নীতি বা সংঘের উপরে আঘাত অনতিক্রমণীয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানবিক সমবেদনা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, সংকটের বৈশিষ্ট্য ও পরিস্থিতির কার্যকরী দিকটি সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করতে হয় এবং এই ব্যাপারে দুর্বলতা, পক্ষপাতিত্ব, আপোষ বা হুকুমজারী করার প্রশ্ন ওঠে না। বলা বাহুল্য এ কাজ অত্যন্ত কঠিন ও এর দ্বারা সকলকে খুশি করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিবর্তনীয় কোন নিয়ম থাকে না। শুধু চাই শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্ভর দীনতা আর সেইসঙ্গে তাঁর নিকটে পথনির্দেশের জন্য আন্তরিক

প্রার্থনা ! স্বামী মাধবানন্দজী প্রকৃতই বিশ্বাস করতেন যে সাহায্য আসে নিজের অন্তরাত্মা ও বহির্জগত উভয়ের থেকেই—সকলের বিবেক ও সহযোগিতা থেকে। কারুর ভাবা উচিত নয় যে তিনি ত্রুটিমুক্ত।

তাঁর মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত দীনতা ও শরণাগতি ছিল আর সেটাই ছিল তাঁর রক্ষাকবচ। তিনি কখনও ক্ষমতার নির্যাসে দ্রবীভূত হননি, ক্ষমতাই বরং তাঁকে সিক্ত করতে গিয়ে তাঁর অতীব শুষ্কতা ও অনমনীয়তার জন্য বিফল হয়েছিল। তাঁর প্রশাসনের পরিধির বাইরে তিনি সর্বদাই ছিলেন সৌজন্যপরায়ণ, মর্যাদাসম্পন্ন ও যথার্থ বিনয়ী এক মানুষ। এমনকি গভীর রাতে যখন তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা বা কোন ওষুধপত্রের দরকার আছে কিনা জানতে চেয়েছি, তিনি বসার কথা বলতে তখনও ভোলেননি। কখনও কখনও তিনি জোর করতেন যাতে আমি তাঁর বিছানায় বসে কথা বলি। স্বামী দয়ানন্দজীর ক্ষেত্রেও ছিল একই ব্যাপার ঃ তাঁর ঘরে ঢোকার দু'এক মিনিটের মধ্যেই তিনি বলবেনই, "বোসো" আর তার সঙ্গে প্রায়ই যোগ করবেন "ভাই" শব্দটি। স্বামী মাধবানন্দজী কিন্তু কদাচিৎ এটি ব্যবহার করতেন।

টাকা পয়সার ব্যাপারেও তাঁর কোন আগ্রহ প্রকাশ পেত না। আমার এক বছরের মতো সময় তাঁর কাছে থাকাকালে ভক্তরা তাঁকে প্রণাম করে যে প্রণামী নিবেদন করত তিনি আমায় কখনও সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন না। যদি কাগজের টাকা (Currency note) দৈবাৎ তাঁর পায়ের নীচে পড়ত তখন তিনি হয়ত সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা সরিয়ে রাখতে ইঙ্গিত করতেন।

তিনি বোধহয় কখনও নিজেকে গুরু হিসাবে স্বীকার করে নিতে পারেননি। কারণ গুরু সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল যে গুরু হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগসূত্র। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে সচ্চিদানন্দই গুরু। এমনকি গুরু হিসাবে কোন কথা দেওয়া তাঁর অপছন্দ ছিল। কোন কথা দেওয়া তাঁর কাছে বিরাট বোঝা বলে মনে হত। তিনি আমায় বলেছিলেন, একবার ঝোঁকের মাথায় তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে একটা কথা দিয়ে ফেলেন। কথা দেবার আরেকটি ঘটনার কথা তিনি আমায় বলেছিলেন—সেটিও তাঁর আরেক বন্ধু ও সুলেখক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীকে নিয়ে। তাঁর মনে হত—কথা দেওয়ার ব্যাপারটাই হল অপরাধে জড়িয়ে পড়ার মতো। এগুলি নিজের নীতিবোধ ও বিবেকের উপরে এক মহাবন্ধন এবং তিনি নিজে সর্বদাই মুক্ত আত্মার আনন্দ উপলব্ধি করতে চাইতেন।

আলোর দিশারী

স্বামী শশাঙ্কানন্দ

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর লক্ষ্ণৌয়ের চাঁদগঞ্জে রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন প্রাঙ্গণের প্রধান প্রবেশদ্বারের দু পাশে সারিবদ্ধভাবে ভক্ত এবং সাধুরা করজোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের নবম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। সেই ভিড়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমিও। তখন আমি একজন নবাগত ব্রহ্মচারী। তাঁকে প্রথম দর্শন করবার আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিলাম। ঘন ঘন দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছিল রাস্তার দিকে।

প্রতীক্ষার অবসান হল। অবশেষে পূজ্যপাদ মহারাজের গাড়ি থামল দরজার সামনে। বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। অন্যান্য মহারাজরা তাঁকে তাঁর ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন, ভক্ত এবং সাধুরা মনে মনে তাঁকে প্রণাম জানালেন। এই আমার প্রথম গুরু-দর্শন।

পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ। এইরূপ উচ্চকোটি মহাপুরুষের শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে বিচরণ করে। তাঁকে চেনা, অনুভব করা যেমন সহজসাধ্য নয়, তেমনি তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখাও সহজ নয়। তবুও আত্মশুদ্ধির জন্য কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে যে স্মৃতিটি মনে আসছে সেটি বৃন্দাবনের একটি ঘটনা। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে পূজ্যপাদ মহারাজজীর শুভাগমন হয়েছে। বেলুড় মঠ থেকে তাঁর কোন সেবক মহারাজ না আসায়, পূজ্যপাদ মহারাজজীর সেবার ভার পেয়ে নিজে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য হয়েছিলাম। রাত্রে খাবার সময় পূজনীয় মহারাজের সচিব স্বামী প্রমথানন্দজী মহারাজজীকে বললেন, "মহারাজ, মীরা সম্বন্ধে একটা বই পড়েছি, লেখক মীরার চরিত্রের অদ্ভুত ছবি এঁকেছেন।" পূজ্যপাদ মহারাজজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "মীরার চরিত্র কেউ বর্ণনা করতে পারে না, মীরা মীরাই।"

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তাঁর শিষ্য পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী সম্পর্কে একদিন বলেছিলেন, "এ যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।" পূজ্যপাদ মহারাজজীকে যতই ভাবি, ততই অনুভব করি শ্রীশ্রীমায়ের কথার সত্যতা। তাঁর অমূল্য সান্নিধ্য পেয়েছি, আর মূল্যবান রত্নরাজিরূপে সঞ্চয় করেছি

কৃপা, ভালবাসা এবং পুণ্যস্মৃতি।

২১শে অক্টোবর, ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ। রাত্রে লক্ষ্ণৌ সেবাশ্রমে স্বামী প্রমথানন্দজী আমাকে বললেন, "যদিও তোমার দীক্ষার দিন স্থির ছিল ২৩শে অক্টোবর, কিন্তু পূজ্যপাদ মহারাজজী প্রথম দিনই অর্থাৎ আগামী কালই (২২শে অক্টোবর) তোমাকে প্রথম দীক্ষার্থী হিসাবে বেছে নিয়েছেন। সুতরাং তুমি প্রস্তুত থেকো। সে-ভাবে আমি পরের দিন স্নানাদি করে ফুল ও ফল নিয়ে দীক্ষার স্থানে উপস্থিত হলাম।

আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং স্মরণীয় সময় উপস্থিত হল। মনে অত্যন্ত আনন্দ ও উল্লাস নিয়ে পূজ্যপাদ মহারাজজীর ঘরে প্রবেশ করলাম। মহারাজজী তখন জপ করছেন। ইঙ্গিতে দীক্ষার সামগ্রী শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের কাছে রেখে নিজের বাম পাশে একটা আসনে বসতে আদেশ করলেন। দীক্ষা হয়ে গেল।

পূজ্যপাদ মহারাজজী একবার বলেছিলেন, "সদ্‌গুরু কৃপা করে—'ইষ্ট' এবং 'মন্ত্র' প্রদান করেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনার উপদেশ দেন। 'ইষ্ট' শব্দের অর্থ প্রিয়। ঈশ্বরের যে রূপ ভক্তের প্রিয় তা-ই তার ইষ্টমূর্তি, ঈশ্বরের যে নাম ভক্তের প্রিয়, সেটিই ইষ্টমন্ত্র। এই ইষ্টমূর্তি এবং ইষ্টমন্ত্র গুরু শিষ্যকে দেন।"

তাঁকে 'গুরু' বলা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। এক সময় এক ভদ্রলোক জনৈক যুবককে পূজ্যপাদ মহারাজজীর 'শিষ্য' বলে পরিচয় দেওয়ায় তিনি বললেন, "যদি কেউ গুরু হন, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণই গুরু, আমরা সকলেই তাঁর শিষ্য।" আমার দীক্ষার দু-তিনদিন পরেই আমি তাঁর কাছে গুরুসেবা করার তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করি এবং তাঁর সাথে আমাকে বেলুড় মঠে নিয়ে যাবার প্রার্থনা জানাই। এর উত্তরে তিনি বললেন, "আমি গুরু নই, গুরু কেবল সচ্চিদানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বক্তা আমি তো কেবল 'লাউড স্পিকার'। ঘটনাচক্রে আমি যন্ত্রমাত্র।···(কিছুক্ষণ পরে) সংঘে যোগদান করাই গুরুর সেবা, সংঘের কাজ গুরুর কাজ।"

কেউ একজন মহারাজজীর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "উপদেশ? 'কথামৃত' পড়, 'মায়ের কথা' পড়, স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' পড়। আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব সেখানে পাবে।"

মহারাজজী তাঁর শিষ্যদের সর্বদা তাঁর উপরে নির্ভর করা অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, "সব সময় আমার উপরে নির্ভর করবে না। অন্তরের ভগবানের দিকে তাকাবে, তাঁর ভরসা করবে। যদি তোমার প্রার্থনা আন্তরিক হয়, তিনি তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। ধর্ম সম্বন্ধে যা কিছু শাস্ত্রে বলা আছে, তা সাধনা করলেই হবে। ধর্ম সম্বন্ধে যা কিছু জেনেছ বা বুঝেছ সবই

ব্যবহারিক জীবনে আনবার চেষ্টা কর।"

ধ্যান এবং জপ সম্বন্ধে আমার অনুভূতিতে অতিরিক্ত ভাবুকতার প্রকাশ দেখে তিনি একদিন দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন, "Don't be emotional, don't be emotional, don't be emotional (ভাবাবেগ-তাড়িত হয়ো না, ভাবাবেগ-তাড়িত হয়ো না, ভাবাবেগ-তাড়িত হয়ো না)।" কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর স্নেহসিক্ত স্বরে অমৃতবাণী উচ্চারণ করলেন, "ভাবুকতা এবং বিচারবুদ্ধি—দুই-এর সম্মিলন প্রয়োজন। ইষ্ট এবং ইষ্টমন্ত্রে বিশ্বাস রাখবে। মন্ত্র জপে সব পাবে। ধ্যান অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু জপ করতে করতে ধ্যানস্থ হতে পারবে। ঈশ্বরকে দেখতে পারবে, এই চোখের দ্বারা নয়, তাঁর দর্শনের জন্য আধ্যাত্মিক নয়ন পাবে—জ্ঞানচক্ষু। ঈশ্বর দর্শন হয়েছে বলতে হবে না, যে ঈশ্বরকে দেখেছে, তার মুখ এবং দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম।"

সেসময় লক্ষ্মৌ আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ব্যস্ত থাকায় পূজ্যপাদ মহারাজজীর পবিত্র সান্নিধ্যে আসার বেশী সুযোগ পাইনি। তবে কোন কোন সময় অত্যন্ত দুর্লভ সঙ্গ পেয়েছিলাম। যেমন, লক্ষ্মৌ শহরে একটি জনসভায় মহারাজজীর সঙ্গে গিয়ে তাঁর ভাষণ শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি কি বলেছিলেন, এবং কোন্ ভাষায় বলেছিলেন তা আজ আর মনে নেই। তবে তাঁর জ্যোতির্ময় দীপ্ত মুখমণ্ডল এখনও আমার মনে ভেসে ওঠে।

এবার লক্ষ্মৌ থেকে নিজের কর্মক্ষেত্র দিল্লীতে ফিরে যাবার সময় হয়ে এল। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে বিদায় নিলাম। জানতাম না আবার কবে দেখা হবে। প্রভুর কৃপায় আবার আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। কয়েকমাস পরেই শুনলাম, পূজ্যপাদ মহারাজজী ১৫ দিনের জন্য দিল্লী আসছেন ২৩শে মার্চ ১৯৬৪। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গুরুসেবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করেছিলাম। সে ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন। দিল্লী কেন্দ্রের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহারাজ আমাকে ডেকে বললেন, "পূজ্যপাদ মহারাজজীর সঙ্গে কোন সেবক আসছেন না। তাঁর সেবার ভার তোমার উপরে থাকল।" শুনেই আমার মন আনন্দে নেচে উঠেছিল। "কৃপাহি কেবলম্, কৃপাহি কেবলম্।" দু-সপ্তাহের অনেক মধুর স্মৃতি আমার জীবনে অপূর্ব তৃপ্তি এনেছিল। তারই কয়েকটি উল্লেখ করার চেষ্টা করব।

দিল্লী আশ্রমের প্রধান প্রবেশপথে এলেই প্রথমে দৃষ্টি পড়বে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের উপর। ডানদিকে গ্রন্থালয় এবং সভাগৃহ, বামদিকে একতলায় কার্যালয় এবং দ্বিতলে সাধুনিবাস। পূজ্যপাদ মহারাজজী এই দ্বিতলের একটি ঘরে থাকতেন। একদিন ঘর থেকে মন্দিরে যাবার জন্য নেমে এসেছেন। একজন সাধু তাঁকে ঘাসের উপর দিয়ে মন্দিরে যাবার জন্য অনুরোধ করলেও পূজ্যপাদ মহারাজজী ঘাসের উপর দিয়ে যেতে চাইলেন না। বারান্দা দিয়ে ঘুরপথে

মন্দিরে গেলেন। ঘটনাটি খুবই ছোট কিন্তু এর মাধ্যমে যে ভাবটা পরিস্ফুট হল, সেটি বড়ই মহত্ত্বপূর্ণ। শ্রীশ্রীমা তাঁকে বলেছিলেন, "ভগবানই সব হয়ে আছেন।" শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনেও আমরা পড়েছি ঘাসের উপরে একজন হেঁটে যাচ্ছেন দেখে তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেছিলেন। ঘাসের ভিতরেও ঈশ্বর প্রকাশিত—এই অনুভব মনে হয় মহারাজজীর মনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল ছিল পূজ্যপাদ মহারাজজীর দীক্ষাদানের দিন। মহারাজজী এক-একজন করে দীক্ষা দিতেন। দীক্ষার পর প্রত্যেক দীক্ষার্থী বেরিয়ে এলে আমি ভিতরে গিয়ে দীক্ষার থালা বাইরে নিয়ে আসতাম। ধূপ শেষ হলে ধূপ জ্বালিয়ে দিতাম। শ্রীশ্রীঠাকুর-মায়ের ছবিতে বেশী মালা থাকলে কয়েকটা মালা সরিয়ে দিতাম। তারপর পরবর্তী দীক্ষার্থীকে ভিতরে যাবার জন্য বলতাম। বোধ হয়, তৃতীয় দীক্ষার্থীর পর মহারাজজীর ঘরে ঢুকে আমি দেখি, উনি পাঞ্জাবী খুলছেন। আমি তাঁকে সাহায্য করলাম। জামাটা উনি আমার হাতে দিলেন। উনি আমাকে ঠিক কি বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না। কারণ তখন আমি বাংলা খুব একটা ভাল বুঝতাম না। আন্দাজে মনে করলাম, জামা ঝুলিয়ে দিতে বলছেন। এজন্য জামাটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দিলাম। কিন্তু ঘুরে দেখি মহারাজজী পরিধেয় গেঞ্জীটিও খাটের উপর রেখে আমার কাছে জামা ফেরত চাইছেন। তখন আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম। তাড়াতাড়ি জামাটা হ্যাঙ্গার থেকে নিয়ে মহারাজজীর হাতে দিলাম। মহারাজজী জামাটা পরে নিলেন। আমি দীক্ষার থালা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম এবং পরবর্তী দীক্ষার্থীকে ভিতরে যেতে বললাম। বেরোবার সময় লক্ষ্য করলাম, মহারাজজী জামার পকেট খুঁজে পাচ্ছেন না। কারণ যখন তিনি পাঞ্জাবী খুলেছিলেন তখন তা উল্টে গিয়েছিল, এবং সেই অবস্থাতেই মহারাজজীকে পরতে দিয়েছিলাম। দীক্ষার্থী ভিতরে ছিলেন বলে তখন কিছু করতে পারিনি। আমার এই ভুলের জন্য আমি খুবই লজ্জিত ও ভীত হলাম। তাড়াতাড়ি স্বামী প্রমথানন্দজীর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলে বললাম, "আমি মহারাজজীর সামনে আর যেতে পারব না।" স্বামী প্রমথানন্দজী বললেন, "মহারাজজী একেবারে শিবের মতো, তিনি কিছুই বলবেন না, তুমি যাও কোন ভয় নেই।" অনেক বলার পর আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। মহারাজজী ইতিমধ্যে জামাটি ঠিক করে পরে নিয়েছিলেন এবং পূর্ববৎ জপ করছিলেন। পরম স্নেহদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, কিছুই বললেন না। আমার সমস্ত ভয় নিমেষের মধ্যে দূর হয়ে গেল। আনন্দিত ও উৎফুল্ল মনে আমি পূর্বের মতো সেবার কাজে ব্রতী হলাম।

পূজ্যপাদ মহারাজজীর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদের প্রতি অপূর্ব শ্রদ্ধা ছিল। একদিন রাত্রে তিনি আহারাদি করছেন। মহারাজজীর খাওয়া প্রায় শেষ।

তখন হঠাৎ আমার মনে পড়ল শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ তো দেওয়া হয়নি। চুপিচুপি একটি প্লেটে ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে গিয়ে বললাম, "মহারাজ, ঠাকুরের প্রসাদ দিচ্ছি।" উনি বললেন, "দাও।" স্বামী প্রমথানন্দজী শুনেই আমাকে বকলেন, "এ কি করেছ, মিষ্টি দেওয়া হয়ে গেছে, বেশী মিষ্টি খেলে মহারাজের শরীর খারাপ হবে।" তিনি তৎক্ষণাৎ মহারাজজীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, এই মিষ্টিটা সরিয়ে দেব কি?" উত্তরে মহারাজজী বললেন, "না থাক, কিছু হবে না।"

পূজ্যপাদ মহারাজজী নিত্য জপ-ধ্যানের পর ২০ মিনিট 'কথামৃত' পড়তেন। তারপর ঠাকুর দর্শনের জন্য মন্দিরে যেতেন এবং পরে প্রাতরাশ গ্রহণ করতেন।

৫ই এপ্রিল, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ। মহারাজজী দিল্লী থেকে কনখল সেবাশ্রমে যাবেন। আগের রাত্রিতে তিনি স্বামী প্রমথানন্দজীকে বললেন, "আগামীকাল মন্দিরে যাব না। প্রাতরাশের পরই কনখলের উদ্দেশ্যে রওনা হব।" সেজন্য পরদিন মহারাজজীর প্রাতরাশ নিয়ে আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল মহারাজজীর উপরে। তিনি বারান্দা থেকে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে অঞ্জলিবদ্ধ করে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম জানাচ্ছিলেন। আমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। সিঁড়িতে এমন জায়গায় ছিলাম, যেখান থেকে আমি তাঁকে দেখতে পারি, কিন্তু তিনি আমাকে দেখতে পাবেন না। কিছুক্ষণ পরে মহারাজজী ঘরে ফিরে গেলেন। কিন্তু আবার বারান্দায় রেলিং-এর কাছে ফিরে এসে মন্দিরের উদ্দেশ্যে বারান্দার থামে নিজের মস্তক স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘরের দিকে অতৃপ্ত মনে পিছিয়ে গিয়ে আবার বারান্দায় আভূমি নত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম জানালেন। তারপর ঘরে চলে গেলেন। মহারাজজী ২০ মিনিট 'কথামৃত' পাঠ করবেন ভেবে নিয়েই আমি এবং স্বামী প্রমথানন্দজী তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে নিতে চাইলাম। খাওয়া সবে মাত্র আরম্ভ করেছি, এমন সময় মহারাজজীর পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি আমার নাম ধরে ডাকছেন, ছুটে বাইরে এসে দেখি, মহারাজজী সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। আমায় দেখে স্বামী প্রমথানন্দজীকে ডাকতে বললেন এবং বললেন, "মন্দিরে যাব।" তখন স্বামী প্রমথানন্দজীও তাঁর সঙ্গে মন্দিরে গেলেন।

ঘটনাটি আমাদের দেখিয়ে দিল তাঁর মন্দিরে যাওয়ার প্রতি নিষ্ঠা। মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর জীবন্ত বসে আছেন, এ ছিল তাঁর অটুট বিশ্বাস। শ্রীশ্রীঠাকুর যে আশ্রমের কর্তা, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে কি করে অন্যত্র যাবেন?

একদিন দিল্লী কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মহারাজ মহারাজজীর ফটো তোলার জন্য একজন ফটোগ্রাফারকে এনেছিলেন। ফটো তোলাতে মহারাজজীর ঘোরতর আপত্তি। অনিচ্ছায় তিনি এসে আসনে বসলেন। কিন্তু মাথাটা নিচু করে

"পূজ্যপাদ মহারাজজী ১৫ দিনের জন্য দিল্লী আসছেন।"—পৃষ্ঠা ২৯৪

স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী প্রমথানন্দ, পশ্চাতে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী রঙ্গনাথানন্দ—দিল্লী আশ্রমের প্রধান প্রবেশপথে গৃহীত চিত্র।

"ফটো তোলাতে মহারাজজীর ঘোরতর আপত্তি। অনিচ্ছায় তিনি এসে আসনে বসলেন। কিন্তু মাথাটা নিচু করে রইলেন।" —পৃষ্ঠা ২৯৬

রইলেন। ফটোগ্রাফারের সবিনয় প্রার্থনায় মাথা তুললেন বটে, তবে দৃষ্টি ছিল ঊর্ধ্বে, উদাস। এরকম অনেকবার মহারাজজীর ফটো তোলার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ দেখেছি। একদিন ফটোগ্রাফার থামের আড়াল হতে ছবি তোলার চেষ্টা করছিলেন। তাও মহারাজজীর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি হাত তুলে ক্যামেরার দিকে ইঙ্গিত করে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, "এটা কি?" তাও ছবিতে উঠে গিয়েছে।

মহারাজজীর বাথরুমে দাড়ি কামানোর সুবিধার জন্য একটি আয়না লাগাবার ব্যবস্থা করতে হবে। মিস্ত্রিকে এমন সময় আসতে বলা হয়েছিল যখন মহারাজজী মন্দিরে যাবেন, এবং তাঁর ঘরে ফিরে আসবার আগেই কাজটি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু মিস্ত্রি একটু আগেই চলে এসেছিল। দিল্লী কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মহারাজ দেখে বললেন, "এখন না, একটু দাঁড়াও, মহারাজজী যখন মন্দিরে যাবেন, তখন কাজটা করবে।" কথাটা একটু জোরে বলাতে মহারাজজী শুনতে পেলেন এবং তিনি অধ্যক্ষ মহারাজকে ডেকে বললেন, "আমার জন্য সে অপেক্ষা করবে কেন? আমি এখনই মন্দিরে যাব"—বলেই মহারাজজী মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। মন্দির থেকে ফিরে এসে আরো ১৪ মিনিট তিনি 'কথামৃত' পাঠে মগ্ন রইলেন। এর মধ্যে আয়না লাগানোর কাজও শেষ হল।

মহারাজজী যখন মন্দিরে যেতেন, তখন আমি মহারাজজীর ঘর পরিষ্কার করে দিতাম। একদিন কাজ শেষ করতে একটু দেরী হয়ে গেল। যদিও ঘর মোছা শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবুও ঘর থেকে ঝাড়ন হাতে বেরোবার সময়ে উনি আমাকে দেখে ফেললেন। সেজন্য তিনি জুতোটা বাইরে রেখেই ঘরে ঢুকলেন। এর অল্পক্ষণ পরেই অনেক মহারাজ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। এবং বহুক্ষণ কথাবার্তা চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বাথরুমে যাবেন বলে মহারাজজী জুতো খুঁজতে লাগলেন। আমি বাইরে বারান্দা থেকে লক্ষ্য করে জুতো আনবার জন্য দৌড়ালাম। ভিতরে উপস্থিত মহারাজরাও মহারাজজীর জুতো আনার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু মহারাজজী আমাদের সবাইকে অতিক্রম করে নিজেই বাইরে এসে জুতো পরে নিলেন।

আমি মহারাজজীর ঘরের বারান্দায় একটা মোড়া নিয়ে বসে থাকতাম, যাতে তিনি কোন প্রয়োজনে ডাকলে আমি শুনতে পাই। আমি এমন জায়গায় বসতাম যেখান থেকে তাঁকে দেখা যেত, কিন্তু তিনি আমাকে দেখতে পেতেন না। আরামকেদারায় বসে তিনি বই পড়ছিলেন। চরণ দুটি রাখার জন্য সামনে থেকে মোড়া টানবার চেষ্টা দেখে আমি দৌড়ে ভিতরে ঢুকলাম। কিন্তু তিনি তার আগেই কাজটি শেষ করে ফেললেন, এবং বুঝতে পারলেন আমি বাইরে সব সময় তাঁর ডাকের জন্য প্রস্তুত থাকি। তিনি আমায় বললেন, "আমার

অপেক্ষায় বসে থেকে সময় নষ্ট কোরো না, ঘরে গিয়ে পড়াশুনা কর।"

৩১শে মার্চ ১৯৬৪। মহারাজজী দিল্লী থেকে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি সেই গাড়িতে সামনের আসনে স্বামী প্রমথানন্দজীর সঙ্গে ছিলাম। মহারাজজীর সঙ্গে ছিলেন পূজনীয় ভরত মহারাজ। আমি তখন বাংলা খুব কম বুঝতাম। তবে একটি প্রসঙ্গ বুঝতে পেরেছিলাম। স্বামী প্রমথানন্দজী মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, বৃন্দাবনের কোনও মন্দিরে যাবেন কি?"

মহারাজজী: হ্যাঁ।

পূজনীয় ভরত মহারাজ: কোন্ মন্দির? শ্রীরাধাবল্লভ?

মহারাজজী: না, বাঁকাবিহারীজী।

এই শুনে আমার মনে প্রশ্ন উঠেছিল কেন মহারাজজী শ্রীবাঁকাবিহারীর মন্দিরে শুধু যাবেন, অন্য কোন মন্দিরে কেন নয়। পরে মনে হল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, মীরাবাঈ, সুরদাস, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা প্রভৃতির সঙ্গে এই মন্দিরের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, সেইজন্যই ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। আর শ্রীবাঁকাবিহারী দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি হয়েছিল। পূজ্যপাদ মহারাজজীর সঙ্গে আমার শ্রীবাঁকাবিহারীর মন্দিরে যাবার সুযোগও হয়েছিল। এর আগেও শ্রীবাঁকাবিহারীকে দর্শন করেছি। কিন্তু এবার শ্রীমাধব ও শ্রীমাধবানন্দকে একসঙ্গে দর্শন করার বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে রইলাম আমি। পরের দিন স্বামী প্রমথানন্দজীকে মহারাজজী জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কালীয়দমন দর্শন করেছিলে?"

স্বামী প্রমথানন্দজী: না, মহারাজ।

মহারাজজী: তাহলে তুমি কিছুই দেখলে না।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে আমি বুঝতে পারলাম, যে সব তীর্থস্থান দিব্য নরলীলার সঙ্গে জড়িত, সেগুলির মাহাত্ম্য মহারাজজীর কাছে ছিল সর্বাধিক। অন্য অবতারের সঙ্গে স্মৃতিজড়িত স্থানগুলির প্রতি তাঁর আন্তরিক ভক্তি থাকা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাক্ষেত্রগুলি ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। কালীয়দমন বর্ণনা শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই করেছেন।

দিল্লীতে থাকাকালীন অনেক সাধু ও ভক্তেরা তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। সেগুলির উত্তরে তিনি যা বলতেন তার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করছি।

প্রশ্ন: কি ভাবে ধর্মজীবন শুরু করব?

উত্তর: আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করবে। আমরা সাধারণতঃ সাময়িক তুষ্টির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা করা উচিত সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ভক্তি ও মুক্তি লাভের জন্য।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়বে। নিত্য কিছু কিছু সৎগ্রন্থ নির্দিষ্টভাবে পড়ার অভ্যাস করবে। সর্বদা একটা সৎচিন্তা সৎভাব নিয়ে থাকার চেষ্টা করবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: "আমি আমার কাজ করে যাব। বাকীটা ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর।"

জপ ও ধ্যান: জপের সঙ্গে মনে মনে ইষ্টদেবতার অথবা ইষ্টমূর্তির ধ্যান করবে। ধ্যান করা খুব কঠিন। সেজন্য প্রথমে জপ করবে।

প্রশ্ন: মহারাজ, ধ্যান করার সময় আমার নিঃশ্বাস ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হতে থাকে এবং ইষ্টমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেজন্য অতি আনন্দে অন্য কিছু হয় না।

উত্তর: আনন্দ পরিত্যাগ করে মনকে আবার ইষ্টচিন্তায় নিয়ে যেতে হবে। কিছুদিন অভ্যাস করবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: মহারাজ, ধ্যানের সময়ে যদি অন্য দেবতাদের মূর্তি আসে, তখন কি করব?

মহারাজজী: সাধারণতঃ কোন্ দেবতার মূর্তি ভাসে?

প্রশ্ন: অমুক · অমুক।

উত্তর: মনে করবে দেবতারা তোমার ইষ্ট ব্যতীত আর কেউ নয়। এই দেবতাদের মধ্যে তোমার ইষ্টমূর্তির ধ্যান করবে। তাহলে কোন অসুবিধা হবে না।

প্রশ্ন: কোন কোন সময়ে ধ্যান গভীর হয়, কিন্তু অন্যান্য সময়ে একেবারে মন স্থির হয় না।

উত্তর: হ্যাঁ, ধ্যান সর্বদা গভীর হয় না। ধ্যান করা খুব কঠিন, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা ধ্যান গভীর এবং দীর্ঘায়িত করা যায়। যেমন, একজন শিল্পী অঙ্কনের জন্য কি করে? আস্তে আস্তে চিত্রের একটি একটি অংশ আঁকে। যে ছবিটা আঁকবে সেই ছবিটা বারে বারে লক্ষ্য করে এবং আঁকার চেষ্টা করে। শেষে যে ছবিটা এঁকেছে তাকে ফুটিয়ে তোলে এবং আগেকার ছবি দেখার আর বেশী প্রয়োজন বোধ করে না। ঠিক এইরকম তোমার মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি আঁকতে থাকবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিটিকে ঘন ঘন দেখলে তাঁর ছবি মনে ফুটে ওঠে। নিজের মনের ভিতরে তাঁর ছবি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়ার নামই ধ্যান।

প্রশ্ন: সাধারণতঃ আমি কাজকর্মকে পূজা বলেই বিশ্বাস করি। তবে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে, এর দ্বারা ঈশ্বর লাভ হবে কি না।

উত্তর: পূর্বে ধারণা ছিল যে ধ্যান এবং তপস্যার দ্বারাই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। কিন্তু এখন স্বামী বিবেকানন্দ "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র

মন্ত্র দিলেন। এটি নতুন পথ। 'জীবেই শিব'—দরিদ্র, মূর্খ, পীড়িতদের মধ্যে শিবই দেখবে। যদি তুমি এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের সেবা কর, তাহলে নিজে নিজেই তৃপ্তি অনুভব করবে। প্রত্যেক কাজ, এমনকি হাত-পা নাড়ানো পর্যন্ত যদি এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে করা যায় তাহলেও সব পূজায় পরিণত হয়। এই ভাব সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা একান্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন ঃ সাধুজীবনের বিঘ্নগুলি কি কি ? কি করে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ?

উত্তর ঃ অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়সুখই প্রধান বিঘ্ন। ইন্দ্রিয়সুখ অর্থাৎ কামনা বাসনা আসতে দেওয়া উচিত নয়। প্রার্থনা এবং সদা সৎবিচার দ্বারা এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ভগবানের কাছে এই বিঘ্নকে জয় করার জন্য প্রার্থনা করবে। মনে মনে বিচার করবে, তুমি সাধু হয়েছ, ইন্দ্রিয়সুখ তোমার পথ নয়। তোমাকে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু লাভ করতে হবে।

মধুর আনন্দঘন দিনগুলি শেষ হয়ে গেল। ৬ই এপ্রিল ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ। পূজ্যপাদ মহারাজজী বেলুড় মঠের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। আমার মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত থাকল তাঁর পুণ্য সঙ্গের পবিত্র মধুর স্মৃতি।

স্মৃতি পবিত্র হলেও সর্বদা মধুর হয় না। কখনও কখনও তা বিষাদমলিন। ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ : মহারাজজীর সাংঘাতিক অসুস্থতার সংবাদে দিল্লী থেকে আমি কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ছুটে এলাম। এবার তাঁকে দেখলাম অন্তর্মুখীন শিশুর মতন। ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর একান্ত নির্ভরশীল। যদিও দিনরাত তিনি জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে যুঝছেন।

অসুস্থতাকালে মহারাজজীর সেবা করার আমার খুবই ইচ্ছা ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপায় সে সুযোগও আমার কপালে জুটে গিয়েছিল। শেষ তিনদিন তাঁর কাছে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতপাখাতে তাঁকে হাওয়া করেছি। মাঝে মাঝে তিনি বলে উঠতেন, "উঃ এমন জ্বালা, যেন মৃত্যু হয়।" কিন্তু তারপরেই উচ্চারণ করতেন, "নারায়ণ ; দুর্গা।" তারপর তিনি অন্তর্জগতে চলে যেতেন। তাঁর মুখে বিরাজ করত পরম প্রশান্তির ছায়া।

আমরা শুনেছি যখন মহারাজজী চর্মরোগে আক্রান্ত হন তখন, যে ব্যথা এবং জ্বালায় সাধারণ মানুষ দুঃখ এবং নৈরাশ্যে ভোগে, সেই অবস্থাতেও তিনি শান্ত স্থির মনে বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতো কঠিন শাস্ত্রগ্রন্থের শাঙ্কর ভাষ্যসহ ইংরেজী অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন। তা কি করে সম্ভব হয়েছিল এখন স্বচক্ষে দেখলাম। আরও দেখলাম কিভাবে দৈহিক ব্যথা এবং কষ্ট থেকে মন তুলে নেওয়া যায়। একদিন খুব বেশী যন্ত্রণা হলে, তিনি খবরের কাগজ

আনিয়ে বড় বড় সব Headline পড়তে বললেন। তিন চারটে Headline শোনার পর তিনি উদাসীনভাবে উচ্চারণ করতে লাগলেন, “মা, দুর্গা, নারায়ণ” এবং এ অবস্থায় সমস্ত ব্যথা-বেদনা ভুলে সম্পূর্ণ ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

একদিন মহারাজজী শুয়ে আছেন, গায়ে মাদ্রাজী গেরুয়া চাদর। আমি পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ মহারাজজী আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। অনুভব করলাম, তাঁর স্নেহসিক্ত ও ভালবাসা মাখানো কৃপাদৃষ্টি। মহারাজজী তাঁর ডান হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি একহাতে তাঁর হাত ধরে আর একহাতে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগলাম। সেই মুহূর্ত ছিল আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং স্মরণীয় ক্ষণ। শ্রীগুরুর কৃপায় সেদিন এক অপূর্ব তৃপ্তি অনুভব করেছিলাম। সেই তৃপ্তি এখনও আমার মনের মণিকোঠায় সযতনে সঞ্চিত করে রেখেছি।

৬ই অক্টোবর ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ। মহারাজজী শুয়ে আছেন। আমি বামদিকে চেয়ারে বসে তাঁর মাথায় হাওয়া করছি। হঠাৎ সামনের দেওয়ালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা এবং স্বামীজীর ছবির দিকে ইঙ্গিত করে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, “এই আলোটা জ্বালিয়ে দাও।” কেউ কেউ মনে করেছিলেন উনি আলো জ্বালাতে বলছেন। কিন্তু তাঁরা দেখলেন ঘরে সব আলোই জ্বালানো ছিল। তাঁরা কি বুঝলেন জানি না, তবে আমি একটি সংকেত পেলাম। তিনি যেন বলতে চাইছেন—তোমার হৃদয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা এবং স্বামীজীকে বসাও। সকল অজ্ঞানান্ধকার হতে মুক্ত হও। ইহজগত থেকে বিদায় নেবার আগে এই ছিল আমার কাছে মহারাজজীর শেষ উপদেশ।

উপরে বর্ণিত স্মৃতিকথাটি হিন্দীতে অনূদিত হয়ে রামকৃষ্ণ নিলয়ম্, জয়প্রকাশ নগর, ছাপরা, বিহার থেকে প্রকাশিত ‘বিবেক শিখা’ পত্রিকার নভেম্বর, ১৯৮৮, স্বামী মাধবানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যায় ‘স্মৃতি-সুমন তব চরণে’ শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে।

স্মৃতি-কণিকা

স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দ

বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় স্বামী মাধবানন্দজীর মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন বয়োকনিষ্ঠ সাধু কোন বিষয়ে নির্মল মহারাজের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেন। তাতে মহারাজ সেই সাধুটিকে তিরস্কার করে উত্তর দেন। পরবর্তীকালে সেই সাধুটি নথিপত্রসমেত এসে প্রমাণ দেন যে তাঁর বক্তব্যই সঠিক। তখন নির্মল মহারাজ নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চান। সেই নবীন সাধুটি অবাক হয়ে গেলেন তাঁর এই মহানুভবতায়—মাধবানন্দজীর মতো সাধারণ সম্পাদক চাইছেন ক্ষমা!

আর একবার কোন এক সাধুকে নির্মল মহারাজ তিরস্কার করায় সাধুটির মনে মহারাজের সম্বন্ধে একটা ভীতিপূর্ণ ধারণা জন্মায়। সাধুটি সদাসর্বদা তাঁকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন। একদিন সেই সাধুটি যখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন তখন অন্ধকারে তাঁর অসুবিধা হতে পারে ভেবে নির্মল মহারাজ পিছন থেকে দ্রুত পায়ে এসে সুইচ্ টিপে সিঁড়ির আলোটি জ্বালিয়ে দেন এবং সাধুটি উপরে উঠে গেলে আবার তা নিভিয়ে দেন। এতে সেই সাধুটি অত্যন্ত অভিভূত হন।

মহারাজ নিজের জন্মতারিখ সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলতে চাইতেন না। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, "আমার জীবনী বের করা হবে নাকি?" কোন দীক্ষিত ভক্ত মহারাজের জন্মতিথি জানতে চেয়ে চিঠি দেন। তাঁকে মহারাজের আদেশে লেখা হল, "মহারাজ বলেছেন—শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করলেই হবে। আমার জন্মতিথি পালন করবার কোনই দরকার নেই।"

মহারাজের ইংরেজী ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা অনেকেই জানেন। বলরাম মন্দিরের মামলাকে কেন্দ্র করে আদালতের Commission চলছিল। সেখানে মহারাজ এসেছেন সাক্ষ্য দিতে। তখন তাঁর চমৎকার ভাষা ও phrase idiom-এর ব্যবহার শুনে জনৈক Stenographer বলেছিলেন, "এরকম ইংরেজী কোথাও শুনিনি।"

তাঁর জীবনে এক মুহূর্ত সময়েরও অপচয় ছিল না। সবসময় একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত একান্তে ধ্যানজপ নিয়ে ছিলেন। তপস্যার থেকে ফিরে আসবার পরে মঠে একজন বয়োকনিষ্ঠ সাধুকে

বললেন, "পাঁচটার সময় ডেকে দিও।" পরে রাত্রিতে খাওয়ার পরে বললেন, "আমাকে ডাক নি?" কনিষ্ঠ সাধু উত্তর দিলেন, "আমি ডাকতে গিয়ে দেখি যে আপনি মালা নিয়ে জপ করছেন, সেজন্য ডাকিনি।" মহারাজজী বললেন, "জপ করছি তো কি হয়েছে? সমাধিতে তো ছিলাম না! আমি কথা দিয়েছিলাম মিটিংয়ে যাব। সত্যের অপলাপ করা হল।"

তাঁর জীবন ছিল খুব বিলাসবর্জিত। একবার পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ কাশী সেবাশ্রম থেকে স্বামী পুণ্যানন্দজী মারফৎ মঠের সাধুদের জন্য কিছু কাপড় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। নির্মল মহারাজ মোটা কাপড় ছাড়া পরবেন না বলে তাঁর জন্য সেইরূপ কাপড় পাঠানো হয়।

তিনি বলতেন, "সর্বদা সব অবস্থায় ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ বিচার করে চলবে। কথাবার্তা, কাজকর্ম কিছুই সৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত বিনা প্রয়োজনে করবে না। ভগবানকে লক্ষ্য রেখে যা কিছু করা যায় তাহাই সৎ, তাঁকে ছেড়ে সবই অসৎ।"

সংঘকে তিনি ঠাকুরের অঙ্গ বলে মনে করতেন। বলতেন, "সংঘের যাবতীয় কাজকে আমরা ঠাকুরের সেবা বলেই জানি। ঠাকুর গৃহীদেরও জন্য, সন্ন্যাসীদেরও জন্য।"

স্মৃতির অর্ঘ্য

স্বামী অচ্যুতানন্দ

"এ কি করেছ! আমার জন্য আবার ট্যাক্সিভাড়া করতে গেলে কেন? এই তো এখান থেকে এত কাছে আশ্রম—আমি তো রিক্সাতেই যেতে পারতাম।"

"না মহারাজ এটি এক ভক্তের গাড়ি। তিনি এনেছেন আপনাকে আশ্রমে পেঁছে দেবেন বলে।"

"আরে ছিঃ ছিঃ! আবার ভক্তকে কষ্ট দিয়ে গাড়ি এনেছ। না না এ ঠিক হয়নি।"

ইতিমধ্যে যাঁর গাড়ি তিনি এগিয়ে এসে প্রণাম করে জানালেন, "না মহারাজ, উনি আমাকে গাড়ি আনতে বলেননি; আমি নিজে থেকেই এসেছি। এদিকে আমার একটু কাজও ছিল, সেটুকু সেরে নিয়েছি—এখন আপনাদের আশ্রমে পেঁছে দিয়ে যাব।"

নিশ্চিন্ত হলেন মহারাজ। গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা সতরঞ্চির একটি ছোট বেডিং আর একটি ক্যানভাসের ব্যাগ। সে দুটি গাড়ির পিছনে তুলে নিয়ে গাড়ি আশ্রমের পথে চলল রেলস্টেশন ছেড়ে।

এই দৃশ্যের প্রধান বক্তা যিনি—তিনি তৎকালীন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। বাইরে থেকে ট্রেনে ফিরছেন বেলুড় মঠে। পথে ব্রেক জার্নি করে একটি আশ্রমে এসেছেন। ট্রেনের সেকেণ্ড ক্লাশ কামরা থেকে নেমে মোটরগাড়ি আনা হয়েছে শুনে বিরক্ত হয়ে পূর্বোক্ত মন্তব্য তিনি করেছিলেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামীজীর কাছে। এই ছোট্ট চিত্রটির মধ্য দিয়ে আমরা পূজনীয় মহারাজজীর অনাড়ম্বর জীবন ও সন্ন্যাসী-সুলভ অপরিগ্রাহী মনোভাবের যে পরিচয় পাই সেটি যাঁরা তাঁকে কাছে থেকে দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই তা স্মরণ আছে।

আশ্রমে পেঁছে হাত মুখ ধুয়ে প্রথমেই শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করতে গেলেন। কত আকুল হয়ে হাত জোড় করে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে, বিনম্রভাবে প্রণাম করে ধীর পদক্ষেপে তাঁর ঘরের সামনে এসে একটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন। সকলেই একে একে প্রণাম করার পর হঠাৎ তিনি আশ্রমাধ্যক্ষকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, তোমার ছাত্রাবাস থেকে একটি ছেলে হঠাৎ কাউকে না জানিয়ে পালিয়ে গিয়েছে কি ব্যাপার? কাগজে তার ছবি দেখলাম হারানো-প্রাপ্তি-কলামে!" অপ্রতিভ আশ্রমাধ্যক্ষ জানালেন, "হ্যাঁ মহারাজ, ছাত্রাবাসের ঐ

ছেলেটি বড় দুষ্টু ছিল। তাকে একজন শিক্ষক একটু শাসন করাতে সে কাউকে কিছু না বলে চলে গিয়েছে। আমরা সবাই খুবই উদ্বিগ্ন, চারিদিকে খোঁজ খবরও করা হচ্ছে—এখনও কোন খবর পাওয়া যায়নি।" পূজনীয় মহারাজ এই ছোট্ট খবরটিও দেখেছেন আর মনে রেখে এখন তার খোঁজ নিচ্ছেন দেখে উপস্থিত সকলেই অবাক। পূজনীয় মহারাজ আবার জানতে চাইলেন —"মাষ্টারটি কি করেছিল যাতে ছেলেটি একেবারে পালিয়ে গেল ?" অধ্যক্ষ মহারাজ সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা জনৈক যুবকের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন—"একেই জিজ্ঞেস করুন মহারাজ—এই সেই মাষ্টার।"

পূজনীয় মহারাজের বিস্মিত দৃষ্টি যার দিকে নিবদ্ধ হল—সেই যুবকটি তখন লজ্জা-সংকোচ-উদ্বেগে বিহ্বল। সে মুখ তুলে তাকাতেও পারছে না। একেতো ছেলেটি চলে যাওয়ার নৈতিক দায়িত্ব সে এড়াতে পারছে না, তার উপর এহেন বরেণ্য সন্ন্যাসী এবং সংঘের প্রশাসনিক প্রধানের সামনে সে কি জবাবদিহি করবে এই চিন্তায় তার মরমে মরে যাওয়ার অবস্থা। সম্ভবতঃ তার এই অবস্থা বুঝে নিয়েই পূজ্যপাদ মহারাজ বললেন, "ও তুমিই সেই মাষ্টার! তা এমন মার দিলে যে ছেলেটা পালাল! খুব দুষ্টু ছেলে ছিল বুঝি? তা যাবে আর কোথায়, কয়েকদিন এদিক ওদিক ঘুরে তারপর আবার ঠিক ফিরে আসবে। তবে দেখ—মাষ্টারি মানে ছেলেদের মারধোর করবার অবাধ অধিকার নয়। শুধু শাসন করার থেকে তাকে যদি বুঝিয়ে তার দুষ্টুবুদ্ধির মোড় ফেরাতে পারতে তবেই তো তুমি ঠিক ঠিক মাষ্টার—কি বল? তোমাদের শিক্ষা মনস্তত্ত্বে আছে না—'Sympathy is the key word'। এই সহানুভূতি ও ভালবাসাই মানুষের জীবনের ধারা বদলে দেয়। শুধু নির্মম শাসন নয়। যাক্ ভেবো না—সে ঠিক ফিরে আসবে।" নবীন শিক্ষক পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেল। বেরিয়ে আসতে আসতেই শিক্ষকটি শুনতে পেল মহারাজ বলছেন, "আজকালকার ছাত্ররাও তেমনি, লেখাপড়ার নাম নেই—adventure করার জন্য পাগল। আর অভিভাবকরাও নিজেদের ছেলেদের সামলাতে না পেরে এনে দেয় আমাদের কাছে—'মহারাজ, এদের মানুষ করে দিন'—আরে বাবা বাড়িতে যা শিখে আসছে তা কি অত সহজে শোধরানো যায়। যাক্ এখন ঠাকুরের দয়ায় ছেলেটি ফিরে এলে সবদিক রক্ষা পায়।"

সেদিন রাত্রে আবার সেই শিক্ষক পূজনীয় মহারাজের কাছে প্রণাম করতে গেলে তাকে তিনি আবার বললেন, "মাষ্টারী করা খুব কঠিন কাজ, জান— তোমার প্রতিটি চালচলন ছাত্ররা দেখবে-শুনবে আর সেগুলি অনুকরণ করবে। সুতরাং খুব সাবধানে থাকবে। তবে এখানকার অধ্যক্ষের কাছে শুনলাম—তুমি নাকি ভালই পড়াও, আর অল্পবয়স হলেও ছেলেরা তোমাকে মানে। সেইজন্য

ছেলেটি পালিয়ে গেলেও স্কুলের ছেলেরা এই নিয়ে কোন হৈচৈ করেনি। যাইহোক আর যেন এমন প্রচণ্ড শাসন কোর না।”

এই প্রসঙ্গেই আবার বললেন, “পড়াশোনার ব্যাপারে কাউকে যদি ছোটবেলা থেকেই তার দ্বারা কিছু হবে না বলি, তবে তার ভিতরের শক্তির বিকাশ হয় না। কাজে কাজেই তোমার ভিতরে কি আছে বা তোমাকে দিয়ে ঠাকুর কি মহৎ কাজ করাবেন তা তুমিও জান না, আমিও বলতে পারি না।” এইরকম অনেক কথা সেদিন তিনি বললেন। পরদিনই তিনি ফিরে যান বেলুড় মঠে। আশ্চর্যের বিষয় তাঁর অমোঘ ইচ্ছায় সেই ছেলেটি দুদিন পরেই ফিরে আসে। কাছাকাছি এক পরিচিত লোকের বাড়িতে গিয়ে সে লুকিয়ে ছিল। সেই ভদ্রলোক কাগজে ছবি দেখে ছেলেটিকে কিছু না বলে আশ্রমে খবর দেন, সাধুরা গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনেন। সেই খবর টেলিগ্রাম করে মঠে পূজনীয় মহারাজকে জানালে তিনি আনন্দিত হন।

এর পরে বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। সেই যুবক শিক্ষক তার কর্মস্থল সেই আশ্রম পরিত্যাগ করে সাধু হওয়ার ইচ্ছায় মঠের একটি শাখা কেন্দ্রে যোগদান করে। পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দজীর দেহত্যাগের পর তখন পূজনীয় মাধবানন্দজী সংঘের সর্বাধিনায়ক। নবীন ব্রহ্মচারীটি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাটি অসমাপ্ত রেখে চলে আসায়, যে আশ্রমে সে এসেছে, সেই আশ্রম-সম্পাদক ও সংলগ্ন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামীজী ক্ষুব্ধ। তাঁরা ব্রহ্মচারীটিকে একদিন ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন নতুন প্রেসিডেণ্ট মহারাজের কাছে। ইচ্ছা, তাঁকে দিয়ে বলাবেন যাতে ব্রহ্মচারী পরীক্ষাটি শেষ করে আসে। পূজ্যপাদ মহারাজ তখন একটি ক্যানভাসের ইজিচেয়ারে বসে পা দুটি একখানি মোড়ায় রেখে কথামৃত পড়ছিলেন। প্রাচীন স্বামীজী দুজন আগে গিয়ে মহারাজকে ব্রহ্মচারীর কথা বলে তাকেও ভিতরে ডাকলেন। ব্রহ্মচারী ভিতরে গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করে তাঁর দিকে তাকাতেই মহারাজ হঠাৎ একটু মুচকি হেসে বললেন, “কি হে তুমি আবার কোত্থেকে এলে—এবার বুঝি পড়ার ভয়ে তুমি নিজেই পালিয়ে এলে? আর এঁরা তোমাকে ধমকে আবার পড়ায় বসাতে চান।” সঙ্গের স্বামীজী দুজন এ রহস্যের কিনারা না পেয়ে অবাক হয়ে তাকাচ্ছেন যখন, মহারাজ নিজেই সেই পুরনো কথা তাঁদের বলে সেই ব্রহ্মচারীকে বললেন—“দাওনা পরীক্ষাটা, আমাদের অনেক কাজে আসবে। তোমার কি আর ইচ্ছা নেই পরীক্ষায় বসতে?” নীরবে ব্রহ্মচারী মহারাজজীর প্রখর স্মৃতিশক্তির কথা স্মরণ করতে করতে তাঁর মুখের দিকে তাকালে তিনি আবার জানতে চাইলেন, “কি দেবে না পরীক্ষা?” ব্রহ্মচারী সঙ্কুচিতভাবে তার পরীক্ষায় বসার অনিচ্ছার কথা জানাতে তিনি আবার বললেন, “পাশ করতে পারবে না এই ভয় নাকি?” তার উত্তরে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামীজী বললেন, “না
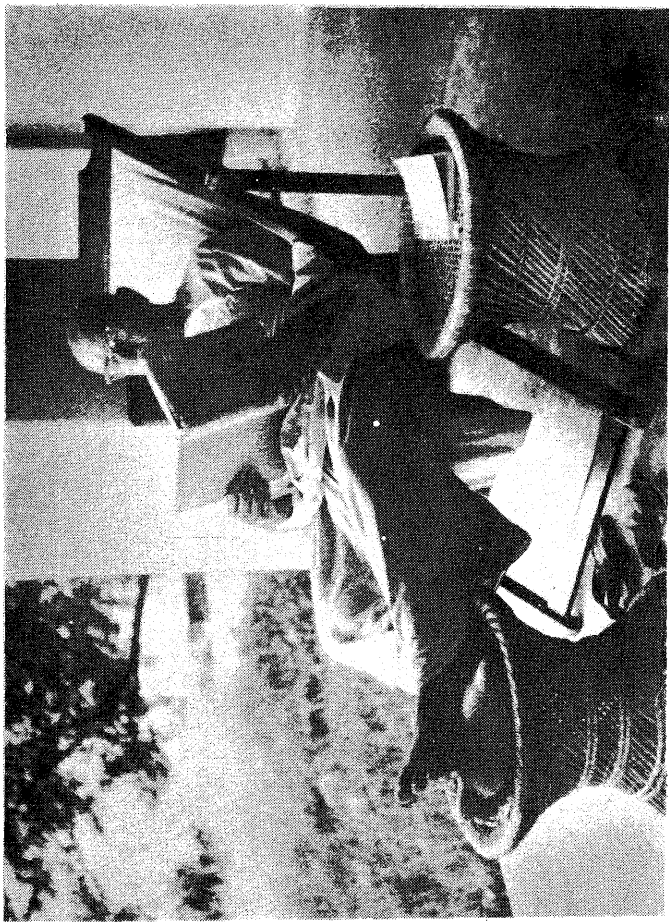
"পূজ্যপাদ মহারাজ তখন একটি ক্যানভাসের ইজিচেয়ারে বসে পা-দুটি একখানি মোড়ায় রেখে কথামৃত পড়ছিলেন।"—পৃষ্ঠা ৩০৬

"প্রেসিডেন্ট হওয়ার ঠিক আগে তিনি সারগাছি আশ্রমে গিয়েছিলেন প্রাচীন সন্ন্যাসী তাঁর গুরুভাই স্বামী প্রেমেশানন্দজীকে দেখতে।"—পৃষ্ঠা ৩০৭

১। স্বামী মাধবানন্দ, ২। স্বামী প্রেমেশানন্দ, ৩। মৃণাল পোদ্দার, ৪। স্বামী সুহিতানন্দ, ৫। স্বামী নিত্যযুক্তানন্দ, ৬। স্বামী সুখদানন্দ, ৭। স্বামী গৌরানন্দ, ৮। স্বামী অজজানন্দ, ৯। স্বামী অনাময়ানন্দ, ১০। স্বামী প্রমথানন্দ, ১১। স্বামী যাদবানন্দ, ১২। স্বামী শিবময়ানন্দ, ১৩। ডাঃ শচীন চৌধুরী, ১৪। অধ্যাপক অমূল্য গুহ, ১৫। শশাঙ্ক দত্ত, ১৬। গোকুল চন্দ্র দাস, ১৮। ধীরেন মণ্ডল, ১৯। সমর বাবু, ২০। চৈতন্যপুরের জমিদার বীরচাঁদ সিংহরায়, ২১। জিতেন বিশ্বাস ও ২২। মনোজ ব্যানার্জী।

মহারাজ, এর ঐ বিষয়ের অনার্স-এর ফল খুব ভাল, ও পরীক্ষায় বসলে ভাল করেই পাশ করবে। ওর অধ্যাপকদেরও তাই মত।" তা শুনে আবার যখন মহারাজ জানতে চাইলেন তখনও ব্রহ্মচারীর একই উত্তর শুনে মহারাজ মত বদলে বললেন—"ছেড়ে দাও ওকে—ওর যখন আর ইচ্ছা নেই কেন ওকে কষ্ট দিচ্ছ? আমারও শেষ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি—বাবুরাম মহারাজ insist করা সত্ত্বেও।" হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ব্রহ্মচারী।

একদিন কাজের প্রসঙ্গে মহারাজকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "সব কাজ ঠাকুরেরই সেবা। ঠাকুরের কাজ বলে করে যাওয়া উচিত। যে মন্দিরে পুজো করছে সেও ঠাকুরের সেবা করছে, আর যে উঠান ঝাঁট দিচ্ছে সেও সেই ঠাকুরেরই সেবা করছে। পূজনীয় রাজা মহারাজকে দেখেছি ঠাকুরের সেবা মনে করে নির্বিকার চিত্তে বাইরের উঠান ঝাঁট দিচ্ছেন। কাজে কাজেই সব কাজকেই ঠাকুরের কাজ মনে করে করে যাও।"

পুরাতন স্মৃতি প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রেসিডেণ্ট হওয়ার ঠিক আগে তিনি সারগাছি আশ্রমে গিয়েছিলেন প্রাচীন সন্ন্যাসী তাঁর গুরুভাই স্বামী প্রেমেশানন্দজীকে দেখতে। প্রেমেশানন্দজী তখন তাঁকে বলেন, "এতদিনে ঠাকুর আপনাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছেন—যোগ্য আসনে আপনাকে বসিয়েছেন।…আমাদের প্রেসিডেণ্টকে আমি তো ঠাকুরেরই প্রতিমা জ্ঞান করি। দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়, আবার আর একখানি প্রতিমা তার জায়গায় বসিয়ে পুজো করা হয়। আমাদেরও তেমনি এক একজন সংঘগুরু চলে যাচ্ছেন—তাঁর শূন্যস্থানে আবার আমরা নতুন প্রতিমা বসাচ্ছি। এ প্রতিমা ঠাকুরেরই প্রতিমা।" মাধবানন্দ মহারাজ এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে বলে উঠলেন, "প্রতিমা যদি বললেন, তবে প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠাটিও আপনি করে দিন। আপনি তো মার প্রিয় সন্তান—সবই পারেন।" কি অদ্ভুত ভাব এঁদের—কোন্ দৃষ্টিতে এঁরা পরস্পরকে দেখতেন! এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে পূজনীয় প্রেমেশানন্দজী যখন শেষ অসুখের সময় কলকাতায় মেডিকেল কলেজে এসে আছেন তখন পূজনীয় মাধবানন্দজী এসেছেন তাঁকে দেখতে। দুই প্রাচীন মাতৃসন্তানের সে কি নিবিড় একান্ত আলাপচারিতা। শেষ বিদায়ের সময়ে দুজনের হাত জড়িয়ে ধরে প্রণাম বিনিময়। এ দৃশ্য তুলনারহিত। গম্ভীরাত্মা মাধবানন্দজীর এ এক অন্যচিত্র।

একবার এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "ভগবানকে নিজের করে নাও—যেন তোমার প্রিয়তম আত্মীয়ের মতন। এইভাবে চল। আন্তরিকতা থাকলে এই জীবনেই তাঁর দর্শন পাবে।"

জনৈক ব্রহ্মচারীকে মঠ কর্তৃপক্ষ মঠে দুর্গা পুজোয় ব্রতী হওয়ার আদেশ করেছেন, কিন্তু সেই ব্রহ্মচারীর পূর্বে কখনও দুর্গাপুজো করার অভিজ্ঞতা নেই।

সেজন্য অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে তার দুর্বলতার কথা মঠের পূজনীয় ম্যানেজার মহারাজকে জানাতে তিনি বললেন, "আমাদের সকলের ইচ্ছা তুমিই এবার মঠে দুর্গাপূজা কর। পূজনীয় নির্মল মহারাজ তোমার নাম শুনে তোমাকেই পূজারী হতে বলেছেন, সুতরাং ভয় পেয়ো না।" তবুও পূজারীর মনে সাহস আসে না দেখে তিনি বললেন, "তাহলে সেবা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তাঁরই কাছে সব খুলে বল।" পূজনীয় মাধবানন্দজী তখন সেবা প্রতিষ্ঠানে অসুস্থ অবস্থায় আছেন। ব্রহ্মচারী তখন তার আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজকে সব কথা বলায় তিনি নিজে তাকে সঙ্গে করে সেবা প্রতিষ্ঠানের যে কেবিনে মহারাজ ছিলেন সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরে ব্রহ্মচারীর কাছে তার অসুবিধার কথা শুনে মহারাজ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "গত বৎসর পূজায় বলি আটকে গিয়েছিল, বোধহয় কিছু ত্রুটি হয়ে থাকবে। এবার আমাদের সকলের ইচ্ছা তুমিই মায়ের পূজা কর। আর যে অনভিজ্ঞতার ভয় করছ সেটা অমূলক। পূজার প্রথম আরম্ভ মঠ থেকেই হোক না! পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন—'এখানে মায়ের বাঁধা আসর।' কিছু ভয় কোরো না, জেনো—তোমার সঙ্গে মঠের সব সাধুদের শুভেচ্ছা থাকবে। যাও প্রাণ দিয়ে মায়ের পূজা কর। কোন ভয় নেই।" সংঘগুরুর অমোঘ আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ব্রহ্মচারী পরিতৃপ্ত প্রাণে ফিরে এল। মঠের পূজাও নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হল।

পর বৎসরেও দেবীর পূজায় সেই-ই ব্রতী। এ বৎসর কিন্তু সকলেরই দারুণ উদ্বেগ কারণ পূজনীয় মাধবানন্দ মহারাজ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সেবা প্রতিষ্ঠানে শয্যাশায়ী। সকলেরই আশঙ্কা পূজার মধ্যেই না কিছু ঘটে যায়। হাসপাতালে আগত সাধুদের মুখে মহারাজ রোজই পূজার সব বিবরণাদি শোনেন। বিজয়া দশমীর দিন মায়ের শান্তিজল নেওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। সেইমতো মঠের সাধুদের শান্তিজল বিতরণ শেষ হওয়ার পরই মঠের পূজনীয় ম্যানেজার মহারাজ, তন্ত্রধারক স্বামীজী ও পূজারী ব্রহ্মচারী মঠের দেবীপূজার ঘটখানি বুকে নিয়ে সেবা প্রতিষ্ঠানে মহারাজের কেবিনে এসে উপস্থিত হন। ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেবকরা জানান সন্ধ্যা থেকেই মহারাজ উদ্বিগ্ন হয়ে শান্তিজলের আশায় থেকে থেকে এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু মঠের ম্যানেজার মহারাজ বললেন,—"না না দেখ তিনি ঘুমোন নি, চল ভিতরে।" আশ্চর্য। ভিতরে সকলে ঢোকামাত্র তিনি চোখ মেলে তাকালেন—তন্ত্রধারক ও পূজারী সমস্বরে বৈদিক শান্তিমন্ত্র আবৃত্তি করে তাঁর মাথায় ঘটের সামান্য জল আম্রপল্লব দিয়ে ছিটিয়ে দিতেই তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি নেমে এল। হাত দুটো জোড় করে দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। ঠিক সেই সময় পূজারী ব্রহ্মচারী ঘটটি আর একজনের হাতে দিয়ে মহারাজকে প্রণাম করতে যেতেই তাঁর ডান হাতখানি

আশীর্বাদের ভঙ্গিতে একটু উঁচু হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রধারক মহারাজ পূজারীকে বললেন—"নে নে মহারাজের হাতের নীচে মাথা রাখ্।" সঙ্গে সঙ্গে পূজারী মাথাটা তাঁর হাতের তলায় রাখতেই কাঁপতে কাঁপতে তাঁর দক্ষিণ হস্তটি পূজারীর মাথায় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য স্থাপিত হল।

শিহরিত কলেবরে পূজারী বুঝল তার দেবী পূজা সার্থক। সাক্ষাৎ জগদম্বা, জ্যান্ত দুর্গা শ্রীশ্রীমায়ের আদরের সন্তান, যাঁর সম্বন্ধে মা বলেছিলেন, "এরা আমার মাথার মণি, যেন জন্মে জন্মে এইরকম ছেলে পাই"—সেই মাধবানন্দজীর কৃপাস্পর্শ লাভের মধ্য দিয়ে পূজারী ব্রহ্মচারী জগজ্জননীরই আশীর্বাদ লাভ করল।

উপরে বর্ণিত স্মৃতিকথাটি হিন্দীতে অনূদিত হয়ে রামকৃষ্ণ নিলয়ম্, জয়প্রকাশ নগর, ছাপরা, বিহার, থেকে প্রকাশিত 'বিবেকশিখা' পত্রিকার নভেম্বর, ১৯৮৮, স্বামী মাধবানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।

স্বামী মাধবানন্দ---একটি নাম, একটি আদর্শ

স্বামী শান্তরূপানন্দ

যদি হিমালয়ের সামনে কেউ দাঁড়ায় তখন তার কি মনে হয়? মনে হয়, কত বিশাল, কত ব্যাপক, কত উচ্চ, কত গভীর! মাধবানন্দজীর কাছে গেলেই কি জানি কেন আমার এইরকম মনে হত। তাঁর কাছে যখনই গেছি এবং পরে যখনই তাঁর কথা চিন্তা করি কেবলই বারবার ম্যাথিউ আরনল্ড-এর 'শেকস্‌পিয়ার' কবিতার কয়েকটি লাইন মনে পড়ে—

> Others abide our question. Thou art free
> We ask and ask. Thou smilest, and art still,
> Out-topping knowledge. For loftiest hill,
> Who to the stars uncrowns his majesty,
> Planting his steadfast footsteps in the sea,
> Making the heaven of heavens his dwelling-place,
> Spares but the cloudy border of his base
> To the foiled searching of mortality.

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত কে না মাধবানন্দজীর কথা জানেন? সাধুতা, বিদ্যাবত্তা, ভদ্রতা ও বিচক্ষণতার জন্য জীবদ্দশাতেই তিনি ছিলেন এক কিংবদন্তী। আর এখন, যারা তাঁকে দেখেনি, শুধু তাঁর বিষয়ে শুনেছে, তাদের কাছেও তিনি পরম শ্রদ্ধাভাজন। গুণে ও চরিত্রের প্রভাবে আজ তিনি সর্বজনপ্রিয়। তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অনেকেই এসেছিলেন। তাঁরা যখন স্মৃতিচারণা করেন তখন কেমন যেন হয়ে যান। তাঁদের চোখ-মুখ দিয়ে এক গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তির ভাব পরিস্ফুট হয়। এ-থেকেই সেই মহান ব্যক্তিত্বের কিছুটা আভাস মেলে।

তাঁর চরিত্রে সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, কর্মযোগী ও ভক্তের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। তাই তো শ্রীমা সারদা দেবী বলতেন, "হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।" দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক। পরে সংঘের অধ্যক্ষ। কিন্তু সর্বাবস্থায় তাঁর সন্ন্যাসোচিত বৈরাগ্যের ভাবটি ছিল স্পষ্ট। কথায় বলে বৈরাগ্যই সাধুর ভূষণ। এই ভূষণেই তিনি সদাই ভূষিত ছিলেন। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। অসুস্থাবস্থায় মহারাজ সেবা প্রতিষ্ঠানে আছেন। দেহত্যাগের মাত্র দুই-চারদিন বাকি। মহারাজের ঘুম

হচ্ছে না। তাই সেবক তাঁর মাথায় অডিকোলন লাগাচ্ছেন। মহারাজ তা জানতে পেরে বললেন, “অডিকোলন লাগিয়ে ঘুম ? ওতো লাকসারী।” এরকম ঘটনা তাঁর জীবনে অগুণতি।

আর তিতিক্ষার তো কথাই নেই। অসাধারণ তাঁর সহ্যশক্তি। বার্ধক্য ও নানা ব্যাধিতে শরীর ভগ্নপ্রায়। আছেন সেবা প্রতিষ্ঠানে। ডাক্তাররা বিভিন্ন প্রকারে চেষ্টা করছেন। যদিও সবকিছুই আয়ত্তের বাইরে। তিনি কিন্তু নির্বিকার। হাসিমুখে সব সহ্য করছেন। অনেকের সঙ্গে আমরাও তাঁকে দর্শন করতে গেলাম। দেখে মনেই হয়নি তিনি অসুস্থ। শুয়ে আছেন। যেন বিশ্রাম করছেন। শরীর তাঁর, কিন্তু তিনি অ-শরীরী। এ-ভাবটি সুস্পষ্ট। হাসপাতালেও তিনি নিত্য জপ-ধ্যান, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করে গেছেন।

তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন শাঙ্কর ভাষ্য সমেত ‘বৃহদারণ্যক উপনিষদ’-এর ইংরাজী অনুবাদ, ‘The Last Message of Sri Krishna’, ‘Viveka-Chudamani’, ‘Bhasa Pariccheda with Siddhanta Muktavali’, ভগিনী নিবেদিতার ‘The Master as I saw him’-এর বঙ্গানুবাদ ‘স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি’ ইত্যাদি। নানাবিধ কাজের মধ্যেও এইসব কাজ করেছেন।

তাঁর ধীশক্তি ছিল খুব প্রখর। একদিন বিকালে তাঁকে প্রণাম করতে গেছি। লাইন বেশ বড়। একে একে সব প্রণাম করছে। হঠাৎ মহারাজ সেবককে পঞ্জিকা আনতে বললেন। পঞ্জিকা আনা হলে একটি বিশেষ দিনের তিথি জানতে চাইলেন। মহারাজের সামনে সেবক কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন। খুঁজতে দেরী হচ্ছে। তখন মহারাজ, “দাও, আমায় দাও” বলেই পঞ্জিকাটি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাঙ্ক বার করে ফেললেন। তারপর তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি দেখে ফেরত দিলেন।

কাজ করতেন চট্‌পট্‌। যে কোনও সমস্যায় তাঁর ঝটিতি সিদ্ধান্ত। কিন্তু তা হঠকারী সিদ্ধান্ত নয়। তাঁর সিদ্ধান্ত হত সঠিক ও সময়োপযোগী। আসলে তাঁর তো কোনও ব্যক্তিগত বিষয় ছিল না। সংঘের কল্যাণ তাঁর কল্যাণ, সংঘের ভাল তাঁর ভাল, সংঘের সমস্যা তাঁর সমস্যা। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত মঙ্গলপ্রদ ও সর্বজনগ্রাহ্য হত। আর আমরা প্রথমেই নিজেদের গণ্ডির কথা চিন্তা করি। তারপর অন্য কথা। তাই আমাদের সিদ্ধান্তও হয় ভুলে ভরা।

স্বামীজী বলেছেন, “Work is worship”—কর্মই উপাসনা। স্বামীজীর এই বাণীর তিনি ছিলেন আদর্শ দৃষ্টান্ত। স্বামীজীর এই বাণীর বাস্তব রূপায়ণ তাঁর জীবন। প্রত্যেক কাজই তাঁর কাছে উপাসনা। তা জপ-ধ্যান হোক, কি প্রুফ-রিডিং হোক, বা অন্য কোন কাজই হোক।

এত পাণ্ডিত্য এত পদমর্যাদা সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রে ভক্তিভাবের কোনও ঘাটতি ছিল না। ঈশ্বর বা পূজ্য ব্যক্তির প্রতি কী সুগভীর শ্রদ্ধা! কী ভক্তি নিয়েই না তিনি ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দজীর মন্দিরে প্রণাম করতে যেতেন! মঠে দুর্গাপূজো হচ্ছে। অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে তিনিও বসে আছেন। পূজো দেখছেন। পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন। দেবতার কাছে ভক্তের এই আত্মনিবেদন ছিল দেখার মতো।

বেলুড় মঠে স্বামী শান্তানন্দজী মহারাজ আছেন। তিনি প্রাচীন সাধু। সকলের প্রণম্য। মাধবানন্দজী মহারাজ যখনই বাইরের কোন কেন্দ্র পরিদর্শন করে মঠে ফিরতেন, কিংবা যখন শান্তানন্দজীর কাছে যেতেন তখনই তাঁকে একেবারে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেন। এ এক অপূর্ব দৃশ্য! না দেখলে বোঝা যায় না।

বাইরের বাহুল্য একদম পছন্দ করতেন না। একদিন বিকালে প্রণাম করতে গেছি। আমি লাইনের একেবারে শেষে। ঐ দিনটি আমার জীবনের এক বিশেষ দিন। তাই একটু বেশি সময় নিয়ে মহারাজকে প্রণাম করছি। অমনি মহারাজ বলে উঠলেন, "বেশি প্রণাম করতে হলে মন্দিরে গিয়ে কর।" তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। তারপর থেকে কোনরকমে প্রণাম সেরেই উঠে পড়তাম। কিন্তু হাত তুলে যে আশীর্বাদটুকু জানাতেন তাতেই মন-প্রাণ ভরে যেত।

মহারাজ বেলুড় বিদ্যামন্দিরে এসেছেন। অনেক ফটো তোলা হয়েছে। মহারাজের একটা ফটো আমি নিজে এনলার্জ করে মঠে নিয়ে গেলাম। উদ্দেশ্য, মহারাজের অটোগ্রাফ নেওয়া। সেবক মহারাজকে সব বললাম। উনি বললেন, "দাঁড়াও দেখি, মহারাজের কাছে নিয়ে যাই।" দূর থেকে আমি দাঁড়িয়ে দেখছি কি হয়! সামনে যাবার সাহস নেই। ওদিকে মহারাজ একা। ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছেন। সেবক ধীরে ধীরে বললেন, "মহারাজ, আপনি বিদ্যামন্দিরে গেছলেন। বিদ্যামন্দিরের ছেলেরা ফটো তুলেছে। এই দেখুন।" মহারাজ দেখে বললেন, "বাঃ বেশ হয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে।" আমি তো খুব খুশি। সেবকও সুযোগ বুঝে বললেন, "মহারাজ, ওরা বলছিল আপনি যদি ওতে একটা অটোগ্রাফ···" ব্যস্! কথা শেষ হতে না হতেই মহারাজের উত্তর, "না"। আমি তো দে দৌড়! অটোগ্রাফ না হোক স্পর্শ তো করেছেন। ওই যথেষ্ট।

তাঁর বেশভূষায় বা ব্যবহারে কোনপ্রকার আড়ম্বর ছিল না। প্রেসিডেণ্ট হবার পর বিদ্যামন্দিরে এসেছেন। গায়ে কোন চাদর নেই। তাই একজন প্রবীণ মহারাজ বললেন, "মহারাজ, আপনি কিন্তু চাদর নিয়ে আসেননি।" তৎক্ষণাৎ মহারাজ বললেন, "এতো এত কাছে। এখানে আসতে গেলে আবার চাদরের কি দরকার?" পরে মহারাজের গলায় মালা দেওয়া হল। রজনীগন্ধার বিরাট
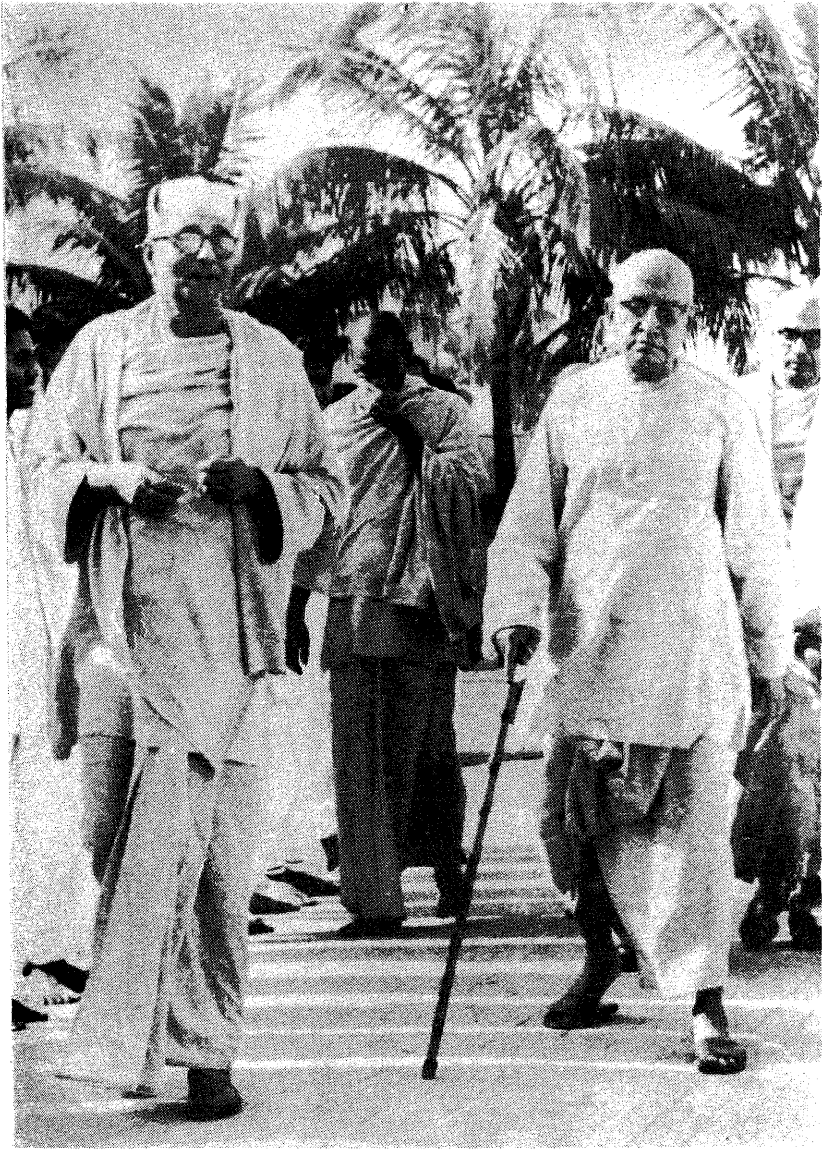
"তাঁর বেশভূষায় বা ব্যবহারে কোনপ্রকার আড়ম্বর ছিল না। প্রেসিডেন্ট হবার পর বিদ্যামন্দিরে এসেছেন। গায়ে কোন চাদর নেই।"—পৃষ্ঠা ৩১২

স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী বিমুক্তানন্দ, পশ্চাতে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ—বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে গৃহীত চিত্র।

"পরে মহারাজের গলায় মালা দেওয়া হল। রজনীগন্ধার বিরাট এক গোড়ে মালা। মালাটা দেখিয়ে মহারাজ বললেন, 'তোমরা চাদরের কথা বলছিলে? এই দেখ, চাদরের কাজ হয়ে গেল।' (বর্তমানে মহারাজের এই ফটোই সর্বাধিক প্রচারিত ও পূজিত।"—পৃষ্ঠা ৩১৩

"গাম্ভীর্যের পাশাপাশি ছিল হাস্য-রসিকতা। বিদ্যামন্দিরে এসেছেন। ছাত্রেরা সব প্রণাম করবে। মহারাজকে আসনে বসানো হল। বেশ পরিপাটি আসন। প্রথমে শতরঞ্চি। তার উপরে ব্যাঘ্রচর্ম। তার উপরে মৃগচর্ম। আসন দেখেই মহারাজ বলে উঠলেন, 'এতো দেখছি বাঘের উপর হরিণ'।"---পৃষ্ঠা ৩১৩
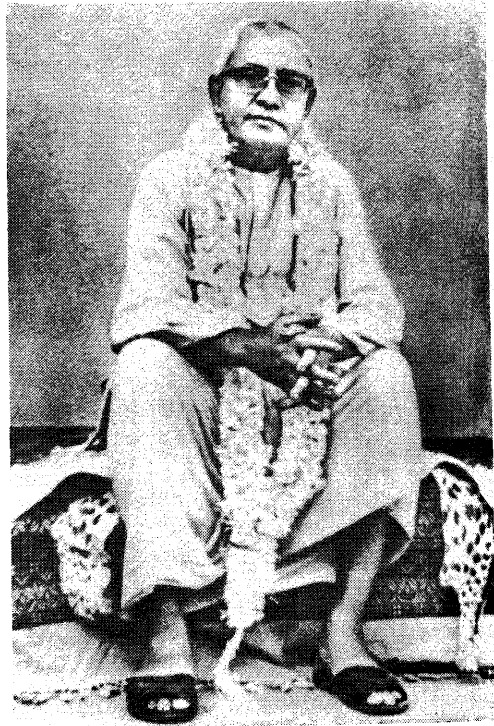
এক গোড়ে মালা। মালাটা দেখিয়ে মহারাজ বললেন, "তোমরা চাদরের কথা বলছিলে? এই দেখ, চাদরের কাজ হয়ে গেল।" (বর্তমানে মহারাজের এই ফটোই সর্বাধিক প্রচারিত ও পূজিত)।

তিনি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর সামনে গেলেই কেমন যেন সব গুলিয়ে যেত। জানি না অন্যের কিরকম অভিজ্ঞতা। আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করত। কিন্তু আশ্চর্য! সেবকের অনুমতি নিয়ে মহারাজের সঙ্গে যখন কথা বলতে গেছি তখন তিনি একেবারেই ভিন্ন লোক। তখন কিন্তু ভয় লাগত না। মনে হত, কত আপনার লোক, খুব কাছের লোক। আপন জন। তখন তিনি নিজে থেকেই কত প্রসঙ্গ করতেন। কত উপদেশ দিতেন। আমি নির্ভয়ে প্রশ্ন করতাম। কথা বলতাম। আবার বাইরে এলেই সেই ভয় ঘাড়ে চাপত। মনে হত, "ওরে বাবাঃ। এতক্ষণ কোথায় ছিলাম! এ যে বিশাল গভীর মহাসমুদ্র!"

গাম্ভীর্যের পাশাপাশি ছিল হাস্যরসিকতা। বিদ্যামন্দিরে এসেছেন। ছাত্রেরা সব প্রণাম করবে। মহারাজকে আসনে বসানো হল। বেশ পরিপাটি আসন। প্রথমে শতরঞ্চি। তার উপরে ব্যাঘ্রচর্ম। তার উপরে মৃগচর্ম। আসন দেখেই মহারাজ বলে উঠলেন, "এতো দেখছি বাঘের উপর হরিণ!"

উপদেশ দেওয়া একেবারেই পছন্দ করতেন না। জীবনের উপর বেশি জোর দিতেন। আর আমরা! কেবল বক্‌বক্‌ করে মরি। কথা বেশি, কাজ কম। তাঁর ঠিক উলটো। কথা কম, কাজ বেশি। প্রায়ই বলতেন, "জীবনে কিছু কর। কিছু উপলব্ধি কর। তবেই জীবন সার্থক। নইলে বৃথা।"

কখনও কখনও সুযোগ করে তাঁর পদপ্রান্তে যেতাম। সেসময়ে সংক্ষেপে যা কিছু বলতেন তা আমাদের অধ্যাত্মজীবনের পরম পথনির্দেশ। একবার আমরা কয়েকজন কলেজের ছাত্র তাঁর কাছে যাই। আগে থেকে আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম কে কি প্রশ্ন করব। কিন্তু যেই না প্রণাম করে তাঁর সামনে বসেছি অমনি সব চুপ। কেউ কারও দিকে তাকাতেও সাহস পাচ্ছি না। কিছুক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করে মহারাজ নিজেই বললেন, "সবাই ঠাণ্ডা যে। তাহলে দেখছি সব প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে। কিছু প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা কর। আমি উত্তর দিচ্ছি। ওই রেডিও খোলার মতো বলে গেলাম। ওতে আমার সুবিধা হয় না।"

তখন আমাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করল, "মহারাজ, জপ কি আমরা সময় নির্দিষ্ট রেখে করব, না সংখ্যা রেখে করব?" উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, একটা সময় নির্দিষ্ট রেখে করবে বইকি। মাঝে মাঝে একটু স্মরণ-মনন করবে। একসঙ্গে অনেকটা সময় না পারলেও মাঝে মাঝে করলেও কয়েকটা Spot-holes [বিন্দু বিন্দু রেখাবৎ] তৈরী হয়। তখন সেইগুলি দিয়ে একটা লাইন টানা

যায়। একটা ধারাবাহিকতা রাখলেই হল।"

একদিন আমার মন বড়ই বিচলিত। সুযোগ করে মহারাজের কাছে গেলাম। সব শুনে তিনি বললেন, "ঘাবড়াবার কিছু নেই। চেষ্টা করলে সকলেরই হতে পারে। মা ঠাকরুন আমাদের কখনও ডিস্‌কারেজ করতেন না। সব সময়েই এনকারেজ করতেন এবং অনুপ্রেরণা দিয়ে দিয়ে ঠিক পথে নিয়ে যেতেন। আমরাও সেই জন্যে কাউকেই ডিস্‌কারেজিং কথা বলি না। বলা উচিতও নয়। পড়াশুনার ব্যাপারেও কাউকে যদি ছোটবেলা থেকেই তার দ্বারা কিছু হবে না বলি, তবে তার ভিতরের শক্তির বিকাশ হয় না। কাজে কাজেই তোমার ভিতরে কি আছে, বা তোমাকে দিয়ে ঠাকুর কি মহৎ কার্য করাবেন, তা তুমিও জান না; আমিও বলতে পারি না।"

আর একদিন মহারাজকে প্রশ্ন করলাম, "মহারাজ, জপ-ধ্যান তো করে যাচ্ছি। কিন্তু সব দিন ঠিকমতো মন বসে না।" তৎক্ষণাৎ মহারাজ বললেন, "ও আমাদেরও হয়। ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। তোমার কর্তব্য করে যাও।"

তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে বাস করেছিলেন। তারপর চলে গেছেন সেই দিব্যধামে। রেখে গেছেন আমাদের জন্য এক চরম ত্যাগাদর্শ।

ভরা থাক স্মৃতিসুধায়

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

যতদূর মনে পড়ে ১৯৬২ সালের শেষের দিকে একবার জয়রামবাটী গিয়েছিলাম, একা। তখন আমি কলেজে পড়ি এবং কলকাতায় থাকি। এরপূর্বে দু'চারবার বেলুড় মঠে ও দক্ষিণেশ্বরেও যাতায়াত করেছি। বেলুড় মঠে সাধুদের সঙ্গে তখন আমার পরিচয়াদি হয়নি। তবে প্রতিবেশী জনৈক ভক্তের সঙ্গে দু'একবার বেলুড় মঠে গিয়ে পূজনীয় স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের নিকট বসে তাঁর সৎপ্রসঙ্গাদি শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন তিনি বর্তমানে প্রেসিডেণ্ট মহারাজের কোয়ার্টারের দোতলার প্রথম ঘরটিতে থাকতেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত সন্তান জেনে এবং ভক্তদের সঙ্গে তাঁর সুমধুর ব্যবহারাদিতে আমি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তবে তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষাদি নেবার তেমন আগ্রহ হয়নি। ঐ সময় তিনি একবার কাশী গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে কলকাতার ভক্তদের চিঠি দেন যাঁরা দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক তাঁরা কাশীতে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নিতে পারেন। আমার নিকট ঐ সংবাদ পেঁৗছালেও পরীক্ষা বা অন্য কিছু কারণে আমার আর কাশী যাওয়া তখন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কয়েকমাস পরে যখন তাঁর দেহত্যাগের সংবাদ পেলাম তখন অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের একজন দীক্ষিত সন্তানের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হলেও তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নেবার আর সৌভাগ্য হল না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঐ সময়ই আমি জয়রামবাটী গিয়েছিলাম। অন্তর্যামিনী মা আমার অবস্থা দেখে বোধহয় মনে মনে হেসেছিলেন।

জয়রামবাটী থাকাকালীন জনৈক বয়স্ক সন্ন্যাসী আমায় ঘুরে ঘুরে মায়ের নতুন বাড়ি, পুরনো বাড়ি, সিংহবাহিনীর মন্দির ইত্যাদি দেখিয়েছিলেন। তাঁরই স্নেহপূর্ণ প্রশ্নে তাঁকে ঐদিন আমার মনের কথা জানিয়েছিলাম। তিনি অভয় দিয়ে বললেন: "ভাবছ কেন? বর্তমান প্রেসিডেণ্ট স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজও মায়ের সন্তান। তুমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে অবশ্যই তাঁর সঙ্গে মঠে দেখা করবে। মায়ের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।" জয়রামবাটীর শান্ত স্নিগ্ধ নির্মল পবিত্র পরিবেশে কয়েকদিন কাটিয়ে ও মাতৃসান্নিধ্য মনে মনে উপভোগ করে মন আনন্দে ভরে উঠল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন জোর করে কলকাতায় ফিরলাম। মনে আনন্দ ও সন্দেহের দোলা—পূজ্যপাদ স্বামী

মাধবানন্দজী মহারাজ আমায় কৃপা করে তাঁর 'সন্তান' হিসাবে গ্রহণ করবেন তো? ইতিমধ্যে আমি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীশ্রীমায়ের কথা ও স্বামী বিবেকানন্দের বইপত্র কিছু কিছু পড়েছি এবং স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছি। তবে পূজ্যপাদ মহারাজের সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান ও মঠ মিশনের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট এবং শুনেছি খুবই ভাল সাধু—এই পর্যন্ত। যাই হোক, মনে মনে তাঁকেই গুরুরূপে গ্রহণ করলাম। এ সুযোগ আর হারালে চলবে না।

এরপর মাঝে মধ্যে বেলুড় মঠে যাতায়াত শুরু করেছি। দু'একবার পূজ্যপাদ মহারাজজীর দর্শনলাভেরও সুযোগ হয়েছে। তাঁকে শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির সাধু বলেই আমার মনে হয়েছে। তাই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার আমার তেমন সাহসই হয়নি। দীক্ষার আবেদন জানিয়ে তাঁর প্রধান সেবক পূজনীয় ধীরেন মহারাজের (স্বামী প্রমথানন্দজী) কাছ থেকে দীক্ষার ফর্ম নিয়েছি এবং ভর্তি করে তাঁকেই পাঠিয়ে দিয়েছি। পড়াশুনা ও কাজের ঝামেলায় পড়ে বেশ কিছুদিন আর বেলুড় মঠে আসতে পারিনি। এরপর আবার টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কয়েক সপ্তাহ ভুগেছি। জ্বর তখনও ছাড়েনি, এমন সময়ে দীক্ষার দিন ধার্য করে আমার নিকট মঠের চিঠি পেঁছেছে। শরীর জ্বরাক্রান্ত ও রুগ্ন; মনে ভীষণ দুঃখ হল—হয়ত এ জীবনে আর শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় লাভ হল না! কলকাতার বাসা থেকে গ্রামের বাড়িতে টেলিগ্রাম গিয়েছিল আমার শারীরিক অসুস্থতা জানিয়ে। গর্ভধারিণী খবর পেয়ে এসেছেন আমার সেবা শুশ্রূষার জন্য, কারণ আমি কলকাতায় একাই থাকতাম। কয়েকদিন বাদে পথ্যাদি পাবার পর তিনি সঙ্গে করে আমায় গ্রামের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি তখনও বেশ দুর্বল। শরীর কিছুটা সেরে উঠলে পুনরায় দীক্ষা নেবার জন্য মন খুবই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তখন একদিন খুব অনুনয় বিনয় করে আমার শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে পূজ্যপাদ মহারাজজীকে মঠে একটি পত্র পাঠালাম। পত্রের উত্তরে তিনি আমায় সান্ত্বনা দিয়ে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হলে কলকাতায় ফিরে তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করতে নির্দেশ দিলেন। মন তখন অনেকটা শান্ত হল।

সময়মতো একদিন মঠে গিয়ে তাঁর দর্শন লাভ করে কলকাতার বাসায় ফিরলাম। কিছুদিন বাদে দীক্ষার দিন ধার্য করে তাঁর চিঠি পেলাম। মনে খুব আনন্দ। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের পরীক্ষা তখনও আমার উপর চলছে, শেষ হয়নি! হয়ত আমার ব্যাকুলতা বাড়াবার জন্য ঐ শোধনের প্রয়োজন ছিল। সেদিন ছিল ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, বৃহস্পতিবার। ভোররাত থেকে মুষলধারে বৃষ্টি, কলকাতার পথঘাট জলের তলায় ডুবে রয়েছে। যানবাহন প্রায় বন্ধ।

আমায় বেলুড় মঠে পৌঁছতে হবে সকাল আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে!

ভেবে কিছু কূল-কিনারা না পেয়ে অগত্যা শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করে পথে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে যৎসামান্য দীক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং একটি ধোয়া কাপড় যেটি বেলুড়ে গঙ্গাস্নানান্তে দীক্ষার সময় ব্যবহার করতে পারি। অধিকাংশ পথ পায়ে হেঁটে নোংরা জল পেরিয়ে খেয়া পার হয়ে কোন রকমে বেলুড়ে পৌঁছালাম। এ দুর্যোগে মঠে তখনও লোকজন আসতে পারেনি। মায়ের ঘাটে গঙ্গাস্নান করে ধোয়া কাপড়টা পরে প্রেসিডেণ্ট মহারাজের কোয়ার্টারের বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখনকার দিনে বেশী দীক্ষার্থী হত না—ঐদিন হয়ত আমরা দশ-বারো জন ছিলাম। স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত প্রত্যেকের পৃথকভাবে দীক্ষা হত। পূজ্যপাদ মহারাজজীর শয়নঘরের মেঝেতে আসনে বসে তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন। আমার জন্য তাঁর বাম পাশে রাখা পৃথক আসনে আমি বসেছিলাম। সম্মুখে কাঠের ছোট সিংহাসনে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের ছবি। পূর্বদিকে (গঙ্গার দিকে) মুখ করে আমরা উভয়ে বসেছিলাম। সেই মুহূর্তের আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার নয়। মূর্তিমান করুণার বিগ্রহ! তাঁর অপার্থিব করুণা যেন শতধারে আমার উপর ঝরে পড়ছিল। পার্থিব পিতামাতার স্নেহ যেন এর তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দীক্ষার সময় মনে হয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কত সংখ্যক জপ করতে হবে। তার উত্তরে স্নেহভরে তিনি আমায় বলেছিলেন, সংখ্যা রাখার দিকে নজর দেবার প্রয়োজন নেই; আনন্দের সহিত তাঁর নাম যতক্ষণ করতে ভাল লাগে ততক্ষণ করবে। অন্তর্যামী গুরু নিশ্চয় বুঝেছিলেন তিনি যদি আমায় দশ-বিশ হাজারবার জপ করতে নির্দেশ দিতেন তাহলে আমার পক্ষে তা সম্ভব হত না। বাস্তবিক জীবনে অনেক দিন এমন অতিবাহিত হয়েছে যেদিন খুব কম সময়ই জপ-ধ্যানে কাটাতে সমর্থ হয়েছি।

সকলের দীক্ষা হয়ে যাবার পর তাঁর শয়নঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসে তিনি আমাদের সাধারণভাবে কিছু উপদেশ দেন। তারপর আমরা সকলে তাঁকে একে একে প্রণাম করলাম। মনে আছে ঐদিন তাঁকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ইচ্ছা থাকলেও তাঁর গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে সে ভাবে প্রণাম করার আমার সাহস হয়নি; সকলের সঙ্গে সাধারণভাবে প্রণাম করে বিদায় নিতে হয়েছে। আর একটি কথা মনে পড়ছে। তাঁর প্রধান সেবক পূজনীয় ধীরেন মহারাজকে ঐদিন অনুরোধ জানিয়েছিলাম যদি পূজ্যপাদ মহারাজজীর ভুক্তাবশিষ্ট একটু প্রসাদ পেতাম, তাহলে দীক্ষার পর তা সর্বপ্রথম গ্রহণ করতাম। উত্তরে পূজনীয় ধীরেন মহারাজ জানালেন—"মহারাজজী পাতে কোনদিন কিছু ভুক্তাবশিষ্ট রাখেন না; যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত একটুও তিনি পাতে নেন না।" আমাকে মঠ বাড়িতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ

পাবার কথা তিনি জানালেন।

এরপর মাত্র দু'তিনবার পূজ্যপাদ মহারাজজীকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। একদিন সকালের দিকে মঠে এসেছি তাঁর দর্শন মানসে। এসে শুনলাম তিনি মঠের 'ট্রাস্টি মিটিং'-এ যোগদান করতে গেছেন; সেদিন ভক্তদের আর প্রণামাদি হবে না। ভারাক্রান্ত মনে তবু অপেক্ষা করছি। অবশেষে মিটিং সেরে তিনি যখন সেবকের সঙ্গে মঠ প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়ে হেঁটে কোয়ার্টারে ফিরছেন তখন পাশ থেকে তাঁকে কিছুক্ষণ দর্শনের সৌভাগ্য হল। মুখমণ্ডল প্রশান্ত ও গম্ভীর। কিন্তু এতেই আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। তাঁর সচল বিগ্রহ সে-বারই দেখেছিলাম। তারপর তাঁকে দর্শন করি পার্ক সার্কাস ময়দানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উৎসবের আলোচনা সভায়। মঞ্চে ঐ সময় আমেরিকা থেকে আগত স্বামী নিখিলানন্দজী ও স্বামী প্রভবানন্দজীকেও দেখেছিলাম ও তাঁদের ভাষণ শুনেছিলাম মনে পড়ছে। পূজ্যপাদ মহারাজজী সভাপতির ভাষণ দান করেছিলেন। তাঁর ভাষণ খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু প্রাণস্পর্শী। ঐ একবারই মাত্র তাঁর ভাষণ শোনার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তিনি বরাবরই অল্প কথায় সুন্দরভাবে গুছিয়ে তাঁর বক্তব্য রাখতেন, কখনও লম্বা বক্তৃতা দেননি বলেই সাধুদের মুখে শুনেছি। তাঁকে আমার শেষ বারের মতো দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল একদিন সন্ধ্যারতির কিছু পূর্বে বেলুড় মঠে, সম্ভবতঃ ১৯৬৪ সালের শেষার্দ্ধে। অফিস ফেরত কলকাতা থেকে হাওড়া ব্রীজ পার হয়ে বাসে বেলুড় মঠে পেঁছুতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায় সেদিন। মনে আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব নিয়ে ছুটেছি গুরু দর্শনে। শুনেছি সন্ধ্যার পরই মন্দিরে আরতি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জপে বসে যান। প্রেসিডেণ্ট মহারাজের কোয়ার্টারে পেঁছে দেখলাম জনৈক ভক্ত তাঁকে প্রণাম করে বাইরে যাচ্ছেন এবং বারান্দার দরজাও তখন বন্ধ হবার উপক্রম। মনে পড়ছে বৃদ্ধ ভক্তটি আমাকে "যান, যান; একা রয়েছেন" বলে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমি এদিক ওদিক না তাকিয়ে দৌড়ে সোজা দক্ষিণ দিকের বারান্দায় হাজির হয়ে দেখলাম পূজ্যপাদ মহারাজজী তখনও চেয়ারে বসে আছেন। কাছে সেবকেরাও কেউ নেই। এই সুযোগে আমি তাঁকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। মনের আবেগে আমার চোখে জল এসে গেছে। যখন উঠলাম তিনি আমার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন দেখলাম। আমারও মন-প্রাণ ভরে গেল। দীক্ষার দিনে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ইচ্ছা সত্বেও করতে পারিনি; আজ সেই আশা পূর্ণ হল তাঁরই কৃপায়। কিন্তু তখন মোটেই ভাবিনি যে এটাই আমার তাঁকে দর্শন ও প্রণামের শেষ সুযোগ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ঐ নীরব প্রসন্ন দৃষ্টিতে যে আশীর্বাদ ঝরে

"মিটিং সেরে তিনি যখন সেবকের সঙ্গে মঠ প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়ে হেঁটে কোয়ার্টারে ফিরছেন তখন পাশ থেকে তাঁকে কিছুক্ষণ দর্শনের সৌভাগ্য হল। মুখমণ্ডল প্রশান্ত ও গম্ভীর। কিন্তু এতেই আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। তাঁর সচল বিগ্রহ সে-বারই দেখেছিলাম।"—পৃষ্ঠা ৩১৮
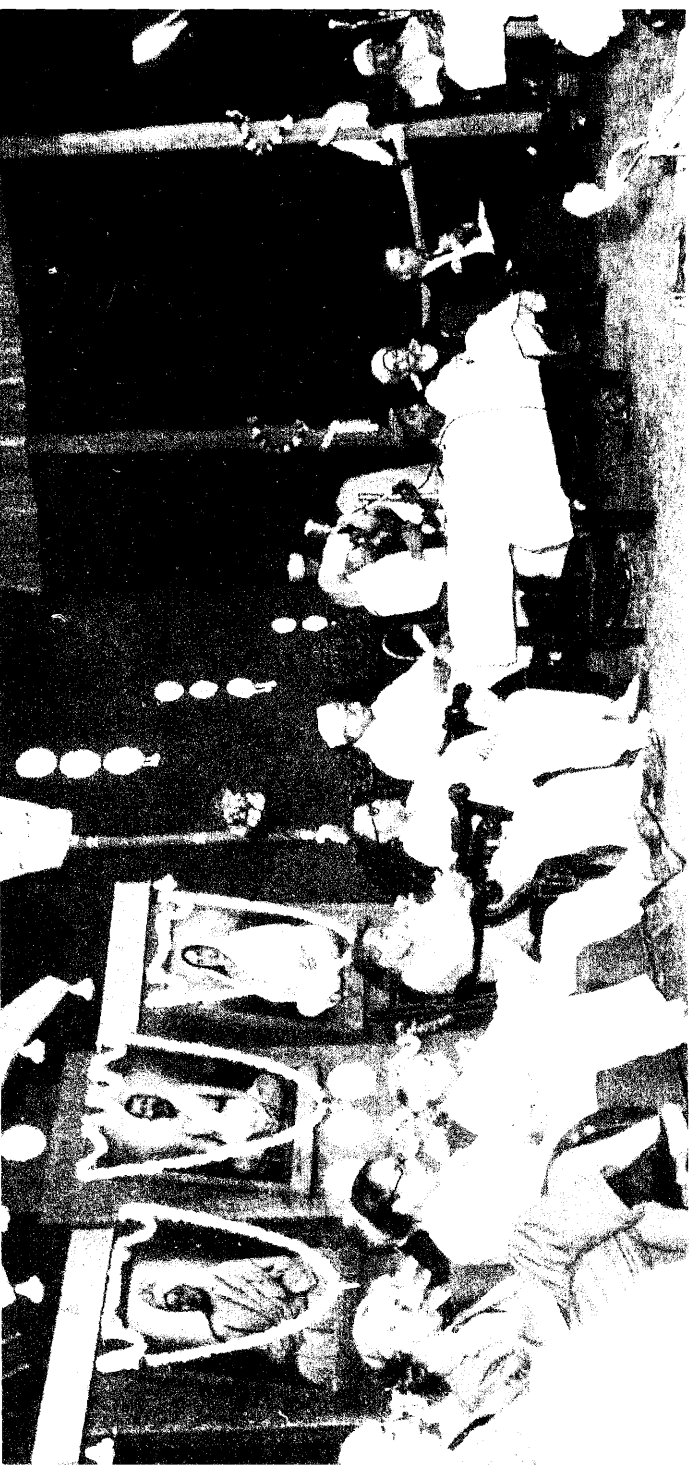
"পূজ্যপাদ মহারাজজী তখনও চেয়ারে বসে আছেন। কাছে সেবকেরাও কেউ নেই। এই সুযোগে আমি তাঁকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। ...যখন উঠলাম তিনি আমার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন দেখলাম।" —পৃষ্ঠা ৩১৮

"তারপর তাঁকে দর্শন করি পার্কসার্কাস ময়দানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উৎসবের আলোচনা সভায়। মঞ্চে ঐ সময় আমেরিকা থেকে আগত স্বামী নিখিলানন্দজী ও স্বামী প্রভবানন্দজীকেও দেখেছিলাম।"—পৃষ্ঠা ৩১৮

দক্ষিণ হইতে বামে : স্বামী মাধবানন্দ, খৃষ্টোফার ইশারউড (আমেরিকা), ম্যাডাম বুর্গি (সুইজারল্যাণ্ড), স্বামী নিখিলানন্দ (নিউইয়র্ক), স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (সেক্রেটারী, স্বামীজী শতবার্ষিকী কমিটি), স্বামী যতীশ্বরানন্দ, বিচারপতি প্রশান্ত বিহারী মুখার্জী, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী প্রভবানন্দ (হলিউড) ও জাপানের প্রতিনিধিত্রয়। পশ্চাতে জার্মানী ও চেক্ প্রতিনিধিদ্বয়।

পড়েছিল তারই ফলস্বরূপ ঐ বছরের শেষ দিকে, ২৫শে ডিসেম্বর, শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির দিনে আমার পবিত্র রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদানের সুযোগ হয়েছিল। তারপর মঠ কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে '৬৫ সালের জানুয়ারীতেই আমি আসামের [বর্তমানে মেঘালয়ের] শিলং কেন্দ্রে চলে যাই। শিলং যাত্রার পূর্বে যদিও আট-দশ দিন আমার মঠ-বাসের সুযোগ হয়েছিল, তথাপি ঐ সময়ে পূজ্যপাদ মহারাজজীকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়নি। তিনি তখন অসুস্থ হয়ে মিশনের কলকাতাস্থ সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। খুব ইচ্ছা হয়েছিল আমার সংঘে যোগদানের খবর তাঁকে জানাব এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আমার সংঘজীবনের প্রথম কর্মস্থল শিলং যাত্রা করব। কিন্তু মঠের দু'একজন সন্ন্যাসী আমায় ঐ সময় সেবা প্রতিষ্ঠানে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ আমি গেলে তাঁর অসুবিধা হতে পারে। তাঁরা বলেছিলেন তিনি সুস্থ হয়ে ফেরার পর ভবিষ্যতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনেক সুযোগ পাব। তাঁদের এই কথা শোনার পর আমার সেবা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার আর সাহস হয়নি।

যাহোক, শিলং মিশনে পৌঁছে পূজ্যপাদ মহারাজজীকে আমার সংঘে যোগদানের খবর ইত্যাদি জানিয়ে একটি পত্র দিয়েছিলাম মঠের ঠিকানায়। এ-সংবাদে তিনি খুশি হয়ে পত্রোত্তরে তাঁর আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন।

১৯৬৫ সালের দুর্গাপূজো সমাপ্ত। বিজয়া দশমীর উৎসবান্তে একাদশীর দিন সন্ধ্যারতির পর মঠ-মিশনের প্রায় সব আশ্রমেই তখন 'রাম-নাম' ভজন সংগীত চলছে। শিলং মিশনে আমিও ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাম-নাম গাইছি। সেই শুভ মুহূর্তে কলকাতার সেবা প্রতিষ্ঠানে পূজ্যপাদ মহারাজজী 'মা' নাম উচ্চারণ করতে করতে স্থূলদেহ ত্যাগ করে তাঁর চিরবাঞ্ছিত মায়ের শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান লাভ করেছেন। রাম-নাম সমাপ্তির পর এই নিদারুণ সংবাদ পেয়ে সেদিন খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম—আমার ভাগ্যে তাঁকে আর দর্শন করার সুযোগ হল না। শুনেছি মহাপূজার সময় প্রতিদিন তিনি মঠের পূজাদির খবর নিয়েছিলেন এবং দেহত্যাগের পূর্বে হাসপাতালে অশেষ রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও ধীর স্থির শান্তভাবে শায়িত অবস্থায় সমবেত অগণিত ভক্তের প্রণাম গ্রহণ করেছিলেন। চিরজীবন কর্তব্যপরায়ণ যোগী মহাপুরুষ তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তটিও এমনভাবে নির্ধারিণ করেছিলেন যাতে মঠে পূজাদি সুসম্পন্ন হয় এবং তাঁর মহাপ্রয়াণে ভক্তদের পূজার দিনের আনন্দে কোনও বিঘ্ন না ঘটে।

তিনি ধরাধাম থেকে চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন সন্ন্যাস জীবনের এমন একটি উচ্চ আদর্শ যা চিরকাল মঠ-মিশনের সাধু ব্রহ্মচারীদের এবং ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবনে অনুপ্রাণিত করবে। আমার ভাগ্যে তাঁর পূত সান্নিধ্য লাভের বেশী সুযোগ না হলেও দীর্ঘকাল (সতের বছর) বেলুড় মঠে

বাসের সুযোগে বৃদ্ধ সাধুদের মুখে তাঁর জীবনের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি অনেক ঘটনার কথা শুনেছি। তাঁর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, মিতব্যয়িতা, নিরভিমানতা, পাণ্ডিত্য, সকলের প্রতি সমবেদনা, নিয়মিত জপ-ধ্যানে গভীর অনুরাগ, সেবাকর্মে অটুট নিষ্ঠা, সরল অনাড়ম্বর সাধু জীবন যাপনে স্বাভাবিক প্রীতি—এই সকল গুণরাজির জন্য মঠ-মিশনের সাধুদের হৃদয়ে তাঁদের শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় 'নির্মল মহারাজ' রূপে তিনি চিরকাল অধিষ্ঠিত থাকবেন। অশেষ রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও অবিচলিত এই অসাধারণ কর্মযোগীকে তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্য কর্মে বা জপধ্যানে অবহেলা করতে কখনও দেখা যায়নি। নিয়মিত গঙ্গাস্নানেও তাঁর স্বাভাবিক প্রীতি ছিল।

আমেরিকায় আসার পরেও তাঁর সম্বন্ধে এখানকার সাধু ও ভক্তদের মুখে কিছু কিছু শুনেছি। বলা বাহুল্য তিনি এদেশে তিনবার এসেছিলেন। প্রথমবার (১৯২৭-২৯) তিনি আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে সানফ্রানসিস্কো বেদান্ত সোসাইটির 'মিনিষ্টার' ছিলেন। মঠ-মিশনের কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে সহকারী সম্পাদক রূপে কাজ করার জন্য তাঁকে বেলুড় মঠে ফিরে যেতে হয়। দ্বিতীয়বার এসেছিলেন ১৯৫৬ সালে হলিউড কেন্দ্র পরিচালিত 'সান্তা বারবারা' কনভেন্টের মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে। ঐ সময় পূজনীয় সূর্য মহারাজও (স্বামী নির্বাণানন্দজী) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা দুজনেই ঐসময় আমেরিকার পূর্ব উপকূলের বস্টন ও প্রভিডেন্স বেদান্ত সোসাইটিতে (লেখক বর্তমানে এখানকার কর্মী) পদার্পণ করেছিলেন। তাঁরা আশ্রমে কয়েকদিন বাস করে ভক্তদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলায় ভক্তরা খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। সোসাইটির 'চ্যাপেলে' 'সানডে সারভিস'-এ (রবিবারের প্রধান বক্তৃতায়) তিনি দুইটি সোসাইটিরই তৎকালীন 'মিনিষ্টার' স্বামী অখিলানন্দ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে তাঁকে ভক্তদের সঙ্গে পরিচয়াদি করানোর সময় যখন স্বামী অখিলানন্দ তাঁর অশেষ গুণাবলী বলতে শুরু করেন তখন তিনি তাঁকে (অখিলানন্দকে) থামিয়ে দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদানে ভক্তদের চমৎকৃত করেন। আজও তাঁরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর কথা স্মরণ করেন। বস্টনে থাকাকালীন ঘরের জানালা দিয়ে একদিন তুষারপাত দর্শন করে এবং চারিদিকের গাছপালা ও রাস্তাঘাট শুভ্র বরফের আস্তরণে ঢাকা দেখে বালকের ন্যায় তিনি কেমন উৎফুল্ল হয়েছিলেন তা এখানে এসেই শুনেছি আশ্রমের 'মিনিষ্টার' স্বামী সর্বগতানন্দজীর মুখে।

১৯৬১ সালে তিনি চিকিৎসার জন্য আর একবার আমেরিকায় আসেন। এবার তিনি প্রধানতঃ নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেণ্টারে ছিলেন। চিকিৎসার জন্য কিছুদিন নিউইয়র্কের একটি বড় হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি হতে

হয়েছিল। এই সময় একটি মজার ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে মহিলা নার্সের সেবা নিতে সঙ্কুচিত হয়ে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, সুদক্ষ বিদেশী মহিলা তাঁকে বলেন, "মহারাজ, সেবার একান্ত প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য আপনি ভুলে যান আপনি পুরুষ শরীরধারী—তাহলেই তো সমস্যা মেটে!" পূজ্যপাদ মহারাজজী তখন নীরব থেকে মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এই বিদেশী মহিলা তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, সেবাকালে মাতৃনির্ভর বালকের মতো কেমন তিনি মৌন প্রার্থনায় রত থাকতেন! নিউইয়র্কে থাকাকালীন ঐ বছরের গ্রীষ্মে তিনি সেণ্টারের 'রিট্রীট' আশ্রম থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে কয়েকমাস কাটিয়েছিলেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ তখন শ্রীমা সারদাদেবীর একটি ইংরেজী জীবনী-গ্রন্থ লিখছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনাদিতে তাঁদের দিনগুলির অনেকটা সময়ই কেটে যেত। নিউইয়র্কের ভক্তরাও তাঁর সরল নিরভিমান সাধুজীবন ও পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে দেখেছেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজীর অপূর্ব সাধুজীবন সম্বন্ধে যত পড়ি বা শুনি ততই জানার আগ্রহ আরও বাড়ে। শুধু মনে হয় তাঁর আশীর্বাদে তাঁর অশেষ সদ্‌গুণাবলীর যৎকিঞ্চিৎ যদি আমার জীবনে প্রতিফলিত হয় তা হলেই জীবন ধন্য। এখন বেশ বুঝতে পারছি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কেন তাঁর এই প্রিয় ও গুণী সন্তানটিকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন একদিন "এ যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।"

তোমারে প্রণমি আমি

স্বামী অমরানন্দ

"শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য"—তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই মন্ত্রাংশ মনে পড়ছে। এরই অনুরণন মায়ের কথায় শুনেছি—"হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।" শ্রীশ্রীমা এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন সন্তান নির্মল সম্পর্কে তাঁর মনোভাব। বৈরাগ্যবান অথচ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, বোধ করি এই কথাটি বলতে চেয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা। গিরিগুহায় গিয়ে যাঁরা সাধনোৎকর্ষ লাভ করেন, তাঁরাও নিশ্চয়ই প্রণম্য। কিন্তু অসংখ্য সমস্যার আবর্তে, মঠ প্রশাসনের তুঙ্গে থাকার বিড়ম্বনা স্বীকার করেও অন্তর্লীন আধ্যাত্মিক সুস্থিতি বজায় রাখা অনেক কঠিন; ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবকে আত্মস্থ করতে না পারলে ও বিশেষ আধার না হলে সে সিদ্ধি আসে না। পুণ্যশ্লোক স্বামী মাধবানন্দজী সেই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবনচর্যাই সে কথার প্রমাণ।

অনেক ক্ষুদ্রতর পণ্ডিতের সঙ্গে জীবনের পথে চলতে চলতে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজে বিরাট জ্ঞানের আকর হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষ মণ্ডলীতে। স্বভাবতঃই "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্"-এর প্রতিফলন তাঁদের জীবনে খোঁজা বাতুলতা। কিন্তু মাধবানন্দজী এমন এক ব্যক্তি, যিনি সারস্বত-সাধনায় জীবনের এক বিরাট অংশ ব্যয় করেও একথা সর্বদা স্মরণ রেখেছেন যে বুদ্ধির কচকচি ভজনানন্দের অনেক তলায়। তাঁর সঙ্গে একান্ত আলাপের ফলেই এই ধারণা আমার মনে সঞ্জাত হয়েছে।

উচ্চকোটির সন্ন্যাসী যাঁরা, অধ্যাত্ম-আনন্দের উদার প্রশস্ত ভূমিতে যাঁরা অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকাল বাস করতে পারেন, আমি সে দলের নই। এ জন্মে বোধ হয় শরীর-মন সেইরকম বৈশিষ্ট্য লাভ করেনি। তাই অধ্যাত্মচর্চার পাশাপাশি বুদ্ধির ক্ষেতে কিছু চাষ-বাস আমাদের করতে হয়। নইলে সাধুজীবনে গভীর পতনের সম্ভাবনা থাকে। অধ্যাত্মভূমি থেকে বিচ্যুতির পরে স্থূল ভোগের ভূমিতে আপতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এইটি করতে হয়। তাই কখনো কখনো দেখা যায় যে, সাধু জীবনের ধারা বুদ্ধির মরুতে যেন শুকিয়ে গেছে। বুদ্ধির মরু নিশ্চয়ই বেদোজ্জ্বলাপ্রজ্ঞা নয়। তুলনামূলকভাবে যখন মাধবানন্দজীর জীবনের দিকে তাকাই, তখন সেই জীবনের মহিমাকে স্বতঃই প্রণাম করতে ইচ্ছা হয়। পাশ্চাত্যের ভোগভূমিতে বাস করেও তাঁর সাধু জীবনের আদর্শ ম্লানহয়ে যায়নি।

ঠাকুর বলতেন চোদ্দ আনা মন ঈশ্বরে রাখতে। কতবার শুনেছি বোধাত্মানন্দজীর (ভব মহারাজের) মুখে: "কাজের কথা নিয়ে গেছি নির্মল মহারাজের কাছে। দু' মিনিটে ফয়সালা হয়ে গেছে। কিন্তু শাস্ত্রীয়-প্রসঙ্গ, সাধন-প্রসঙ্গ যদি কখনো উত্থাপন করেছি, আধ ঘণ্টারও বেশি কথা বলেছেন; General Secretary-র তখন অফুরন্ত সময়।" জীবনের শেষ লগ্নে তিনি যখন সংঘগুরুর পদে অভিষিক্ত তখনো কাছে থেকে দেখেছি, সন্ধ্যালগ্নে তিনি স্মরণ মনন করছেন; ঘরের বাতি নিভে গেছে।

কঠোর কর্তব্যের যখন প্রয়োজন হয়েছে, তখন আপাত-পেলব-কোমলতা দিয়ে অন্যায়ের সঙ্গে তিনি আপোষ করেননি। বিদেশের কোন কোন কেন্দ্রও সে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। ১৯৫৭ সালের শেষাশেষি থেকে চার বছর কাল রামকৃষ্ণ সংঘের একটি বিদেশস্থ কেন্দ্র সাধুবিহীন অবস্থায় কার্যতঃ একটি মহিলার কর্তৃত্বাধীনে ছিল। সেই লগ্নে মাধবানন্দজী নির্দেশ দিয়েছিলেন সংঘের কোন সন্ন্যাসী ঐ কেন্দ্রে পদার্পণ করবেন না। তাঁর সেই কঠোর শাসনের সুফল ফলেছিল। কেন্দ্রটিতে একজন সাধুর নেতৃত্ব পুনঃস্থাপিত হয়। ভারতের বহু কেন্দ্র তাঁর উদ্যত অঙ্কুশের কারণে রক্ষা পেয়েছে। বেশ কিছু কেন্দ্রের ছোট বড় ইতিবৃত্ত আমার মনে ভাসছে।

প্রয়োজনবোধে সমুন্নত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরও রাশ তাঁকে টানতে হয়েছে। আগেই বলেছি আদর্শের ক্ষেত্রে আপোষ করতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু সর্বোপরি তিনি ছিলেন সন্ন্যাসের আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাই যখন মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁকে আমেরিকায় পাঠানো হচ্ছিল সেই মুহূর্তে বহিষ্কৃত কিছু সাধুও তাঁকে দর্শনের জন্য বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়েছিলেন; কারণ তাঁরা জানতেন যে সংঘের স্বার্থে অনহংকৃতভাবেই মাধবানন্দজী তাঁদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

শুনেছি অভ্রান্তদর্শী রাজা মহারাজ মঠের ট্রাস্টি হিসাবে বিশুদ্ধানন্দজী ও মাধবানন্দজীকে মনোনয়ন করার সময় বলেছিলেন: "এমন হয়ত সম্ভব যে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কিছু করল যাতে সংঘের ক্ষতি হয়; কিন্তু এই দুজন সাধুর পক্ষে এমন কোন কাজ সম্ভব নয় যাতে সংঘ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।"

তপস্যার মূর্ত শক্তিতে তিনি সংঘকে চালিত করেছেন? অথবা বিশাল পাণ্ডিত্যের পাখায় ভর করে সংঘের নেতৃত্ব করেছেন? অথবা প্রশাসনিক দৃঢ়তায় তিনি সংঘকে পরিচালিত করেছেন? এক্ষেত্রে আমার বিচার এই যে, আমাদের সংঘের যে বিশেষ আধ্যাত্মিকতা, তাই মাধবানন্দ-কায়া ধারণ করেছিল। "বিশেষ আধ্যাত্মিকতা" বলতে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জীবনে তথা বাণীতে আপাতভাবে ত্রিধা-বিভক্ত হয়ে যে একটি পরমা দৈবীচর্যার ঐক্যের

সন্ধান আমরা পাই, সেই বস্তুটিকে আত্মস্থ করতে যত্নশীল হয়েছিলেন তিনি। সেই সাধন-সিদ্ধির বলেই তিনি বলীয়ান ছিলেন। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বা ব্যক্তিবিশেষের জন্য পরামর্শে বারংবার তারই প্রতিফলন আমরা দেখি। সংঘের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কেও তাঁর গভীর আস্থা ছিল। তদানীন্তন ভারতের একজন বিশ্ববিশ্রুত যোগী তথা মনস্বী সম্পর্কে আলোচনার কালে তিনি মন্তব্য করেছিলেনঃ "আমাদের সংঘে ঐ শ্রেণীর আধ্যাত্মিকতার অধিকারী অন্ততঃ একশো জন সাধু আছেন।" (এই মন্তব্যটিও শুনেছি বোধাত্মানন্দজীর কাছে)।

মাধবানন্দজীর মহৎ চরিত্র ও মনীষা মঠের প্রাচীন সাধুদের কাছে বিচিত্র ঘটনার আলোকে ব্যাখ্যাত হতে শুনেছি অজস্রবার। সেই সব কাহিনী যত বেশি পশ্চাদবর্তী তরুণ উদীয়মানদের কাছে কীর্তিত হয়, ততই মঙ্গল। মাধবানন্দজীকে এবং শতবর্ষ আগে যে জননী তাঁকে জঠরে ধারণ করে কৃতার্থা হয়েছিলেন, উভয়কেই আমরা প্রণাম জানাচ্ছি।

ওঁ তৎসৎ ॥

আমেরিকায় স্বামী মাধবানন্দ*

স্বামী যোগেশানন্দ

যে পরিস্থিতির মুখোমুখি তাঁকে হতে হবে সে সম্বন্ধে ভালভাবে জেনেই স্বামী মাধবানন্দজী [১৯৬১ সালের ৭ই এপ্রিল] কলকাতা থেকে নিউইয়র্ক যাত্রা করেছিলেন। সেখানে সতীর্থ-সন্ন্যাসীগণ ও ভক্তেরা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে শীঘ্রই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। সেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার পর তাঁর মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা স্থির হয়। তাঁর মস্তিষ্কের পিছন দিকে একটি টিউমার চাপ সৃষ্টি করছিল। অবশ্য টিউমারটি খুব একটা বিপজ্জনক ছিল না। মহারাজের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু স্বামী নিখিলানন্দ চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করেছিলেন এবং তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র নিউইয়র্কের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র থেকে এ ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আরও সঠিক ভাবে বলতে হলে স্বামী নিখিলানন্দ স্বামী মাধবানন্দজীকে অস্ত্রোপচারে রাজী হওয়ার জন্য দীর্ঘ অনুরোধ উপরোধের পর সংশ্লিষ্ট সবাইকে এবিষয়ে উদ্যোগী করে তুলেছিলেন। স্বামী মাধবানন্দজী সকলের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে অস্ত্রোপচারে সম্মতি জানিয়েছিলেন এবং রামকৃষ্ণ সংঘের সাধারণ সম্পাদকরূপে তাঁর দীর্ঘদিনের কার্যভার থেকে সাময়িকভাবে অবসর নিয়েছিলেন।

স্বামী নিখিলানন্দের কেন্দ্রে অল্প সংখ্যক কর্মী থাকায় তিনি সানফ্রানসিস্কো কেন্দ্রের স্বামী অশোকানন্দকে স্বামী মাধবানন্দজীর সেবার জন্য একজন ব্রহ্মচারী পাঠাতে বলেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে অশোকানন্দজী আমাকেই স্বামী মাধবানন্দজীর সেবক রূপে মনোনীত করলেন।

বিমানবন্দর থেকে আমাদের কেন্দ্রে আসার পথে আমার রীতিমতো রোমাঞ্চ লাগছিল এই ভেবে যে প্রথম অভিজ্ঞতাটি না জানি কেমন হবে যা থেকে অদূরে ভবিষ্যতে কি অপেক্ষা করছে তার আভাস পাব। আমাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না এবং অনতিবিলম্বেই পরিস্থিতি সহজ হয়ে উঠল। স্বামী নিখিলানন্দ অকস্মাৎ বললেন, "এখন থেকে এই হল আপনার সেবক, আপনার সব কিছু এই করবে।"

---

*স্বামী যোগেশানন্দ রচিত 'MORE MEMOIRS FROM AMERICA' শীর্ষক মূল ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে অনূদিত।

বাংলা অনুবাদ—নীতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বামী মাধবানন্দজী সোজাসুজি উত্তর দিলেন, "জান, ভারতে একটা কথা প্রচলিত আছে—পায়ে হাঁটা লোক ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হয়। অতএব আমারও দেখছি তাই হবে।" খুব যুতসই রসিকতা ছিল তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। আর এতেই আমাদের সমস্ত সম্পর্কের সুরটা বাঁধা হয়ে গেল।

পরের কয়েকটা দিন মহারাজ আপাতদৃষ্টিতে তেমন কিছু না করেই একেবারে শান্তভাবে কাটালেন। তাঁর এই প্রশান্ত ভাব আমার কাছে পরম বিস্ময়কর মনে হত। শাস্ত্রে বর্ণিত আদর্শের নিখুঁত প্রতিমূর্তির মতো কেমন ভাবে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর আরাম কেদারায় চুপ করে বসে থাকতেন, দেখে মনে হত পরম প্রশান্তিতে ডুবে আছেন। যদি কেউ পোষাক বদলাবার বা খাওয়ার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে চাইত, তিনি একটু মিষ্টি হেসে বলতেন, তাঁর সত্যিই কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। গোড়ার দিকের সেই দিনগুলিতে তাঁর স্বভাবের নমনীয়তা আমাদের মুগ্ধ করেছিল। [তাঁর প্রয়োজন সম্বন্ধে] তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে বা কি তাঁর পছন্দ জানতে চাইলে তিনি এমন করতেন মনে হত যেন তুচ্ছ বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে একজন শিশুর মতো মহা আনন্দে মেতে আছেন।

মহারাজ আমেরিকায় এর আগে দুবার এসেছিলেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ও স্বামী নির্বাণানন্দ সান্তা বারবারাতে মন্দির উদ্বোধন উৎসবে উপস্থিত থাকার জন্য স্বামী প্রভবানন্দের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই সফরে দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়ার কয়েকটি কেন্দ্রে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে ভারতে ফেরার পথে তাঁরা এদেশের অন্যান্য বেদান্ত কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল যে, স্বামী মাধবানন্দজী ১৯২৭ থেকে ১৯২৯—এই দু বছর সানফ্রানসিস্কো বেদান্ত সোসাইটির দায়িত্বে ছিলেন। তারপর তাঁর ভারতে ফিরে যাবার জরুরী ডাক আসে। এবারে তিনি আমেরিকায় এলেন প্রথম বারের বত্রিশ বছর পরে! এখানকার আধুনিক পরিবেশ ও নতুন দিনের গতিপ্রকৃতি মহারাজের চোখে যা ধরা পড়েছিল তা তাঁর মনে অবিরাম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলেছিল। এটা বুঝতে হলে সেসময় ভারতে পরিবর্তনের শ্লথ গতির কথা চিন্তা করতে হবে।

কৃচ্ছ্রতাপ্রিয়, কঠোর ও গম্ভীর প্রকৃতির সাধকরূপে মহারাজের খ্যাতির কথা আমার আগেই জানা ছিল। কিন্তু তাঁর প্রতি সংঘের সকলের, এমনকি প্রাচীন মহারাজদেরও যেরকম সমীহের ভাব ছিল সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। এটাও আমি জানতাম না যে আমাদের কোন কোন সাধু তাঁকে একরকম ভয়ই করতেন। আমার এই অজ্ঞতাই ছিল আমার পরিত্রাণের কারণ। তাঁর সম্বন্ধে আমার কোন ভয় ছিল না। আমি তাই একজন পেশাদার শুশ্রূষাকারী যেমন করে থাকে তাঁর সঙ্গে প্রায় সেরকমই ব্যবহার করতাম।

তিনিও তা সম্পূর্ণ বুঝতেন।

তাঁর অস্ত্রোপচারে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা সময় লেগেছিল। অস্ত্রোপচারের পর যখন তিনি আবার কথা বলতে পারলেন, তখন তিনি তাঁর আরোগ্য কক্ষটির বর্ণনা দিলেন—একটি শীতল শূন্যস্থান যেখান থেকে তাঁর মনে হয়েছিল হয়ত আর কোনদিনই বেরুতে পারবেন না! তিনি বলেছিলেন, "নরক সম্বন্ধে প্রচলিত সনাতন ভারতীয় বর্ণনার সঙ্গে ঘরটির বেশ মিল ছিল।" কয়েকদিনের মধ্যে তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠলেন। এবার এল একজন শয্যাশায়ী রোগীর মানসিকতা থেকে সচল কর্মক্ষম মানুষের মানসিকতায় অভ্যস্ত হওয়ার পালা—যা তাঁর আমেরিকাবাসের বাকী দিনগুলি এবং বস্তুতপক্ষে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলির জন্য তাঁকে আয়ত্ত করতে হয়েছিল।

মহারাজের দৈহিক ভারসাম্যবোধ খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত না করে তাঁর টিউমারটি অপসারণ করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে মহারাজকে পুনরায় হাঁটা 'শিখতে' হয়েছিল। চিকিৎসকরা তাঁর অন্যতম প্রাথমিক ব্যায়াম নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন একটা খালি হুইল চেয়ারকে দৈনিক তিনবার টানা বারান্দার মধ্য দিয়ে ঠেলে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রথমে তিনি তা মোটেই করতে চাননি। কিন্তু কি সাহসীই না তিনি ছিলেন! স্বামী মাধবানন্দজীর মতো প্রকৃতির মানুষ, যিনি প্রায় পঞ্চাশ বছরের সাধু-জীবন অতিবাহিত করেছেন—তাঁর পক্ষে আমেরিকার একটা বড় হাসপাতালের টানা বারান্দা খুব একটা উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। চারিদিকে মহিলারা আছেন, কর্মব্যস্ত সেবিকারা চলাফেরা করছেন, দর্শনার্থীরা কৌতুহলী হয়ে একদৃষ্টিতে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে ভাবছেন—ইনি কে, কোন জাতির লোক, হুইল চেয়ার খালিই বা কেন—আর তিনি হলঘরের মধ্য দিয়ে খালি হুইল চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে চলেছেন, পরনে হাসপাতালের গাউন ও পায়ে চপ্পল। যিনি তাঁকে এগুলো করবার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর কতই না খারাপ লেগেছে। কিন্তু তিনি জানতেন যে এটা করা প্রয়োজন এবং তিনি তাঁর এই ট্রেনিং-এর নাম দিয়েছিলেন, 'মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া'।

শেষ পর্যন্ত মহারাজ স্বাভাবিক চলাফেরার ক্ষমতা ফিরে পেলেন, অবশ্যই তা যথেষ্ট অভ্যাসের ফলে। 'থেরাপি'-র ঘরে প্রথম দিন সকালে তাঁর থেরাপিষ্ট মিঃ ব্রাউন তাঁকে বলেছিলেন দুই হাতে কাঁধ বরাবর উঁচু প্যারালেল বার ধরে হাঁটা অভ্যাস করতে। থেরাপিষ্ট বলতেন, "না মহারাজ, ডান হাত বাঁ পা। না না…ওটা ভুল হাতে ধরেছেন।" তারপর অমায়িক হেসে বলতেন, "আপনি খুব দৃঢ়চিত্ত, তাই না? এবার বিশ্রাম করুন।" আমার কাছে এসে থেরাপিষ্ট ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি কি তাঁর সংঘের সর্বপ্রধান ব্যক্তি?" হেসে আমি উত্তর দিলাম, "সেইরকমই অনেকটা। গত তিরিশ বছর ধরে ইনি

আদেশ দিয়ে আসছেন। আপনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন।" মিঃ ব্রাউন বললেন, "এতে আমার খুবই অস্বস্তি হচ্ছে…কিন্তু আমি…আমাকে তো এটা করতেই হবে।" আমি উত্তর দিলাম, "নিশ্চয়ই।" তাঁর চিকিৎসা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সর্বদাই আমরা এটা লক্ষ্য করেছিলাম যে যদিও মহারাজ [অসুস্থতার কারণে] অল্পবিস্তর অসহায় অবস্থায় পড়তেন, তবুও অন্যেরা তাঁর তেজস্বিতা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব না করে পারতেন না।

প্রথাগত ধর্মীয় অনুশীলনের ব্যাপারে হাসপাতালে মহারাজের মনোভাব দুর্বোধ্য ছিল। তিনি জপের মালা কখনও ব্যবহার করতেন না যদিও তা তাঁর পাশেই রাখা থাকত। তিনি তাঁর ধর্মগ্রন্থগুলি পড়তেন না, বা কাউকে পড়ে শোনাতেও বলতেন না। তাঁর জপধ্যান না করার বিষয়ে কেউ মন্তব্য করলে উত্তর পেতেন, "হাসপাতালের আবহাওয়া বোধহয় এসবের উপযোগী নয়। এ ব্যাপারে লোকদেখানো কিছু না করাই ভাল"—যা তিনি কখনও করতেন না। তখন থেকে আমি বুঝতে শুরু করলাম যে, সর্বত্র সাধারণভাবে থাকা এবং নিজেকে জাহির না করার বিষয়ে তিনি কত সতর্ক ছিলেন। আমরা সকলে এও বুঝতে পারলাম, হাসপাতাল থেকে তাঁর ছুটি তাঁর মনের উপর চমৎকার কাজ করবে।

একদিন থেরাপির সময় স্বামী নিখিলানন্দ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ মাধবানন্দজী মহারাজকে বললেন, "জানেন, আমি কাল রাতে বাড়ি গিয়ে এই ব্যায়ামগুলো করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারলামই না করতে, কিছুতেই পারলাম না। আপনি কি করে করছেন ?" তারপর থেরাপিস্টকে বললেন, "শীঘ্রই আপনি এঁকে 'বার্নাম ও বেইলী'র জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে দেখবেন !" স্বামী মাধবানন্দজী একবার আমাকে বলেছিলেন, বহু বছর ধরে তিনি হাঁটার সময় হাত না দোলাতে সর্বদা চেষ্টা করতেন। কিন্তু এখন তাঁকে তাই করতে হচ্ছে। মহারাজ এদেশে যতদিন ছিলেন এইভাবে সমস্ত ব্যাপারেই তাঁর নিজের অভ্যাস ও চিন্তাধারা পাল্টে অন্যেরা তাঁকে যা করতে বলতেন তাই করতেন। এ একটা দেখার মতো বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহান শিষ্যদের মধ্যে যাঁদের তিনি দেখেছিলেন, তাঁদের কথা আমি অনেক সময় জিজ্ঞাসা করতাম। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি ছোট ঘটনা ছাড়া এবিষয়ে আর খুব কমই তিনি আমায় বলেছেন। আসলে ধরাবাঁধা নিয়মের অনুসারী হয়ে আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে চাইতেন না। তাঁর পবিত্রতা ছিল অন্য ধরনের—যা বলা যেতে পারে, একজন দেবশিশুর মধুর নমনীয়তার সঙ্গে আদর্শগত বিষয়ে আপোষে অনিচ্ছুক কোন ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয় সংযুক্ত হয়ে এই পবিত্রতা স্বতঃপ্রকাশিত হত। তিনি যখন কিছু বলতেন তখন ভারতীয় প্রথা-প্রকরণ, বিভিন্ন জাতি, ভাষাসমূহ, সংস্কৃত সাহিত্য,
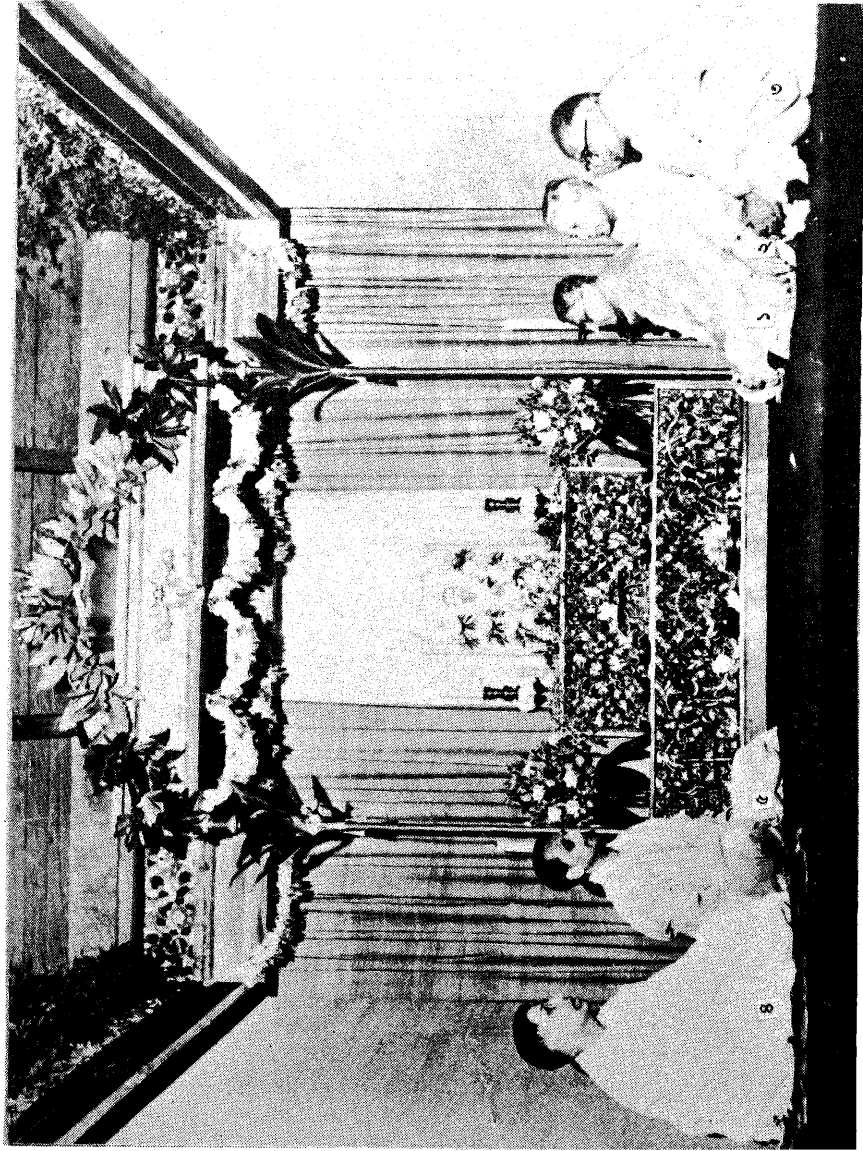
"১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি [স্বামী মাধবানন্দ] ও স্বামী নির্বাণানন্দ সান্তা বারবারাতে মন্দির উদ্বোধন উৎসবে ...অংশগ্রহণ করেছিলেন।"—পৃষ্ঠা ৩২৬

১। স্বামী মাধবানন্দ, ২। স্বামী প্রভবানন্দ, ৩। স্বামী নির্বাণানন্দ, ৪। স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও ৫। স্বামী বন্দনানন্দ—সান্তা বারবারা বেদান্ত মন্দিরে গৃহীত চিত্র।
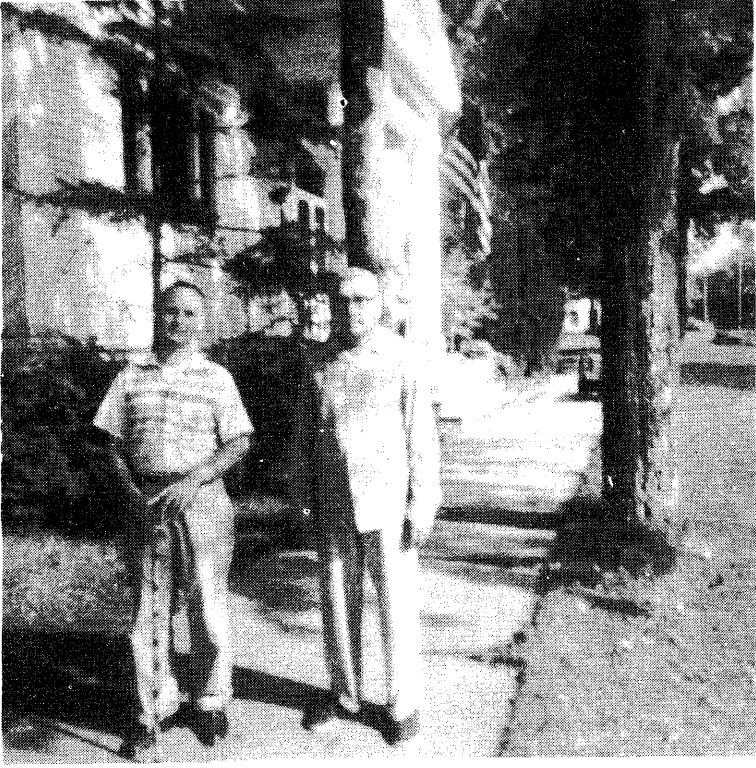
"শেষ পর্যন্ত তিনি ছড়ি ব্যবহার করা একেবারেই ছেড়ে দিলেন এবং যদি তাঁর দরকার হয় এই ভেবে স্বামী নিখিলানন্দের নির্দেশমতো আমিই তাঁর ছড়ি আমার সঙ্গে রাখতাম। সবাই আমাকে দেখে অবাক হত যে একজন যুবক কেন ছড়ি নিয়ে হাঁটছে।" —পৃষ্ঠা ৩২৯

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সহস্র দ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) গ্রামের লাইব্রেরীর সম্মুখে গৃহীত চিত্র।

রাজনীতি, সমাজের মহান ব্যক্তিগণ, তাঁদের চারিত্রিক দোষ-গুণ এবং খবরের কাগজের প্রতিবেদনের মতো সাধারণ বিষয়াদি নিয়েই বলতেন। তিনি কখনও 'প্রচার' করতেন না। আমার মনেই পড়ে না যে তিনি কখনও আমায় তাঁকে আধ্যাত্মিক গুরুর আসনে বসাতে দিয়েছেন।

মহারাজের ঘরের ঠিক পাশেই আমার শোবার ঘর ছিল। আমি খুব হাল্কা ভাবে ঘুমাবার চেষ্টা করতাম, যাতে তাঁর কিছু প্রয়োজন হলে তাঁর কথা শুনতে পাই। আমরা তাঁকে একটা ছোট ঘণ্টা দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি তা কখনও বাজাতেন না এবং আমাকে ডাকতেনও না। তিনি এত বিবেচনা-পরায়ণ ছিলেন যে রাত্রে ওঠার সময় আলো জ্বালার জন্য আমাকে না জাগিয়ে কি করে নিজেই এগুতে পারেন তার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

স্বামী মাধবানন্দজীর সহস্র দ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) অবস্থানের কাহিনী অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। সেখানে যে পাহাড়ে মিস্ ডাচারের কুটির ছিল, তারই পাদদেশে 'বেদান্ত কুটিরে' মহারাজের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমার ঘরটা তাঁর ঘরের মুখোমুখি ছিল, মধ্যে ছিল হলঘরে যাবার সরু পথ। রাত্রিতে আমরা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ার একটু পরেই একটা বড় স্টীমার অন্ধকারের মধ্যে অর্গান পাইপের মতো গম্ভীর অনুনাদী ভোঁ শব্দ তুলে সেণ্ট লরেন্স নদীর উপর দিয়ে চলে যেত। মহারাজ তখন ঘুমের অপেক্ষায় থাকতেন আর বলে উঠতেন, "হুম! ঐ সেই বড় জাহাজটা যাচ্ছে!" মনে হত যেন ছোট এক শিশু কথা বলছে।

সারাদিনের মধ্যে তাঁর বেড়ানোই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল, কারণ সে সময়েই তিনি কথা বলার উৎসাহ পেতেন। যা দেখতেন সে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করতেন—মানুষ, মৌলিক নীতি, ধর্মশাস্ত্রের অনুচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এসময়ে জানা যেত। স্বামী মাধবানন্দজী প্রায় আক্ষরিক অর্থেই রক্ষণশীল ছিলেন এবং ভিক্টোরিও যুগের ভারতে জন্মগ্রহণকারী একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভাব সব সময় তাঁর মধ্যে থাকত। তিনি মনে মনে দেড় মাইল দূরত্ব কতটা হবে স্থির করে নিতেন এবং অন্যেরা তাঁর হিসাব নিয়ে তর্ক করলেও, ঠিক ততটাই আমাদের হাঁটতে হত। গ্রামের মধ্য দিয়ে জাহাজ-ঘাটের দিকে যাবার সময় তিনি কষ্ট করে হেঁটে যেতেন। গ্রামের কুটিরে অবকাশ যাপন-কারীদের কাছে সেটি ছিল একটি পরিচিত দৃশ্য। শেষ পর্যন্ত তিনি ছড়ি ব্যবহার করা একেবারেই ছেড়ে দিলেন এবং যদি তাঁর দরকার হয় এই ভেবে স্বামী নিখিলানন্দের নির্দেশমতো আমিই তাঁর ছড়ি আমার সঙ্গে রাখতাম। সবাই আমাকে দেখে অবাক হত যে একজন যুবক কেন ছড়ি নিয়ে হাঁটছে। গ্রামের লাইব্রেরীর বাইরে একটা বেঞ্চি ছিল। সেই জায়গাটাকে আমাদের ভ্রমণপথের অর্ধেক ধরে নিয়ে সেখানে আমরা পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য থামতাম।

প্রায়দিনই সে সময় মহারাজ কথা বলার মেজাজে থাকতেন। তিনি প্রশ্ন করতেন, —"মাঠে বাচ্চারা কি খেলা খেলছে" অথবা "নদীতে এখন কি কোনও জাহাজ দেখা যাবে?" ইত্যাদি।

আমি ও অন্যান্য যারা তাঁর সঙ্গে বেড়াতাম, মাঝে মাঝে সাহস করে নতুন পথের কথা বলতাম। ভাবতাম হয়ত তাঁর মনও আমাদের মতো বৈচিত্র্য চায়। কিন্তু তাঁর এবিষয়ে কোন আগ্রহ ছিল না। শুধু গ্রীষ্মাবকাশের শেষের দিকে একদিন তিনি আমার কাঁধ ধরে বাঁ দিকে ঘোরালেন। তারপর থেকে কিছুদিন আমরা পার্কের অপরার্ধ দিয়ে ঘুরে যেতাম। এই পথে একটা বেঞ্চি বেশ সুন্দরভাবে রাখা ছিল যেখানে বসে মূল ভূখণ্ড, নদীটি এবং ছোট ছোট দ্বীপ-গুলির অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। সেখানে গিয়ে বসবার এবং বিশ্রাম নেবার জন্য বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও মহারাজ সেখানে যেতে চাইতেন না। কয়েকদিন পর আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে আমি আসল কারণ আবিষ্কার করলাম: পারতপক্ষে ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে নেই। তিনি আমাকে এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দিলেন। বললেন, "জান, ঘাস জীবন্ত···, তুমি কি পার্কে 'ঘাস এড়িয়ে চলুন' —এই বিজ্ঞপ্তি দেখনি?" আমি বলতে চাইলাম, এই নির্দেশ সাধারণতঃ নতুন বাগিচার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যতক্ষণ না সেখানকার কচি ঘাসগুলো বেড়ে ওঠে। কিন্তু তিনি তা মানতে চাইলেন না। অতএব আমরা ঘাস ও বেঞ্চি দুটোকেই এড়িয়ে চলতাম।

গ্রীষ্ম শেষ হল, তিনিও বেশ ভাল হয়ে উঠলেন। আমরাও অধিকতর প্রফুল্লচিত্তে শহরে ফিরে এলাম। তিনি একটু-আধটু আমার পিছনে লাগতেন। সে-সময় ডাক্তাররা তাঁকে সিঁড়িতে একটা ব্যায়াম করতে বলেছিলেন। তিনি বলতেন, "ঠিক আছে, এবার তুমি গুনতে আরম্ভ কর।" কিন্তু আমি বারো বা সেরকম কিছু গোনার আগেই তিনি বলে উঠতেন, "না, না তুমি গুনতে ভুল করেছ। তুমি আমাকে দিয়ে বেশী করে করাচ্ছ।" আমি বলতাম, "মহারাজ, মনে হয় আমার ভুল হয়নি। বারো পর্যন্ত গুনতে সাধারণতঃ আমার অসুবিধা হয় না।" পরের দিন তিনি আবার চেষ্টা করতেন যাতে পরিশ্রমটা কমানো যায়। ব্যায়ামের মাঝখানেই তিনি জোরে হাততালি দিয়ে হেসে উঠতেন, "আঃ! তুমি আবার ভুল করেছ, দু'বার করে চার গুনলে" —ইত্যাদি। যদিও তা অসম্ভবই ছিল। আমাকে এইভাবে 'প্রশংসা' করার অর্থ আমি বুঝতাম। তিনি আমার সঙ্গে মজা করে এবং আমাকে খেপিয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ দিতেন, যা তিনি সাধারণতঃ শুধু তাঁর প্রিয় বন্ধু তথা আতিথ্যদাতা [স্বামী নিখিলানন্দের] সঙ্গেই করতেন।

এবার আমরা এক সমস্যাপূর্ণ সন্ধিক্ষণে ও বেশ কিছুটা চাপের মধ্যে এসে

পড়লাম। স্বামী মাধবানন্দজীকে তাঁর দাঁত ও চোখের চিকিৎসাও এদেশে করিয়ে নেওয়ার জন্য চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাঁর জন্য আরও অর্থব্যয় করা হোক বা তাঁর "এই তুচ্ছ শরীরটাকে" ঠিক করার জন্য আরও কিছু করা হোক—এ ব্যাপারে মহারাজের তীব্র বিতৃষ্ণা ছিল। তিনি বলতেন, "যতই হোক আমি যখন খেতে পারছি, দেখতেও পারছি তখন আরও কয়েকটা বছর অপেক্ষা করে দেখা যাক না। ভারতের ডাক্তাররাও তো সব সময়েই ছানি অপারেশন করে থাকেন…।" এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চলত।

এই সময়ে আমরা এখান থেকে একটা ব্লক পার হয়ে বিখ্যাত সেণ্ট্রাল পার্কে বেড়াতে যেতাম। এখানেই যেন মহারাজকে আমি ঠিক ঠিক বুঝতে শুরু করলাম। অবশ্য এ নয় যে মহারাজ তাঁর অন্তরস্থ ভাবনা-চিন্তাগুলো আমাকে বলতে আরম্ভ করলেন—যা তিনি আমার কাছে কদাচিৎ করেছিলেন। কিন্তু কে যেন বলেছিলেন যে, ছোটখাট ব্যাপারে আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই মহাপুরুষদের চেনা যায়। আর এই সব সাধারণ বিষয়ে মহারাজও খুব সতর্ক থাকতেন। রাস্তায় যখন আমরা আমাদের দিকে আগত কোন ব্যক্তির মুখোমুখি হতাম, মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে গতিপথ পাল্টে ডান দিকে সরে যেতেন। এমনকি কোন কোন সময়ে এরকম ভাবে সরে যাওয়াটা না সরার চেয়ে বেশী দৃষ্টিকটু লাগলেও তার অন্যথা হত না। তিনি ব্যাখ্যা করে বলতেন, "এটাই পথ চলার নিয়ম। এদেশে ডান দিকে যেতে হয়, ভারতে বাঁ দিকে।" তারপর আমি জানতে পেরেছিলাম যে বিশের দশকে সানফ্রানসিস্কোতে বেদান্ত সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান থাকার সময় জনৈক ভক্ত মহারাজকে একটি গাড়ি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন এবং তিনি তা শহরের মধ্যে চালাতেও শিখেছিলেন। সেণ্ট্রাল পার্কে নির্দিষ্ট চলনপথ ছাড়া তিনি কখনও হাঁটতেন না। যান-চলাচল নিয়ন্ত্রক আলো সম্বন্ধে তিনি সমানভাবে সতর্ক ছিলেন। সবুজ আলো দেখার এক মুহূর্ত আগে চলা শুরু করা অথবা এক মুহূর্ত দেরী করার প্রশ্নই উঠত না।

শীত পড়ে গেল। আমরা যখন বেড়াতাম তখন ঠাণ্ডা বাতাস বাড়িগুলোর চারিপাশে যেন কশাঘাত করত, আর আমাদের সারা শরীরের ভেতর দিয়ে কাঁপুনি ধরানো শৈত্যপ্রবাহ বহে যেত। স্বামী নিখিলানন্দ তাঁর অতিথির স্বাস্থ্যের জন্য সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকতেন, এবং জোর করতেন আমরা যেন সঙ্গে ওভারকোট, স্কার্ফ ও দস্তানা নিয়ে যাই। স্বামী মাধবানন্দজী এসব কিছুই নিতেন না। সবেতেই আপত্তি জানিয়ে তিনি বলতেন, "কোন প্রয়োজন নেই।" সাধারণতঃ এই ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্বের একটা আপোষে নিষ্পত্তি হত। আমরা ঐ জিনিষগুলো সঙ্গে নিতাম এবং আমি সেগুলো বহন করতাম। সম্ভবতঃ মহারাজের একটা 'খ্যাতি' ছিল যে তিনি কোনরকম অনুরোধ বা পরামর্শের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এও দেখতাম যে যদি তিনি ভাবতেন নতুন

প্রস্তাবটি বেশ উপযুক্ত বা তার পিছনে ভাল যুক্তি আছে অথবা যদি তিনি মনে করতেন যে আপনার প্রয়োজনীয় কোন ব্যাপারে তা হয়ত সত্যিই আপনার পক্ষে অধিক মঙ্গলজনক হবে তাহলে তিনি অত্যন্ত বাধ্য শিশুর মতো তাতে রাজী হয়ে যেতেন। তাঁর এই ছবিই আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র অন্যের ধারণা যে ওভারকোট পরে তাঁর আরাম হবে—এই কারণে অনুরোধ রক্ষা করা ? না, কখনই নয়।

মহারাজ ভাষা সম্বন্ধে খুব আগ্রহী ছিলেন। ভাষার ব্যবহার, উচ্চারণ, শব্দের বানান এবং এই ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা এক সময়ে তাঁর মনকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। সেণ্ট্রাল পার্কের ধারে ধারে লাগানো বিজ্ঞপ্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল, গৃহপালিত পশুর মালিকদের জন্য একটি সতর্কবাণী : "Curb your dog (আপনার কুকুরকে আটকে রাখুন)।" মহারাজ নিশ্চিত ছিলেন যে সোজা কথায় এর অর্থ হল, "আপনার কুকুরকে সামলে রাখুন।" কিন্তু আমেরিকায় বিশেষ্য পদকে অনেক সময় ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাই তিনি শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন যে এর মানে হতে পারে, "Take your dog to the curb (আপনার কুকুরকে আটকে রাখার জায়গায় [খোঁয়াড়ে] নিয়ে যান)।"

এই সময় ডাক্তার আর ডেণ্টিষ্টদের কাছে আমরা অনন্তকাল কাটাতাম বলে মনে হত। একবার এক ডাক্তারের কাছে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর মহারাজ বললেন, "আমরা যারা বরিষ্ঠ অবতার পুরুষ ও তাঁর পার্ষদদের পরম্পরাসূত্রে এসেছি, তাদেরই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে একবার ভাব সাধারণ লোকের ভাগ্যে কি হবে।" তাঁর এই মন্তব্য আমাকে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক দিয়েছিল।

আমরা মহারাজের ঘরে একটি দূরদর্শন যন্ত্র বসিয়েছিলাম এই আশায় যে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট অরুচিকর পথ্য খাওয়ার এবং 'আরও খরচ ও ঝামেলা না বাড়িয়ে' ভারতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে গভীর চিন্তা থেকে তাঁর মনকে একটু অন্যমুখী করা যাবে। স্বামী নিখিলানন্দ ঠিকই ভেবেছিলেন যে দূরদর্শন এবিষয়ে সাহায্য করবে। স্বামী মাধবানন্দজী দূরদর্শনের প্রযুক্তি বিদ্যা, গঠন-কৌশল ও আশ্চর্য-ক্রিয়ায় খুবই উৎসুক হয়ে পড়েছিলেন। এই যন্ত্রটির একটি রিমোট-কণ্ট্রোল সুইচ হাতে নিয়ে তিনি আরাম কেদারায় বসে থাকতেন। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে ডাকতেন ঘরে এসে তাঁর সঙ্গে টিভি দেখতে। কিন্তু কোন অনুষ্ঠান দেখার চেয়ে চ্যানেল বদলানোর ঝোঁকই তাঁর বেশী ছিল। তাই দ্রুত পরিবর্তিত কতকগুলি দৃশ্য ছাড়া আর কোন কিছুই একটানা আমরা দেখতে পেতাম না। কিছুদিন বাদে তিনি আমেরিকার দূরদর্শনের উপরে তাঁর নিজের চূড়ান্ত মতামত দিয়ে দিলেন—"প্রযুক্তি-কৌশল অপূর্ব, কিন্তু বিষয়বস্তু অকিঞ্চিৎকর।" এই সময়টাতে তাঁর চোখের বিশেষ পরিচর্যা চলছিল। তাই

তাঁর পক্ষে বই পড়ার চাইতে টেলিভিসন দেখা সহজ ছিল। তিনি টেলিভিসনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জীবজন্তু, সার্কাস এবং ব্যালেনৃত্য দেখতে ভালবাসতেন। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম যে তাঁর নিজের শরীরের দুর্বল ভারসাম্যবোধই কি তাঁর এই ভাললাগার আংশিক কারণ। শরীরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এরকম অঙ্গবিন্যাস ও নৃত্যভঙ্গিমা প্রদর্শনের উপযোগী করা যায় ভেবে তিনি কি বিস্মিত হতেন ?

চোখের ছানি অপারেশনের পর একটা সময় এল যখন মহারাজকে অন্যের চোখের উপর নির্ভর করতে হত। সকালবেলায় আমি তাঁকে দৈনিক সংবাদপত্র থেকে পড়ে শোনাতাম। তিনি কদাচিৎ বিস্তারিত খবর জানতে চাইতেন, প্রায়ই শুধু সংবাদ-শিরোনামগুলি পড়ে শোনালেই যথেষ্ট হত। অন্য সময় তাঁর প্রিয় পত্রিকা ছিল 'রিডার্স ডাইজেস্ট'। প্রথমে প্রবন্ধের নামকরণ দেখে যেটা তাঁর সবচেয়ে মনোমতো হত সেটাকে আগে বাছতেন। কখনও কখনও আমরা পুরো সংখ্যাটাই শেষ করে ফেলতাম। যদিও শেষের দিকের কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে তিনি হয়ত বেশী একাত্ম হতে পারতেন না। 'রিডার্স ডাইজেস্ট'-এর প্রতিটি মজার টিপ্পনী মহারাজ শুনতে চাইতেন, সে বাগ্‌ধারাগুলি (idioms) তাঁর জানা থাক বা নাই থাক। করুণ কাহিনীগুলি শুনে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হতেন। যেমন [সে সময়ে] সদ্য ঘটে যাওয়া 'Deg Hammerskold'-এর জীবনের দুঃখজনক পরিণতির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। পত্রিকাটিতে কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি প্রকাশিত হয়েছিল যা 'Hammerskold'-এর পরিবার থেকে পাওয়া বাইবেল গ্রন্থে উদ্ধৃতিরূপে ছিল। "এ জগতে প্রত্যেক মানুষ যখন কাঁদতে কাঁদতে আসে, তখন এখানকার অন্যেরা হাসে। মানুষের সে রকম জীবনই যাপন করা উচিত যাতে যখন সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে তখন সে হাসতে হাসতে যাবে কিন্তু অন্যেরা কাঁদতে থাকবে।"

আমি মহারাজকে বললাম, "এই ভাবটা ভারতীয়।" মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, তুলসীদাস থেকে এটা নেওয়া হয়েছে।" আমি সখেদে বললাম, "প্রাচ্য আকর গ্রন্থের সূত্র উল্লেখ না করার ব্যাপারে পাশ্চাত্যের প্রকাশকদের মধ্যে কি অদ্ভুত মিল দেখতে পাওয়া যায়।" মহারাজের প্রতিক্রিয়া হল—"তাতে কিছু এসে যায় না।"

পত্রিকায় বাইবেল সম্বন্ধেই একটি লেখা ছিল। সেটা শুনে মহারাজ মতামত দিলেন—"নতুন ইংরেজী অনুবাদগুলি অনেক কিছুই আরো পরিষ্কার করে দিয়েছে, বিশেষ করে ছোটখাট জিনিষগুলি। কিন্তু অধ্যায়গুলিকে একেবারেই টুকরো টুকরো করে ফেলেছে, এগুলিই আমরা কষ্ট করে মুখস্থ করেছিলাম।"

যেসব কাহিনীতে কোনও সাফল্যের বর্ণনা থাকত সেগুলি মহারাজের প্রিয় ছিল। হেনরি ফোর্ডের সয়াবীনকে নানাভাবে কাজে লাগানোর বিষয়ে অথবা

কানাডার জাতিগঠনকারী জন আলেকজাণ্ডার ম্যাকডোনাল্ডের সম্বন্ধে আমরা পড়েছিলাম। দু'জনেরই প্রসঙ্গ মহারাজের ভাল লেগেছিল। কখনও কখনও তিনি বয়োকনিষ্ঠ সাধুদের বাংলা কথামৃত থেকে পড়ে শোনাতে বলতেন। আমার মনে হত তাঁর সামনে যা কিছু হয়ে চলেছে—'আধ্যাত্মিক' অথবা 'লৌকিক'—সব কিছুর মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করছেন। একটা বইয়ের ক্রোড়পত্রে একটা সত্য ঘটনামূলক গল্প ছিল সিংহী এলসা সম্বন্ধে। আফ্রিকানিবাসী এ্যাডামসন দম্পতি এলসাকে সন্তানের মতো পালন করে বড় করে তুলেছিলেন। এই মনোগ্রাহী গল্পটি এমন চিত্রার্পিতরূপে বর্ণিত হয়েছিল যে এটা শুনে মহারাজ কতখানি অভিভূত হয়েছিলেন তা পরিষ্কার বোঝা যেত।

আর একটি ছিল 'উত্তর আমেরিকার শেষ বন্য আদিম মানুষ (Wild Indian)' ঈশির জীবনকাহিনী। মধ্য কালিফোর্নিয়ার একজন আদিম মানুষ (Yana Indian) ঈশিকে অজ্ঞ লোকেরা ঘৃণ্যভাবে বন্দী করেছিল। পরবর্তীকালে একজন দয়ালু ও সমঝদার নৃতত্ত্ববিদের হাতে তার মুক্তিলাভের মধ্য দিয়েই দেশের সামাজিক ইতিহাসের কালানুক্রমিক লিখিত বিবরণের সূচনা হয়। সেই নৃতত্ত্ববিদ্ ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের প্রতিপাল্য হিসাবে ঈশির জীবনের জন্য আন্তরিক যত্ন নেওয়া হয়। এরপর ঈশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে অনেক বছর বেঁচে ছিল এবং সুখী জীবন-যাপন করেছিল। সে শুধু যে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের নানাপ্রকার দক্ষতা এবং শিল্প-নৈপুণ্যকে স্বচ্ছন্দে তুলে ধরেছিল তাই নয় সেইসঙ্গে সেইসব জনগোষ্ঠীর প্রশংসনীয় আচার-ব্যবহার ও জীবনদর্শনেরও সাবলীল প্রকাশ ঘটিয়েছিল। সহমর্মিতার যে সম্পর্ক ঈশি গড়ে তুলেছিল তাতে তার চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল সেইসঙ্গে তার সরল আনন্দময়তা এবং সাদাসিধে জীবন ছিল অসাধারণ। এই [আমেরিকা] মহাদেশের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে ভারতীয়দের একটা চরিত্রগত নৈকট্য এতে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। মহারাজ এই কাহিনীর একটি কথাও বাদ দিতেন না। তিনি পরে আমায় বলেছিলেন, এই আখ্যান তাঁর অত্যন্ত অনুপ্রেরণামূলক মনে হয়েছিল। "সিংহীর গল্পের চাইতে অনেক ভাল"—তিনি বলেছিলেন। তাঁর মতে ঈশি একজন "প্রকৃত মানুষ" ছিল।

কয়েক বছর বাদে আমি কালিফোর্নিয়ার আর একটি মিউজিয়াম দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। তখন দেখেছিলাম একটা পুরো ঘর শুধু ঈশির হাতে তৈরী শিল্পকর্ম, তার রেখে যাওয়া স্মৃতিচিহ্ন, তার ফটো ইত্যাদি দিয়ে আলাদা করে সাজানো আছে। আমি স্বামী মাধবানন্দজীকে [চিঠিতে] লিখেছিলাম যে আমি এসব দেখেছি। তিনি তখন মঠ ও মিশনের সংঘাধ্যক্ষ হয়েছেন। তাঁর সব কথা খুব ভালই মনে ছিল। তিনি ঈশির 'ঘর'-এর কথা জেনে খুব সন্তুষ্ট

হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন।

দশমাসব্যাপী [আমেরিকাবাসের] এই কঠিন পরীক্ষা মহারাজের মতো সম্পূর্ণ আলাদা এক জগৎ থেকে পাশ্চাত্যের মহানগরে আসা একজন দ্বিসপ্ততিতম বর্ষ বয়স্ক মানুষের পক্ষে একটা বিরক্তিকর ও কষ্টকর ব্যাপার ছিল। এত ঘনঘন অস্ত্রোপচার, নার্সদের সেবকদের ডাক্তারদের আজ্ঞাবহ হয়ে চলা, সুদীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করে থাকা, হাতে খরচ করার মতো সময় থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত পরিস্থিতির অভাবে তা অল্পই কাজে লাগাতে পারা—এসব [তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া] কি আশ্চর্যের বিষয় ছিল না?

সৌভাগ্যক্রমে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের চমৎকারিত্বের ফলে তাঁর এই ভোগান্তির মধ্যে সর্বদাই শারীরিক যন্ত্রণা খুব কমই সহ্য করতে হয়েছিল। অপরদিকে প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁকে মানিয়ে চলা, মর্যাদাহীনতা ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল এবং যে মধুর সহিষ্ণুতার সঙ্গে তিনি সব কিছু সহেছিলেন সুখ-দুঃখে সম-উদাসীনতার (stoicism) চেয়েও তা অনেক বড়। আমি শিখেছিলাম—বীরত্ব কত ধীর, প্রশান্ত, অচঞ্চল হতে পারে। যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছিলেন সে শিক্ষা পাশ্চাত্যের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

হয়ত ভবিষ্যতে একদিন সুযোগ আসবে যখন পরবর্তী কয়েক বছরে প্রাপ্ত তাঁর পত্রাবলীর রত্নরাজিগুলি সকলের সঙ্গে একযোগে আস্বাদন করতে পারব।

তিনি ছিলেন আমার কাছে এক চ্যালেঞ্জ

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

মহারাজ ছিলেন আমার কাছে এক চ্যালেঞ্জের মতো। তাঁকে প্রথমে মানতে চাইনি, অথচ তাঁর জ্ঞান ও যুক্তির সামনে মাথা নত করতে হয়েছিল। তিনি ভালবাসতেন, অথচ সেই ভালবাসাকে বাধা দিতে চেয়েছিলাম যাতে যুক্তিবাদকে ভাবাবেগ আচ্ছন্ন করতে না পারে। কারুর আধ্যাত্মিকতা বিচার করার শক্তি ছিল না আমার, তাই তাঁকে একজন মানুষ হিসেবেই দেখতাম প্রথমে। তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলাম নম্রতা বা বিনয় নিয়ে নয়, বরং চ্যালেঞ্জের মনোভাব নিয়ে। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ধর্মভাব দেখলে ব্যঙ্গ করতাম। এই মানসিকতা নিয়েই মহারাজের কাছে প্রথম চিঠি দিয়েছিলাম যখন তাঁকে চিনতামও না।

আসলে সে-সময়ে প্রচণ্ড এক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। কমিউনিস্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলাম। পড়াশোনার চেয়েও রাজনীতিই ছিল মুখ্য। কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদেরই কাছের মানুষ বলে মনে হত। মিছিল, নির্বাচন, সভা-সমিতি, গোপন মিটিং, প্রবন্ধ লেখা—এগুলিই সমস্ত সত্তাকে অধিকার করে রেখেছিল। অথচ পাশাপাশি দুটি প্রশ্ন মনকে তোলপাড় করছিল। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে গোপন মিটিং-এ আলোচনা করতাম—পার্টি-নেতৃত্ব ভুল পথে চলছে, সংসদীয় ব্যবস্থার মোহে পড়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ত্যাগ করেছে। এই অবস্থায় কর্তব্য হল একটি নতুন যথার্থ বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতাদের নমস্য ব্যক্তি বলে মনে করতাম। কিন্তু একজনকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে তাঁর সব কথা মেনে নিতে হবে—এই মনোভাবকে গ্রহণ করতে পারিনি। ধর্মীয় গুরুবাদ যদি নিন্দনীয় হয় তবে রাজনৈতিক গুরুবাদই বা মানব কেন? প্রথম প্রশ্নটি থেকেই উঠে এল দ্বিতীয় প্রশ্ন—মানুষের মুক্তি-সংগ্রামে ব্যক্তি মানুষের কি কোনও স্থান নেই? ব্যক্তি কি শুধু পার্টি বা দলের নামে মুষ্টিমেয় নেতৃত্বের হুকুম তামিল করে যাবে? রাজনীতি মানে কি শুধু ক্ষমতা দখল? আগে ক্ষমতা দখল কর, পরে উপর থেকে নীচে সমাজকল্যাণের কর্মসূচী ছড়িয়ে দাও—এই মৌল নীতিতেই কি সব রাজনৈতিক মত ঘুরপাক খাচ্ছে?

একে মার্কসবাদী, তাঁর উপর বিজ্ঞানের ছাত্র। ফলে ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল না। তবে হাক্সলী-রাসেল-সাত্রে-কৃষ্ণমূর্তির বই পড়ে গোঁড়ামি থেকে

মনকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করছিলাম। রাজনীতি প্রসঙ্গে যে প্রশ্নগুলি মনকে তোলপাড় করেছিল, সেই ধরনের প্রশ্ন তুলেছিলাম ধর্ম প্রসঙ্গেও। ধর্ম মুক্তির কথা বলে ঠিকই, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তা মানুষকে নানান বাধা-নিষেধে জড়িয়ে রাখে। তত্ত্ব ও ব্যবহারের মধ্যে বিপরীত আচরণ কি স্ববিরোধিতা নয়? দ্বিতীয়তঃ, ধর্মজগতের নেতাদের মনে হত পুরনো পৃথিবীর বাসিন্দা। বিশ্বের মানুষের জ্ঞান ও কর্মশক্তি যে অনেক বেড়ে গেছে, পুরনো মূল্যবোধের যে আমূল পরিবর্তন দরকার, পূর্বজন্ম ও পরজন্মের চেয়েও বর্তমান জন্মটা যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ—এগুলি তাঁরা বোঝেন না কেন? আমার বোঝায় ভুল থাকতে পারে, কিন্তু তখন এটাই মনে হয়েছিল। আনন্দময়ী মা, সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, স্বামী প্রেমানন্দ (ভারত সেবাশ্রম সংঘ) প্রমুখ ধর্মনেতাদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল বন্ধুরা। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু সেইসঙ্গেই সতর্ক ছিলাম ভাবাবেগ যেন যুক্তিবোধকে ছাপিয়ে না যায়।

মনে হয়েছিল, রাজনীতি মানুষের প্রাথমিক সমস্যা বুঝলেও মৌল সমস্যাকে ধরতে পারেনি, আর ধর্ম মৌল সমস্যাকে বুঝলেও প্রাথমিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না। মার্কস ধর্মকে আফিম বলেছিলেন। এ-বিষয়ে আমার চিন্তাটা ছিল এ-রকম—তিনি ৫০% ঠিক, ৫০% ভুল। ধর্মের মধ্যে কিছু সত্য থাকতেও পারে—এজন্য মার্কস ভুল। বিপরীতদিকে বহু মানুষই ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে পলায়নী মনোবৃত্তির তাগিদে, বহু ধর্মনেতা ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখেন—এদিক থেকে মার্কসের মন্তব্য ঠিক। আবার বলি, এ বিষয়ে আমার বোঝা ভুল হতে পারে, কিন্তু তখন এটাই মনে হয়েছিল।

এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলি লিখলাম তার উদ্দেশ্য, পাঠককে বোঝানো কোন্ মানসিক পরিস্থিতিতে স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের কাছে আমি গিয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, আজ হোক্ কাল হোক্ ঘর ছাড়তেই হবে। পড়াশোনা, ভাল রেজাল্ট, ভাল চাকরী, বিয়ে, সংসার এবং একদিন মৃত্যু—এ জীবনের প্রতি প্রচণ্ড একটা ঘৃণাবোধ ছিল। জীবনের এইরকম সময়ে প্রহ্লাদদা (শ্রীপ্রহ্লাদ পাঠক, কলেজের রসায়ন গবেষণাগারের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী ছিলেন) হঠাৎ একদিন স্বামী বিবেকানন্দের একটি বই দিয়ে পড়তে বললেন। যতদূর মনে পড়ে, বইটি ছিল 'কর্মযোগ'। ইচ্ছা ছিল না, তবুও বইটি নিলাম প্রহ্লাদদার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ। পরীক্ষার সময় সল্ট্ (Chemical Salt) বলে দিয়ে রসায়ন বিভাগের কর্মীরা ছাত্রছাত্রীদের থেকে টাকা নেন—এ-জিনিষ সর্বত্রই চলে। কিন্তু প্রহ্লাদদা ছিলেন বিপরীত চরিত্রের। তাঁর গুরু ছিলেন স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। প্রহ্লাদদার আর্থিক

অবস্থা ভাল ছিল না, প্রায়ই ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে আসতেন, অথচ গরীব ছেলেমেয়েদের সাহায্য করা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। মনে পড়ে একদিন বন্ধুর সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছিলাম, প্রহ্লাদদা পথ আটকে বললেন—"দশটা টাকা দিন তো, আমাদের পাড়ার এক ভিখারী মারা গেছে, তাকে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে।" সেদিন আর সিনেমায় যাওয়া হয়নি।

প্রহ্লাদদাই বলতেন, "মহারাজকে চিঠি দিন আপনার প্রশ্নগুলি জানিয়ে। তিনি ঠিক উত্তর দেবেন।" তাঁর কথাতেই চিঠি দিলাম অনেক প্রশ্ন নিয়ে। উত্তর পেলাম। ভাল লেগেছিল মহারাজের বাস্তববোধ ও যুক্তিপ্রিয়তা দেখে। "মুক্তি মানে তো শুধু নিজেকে নিয়ে নয়! সমাজে যে অসংখ্য দুঃখী মানুষ রয়েছে তাদের কথাও ভাবতে হবে"—মহারাজের এই কথা মনকে স্পর্শ করেছিল। (এখানে বলে রাখি, তাঁর চিঠিগুলি বর্তমানে আমার কাছে নেই। বাড়ি ছাড়ার সময় সেগুলি নিয়ে আসিনি। দীর্ঘকাল পরে তাঁর কথাগুলি আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত করাও সম্ভব নয় কারণ আমার স্মৃতিশক্তি অতটা নিখুঁত নয়। সুতরাং এই প্রবন্ধে মহারাজের উক্তিগুলি যেন ভাবার্থে গ্রহণ করেন পাঠকেরা।) আর একটি প্রশ্ন ছিল—ধর্মীয় বিষয়গুলিতে বিশ্বাস করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। উত্তরে তিনি লিখেছিলেন, "বিশ্বাস নয়, নিজে সাধনা করে দেখ ওগুলি ঠিক কি-না।" পাল্টা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে একটু হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। পরক্ষণেই মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিলাম এই বলে যে এ হয়ত প্রকারান্তরে দীক্ষা নেওয়ার প্রেরণা। মনকে যা-ই বলি না কেন, এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে শুধু অন্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লাভ নেই, অন্যের চ্যালেঞ্জও আমাকে গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয় চিঠি দিয়েছিলাম বেশ কিছুদিন পরে। উত্তরের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু বহুদিন পরও যখন উত্তর পেলাম না, একদিন মনে প্রশ্ন উঠল—এত বড় একটা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, অথচ চিঠির উত্তর দেন না; তিনি কি-রকম মানুষ? আশ্চর্য, সেদিন রাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম। গেরুয়া পরা একজন সন্ন্যাসী, চোখে চশমা, ভাল স্বাস্থ্য। তিনি আমায় বলছেন, "আমার চিঠি না পেয়ে রাগ করেছ? আমি তো তোমার চিঠির উত্তর সময়মতোই দিয়েছি। ডাকের গণ্ডগোলে দেরী হচ্ছে। চিন্তা কোরো না, কাল সকালেই ওটা পেয়ে যাবে।" ঘুম থেকে উঠে স্বপ্নের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। যথারীতি স্নান-খাওয়া সেরে কলেজে যাবার সময় লেটার-বক্স খুলেছিলাম। দেখি মহারাজের চিঠি বাক্সে পড়ে আছে। তারিখটা লক্ষ্য করলাম—প্রায় একমাস আগে লেখা। চমকে উঠেছিলাম। অবিশ্বাস্য, অথচ অস্বীকার করি কিভাবে? অলৌকিক কোন কিছুকে মানতে মন তখনও রাজী নয়। সেদিনই তাঁকে চিঠি দিলাম স্বপ্নের কথা জানিয়ে। সেইসঙ্গে আরও অনেক প্রশ্ন করে।

কিছুদিন পর সব প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন তিনি চিঠিতে, স্বপ্নবিষয়ক প্রশ্নটি বাদে।

ভাবলাম, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে হবে। বেলুড় মঠে গেলাম। তাঁকে দেখে আরেকবার চমকে উঠলাম। আগে তাঁকে কখনও দেখিনি ; প্রথম সাক্ষাতেই দেখলাম, স্বপ্নে দেখা সাধুই বসে আছেন সামনে। নিজের পরিচয় দিয়ে অনেক ভক্তের মাঝেই তাঁকে প্রশ্ন করলাম স্বপ্নের বিষয়ে। তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "স্বপ্ন স্বপ্নই। ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?" "কিন্তু স্বপ্ন কি এতখানি সত্য হয়? আপনার চেহারা, চিঠি পাওয়ার সময়—সব কিছুই ঠিক দেখলাম। এর ব্যাখ্যা কি?"—আমার পাল্টা প্রশ্নে তিনি বললেন, "প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অসীম শক্তি। তোমার মধ্যেও। কোন কারণে হয়ত সেই শক্তি হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল সেই রাতে তোমার ভিতরে। এ-ব্যাপারে আমার কোনও ভূমিকা নেই, তোমারই কৃতিত্ব।"

বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ চিন্তা করেছিলাম সেদিন এ-বিষয়ে। অবাক হয়েছিলাম এই দেখে যে মহারাজ এ-ব্যাপারে নিজের কোন কৃতিত্ব দাবী করলেন না, অলৌকিক ব্যাখ্যাও দিলেন না। তাঁর উত্তর যুক্তিসম্মত মনে হয়েছিল। একটা নতুন আলোর সন্ধান পেলাম। আগে মনে হয়েছিল, ধর্ম মানুষের দুর্বলতার উপর জোর দেয়। বলে প্রার্থনা করতে, প্রায়শ্চিত্ত করতে, নিজেকে দীন-হীন ভাবতে। কিন্তু মহারাজ তো তা বললেন না! বরং তিনি বললেন, প্রত্যেকের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অসীম শক্তি। মানুষের উপর এত আস্থা, এত বিশ্বাস!

ধীরে ধীরে বেলুড় মঠে যাওয়া বাড়তে লাগল। ওখানেই পরিচয় হল সমবয়সী আরও অনেকের সঙ্গে। সব মিলিয়ে আমরা ছিলাম তেরো জন বন্ধু। (পরে নয় জন সংঘে যোগ দিই।) স্বামী প্রমথানন্দ মহারাজ ব্যবস্থা করে দিতেন পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে দেখা করার। বন্ধুদের সবারই দীক্ষা হয়ে গেছে। তারা প্রায়ই আমায় বলত দীক্ষা নিতে। রাজী ছিলাম না। ধর্ম সম্বন্ধে তখনও প্রশ্ন ছিল। তাছাড়া, একজনকে গুরু বলে মেনে নিতে ইচ্ছা ছিল না। রাজনৈতিক গুরুবাদের মতো ধর্মীয় গুরুবাদও মানুষের ক্ষতি করে—এই ধারণা ছিল। একদিন মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, দীক্ষা নিলে গুরুর সব কথাই কি মেনে নিতে হয়? গুরুই নাকি সব করে দেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "সবই যদি গুরু করেন, তবে তোমার মাথা আর দুটো হাত কি জন্য রয়েছে? তোমার ভবিষ্যৎ তোমাকেই গড়তে হবে। ইচ্ছা করলে তুমি অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পার। নিজের দায়িত্ব নিজে নাও।"

অবাক চোখে তাকিয়েছিলাম মহারাজের দিকে। ধর্ম সম্বন্ধে আগে যে ধারণা ছিল, তার কিছুই মিলছে না। মানুষের উপর শুধু বিশ্বাস নয়

মানুষকে স্বাধীনতাও দেন তিনি। আরেকদিনের কথা। তখন বন্ধুরা মিলে একটা বস্তিতে সমাজসেবা করতাম। একদিন মহারাজকে প্রশ্ন করেছিলাম, "মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখার চেষ্টা কিভাবে করতে হয়?" তাঁর উত্তর—"আগে মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখতে শেখ। সে যতই গরীব বা দুঃস্থ হোক, তারও যে একটা আত্মসম্মানবোধ আছে, তারও যে মর্যাদা আছে, সুযোগ পেলে সেও বিরাট হয়ে উঠতে পারে, এ-কথা মনে রেখে তার সঙ্গে ব্যবহার কর। মানুষকে মানুষ হিসাবেই যদি দেখতে না পার, তবে তার মধ্যে ভগবানকে কিভাবে দেখবে?"

মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়তে লাগল। স্বচ্ছ চিন্তা, প্র্যাক্টিক্যাল্ অ্যাপ্রোচ্, স্পষ্ট কথা, মানুষের শক্তিতে ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস—তাঁর এই গুণগুলিতে অভিভূত হলাম। মনে হয়েছিল, একজন খাঁটি মানুষকে খুঁজে পেয়েছি। একদিন তিনি বলেছিলেন, "শুধু গাছের পাতা গুনে কি হবে? আদর্শকে জীবনে ব্যবহারিক করে তোলাটাই মূল কথা। একটা আদর্শের জন্যই বাঁচা, সেই আদর্শের জন্যই মরা, সেই আদর্শকে জীবনে ব্যবহারিক রূপ দেওয়া—এই তো জীবন।"

মহারাজের কাছে যেতাম ঠিকই, তবে রাজনীতিকে তখনও ত্যাগ করিনি। ইতিমধ্যে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি দু'টুকরো হল। পার্টির উপর যে হতাশাবোধ এসেছিল তা দূর হয়ে নবোদ্যমে কাজে লাগলাম। স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন তখন ভাঙার পথে চলেছে। কলেজে নতুন ছাত্র সংগঠন গড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এর মধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তখন লিখতাম। সে-সময় একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম—"ধর্মকে বাদ দিয়ে ভারতে নতুন সমাজ গড়া যাবে না; ধর্মের ভাল দিকগুলিকে গ্রহণ করেই ভারতীয় সমাজতন্ত্রের পথ খুঁজতে হবে।" আরও লিখেছিলাম, "স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে এই নতুন পথ।" দলের একাংশ তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এই লেখার বিরুদ্ধে। অবাক হলাম। তবে কি নতুন দলও রেজিমেন্টেশনের দিকে এগুচ্ছে? দলের উপরতলায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন নীতি ও কর্মপন্থা স্থির করবেন, আর বাকী সবাইকে তা বিনা বাক্যে মেনে নিতে হবে? বেশ কয়েকজন বন্ধু আমায় সমর্থন জানালেও মনে তখন এক অস্থির অবস্থা।

রাজনীতির উপর বিশ্বাস হারাচ্ছি। ওদিকে মহারাজকে ভাল লাগলেও ধর্মকে তখনও মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারিনি। একদিন মহারাজের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বললেন, "নিজের ভাগ্যকে নিজে গড়ে নিতে হয়। নিজে যেটা ঠিক বলে বুঝেছ, সেটা ধরে থাক।"

আরেকদিনের কথা। মহারাজকে বললাম, "আপনার কাছে দীক্ষা নিতে পারি। কিন্তু একটা শর্ত আছে। যদি কোন বিষয়ে আপনার মতের সঙ্গে

আমার মত না মেনে তবে কিন্তু ঐ-বিষয়ে আপনার উপদেশ মানব না।" শুনে মহারাজ একটু হাসলেন। তাঁর তীব্র ব্যক্তিত্বের সামনে হঠাৎ নিজেকে কেমন যেন ছেলেমানুষ মনে হল। তবুও জোর করে বললাম, "কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা কি উচিত?" মহারাজ মাথা নেড়ে বললেন, "না।"

দীক্ষার আবেদনপত্র পূরণ করে চলে এসেছিলাম। কিছুদিন পর বেলুড় মঠ থেকে চিঠি এল দীক্ষা নেবার তারিখ জানিয়ে। সেদিন গেলাম না। চিঠি দিয়ে জানালাম, অন্য একটি তারিখ দিতে। পরে অন্য তারিখ জানিয়ে চিঠি এল। সেবারও গেলাম না। আসলে, মনের মধ্যে তখন তোলপাড় চলছিল। একজনকে গুরু বলে মেনে নেব? হঠাৎ কি-জানি মনে হল একটা পরীক্ষার কথা। দীক্ষার ফর্মে লিখেছিলাম, 'অমুক' দেবতাকে ভাল লাগে। পরে নেহাৎ কৌতূহলবশতই মনে-মনে প্রার্থনা করলাম অন্য আরেক জনের কাছে—"তোমার নামের মন্ত্রে যেন দীক্ষা হয়।" তারপর হঠাৎই একদিন চলে গেলাম বেলুড় মঠে। গিয়ে স্বামী প্রমথানন্দ মহারাজকে বললাম, "আমার দীক্ষার ব্যবস্থা করে দিন।" তিনি আমাদের খুবই স্নেহ করতেন। ব্যবস্থা করে দিলেন। দীক্ষার দিন মহারাজের ঘরের পাশে বারান্দায় বসেছিলাম। পরে একসময় ডাক পড়ল। মহারাজের ঘরের মধ্যে গেলাম। তিনি যখন মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, অবাক হয়ে গেলাম। দীক্ষার ফর্মে যে-দেবতার নাম লিখেছি তাঁর মন্ত্র নয়, বরং যাঁর কাছে মনে-মনে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম তাঁর নামই দিলেন।

দীক্ষার কয়েকদিন পর মনে হল, সাধন-ভজনের ব্যাপারে পার্ট-টাইমার হয়ে লাভ নেই। ঠিক করলাম—সাধু হয়ে ভাল করে জপ-ধ্যান করে দেখতে হবে আধ্যাত্মিক অনুভূতি বলে সত্যিই কিছু আছে কিনা; যদি দুই বছরের মধ্যে কিছু না পাই তবে ফিরে যাব। মহারাজের সঙ্গে দেখা করে বললাম, "সাধু হতে চাই।" তিনি বললেন, "এম. এসসি. পাশ করে এস আগে।" "কেন?" পাল্টা প্রশ্ন আমার—"আপনিও তো এম. এ. পড়তে পড়তে চলে এসেছিলেন, শুনেছি।" তিনি হেসে বললেন, "আমার কথা ছেড়ে দাও। পড়াশুনো করে এলে ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ আরও ভালভাবে করতে পারবে।"

তখন মাথায় একটা বুদ্ধি এল। যুক্তি দিয়ে বললাম, "এখন যখন মনে শুভ ইচ্ছা জেগেছে, তখন সাধু হয়ে যাওয়াই ভাল। পরে ধরুন যদি একটা ভাল চাকরী পেয়ে যাই, তখন তো সাধু হবার ইচ্ছা নাও হতে পারে!" মহারাজ হেসে বললেন, "না না, সে কিছু হবে না। ইচ্ছা করলে তুমি পরে সাধু হতে পারবে।" বললাম, "এ তো আপনি আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলছেন। পরে যে সাধু হতে পারব, তার গ্যারাণ্টি কি?" কথাটা শুনে মহারাজ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আমি

বলছি, তুমি সাধু হবে।"

এর উপর কোন কথা চলেনা। তবুও বললাম, "কিন্তু ধরুন, বাড়ি থেকে তো বাধা আসতে পারে।" মহারাজ উত্তর দিলেন, "না, কোন বাধা আসবে না।" সত্যিই কোনও বাধা আসেনি পরে সাধু হবার সময়। মা-বাবাকে যখন বলেছিলাম যে, আমি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিতে চাই, তাঁরা কোনও আপত্তি করেননি, এক-কথায় তাঁরা দুজনেই সম্মতি জানিয়েছিলেন।

মহারাজের দুটি রূপ দেখেছি। সাধারণতঃ তিনি খুব গম্ভীর, স্বল্প কথার মানুষ। অথচ তাঁর সঙ্গে যখন একা-একা কথা বলতাম তখন তিনি খুবই সহজ। কোনরকম ভয় না রেখে খুব খোলাখুলি কথা বলতাম তাঁর সঙ্গে। তিনি বোধহয় আমার ছেলেমানুষি প্রগল্‌ভতায় কৌতুক বোধ করতেন, কিংবা যুবকদের সঙ্গে সহজভাবে মিশে পরিবেশটা সহজ করে দিতেন। মাঝে-মাঝে এই ভেবে অবাক লাগত, এত বড় একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, অথচ তাঁর ব্যবহার কি সহজ সরল। বারবার বলতেন—"স্বামীজীর বই পড়, স্বামীজীর বই পড়।" বলতেন, "তোমাদের মতো যুবকদের কাছে তিনি অনেক আশা করেছেন। তাঁর সেই আশাকে পূর্ণ কর।"

মহারাজের কাছ থেকে কি শিখেছি? প্রথমতঃ ধর্ম ব্যাপারটি কি? মানুষের মধ্যে অসীম শক্তি লুকিয়ে আছে। সেই শক্তিকে ফুটিয়ে তুলে স্বাধীন হওয়াই ধর্ম। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর সর্বত্র রয়েছেন। প্রত্যেক জীবের মধ্যে তিনি আছেন, এ-কথা মনে রেখে মানুষকে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার দিতে হবে। তৃতীয়তঃ, সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করে যেতে হবে প্রকৃত ধার্মিককে।

মহারাজের আধ্যাত্মিকতা বিচারের শক্তি আমার ছিল না, তাঁকে দেখেছি এক আদর্শ মানুষ হিসেবে। একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, "আপনি তো গুরু, আপনাকে কি চোখে দেখব?" সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠেছিলেন, "গুরু একমাত্র ঠাকুরই—আমি নই। নিজের পথ নিজে তৈরি কর।" বহু পত্র-পত্রিকায় লিখি এ-কথা জানতে পেরে তিনি একদিন বলেছিলেন, "স্বামীজীর বিষয়ে কিছু লেখ? তাঁর কথা লেখ। তুমি যেমন বুঝেছ, তেমনি লেখ।" বলেছিলাম, "যদি ভুল লিখে ফেলি?" একটু যেন বিরক্ত হয়েছিলেন এই বিনয় দেখে। বলেছিলেন, "এ-কথা আগেই কেন ভাবছ? স্বামীজীকে খুব ভাল করে পড়। গভীরভাবে চিন্তা কর। তারপর লেখ। কোন ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।" পরে 'স্বামীজীর সমাজতন্ত্র' বিষয়ে একটি লেখা বেরিয়েছে জেনে বলেছিলেন, "ভাল, লিখে যাও।"

প্রথমদিকে তিনি আমার কাছে এক চ্যালেঞ্জের মতোই ছিলেন। পরে হয়ে উঠেছিলেন আমার কাছে এক সহজ মানুষ।

সতীর্থ স্বামী মাধবানন্দ*

রমেশচন্দ্র মজুমদার

স্বামী মাধবানন্দের তিরোধানে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে আমাকে কয়েকদিন আগে বলা হলেও ঠিক সভাপতিত্ব করতে হবে একথা জানলাম আজ সকালের সংবাদপত্র দেখে। স্বামী মাধবানন্দের অধ্যাত্ম চিন্তার বিষয়ে আমার বলবার কোন অধিকার আছে বলে আমি মনে করি না। তবে তাঁর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি কথা বলতে পারি—তার কারণ স্বামী মাধবানন্দ ছিলেন আমার কলেজ জীবনের সহপাঠী। সে প্রায় ষাট বছর আগেকার কথা। আমরা দুজনেই প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ি এবং দুজনেই থাকি ইডেন হিন্দু হোস্টেলে। ওখানে আমাদের আর একজন সহপাঠী ছিল, তাঁর নাম সীতাপতি [পরবর্তীকালে স্বামী রাঘবানন্দ]। স্বামী মাধবানন্দের নাম ছিল নির্মল। নির্মল আর সীতাপতি ছাত্রজীবনে খুবই ধর্মপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করত। তখনই আমার মনে হয়েছিল এঁরা দুজনে সংসার জীবনের মানুষ নন। ছাত্রজীবনে নির্মল নিয়মিত বেলুড় মঠে আসত, সাধু সঙ্গ করত। আমিও মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে এখানে আসতাম। তারপর বি. এ. পাশ করলাম। আমরা দুজনেই এম. এ.-তে ভর্তি হলাম। আমি এম. এ. পড়তে লাগলাম কিন্তু নির্মলকে দেখতাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আর পড়তে ইচ্ছা নেই। সে প্রথম সাধুজীবন-যাপন করার ইচ্ছায় মাদ্রাজে গেল। তার পরে যে জীবন ওঁর, তার সঙ্গে আমার দুস্তর ব্যবধান। কর্মজীবনে আমরা কে কোথায় ?

পরবর্তী জীবনে আবার ওঁকে পেলুম বেলুড় মঠে। নির্মল তখন বোধহয় মঠের সহকারী সম্পাদক—কি এমনি কিছু। 'Great Women of India' নাম দিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করবার ভার পড়ল আমার এবং নির্মলের উপর। মা ঠাকুরানীর শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময়ে প্রায়ই আমায় আসতে হত। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি। উল্লিখিত গ্রন্থে সংকলিত আমার একটি প্রবন্ধ নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলোচনাকালে আমাকে একটু কঠিন কথা প্রয়োগ করতে হয়।

---

* স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের তিরোধানে ভাণ্ডারা উপলক্ষে ১৮ই অক্টোবর, ১৯৬৫, বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিরূপে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রদত্ত অভিভাষণ। হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম থেকে শংকরী প্রসাদ বসু ও বিমল কুমার ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সেটি হল, বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে কি কি প্রক্রিয়ায় পণ্ডিত পুত্র উৎপাদন করা হয় আবার পণ্ডিতা কন্যার জন্মই বা কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। এখানে 'পণ্ডিতা' বলতে শঙ্করাচার্য তাঁর বৃহদারণ্যকের ভাষ্যে বুঝিয়েছেন, যে কন্যা সাংসারিক গৃহকর্মে নিপুণা সেই হবে 'পণ্ডিতা', কেননা কন্যার তো শাস্ত্রে অধিকার নেই। অতএব বিদ্যা শিক্ষা কন্যার পক্ষে অবিধেয়। সুতরাং 'পণ্ডিতা কন্যা' অর্থে কোন মতেই 'শাস্ত্রজ্ঞা কন্যা' হতে পারে না। এখন এইখানেই আমার আপত্তি। 'বৃহদারণ্যক' সৃষ্টির পরে ১৫০০ বৎসর অতিক্রান্ত হলে শঙ্করাচার্য তার ভাষ্য লিখতে বসলেন। তাঁর মতো মানুষও কিন্তু সংস্কারমুক্ত হতে পারেননি—তাই তিনি 'পণ্ডিতা' শব্দের একটু বিকৃত অর্থ করলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই গার্গীর উল্লেখ আছে। গার্গী প্রভৃতি আচার্য শঙ্করের আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁরা সকলেই পণ্ডিতা, শাস্ত্রে তাঁদের অপূর্ব পারদর্শিতা ছিল। এক্ষেত্রে আমাকে শাঙ্কর ভাষ্যের ত্রুটি ধরতে হল। ঐতিহাসিক হিসাবে আমি কিন্তু শাঙ্কর ভাষ্য মানতে পারলাম না। নির্মল মহারাজ বৃহদারণ্যক উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন। এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। এর চেয়েও বড় কথা শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ। ইংরেজী ও সংস্কৃতে কত বড় পারদর্শিতা থাকলে তবে শাঙ্কর ভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদ সম্ভব—তা আমি বুঝি। যাই হোক ওঁকে বললাম আমার প্রবন্ধে আমি শাঙ্কর ভাষ্য মানতে পারছি না। উনি আমার যুক্তি মেনে নিলেন। অত বড় পণ্ডিত কিন্তু সংস্কার-মুক্ত ছিলেন!

একবার ওঁর ব্রেন টিউমার হল। ডাক্তার বললেন এই ব্যাধি ভয়ানক এবং এর চিকিৎসা এখানে নেই। আমেরিকায় চিকিৎসা হলে উনি সুস্থ হবেন। উনি বললেন—"না না, মৃত্যু তো একদিন আছেই, এত খরচ করে আমেরিকায় গিয়ে দেহের চিকিৎসা করাতে পারব না।" আমরা সবাই বললাম,—"সে কি! তোমার জীবন কি শুধু তোমারই প্রয়োজন?" উনি বললেন,—"ঠাকুরের ইচ্ছায় সে যা হয় হবে, কিন্তু মঠের পক্ষে এত টাকা ব্যয় করা যাবে না।" এই যে নিজের জন্যে নিরুদ্বিগ্ন মানস, এইটাই ছিল তাঁর বিশেষত্ব। তাঁর সব সময়েই মনে হত নিজের জন্যে যেন কোন কারণে অতিরিক্ত ব্যয় না হয়। অবশেষে তিনি অবশ্য আমেরিকায় যেতে রাজী হয়েছিলেন—যখন স্বামী নিখিলানন্দ তাঁকে জানালেন —"অপারেশনের ব্যয়ভার এখান থেকেই বহন করা হবে, আপনি এখানে [আমেরিকায়] চলে আসুন।" তিনি গিয়েছিলেন এবং অপারেশন করিয়ে অবশেষে সুস্থ হয়ে ফিরেও এসেছিলেন।

একবার তাঁর মনে একটা প্রশ্ন জাগল—নিউইয়র্কে বেদান্ত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা কে করেন, স্বামী অভেদানন্দ, না স্বামী বিবেকানন্দ? সে এক গবেষণার ব্যাপার। নির্মল মহারাজ বললেন, "তোমাকে এই সব বই, চিঠিপত্র বা কাগজপত্র

পাঠ করতে হবে এবং একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে হবে।" বললাম, "এতো অনেক পড়াশুনার ব্যাপার।" তিনি বললেন, "তা হোক, এসব দেখে তোমাকে বলতে হবে।" আমার সব কাগজপত্র পড়তে প্রায় দিন পনেরো লাগল। তারপর আমার রিপোর্ট তৈরী করে এনে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখলাম মঠে নেই। কোথাও গেছেন। অপেক্ষা করলাম, জানতাম আসবেন। দেখি, টেবিলে একটি গ্রন্থ খোলা—Letters of Swami Vivekananda (স্বামীজীর পত্রাবলী)। একটি মাত্র চিঠি খোলা আছে। উনিও পড়াশুনা করছিলেন। যে চিঠিটি দেখলাম সেই চিঠি আমিও দেখেছি, কিন্তু বেদান্ত মঠ থেকে প্রকাশিত আমার দেখা সেই বইটিতে চিঠির প্রথম দু লাইন ছিল না। যাই হোক সব সন্দেহের নিরসন হল।

এরপর আরও সব কথা মনে পড়ছে। ব্যক্তিগত কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে, আবার না বললে ওঁর চরিত্রের আর একদিক অপ্রকাশিত থেকে যাবে। একদিন আমি নির্মল মহারাজকে বললাম,—"দেখ, তোমাদের কাশী সেবাশ্রমে একটা ঘর আমি করতে চাই হাজার পনেরো টাকা খরচ করে। এতে আমার স্ত্রীর জীবনসত্ব থাকবে, তারপর তা মঠের সম্পত্তি হয়ে যাবে।" নির্মল মহারাজ কিন্তু শুনে খুব রেগে গেলেন। বললেন, "না না, তা কি করে হয়? কেন তুমি মারা গেলে আমাদের কি এমন কেউ থাকবে না যে তাঁর দেখাশুনা করবে? এর জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে। দেশেও কি কেউ থাকবে না? না না, তা হতেই পারে না।" নির্মল মহারাজ তাঁর চিন্তা থেকে আর নামতে চাইলেন না, আমিও আর অনুরোধ করতে পারলাম না। তিনি সংসারী না হয়েও আমাদের মতো মানুষের স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সংবাদ গ্রহণ করতেন।

স্বামী মাধবানন্দের দেহত্যাগে আপনাদের গুরুর আসন শূন্য হয়েছে। সে আসন শূন্য থাকবে না। আজ আপনাদের হৃদয়ে যে কান্না আছে আমার হৃদয়ে তার চেয়ে কম বেদনা নেই। নির্মল মহারাজের তিরোধানে আমি আমার বাল্যকালের এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে এই বয়সে হারালাম। এ ব্যথা ও এ শূন্যতা আমার হৃদয় জুড়েও···(বেদনায় তাঁর বাক্‌রোধ হল তিনি আসন গ্রহণ করলেন।)

সন্ধ্যাপ্রদীপ সম স্মৃতি অনুপম*

অমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যখন ময়মনসিংহে শ্রীযুক্ত জিতেন দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তখন পূজনীয় মাধবানন্দ মহারাজকে আমরা প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম। তিনি পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের অনুরোধে ময়মনসিংহ টাউন হলে স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্ম বিষয়ে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ পূজনীয় মাধবানন্দ মহারাজকে স্বামীজীর সেবাধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিলে তিনি প্রথমে এই বলিয়া অস্বীকার করেন যে, তাঁহাদের মতো মহাপুরুষদের উপস্থিতিতে তাঁহার পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। পুনরায় পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে আদেশ করিলে, তিনি তাঁহাদের নিকট করজোড়ে প্রণাম করিয়া আদেশ মান্য করিলেন এবং একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ তাঁহার বক্তৃতা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

তাহার পর আমরা তাঁহাকে মঠে বহুবারই দেখিয়াছি। তিনি আমাদের কৃপা করিয়া মধ্যে মধ্যে উপদেশও দিতেন। মহারাজ চিরদিনই কঠোর সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি বহুকাল মঠ ও মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। মঠ-মিশনের কাজের মধ্যে আমরা তাঁহার তীক্ষ্ন বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছি। তিনি যখন শেষবার আমেরিকা হইতে আসিলেন আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে মঠের 'গেস্ট-হাউস' (অতিথি ভবন) এ গিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে যে সকল কথা উপস্থিত অনুরাগী ভক্তদের সামনে আমার সঙ্গে হইয়াছিল তাহারই একটি চিত্র এখানে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

অমূল্য ঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আপনি 'ব্রেন-অপারেশন' (মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার)-এর পর আরোগ্য লাভ করেছেন—এতে আমরা খুবই আনন্দিত। আপনারা বেঁচে থাকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের কত কাজ হয় এবং আমাদেরও কল্যাণ

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব কমিটি, দমদম এয়ারপোর্ট কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব স্মরণিকা' ১৯৬৭ সংখ্যায় মুদ্রিত অমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায় রচিত 'পূজ্যপাদ শ্রীমৎ মাধবানন্দ মহারাজের পুণ্য স্মৃতিকথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। স্মরণিকাটি ফণীভূষণ শ্যামরায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

হয়।

মহারাজ ঃ স্বামীজী তো ৩৯ বৎসর বেঁচে ছিলেন, তারপর কি ঠাকুরের কাজ হচ্ছে না ? বরং আরো বেশী হচ্ছে।

অমূল্য ঃ হ্যাঁ, কিন্তু মহারাজ, আপনাদের সঙ্গ আমাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমরা ১৯১৫ সালের জানুয়ারীতে পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজের [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] সঙ্গে ময়মনসিংহে আপনাকে প্রথম দর্শন করি। এতকাল পূর্বের পরিচয়—এতে আনন্দই হয়।

মহারাজ ঃ তুমি ভুল করলে, ১৯১৫ সালে নয় ১৯১৬ সালে।

অমূল্য ঃ হ্যাঁ মহারাজ, আমারই ভুল হয়েছে। ১৯১৬ সালেই বটে। (তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির প্রমাণ দেখে আমি খুব বিস্মিত হইলাম।)

অমূল্য ঃ মহারাজ, 'কথামৃত'-র দ্বিতীয় ভাগে (পৃঃ ৬১) পড়েছি—শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—"কি জান, সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে পড়ে। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুন মনের যা ক্ষতি হয়,—সে ক্ষতি আবার পূরণ হয়, যদি কেউ সন্ন্যাস গ্রহণ করে।" ভগবান যীশুখৃষ্টও বলেছেন, "Except ye be born again ye can not enter into the kingdom of Heaven.—যদি তোমার পুনর্জন্ম (ত্যাগ বা সন্ন্যাস) না হয় তবে তুমি স্বর্গ রাজ্যে যেতে পারবে না।" মা-বাবার ঘরে প্রথম জন্ম, তারপর দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নে, আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়। আমাদের সংসার করতে হয়েছে, এখন কি করা কর্তব্য।

মহারাজ ঃ হ্যাঁ, ঠাকুর যা বলেছেন তা সত্য, সন্দেহ কি ? তবে কি জান, সন্ন্যাস হচ্ছে মনে, তা যদি না হয়, কামনা-বাসনা না যায়, চরিত্রগঠন না হয়, তবে সন্ন্যাস নিলেও কিছু হবে না। সন্ন্যাস আশ্রম একটি শিক্ষার স্থান মাত্র। সন্ন্যাস নিয়ে Struggle (সংগ্রাম) করতে হয়। তাতে কৃতকার্য হলেই ঠিক ঠিক সন্ন্যাস। তা না হলে, সন্ন্যাস নিয়েও বিশেষ উপকার হয় কিনা জানিনা ; লাল কাপড়খানায় যদি বিবেক-বৈরাগ্য আনে, অর্থাৎ সন্ন্যাসী যদি ভাবে যে আমি লাল কাপড় পরে এইসব করছি কি ? তবে ভাল কথা। তবে নেহাৎ যখন কপাল খারাপ হয় তখন এই বিবেকটুকুও থাকে না। তোমরা তো জান, পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন, "কেহ perfect (পূর্ণ) হয়ে আসেনি, এখানে এসেছে perfect (পূর্ণ) হতে। তাই খুব Struggle (সংগ্রাম) করতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাদের এই উদ্যম দেখে সাহায্য করেন ও যথার্থ সন্ন্যাস রক্ষা করেন। কাপড়ে কিছু আসে যায় না। আমরা রামপুর-হাটের মুকুন্দবাবুকে বিশেষভাবে জানি। দেখ তাঁর কত কর্ম, ভক্তি, বিশ্বাস, ত্যাগ। তিনি তো সাদা কাপড়ই পরেন। তাঁকে দেখে আমরা অবাক হই। ভগবানে ভক্তি বিশ্বাসই আসল কথা। তাঁর কৃপায় এই সব যদি তোমাদের

জীবনে এসে থাকে তবেই কৃতার্থ হলে। আমরা তোমাদের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করছি তিনি তোমাদের জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস ও চরিত্র দিন, তবেই জীবন ধন্য হবে।"

আমরা তাঁহার এই সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলাম এবং মনে হইতে লাগিল আচার্য শঙ্করের সেই চিরস্মরণীয় অমোঘ বচন— "ক্ষণমিহ সজ্জনসংগতিরেকা। ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।"

১৯।৮।৬৪ বুধবার, বেলা ৪-৩০ মিঃ, বেলুড় মঠ। মঠে আসিয়া প্রথমেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিলাম। পূজনীয় মাধবানন্দ মহারাজকে দর্শন করিতে চলিলাম Guest House (অতিথি ভবন)-এ। মহারাজের প্রধান সেবক পূজনীয় ধীরেন মহারাজ আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে মহারাজের নিকট হইতে আমার দেখা করিবার অনুমতি লইয়া আসিলেন। এইজন্য আমি কৃতজ্ঞ। পূজনীয় মহারাজকে গেষ্ট হাউসের (অতিথি ভবন) দক্ষিণ বারান্দায় ইজিচেয়ারে (আরাম কেদারা) উপবিষ্ট অবস্থায় দর্শন করিলাম। ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই মহারাজ বলিলেন, "এই আসনখানায় বসো।" আমি সঙ্কোচ করিলে তিনি বলিলেন, "আমি তোমার জন্যই আসন পেতে রাখিয়েছি।" অগত্যা তাঁহার আদেশ মান্য করিলাম।

অমূল্য ঃ মহারাজ, শ্রীশ্রীমার ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদগণের স্মৃতিকথার ডায়েরী এবং পূজনীয় কেদার বাবার পত্রাবলী রেখেছিলাম। আপনার নিকট আদেশ নিতে এসেছি ছাপাব কিনা ; এই দুখানা বই বিক্রয়ের সমস্ত আয় বারাসত রামকৃষ্ণ শিবানন্দ আশ্রমে [বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ] শ্রীশ্রীঠাকুর সেবায় ব্যয়িত হবে, এই আমাদের ইচ্ছা।

মহারাজ ঃ তা বেশ, ছাপাও। শ্রীশ্রীমা ও মহারাজদের পুণ্য কথা ছাপালে ভক্তগণের উপকারই হবে, তাতে সন্দেহ নেই। এঁদের অমূল্য উপদেশ এখন না ছাপালে পরে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

তাহার পর এই বই দুইখানা কিভাবে ছাপানো হইবে সেই সম্বন্ধে কুড়ি মিনিট যাবতীয় উপদেশ দিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিলেন।

মহারাজ ঃ বইয়ের কি নাম দিয়েছ এবং কে এডিট্ করবেন ?

অমূল্য ঃ উদ্বোধনের অধ্যক্ষ পূজনীয় জ্ঞানাত্মানন্দ মহারাজ বইয়ের ঘটনাগুলি দয়া করে শুনে আমাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখন বইয়ের কি নাম দেব দয়া করে বলে দিন।

মহারাজ ঃ তুমি কি নাম দেবে বলে ঠিক করেছ ?

অমূল্য ঃ আমি আপনাদের নিকট বইয়ের নামকরণের বিষয়ে সাহায্য চাইছি।

মহারাজঃ তোমার মনটাতো এই বিষয়ে একেবারে ব্ল্যাঙ্ক (খালি) নয়। তুমি বল, তার পর আমি বলব।

অমূল্যঃ "শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদগণের স্মৃতিকথা"—এই নাম আমার মনে উঠেছে।

মহারাজঃ তুমি তো সব পার্ষদগণের স্মৃতিকথা লিখছ না, মাত্র সাতজনের লিখছ। ভক্তগণ মনে করবেন যে, সব মহারাজদেরই স্মৃতিকথা বইতে আছে। এইভাবে তাঁদের Cheat (প্রতারণা) করা হবে।

অমূল্যঃ মহারাজ, সব মহারাজদের নাম কভার পেজে দেওয়া তো সম্ভব নয়।

মহারাজঃ তা ঠিকই বলেছ। এক উপায় আছে। তুমি কভার পেজে ঐ নামই দাও। ভূমিকায় মহারাজদের সাতজনের নাম দেবে। কোনও ভক্ত যখন কিনবে সে তো ব্লাইণ্ড (অন্ধ) নয়, সে দেখতে পাবে মাত্র এই কয়জনের স্মৃতিকথা আছে। এই ভাবে দিলে এতে তোমার আর Cheating (প্রতারণা) করা হবে না।

আমি তাঁহার সূক্ষ্ম যুক্তি ও সম্পূর্ণ সততার কথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাহা শিরোধার্য করিলাম।

মহারাজঃ তুমি এই বই ছাপাবার খরচ কোথায় পাবে ?

অমূল্যঃ আমি এই বিষয়ে কারো নিকট সাহায্য চাইব না। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ একদিন আমাকে বলেছিলেন "কারো নিকট হাত পাতবি না, পাতলে ছোট হয়ে যাবি। ঠাকুর তোদের আবশ্যক মতো অর্থ দেবেন।"

মহারাজঃ (রহস্য করে হাসতে হাসতে বললেন) তবে কি ঠাকুর একদিন রাত্রে তোমাদের ঘরের বারান্দায় টাকা রেখে আসবেন ?

অমূল্যঃ এই বই ঠাকুর সেবার জন্য লিখছি শুনে অনেক পরিচিত ভক্ত অর্থ সাহায্য করতে রাজী হয়েছেন।

মহারাজঃ আমি শুনে বড়ই আনন্দিত হলাম। দেখ, মহাপুরুষদের কথা কখনও বিফল হয় না। আমি বলছি তোমাকে কিছু টাকা রাখতে হবে দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য ; কারণ আবার এইসব ভক্তদের কাছে টাকা চাওয়া সঙ্গত হবে না।

আমি তাঁহার এই দূরদর্শিতার পরিচয় পাইয়া অবাক হইলাম।

অমূল্যঃ আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে বই দুখানা ছাপা হয়ে যায়।

মহারাজঃ পূজনীয় কেদার বাবার শুধু পত্রাবলী ছাপিয়ো না। তার সঙ্গে তাঁর স্মৃতি ও জীবন-কথা দিলে ভক্তদের আকর্ষণ বাড়বে। সৎ কাজে ঠাকুর তোমাকে সাহায্য করবেন। তোমার এই বই লেখা তো গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। তাঁদেরই কথা তাঁদেরই সেবাতে ব্যয়িত হবে ; তাতে তুমিও মাঝে

থেকে ধন্য হয়ে যাবে।

বই দুটি প্রকাশিত হইবার পর আমি তাঁহাকে ২৫।৫।৬৫ তারিখে তাহা প্রদান করিলে তিনি অত্যন্ত খুশি হইয়াছিলেন। পরে শুনিয়াছিলাম, তিনি বই দুখানা পড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মাধবানন্দজী মহারাজের সম্পর্কে আমার এই পুণ্য স্মৃতি দীর্ঘকাল পূর্বের ; ইহা আমার মনের মণিকোঠায় চিরকাল জাগরিত থাকিবে। তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নাই, কিন্তু তাঁহার এই স্মৃতিকথা আজও সন্ধ্যা প্রদীপের মতো হৃদয়ে জ্বলিতেছে।

লইনু শরণ

নির্মল কুমার রায়

সেদিন ছিল ১৯৬৪ সালের ৯ই মার্চ ; সময়—সন্ধ্যার পূর্বক্ষণ। বেলুড় মঠে পৌঁছে যথারীতি মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে এবং শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী মাধবানন্দজীকে প্রণাম করলাম। তখন তিনি ঘরে একাকী। যেন কারুণ্যের প্রতিমূর্তি। ভাবস্থ।

প্রণামান্তে তাঁরই সচিব স্বামী প্রমথানন্দজীর কাছে গিয়ে প্রকাশ করলাম আমার দীক্ষা গ্রহণের আগ্রহের কথা। তিনি কৃপা করে আমাকে একটি মুদ্রিত আবেদনপত্র দিয়ে সেটির যথাযথ উত্তর লিখে জমা দিতে বললেন এবং নিজেও কয়েকটি প্রশ্ন করে আমার মনের ভাবটি জেনে নিলেন।

যাইহোক, আবেদনপত্রের সমুদয় প্রশ্নের উত্তর লিখে তখনই সেটি স্বামী প্রমথানন্দজীর হাতে জমা দিয়ে আমি অনুরোধ করলাম—"আগামীকালই কৃপা করে আমার দীক্ষার ব্যবস্থা করুন।" মহারাজ একটু হেসে পরম স্নেহভরে আবেদনপত্রের শেষাংশের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ; সেখানে লেখা ছিল—"দীক্ষার তারিখ পড়িতে প্রায় দেড় মাস দেরী হইবে।"

কিন্তু সেদিন তখন আমার প্রতিক্ষণে মনে হচ্ছে, আমার অবিলম্বে দীক্ষার প্রয়োজন, আমার গুরু চাই। অন্তরে হাহাকার উঠেছে। চোখ বারেবারেই জলে ভরে আসছে। সেই সময় আমার মনে যে ব্যাকুলতার সঞ্চার হয়েছিল, জীবনে আর কোনদিন অবশ্য সেরূপ হয়নি। বার বার স্বামী প্রমথানন্দজীকে আমার অন্তরের প্রার্থনা জানিয়েও যখন তাঁর নিরুপায় অবস্থা অনুভব করলাম, তখন উজ্জীবিত অভিমানে আবার ফিরে গেলাম ঠাকুরের মন্দিরে আরাত্রিক-ভজনে যোগদান করতে।

ভজন শেষ হলেই আবার সেই প্রবল অলৌকিক আকর্ষণ! মন্দির ছেড়ে পুনরায় গেলাম অধ্যক্ষ মহারাজের বাসভবনে। এবার সত্যই অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হল! আমাকে দেখেই স্বামী প্রমথানন্দজী আশ্বাসভরা কণ্ঠে জানালেন, "আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে। আগামীকাল পূর্বনির্দিষ্ট কয়েকজনের দীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল ; কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজন আসতে পারবেন না বলে কিছুক্ষণ আগে টেলিফোনে জানালেন। অধ্যক্ষ মহারাজ যদি অনুমতি দেন,

তবে আগামীকালই সেই অনুপস্থিত দীক্ষার্থীর স্থলে আপনার দীক্ষা হতে পারে।" অতঃপর স্বামী প্রমথানন্দজী অধ্যক্ষ মহারাজের ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। চারদিকে এক মধুর নীরবতা বিরাজমান। আমার বুকের মধ্যে তখন ঠিক যেন হাতুড়ি পেটার অবস্থা চলছে।

কিছুক্ষণ পরে স্বামী প্রমথানন্দজী এসে বললেন, "আগামীকালই (১০।৩।১৯৬৪) আপনার দীক্ষা হবে।" তিনি আমার হাতে সঙ্গে সঙ্গে একটি ছাপানো পোষ্টকার্ড দিলেন, যাতে দীক্ষাগ্রহণকালীন অধ্যক্ষ মহারাজের কতকগুলি নির্দেশ ছিল।

সেদিন বাড়ি ফিরে আনন্দে বিনিদ্র রজনী যাপন করে, পরের দিন প্রাতঃকালেই যথাসময়ে দীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট দ্রব্যাদি নিয়ে মঠে হাজির হলাম। দীক্ষান্তে সেই দিন মঠে ঠাকুরের প্রসাদও পেয়েছিলাম।

আমার দীক্ষাগ্রহণের পর, অর্থাৎ ১০ই মার্চ ১৯৬৪ সাল থেকে গুরুমহারাজের মহাপ্রয়াণের দিন অর্থাৎ ৬ই অক্টোবর ১৯৬৫ সাল অবধি মাত্র এক বছর সাত মাস তাঁকে স্থূলশরীরে দর্শন করেছি, তাঁর সান্নিধ্যে অনেকবার গিয়েছি, পত্র দিয়ে উত্তরও পেয়েছি। তাঁর সব কটি পত্র সযত্নে আমার কাছে অমূল্য সম্পদের মতো রক্ষিত আছে। এখানে মাত্র একটি পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি তাঁর কৃপাকথা প্রকাশের আগ্রহে।

একদা কোন কারণে মানসিক অশান্তির প্রবল ঝড়ে আমার মনটি বিধ্বস্ত হতে চলেছিল এবং জপ-ধ্যানে বিঘ্ন ঘটতে শুরু করেছিল। মহারাজজীকে সে কথা লিখলে তিনি পথনির্দেশ করলেন—"তোমার পত্রের মর্ম জানিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। ঠাকুরকে ধরিয়া থাক—যতই অশান্তি বিপদ আসুক না কেন। তিনি কৃপাময়, তাঁহার দয়া হইলে এক মুহূর্তেই সকল অশান্তি কাটিয়া যাইতে পারে।"

মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পূর্বে তাঁর স্বহস্তে লেখা শেষ পত্রখানিও পরে মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমার কাছে।

আমি ধন্য, আমি ভাগ্যবান! জয় প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ! জয় গুরু মহারাজ!

পরিশিষ্ট

অতিরিক্ত তথ্য

(১)

বর্তমান গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠায় ১৬ লাইনে 'স্বামী মাধবানন্দ জীবনকথা'য় উল্লিখিত হয়েছে : "শশী মহারাজ বলে দিয়েছিলেন, 'পুরী হয়ে যাও। সেখানে সাক্ষাৎ জীবন্ত জগন্নাথ দর্শন হবে।' মহারাজকে mean (উদ্দেশ্য) করেই বলেছিলেন। আমি তাই করেছিলাম। মহারাজ একজনের কাছে বলেছিলেন, 'ছেলেটাকে যেন Body warrant করে নিয়ে গেল। আমার দেখে কষ্ট হচ্ছে'।" স্বামী মাধবানন্দজীর দেহত্যাগের পরে বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা 'স্বামী মাধবানন্দ' থেকে উপরিউক্ত তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু 'বেদান্ত কেশরী', আগষ্ট, ১৯৪৮ সংখ্যায় স্বামী মাধবানন্দজী লিখিত 'At the feet of the saints in the Madras Math' শীর্ষক প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে অন্যবিধ তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বামী মাধবানন্দজী লিখেছেন, "At puri, we were blessed to meet Maharj. What his reactions on seeing us were, I knew the next time I met him there, some four months later. He said to a friend, 'The boy was mercilessly dragged under a body warrant, as it were'." স্বামী মাধবানন্দজী তাঁর উপরিউক্ত স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল মাদ্রাজ মঠে গিয়ে ৮ দিন অতিবাহিত করে কলকাতায় ফেরার পথে পুরীতে রাজা মহারাজকে প্রণাম করে আসেন। এই ঘটনার প্রায় চার মাস পরে অর্থাৎ আনুমানিক ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী মাধবানন্দজী দ্বিতীয় বার পুরীতে রাজা মহারাজের কাছে উপস্থিত হলে তখন তিনি [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] স্বামী মাধবানন্দজীর প্রথমবারের কলকাতা প্রত্যাবর্তনের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে উপরিউক্ত মন্তব্য করেন।

(২)

বর্তমান গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় ২–৮ লাইনে উল্লিখিত হয়েছে ঃ "শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভের পর আরও অন্তর্মুখী হল নির্মলের মন। তিনি সাধন ভজনে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন। তুচ্ছ হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা। আরও অধিকতর প্রিয় হয়ে উঠল জপ–ধ্যান। পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা খুলতে একেবারে অনীহা। একেবারে অমনোযোগী হয়ে পড়লেন পড়াশুনায়। নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না তিনি। অন্তরের বৈরাগ্য অনলের প্রবাহে সোজা পুরীধামে রাজা মহারাজের কাছে উপস্থিত হলেন নির্মল।" উপরিউক্ত তথ্যগুলি বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত 'স্বামী মাধবানন্দ' নামক পুস্তক থেকে পাওয়া যায়। যদিও 'বেদান্ত কেশরী', আগষ্ট, ১৯৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী মাধবানন্দজীর স্বলিখিত প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলকাতায় বলরাম বাবুর বাড়িতে স্বামী মাধবানন্দজী পুনরায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর দর্শনলাভ করেন। তখন স্বামী মাধবানন্দজী এম. এ. ক্লাশে সবেমাত্র ভর্তি হলেও তখনও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করেননি। অর্থাৎ পুরীতে রাজা মহারাজের কাছে দ্বিতীয়বার গমন (যা স্বামী মাধবানন্দজীর স্বলিখিত স্মৃতিকথা অনুসারে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা) শ্রীশ্রীমায়ের কাছে কৃপালাভের পূর্বেকার ঘটনা।

(৩)

বর্তমান গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায় স্বামী মাধবানন্দজী সম্পাদিত বইয়ের তালিকায় সংযোজিত হবে : ৭) ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।

(৪)

বর্তমান গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠায় স্বামী মাধবানন্দজী লিখিত ভূমিকালিপি সংবলিত বইয়ের তালিকায় সংযোজিত হবে :

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা ষ্টুডেন্টস্ হোম, বেলঘরিয়া কর্তৃক প্রকাশিত 'স্বামী নির্বেদানন্দ : জীবনী ও রচনাদি সংগ্রহ' (১৩৬৬)।

(৫)

বর্তমান গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় স্বামী বিমলাত্মানন্দ রচিত 'জীবনকথা' এবং ৩১০–৩১১ পৃষ্ঠায় স্বামী শান্তরূপানন্দ রচিত স্মৃতিকথা অনুসারে অডিকোলন দেওয়ার ঘটনাটি স্বামী মাধবানন্দজীর দেহত্যাগের দু'চার দিন পূর্বে ঘটেছিল। কিন্তু ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের স্মৃতিচারণ অনুসারে (পৃষ্ঠা ১৪৭) উক্ত ঘটনা দেহত্যাগের অল্প কিছুক্ষণ আগে ঘটেছিল।

নির্দেশিকা

নির্দেশিকাটি প্রস্তুত করেছেন শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ।

যাঁদের সাহায্য ছাড়া এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব হত না

তথ্য, সূত্র ও উপাদান দিয়ে এবং অন্যবিধ সহায়তা করেছেন ঃ স্বামী নির্জরানন্দ, স্বামী অকুণ্ঠানন্দ, স্বামী স্বানন্দ, স্বামী অমলানন্দ, স্বামী চন্দ্রানন্দ, স্বামী ভর্গানন্দ, স্বামী প্রমথানন্দ, স্বামী অনাময়ানন্দ, স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ, স্বামী মুমুক্ষানন্দ, স্বামী বাগীশানন্দ, স্বামী উমানন্দ, স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী যোগেশানন্দ, স্বামী অচ্যুতানন্দ, স্বামী শশাঙ্কানন্দ, স্বামী শান্তরূপানন্দ, স্বামী লোকেশানন্দ, স্বামী বিমলাত্মানন্দ, স্বামী বিবেকাত্মানন্দ, স্বামী সর্বগানন্দ, দিনাজপুর (বাংলাদেশ) রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় বি. টি. কলেজ, বেলুড় মঠ গ্রন্থাগার, অদ্বৈত আশ্রম গ্রন্থাগার, উদ্বোধন গ্রন্থাগার, গদাধর আশ্রম গ্রন্থাগার, বারাসত মঠ গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিষ্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন আশ্রম (ইণ্টালী), রামকৃষ্ণ সারদা মিশন মাতৃভবন, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন, হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের পক্ষে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শ্রীবিমল কুমার ঘোষ, বামুনমুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সমাজশিক্ষা' পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী, প্রেসিডেন্সী কলেজ এ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশনের শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীগড়স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাষ্টের শ্রীমতী ঈশ্বর দেবী গুপ্তা, শ্রীপবিত্র রায়চৌধুরী, শ্রীসুমিত সাহা, শ্রীসুরজিত চন্দ্র দাস, অধ্যক্ষ অমিয় কুমার মজুমদার, শ্রীনির্মল কুমার রায়, শ্রীমতী মীরা মিত্র (এলাহাবাদ), শ্রীনরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ও শ্রী বিজয় সরকার (উত্তরপাড়া), শ্রীমতী উমা সেনগুপ্তা (বোম্বাই), অধ্যাপক শেখর চন্দ্র শেঠ (শিবপুর বি. ই. কলেজ), অধ্যাপক অরুণ কুমার বিশ্বাস (আই. আই. টি. কানপুর), শ্রীকৃষ্ণদাস লাহিড়ী (রাঁচী), শ্রীপীযূষকান্তি রায়, শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়াত অধ্যাপক ফণিভূষণ সান্যাল, শ্রীসুনীল চৌধুরী, শ্রীফণিভূষণ শ্যামরায়, শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, বিচারপতি অরুণ কুমার দাস, শ্রীকালীশঙ্কর দাশগুপ্ত, শ্রীব্রজেন ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ফটো ল্যাবের শ্রীপার্থসারথি নিয়োগী, সি ব্রাদার্স স্টুডিওর শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়।

যাঁদের সানুগ্রহ আনুকূল্য গ্রন্থপ্রকাশের কাজ সুগম করেছে ঃ স্বামী স্বাহানন্দ, স্বামী প্রমথানন্দ, স্বামী তথাগতানন্দ, স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দ, স্বামী হিতাত্মানন্দ, স্বামী নির্লিপ্তানন্দ, স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দ, স্বামী জয়ানন্দ, স্বামী বরদানন্দ, শ্রীসত্যবিলাস ঘোষ (ব্যাণ্ডেল), প্রয়াত কৃষ্ণপ্রতাপ মিত্র (দিল্লী), শ্রীআশু বসু, আভা প্রেসের শ্রীঅরুণ মজুমদার, সার্ভোলিঙক ইণ্ডিয়ার শ্রীনির্মাল্য গুহ, শ্রীমতী গীতা সেন।

প্রেসকপি করেছেন ঃ সর্বশ্রী কুমারেশ মিত্র, সুধাময় বসু, দেবপ্রসাদ পাল, মানব দাস, অঞ্জন বসু, শ্রীমতী শেফালী বসু ও শ্রীমতী কেকা মিত্র।

বাংলায় ভাষান্তর করেছেন ঃ স্বামী গর্গানন্দ, স্বামী বিকাশানন্দ, স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী চৈতন্যানন্দ, স্বামী সর্বগানন্দ, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক নীরদ বরণ চক্রবর্তী, প্রয়াত অশোক কুমার সেন, শ্রীআনন্দ বাগচী, শ্রী শশাঙ্ক ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনির্ঝরকান্তি ভট্টাচার্য ও শ্রীঅঞ্জন বসু।

প্রুফ দেখেছেন ঃ অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোষ, সর্বশ্রী রবীন্দ্রনাথ বসু, কুমারেশ দাস, মধুময় বসু, নির্ঝরকান্তি ভট্টাচার্য, পার্বতী মুখোপাধ্যায়, রঞ্জন বসু, বরুণ (শান্তি) চৌধুরী, গুঞ্জন বসু, শ্রীমতী সুচিত্রা বসু ও সমর্পিতা বসু।